অভ্যাসের অন্ধকার

প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা

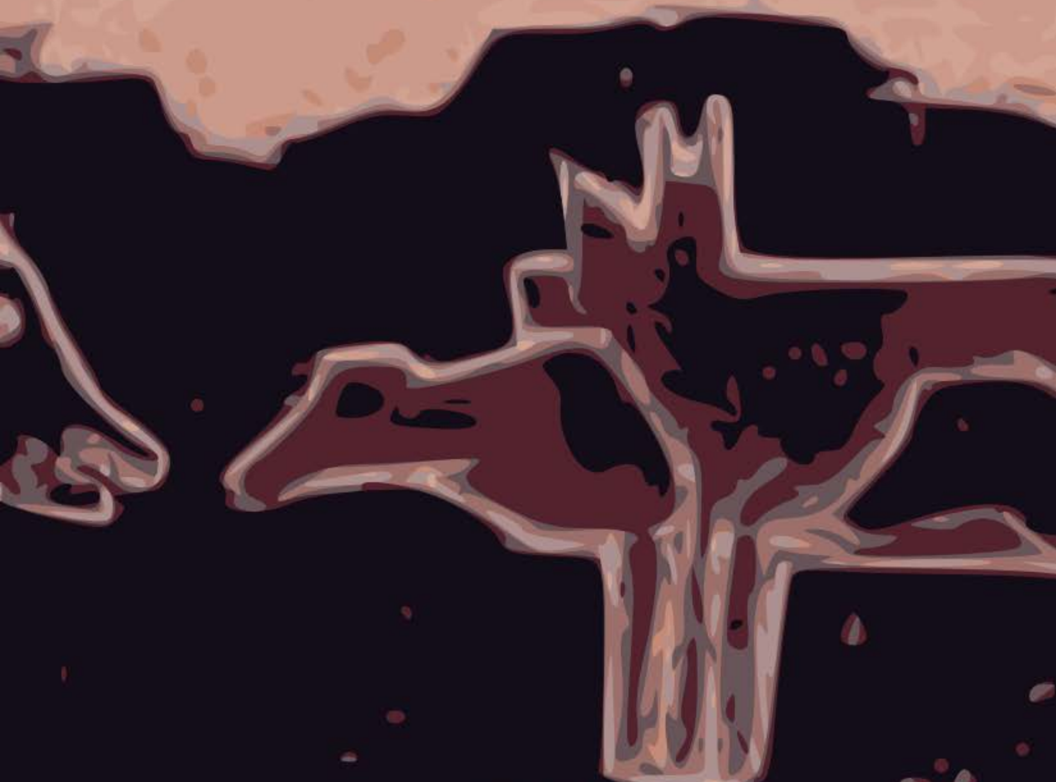

সম্পাদনা

সেলিম রেজা নিউটন

অভ্যাসের অন্ধকার

প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা: চার

সম্পাদকের অন্যান্য বই

অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন
আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৫

পরিস্থিতির বিবরণ
উলুখড় প্রকাশনী ঢাকা ২০১৫ (কাব্যগ্রন্থ)

নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এমএন রায়ের মুক্তিপরায়ণতা প্রসঙ্গে
আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৩

বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়
যেহেতু বর্ষা ঢাকা ২০১০

গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের সহজ পুস্তক
বাংলা একাডেমি ঢাকা ২০০৯

মানুষ: মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক পত্রিকা
সমাবেশ ঢাকা ২০০৩ (সম্পাদিত)

জুলফিকার মতিন: চিন্তা সৃজন সংগ্রাম
সাম্যবাদী চিন্তা ও চর্চা কেন্দ্র রাবি ১৯৯৮ (সম্পাদিত)

অভ্যাসের অন্ধকার

প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা

সম্পাদনা

সেলিম রেজা নিউটন

আগামী প্রকাশনী

সেলিম রেজা নিউটন
অভ্যাসের অন্ধকার : প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা
প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রকাশক : ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১১৩৩২, ৭১১০০২১
মুদ্রণ : স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জায় ব্যবহৃত যাবতীয় চিত্রকর্ম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রচ্ছদবিন্যাস, পৃষ্ঠাসজ্জা ও কম্পিউটার-কারিগরি : সেলিম রেজা নিউটন
মূল্য : ৮৫০ টাকা

Salim Reza Newton
The Darkness of Habits: Investigations into love, marriage, family and relationship
First Edition : February 2015
Published by : Osman Gani, Agamee Prakashani, 36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Phone 7111332, 7110021.
Cover-art and other artworks : Rabindranath Tagore
Cover, typesetting, makeup and computer graphics : Salim Reza Newton
Price : Tk 850. US$ 12

Abhyasher Andhakar (The Darkness of Habits) by Salim Reza Newton is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

ISBN: 978 984 04 1791 9

উৎসর্গ

লালন সুস্মিতা মীরা

সম্পর্কের স্বাধীনতার দায়ে

একটা পত্র কুড়িয়ে পেলাম পথে।
অর্ধেক তার তোর হাতে দিয়ে অর্ধেক নিয়ে হাঁটি।
পথে অভ্যাস ডাক দিয়ে বলে:
কোন অর্ধেক খাঁটি?
কোন অর্ধেকে মিশেছে মলিন মাটি?

আমি পড়ি মুশকিলে।
ভাবি: কাকে বলে গৃহস্থ, আর কাকে বলে সন্ন্যাসী?
যে আছে এখানে, সেই তো ওখানে আছে—
ঘরে আর পথে মাখামাখি-মিলেমিশে
বিশুদ্ধ মুসিবতে।

যেটুকু শুদ্ধ, সেটুকু রয়েছে গাছে,
জড় ও প্রাণের সংজ্ঞার মাঝখানে;
মলিন ধুলায়, বৃষ্টি-কাদায়, দূরে আর খুব কাছে
পাতার এবং আমার আত্মা এক সাথে শুয়ে আছে
চিরবিরহের অচেনা ঐকতানে।

পাতার কবিতা। সেলিম রেজা নিউটন। সাহিত্য ক্যাফে

সূচিপত্র

০০০ ভূমিকা
০০০ সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

<u>সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা: নারীবাদী নিরীক্ষণ</u>

০০০ নাসরিন খন্দকার ॥ প্রেমের মাত্রা ও মাত্রিকতা
০০০ সায়দিয়া গুলরুখ ॥ যোনিদেশ
০০০ নাসরিন সিরাজ এ্যানী ॥ ধর্ষণ ও নারী-পুরুষের বেড়ে ওঠা
০০০ নাসরিন সিরাজ এ্যানী ॥ বাল্টিক সাগরে এক রাত
০০০ সুস্মিতা চক্রবর্তী ॥ সর্ম্পক-সঙ্গ-সমাচার
০০০ মানস চৌধুরী ॥ সম্পর্ক: নিরন্তর আত্মকে খোঁজা, এমনকি আত্মোৎসব
০০০ মানস চৌধুরী ॥ কায়ামন: প্রেম, ভালোবাসা, যৌনতা, অধিকল্পনা
০০০ মানস চৌধুরী ॥ বেযোগাযোগ: কী ফারাক বন্ধু কিংবা প্রতিবন্ধুতে?
০০০ মানস চৌধুরী ॥ বাসনার লিপিকার আর স্মৃতিকল্পলোকের মেটাফর
০০০ মানস চৌধুরী ॥ সোনাবন্ধু'র পিরীতি এবং ভালোবাসার সুশীল ডিসকোর্স
০০০ মানস চৌধুরী ॥ 'সূক্ষ্ম প্রেমে'র অর্থ: নিম্নবর্গীয় গানে যৌনতা এবং নারীর আত্মসত্তা
০০০ মানস চৌধুরী এবং সায়দিয়া গুলরুখ ॥ যৌনতা ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গ
০০০ মানস চৌধুরী এবং রেহনুমা আহমেদ ॥ লিঙ্গ, শ্রেণী এবং অনুবাদের ক্ষমতা: বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে

সম্পর্কের সার্বিকতা: মার্কসীয় মনীষা

০০০ মুঈনুদ্দীন আহ্‌মদ ॥ নারী-পুরুষ সম্পর্ক: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
০০০ মনিরুল ইসলাম ॥ যৌনসম্পর্কের লিঙ্গবৈষম্য: জৈব-সামাজিক অনুসন্ধান

সম্পর্ক-সন্ধিৎসা: স্বাধীনতাশীল পাঠ

০০০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ
০০০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ পারিবারিক দাসত্ব
০০০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ স্ত্রীর পত্র
০০০ নিয়ামুন নাহার ॥ নতুন চোখে ‘স্ত্রীর পত্র’ পাঠ: সম্পর্কে বিবাহে পরিবারে
০০০ সেলিম রেজা নিউটন ॥ সম্পর্ক স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ
০০০ সেলিম রেজা নিউটন ॥ ধর্ষণ বলপ্রয়োগ বলাৎকার
০০০ সেলিম রেজা নিউটন ॥ সম্পর্ক সিনেমা যৌনতা
০০০ মামুন হুসাইন ॥ সংক্ষিপ্ত জীবন সমগ্র: ২০১৪
০০০ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ: বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবা ও তারাপুরের বামা ক্ষ্যাপার কথা
০০০ কলিম খান ॥ যোজনগন্ধবিকার: ‘সিস্টেম ডিজাইনিং’-এর একটি সমস্যা

০০০ লেখক-পরিচিতি

মানস চৌধুরী

ভূমিকা: সম্পর্কযাপন সম্পর্কঘোষণার চেয়ে সহজ!

এক

‘অন্ধকার’ বিশেষ্যটির বিশেষণগুণই মুখ্য। আর সেটিকে অজ্ঞতার সমান্তরালে দেখার ক্ষেত্রে আমার ষোল আনা অসাচ্ছন্দ্য আছে, যদিও সম্পাদক তরফে লিখিত বিবরণীর আগেই তাঁর কথ্য ব্যাখ্যার সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত এবং তাঁর ব্যাখ্যা তাঁর কাজটি গড়ে-তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিকই মনে করি। ফলে আমার

অস্বস্তি কেবল নিজগুণে ব্যাখ্যাযোগ্য, গ্রন্থটির গঠন সাপেক্ষে নয়। হয়তো একটা খোলাখুলি আলাপে তা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে; সেজন্য বলা। অন্ধকার দুই অর্থেই সঙ্কটে ফেলে। প্রথম অর্থে, আলোর-বিপরীতে অন্ধকারকে অনাকাঙ্ক্ষিত ভেবে নিলে তা এমনকি সাহিত্যময় দুনিয়ায় অন্ধকার বা রাত্রির মনোলোভা চরিত্রকে খর্ব করে। দ্বিতীয় অর্থে, অন্ধকার যখন কালোর সমার্থক তার অনেক বিশেষণগুণ রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বের দার্শনিক ভিত্তির প্রশ্নাতীত অনুমানকে প্রকাশ করে। আমার অস্বস্তিটা তাই প্রাসঙ্গিক। আবার প্রাসঙ্গিক বলেই এই বইয়ের নামকরণে সম্পাদকের স্পষ্টতা ম্লান হয়ে যায় না।

সম্পাদকের পক্ষে সাফাই গাইবার জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট। অধিকন্তু, গ্রন্থের একটি নামকরণ অপরাধ বিশেষ নয় বটে। তবে ‘অন্ধকার’-এর যে ব্যঞ্জনা এখানে মুখ্য হিসেবে দেখা চলে সেটার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হচ্ছে। অস্পষ্টতা কিংবা আবছায়া। সম্পর্কে মানুষের বসবাস যত তীব্র যত নিবিড়ই হোক না কেন সেগুলো সম্বন্ধে উপলব্ধি যে ঘোলাটে সেমতো পর্যবেক্ষণ সম্পাদক তরফে থাকার কথা। এগুলো কথার পিঠে কথা রেখে বিতর্ককেই জারি রাখা আমার তরফে। নইলে আছেই বা কী!

দুই

বৃহত্তর বিষয়বস্তুর কথা বিবেচনা করলে যৌনতা আর সেইসংক্রান্ত নীতি-নৈতিকতার বিধিব্যবস্থা আর ভাষামালা ইত্যাদি প্রসঙ্গে, আরও বিশেষে বাসনার প্রণালী বিষয়ে একখানা গ্রন্থ আমার বহু-আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সম্পাদক সেলিম রেজা নিউটনকেই সেই দায়িত্ব নিতে হবে কিংবা তিনি গ্রন্থ-সংকলনের কাজে হাত দিলে সেই প্রসঙ্গ-রাজির মধ্যেই তাঁর থাকতে হবে এমন কোনো আব্দার তাঁর প্রতি করা যায় না। এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা তাঁকে দেবারও কোনো কারণ নেই। ফলে তিনি বৃহত্তর পরিসরে গ্রন্থটির অনুসন্ধিৎসাকে নিয়ে গেলেন। সেটা যৌনতা বিষয়ক জিজ্ঞাসাদিকে পাশ কাটায় না, বরং বিপরীতে যৌনতা বিষয়ক অনুধাবনে যে সীমিত ও ক্রিয়ানির্ভর অনুমানগুলো সাধারণ্যে কাজ করে সেটাকে ধাক্কা দেয়। খুব জরুরি সেই কাজটিও।

যৌনতা বিষয়ক গড়পরতা ভাবনাজগৎ যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ানির্ভর বা ক্রিয়া-সাপেক্ষ, সেটাই এই বিষয়ক ভাবনার প্রধান সমস্যাগুলোর একটা বলে আমার মনে হয়। সেই হিসেবে প্রেম-বিয়ে-পরিবার-সম্পর্ক ইত্যাদি সমান্তরাল-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে একটা পাটাতনে রেখে একটা গ্রন্থের উদ্যোগ প্রাসঙ্গিক বটে। যে মৌলিক সুবিধাটা হয়, অন্তত এই গ্রন্থের সঙ্গে যাঁরা সংমিশ্রণ ঘটাবেন তাঁদের পক্ষে নানাবিধ সম্পর্কের জটিল মিথষ্ক্রিয়া আর অন্তর্গত শরীরী জমিনের বিষয়ে সজাগ না থাকা কঠিন হবে। এই সজাগতার একটা দিক অবশ্যই বিদ্যায়তনিক বা এ্যাকাডেমিক।

তবে বিদ্যাশাস্ত্রের যাবতীয় স্বকীয়তা ও সামর্থ্য বজায় রেখেই একটা বিনীত প্রস্তাব করে রাখতে চাই। গণতন্ত্র হোক বা রাষ্ট্র, ভালবাসা বা যৌনতা—সকল কিছুকে শাস্ত্রসমূহ কিছুমাত্র বোধগম্য করে তুলবার বদলে সম্ভবত দুর্বোধ্য করেছে বেশি। ফলে এই গ্রন্থটির যাত্রা যে তাগিদ থেকে শুরু হয়েছে সেটাকে বরং আমি রাখতে চাইব আরও আটপৌরে পরিমণ্ডলে। আরও নেহায়েৎ যাপনের প্রশ্নাবলীতে। যাপনের উপলব্ধি, উপলব্ধির যাপনের থেকেও।

তিন

মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনাবলী থেকে কিছু সংযোজন একদম সঙ্গত মনে হয়েছিল আমার। অন্তত দুটো কারণে। প্রথমত, যতই বিদ্যাজগতে মার্ক্স-এঙ্গেলস তুলকালাম আলোচিত হোন না কেন, তাদেঁর রচনার যে তর্কগত অন্তর্সার তা যে কোনো উপলব্ধিমুখী মানুষের জন্য দারুণ পাটাতন দেয়। দ্বিতীয়ত, মার্ক্স-এঙ্গেলস অনূদিত হয়েই আছেন বাংলায়। বিশেষত তাঁদের *ইশতেহার* আর *পরিবার, ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব* সম্পর্কমালা নিয়ে তীক্ষ্ণ সব পর্যবেক্ষণে ঠাসা যেখানে আধুনিক সম্পর্কের বনিয়াদ রচনায় সম্পদের মালিকানার ভূমিকা পর্যালোচিত হয়েছে। প্রণয় ও/বা যৌনতার বিধিবিধান কীভাবে ক্ষমতা-সম্পর্কের বলয় দ্বারা নির্ধারিত সেটার বিশ্লেষণ দুই রচনাতেই সুলভ।

তবে এই গ্রন্থটির গঠনের বিষয়ে উল্লেখ করবার মতো বিষয় হলো অন্য ভাষার রচনা থেকে কিছু বাছাই করা হয়নি। সেটা বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থের। উপরন্তু, যেসব যুক্তি-পর্যবেক্ষণ মার্ক্স-এঙ্গেলস সম্পর্ক বিষয়ে হাজির করেছেন সেগুলোর উপর ভিত্তি করে অন্তত দুটো রচনা এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে। মুঈনুদ্দীন আহমদ এবং মনিরুল ইসলাম-এর প্রবন্ধ দুটো মার্ক্সীয় বীক্ষণকে উপস্থিত করেছে এই বইয়ে। তবে শ’ দেড়েক বছর পর খোদ মার্ক্সের রচনার বিরুদ্ধে যেসব সাধারণীকরণের অভিযোগ রয়েছে, সেগুলোকে বিবেচনায় রাখলে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সের মৌলিক রচনার অংশবিশেষ নতুন করে হাজির করার পক্ষপাতী আমি। কথাটা পুনরাবর্তন হলেও সামনে রাখলাম।

চার

এই বইটির মূলভাব-বিভাজন বেশ চমকে দেবার মতো। বিশেষত, শেষভাগটি যে অংশটিকে সম্পাদক ‘স্বাধীনতাশীল’ পাঠ বলছেন। বইটির বিভাজনের যাথার্থ্য স্বতন্ত্রভাবে বলছি না, বরং চমকের কথা যে বললাম সেটা রবীন্দ্রনাথের এই পর্বে সংযোজনের কারণে। সম্পাদককে জানি বলেই এই স্বাধীনতাশীলতার অর্থ আমি

উপলব্ধি করি যাকে ইংরেজি ভাষায় স্বাধীনচেতারা 'লিবের্টেরিয়ান' বলে থাকেন। যদি সামগ্রিক সম্পর্কের জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথকে স্বাধীনতাশীল চিন্তাধারার অংশীদার ভাবা যায় বা ভাবা হয় সেটা মূলগতভাবেই চমকদার বটে। সেটা রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার অনাস্থার কারণে নয়, এমনকি উদারতাবাদ বিষয়ে তাঁর সনিষ্ঠ লাগাতার ব্রতী থাকার পরও। বরং এক্ষেত্রে খুব জোর দিয়েই বলবার আছে যে কোনো চিন্তক/শিল্পী যুগপৎ বৃহত্তর কাঠামোতে উদারতাবাদী এবং ক্ষুদ্রতর কাঠামোতে স্বাধীনতাশীল থাকা আমি সম্ভব বিবেচনা করি। কিংবা বৃহত্তর কাঠামোতে যাকে সংরক্ষণশীল বলে সেরকম অবস্থান গ্রহণ করা, আর ক্ষুদ্রতর কাঠামোতে যাকে র‍্যাডিক্যাল বলা হয়ে থাকে সেরকম অবস্থান গ্রহণ বা পালন সম্ভবপর মনে হয় আমার। সংক্ষেপে এটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে কারো ম্যাক্রো ও মাইক্রো রাজনৈতিক/দার্শনিক অবস্থার গুরুতর আপাত-বেখাপ্পা অবস্থান খুবই সঙ্গত মনে করি আমি। সর্বোপরি, কারো অবস্থান অন্যদের উপলব্ধিসাপেক্ষ তো বটেই, সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশন-সাপেক্ষ। ফলে বিষয়গুলো সাদাকালোর মতো বিভাজিত হবার সম্ভাবনা আমি দেখি না।

যাহোক, রবীন্দ্রনাথের এই অংশে সংযোজন চমকদার এই কারণে যে দুই বাংলাতেই রবীন্দ্রভক্তরা তাঁকে ভক্তিরসে সঞ্চারিত করে-করে এমন এক অযৌন পাথরপ্রতিমা বানিয়েছেন যে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ক ভাবনার গতিশীল জায়গাগুলো প্রায়শই অনাবিষ্কৃত থেকে যায় ভক্তকুলে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্র-সমালোচকরা তাঁকে স্পষ্টত দুটো বাক্সে বন্দি করে থাকেন – হিন্দুত্ব/ব্রাহ্মণ্যবাদী আর উদারতাবাদী/ জাতীয়তাবাদী যে দুটো আবার নিজগুণে সাংঘর্ষিক। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত দুরূহ বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে চলেছেন, যতটা তাঁর না হলেও চলত। তাঁর সম্পর্ক বিষয়ক গতিশীল, বা অন্তত অপ্রথাগত, ভাবনা নিয়ে সংশয় কাটানোর জন্য কেবল তাঁর বড় গল্প ও উপন্যাসগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেই চলে। *নষ্টনীড়* থেকে *নৌকাডুবি*, *গোরা* থেকে *ঘরে-বাইরে*, *চতুরঙ্গ* থেকে *চোখের বালি* কোথাওই রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশসৃষ্ট মধ্যবিত্তের 'আদর্শ' পরিবার কিংবা নারী কিংবা লিঙ্গরূপের জয়গান গান নাই। যদি এর সঙ্গে তাঁর নাটকগুলোকে আর গীতিনাট্যগুলোকে যোগ করা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের লিঙ্গদর্শন গুরুতর ভাবনাযোগ ঘটাবেই শুধু। কিন্তু তার পরও রবীন্দ্রনাথ যে গদগদ অযৌনরূপে প্রতীয়মান থেকে যান, সেটা তাঁর ভক্তকুলের পাঠবিভ্রাটের কারণেই কেবল নয়, ভক্তকুলের আদর্শমান বা নর্মের কারণে; অধিকন্তু, সম্ভবত, তাঁর সঙ্গীতশৈলীর উপর অধিক অর্থরোপের কারণে। এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আলাপ করা সুবিধাজনক হতো, তবে গ্রন্থটির প্রথমাংশের একটি প্রবন্ধ আপাতত আপৎকালীন একটা আলোচনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পাঁচ

অভ্যাসের অন্ধকার গ্রন্থটির সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ, তদুপরি, হবার সম্ভাবনা এর প্রথমভাগের। সম্পাদক ভাগটির নাম দিয়েছেন ‘নারীবাদী নিরীক্ষণ’। সবচেয়ে বিতর্কিত হওয়া নিয়ে আমার, বা আমার ধারণা সম্পাদকেরও, বিশেষ কোনো অশান্তি যে রয়েছে তা নয়। তবে এই অবকাশে সম্পর্ক-ভাবনায় নারীবাদী অবস্থান বিষয়ক জোরদার বিতর্ক নিয়ে আলোকপাতের আগ্রহ রয়েছে আমার; বিতর্কের অপরাপর দিক নিয়েও।

খুব বেশি সংকলিত কিংবা সম্পাদিত গ্রন্থ পাওয়া সহজ হবে না যেখানে একজন রচয়িতার একক ও যুগ্ম রচনাক্রিয়ার গোটা আষ্টেক রচনা সংযোজিত আছে। এমন গ্রন্থ পাওয়াও সহজ নয় যেখানে বড় রকমের রচনা-অংশগ্রহণকারী খোদ নিজে বইটির ভূমিকা রচনা করছেন, তা যতই না কেন দুবলা হোক। সেই অর্থে একটা অহেতু পরিস্থিতিতে সম্পাদক পা দিয়েছেন যেখানে এতগুলো রচনা একজন রচয়িতা থেকে বাছাই করা নিয়ে তাঁর কথা শুনতে হবে। আমি সম্পাদক তরফে এর ব্যাখ্যা জানি, অনুধাবন করতে পারি আরও বেশি। সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধিৎসু লেখা খুঁজতে গিয়ে তিনি সুবিস্তৃত অধিক লেখকের প্রতিনিধিত্বের বদলে সর্বাত্মক অনুসন্ধিৎসাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তাতে এই হাল দাঁড়িয়েছে।

নারীবাদ খোদ নিজ মহলে বিতর্করত একটি দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষত, অধুনা বাংলাদেশে সরকারী কর্মকর্তা থেকে শুরু করে দেশি-আন্তর্জাতিক এনজিও মহল ‘জেন্ডার জেন্ডার’ করে তুলকালাম বাধিয়ে এই পরিস্থিতিটাকে ঘনীভূত করেছেন বটে। কিন্তু এর আগের পর্বকালটাও কিছুমাত্র সুবিধাজনক নয়। তসলিমা নাসরিনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোদ বাংলাদেশের ‘নারী আন্দোলনকারী’গণ। মুনীর-খুকু মোকদ্দমাতে খুকুর ফাঁসি চেয়ে ময়দানময় ছিলেন তাঁরা। সংক্ষেপে, ‘লিঙ্গ’ প্রশ্নে লিবেরেল আর র‍্যাডিকেলদের পার্থক্য এত যোজন-যোজন যে এঁদের মধ্যকার লড়াই নারীবাদের প্রতি সামগ্রিক প্রতিপক্ষতার থেকে কিছুমাত্র কম গুরুত্বের নয়। একটা সহজ লক্ষণা হতে পারে যৌনতা বিষয়ক অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে লিবেরেল নারী কর্মীদের নিরুৎসাহ, এমনকি নিন্দা। তবে বহুগামিতা কিংবা বিবাহমুক্ত যৌন ও/বা প্রণয় অভিব্যক্তির প্রশ্নে অলিবেরেলরা যে লাগাতার সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা নিষ্ঠাবান ভূমিকা রেখে গেছেন তার অনেক নমুনা আমি দেখি না। ফলে, আমার বিবেচনায়, এই প্রশ্নগুলি অনেক জটিল, অনেক ধোঁয়াটে হয়ে রয়ে গেছে। রয়ে যাচ্ছে।

এই অংশে সম্পাদক কিছু ঝামেলা গোড়াতেই ঝেড়ে ফেলেছেন লিবেরেল নারীবাদী বা নারী ‘আন্দোলন’ ধারার লেখালেখি গ্রহণ না করে। সেই অর্থে অংশটি গোড়া থেকেই পোক্ত অবস্থানমুখী। আবার কিছু ঝামেলা সম্পাদক তৈরি করেছেন

এমন কিছু রচনা সংযোজন করে যেগুলো প্রশিক্ষিত শাস্ত্রীয় মনে 'যথেষ্ট বিশেষ নারীবাদী নয়' বলে বিবেচিত হতে পারে। সেই রচনাগুলো আবার ঘটনাচক্রে আমার, এবং ইচ্ছাসাপেক্ষে 'সাহিত্য' হিসেবে চলতি বিচারবর্গে যা বলা হয়ে থাকে সেসংক্রান্ত পরিমণ্ডলে প্রকাশিত। কিন্তু পরিশেষে, এসব বর্গ-বিভাজন নেহায়েৎ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং অজস্র বিতর্ক ও প্রতিপক্ষতামণ্ডিত। কোন ব্যক্তিকে বা কোন বিষয়বস্তুকে কী নামে ডাকা হবে, কী পরিচয় হবে তার – সত্তার রাজনীতির মৌল তৎপরতা সেসব প্রশ্নকে ঘিরেই আবর্তিত। ফলে, এই পরিচয়বিভ্রাট পরিশেষে লোকসান নয়।

ছয়

আমার খুব সন্দেহ আছে যে এই গ্রন্থখানি পাঠকস্থ করে এর সম্পাদক কাজ সম্পাদন করে ফেলতে পারবেন। তাঁর, উত্তরকালে নিকট ও সন্নিকট জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নানাবিধ বুদ্বুদ প্রশ্নের জবাবদিহিতা করতে হবে। সম্পর্ক-অনুশীলন-সান্নিধ্য-প্রণয়-পরিণয়-কামনা-লীলা-লিপ্সা অজস্র সম্পর্কিত অথচ দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুতে মনো-যোগী হতে হবে। আর সম্মুখে প্রশ্নকারী মানুষজনকে মনোযোগী করানোর উছিলা তৈরি করতে হবে। হয়তো তাঁর পরের গ্রন্থখানির পরিকল্পনা খুব দ্রুত করে ফেলতে হবে এটার প্রভাবে বা চাপেই, অতি দ্রুত। তবে আমি খুশি হব যদি তার আগেই কথনের আর অনুশীলনের দুনিয়ায় প্রভাবগুলো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আমি ঠিক বই নিয়ে বলছি না। সামগ্রিক ভাবনাচিন্তার কোনো প্রভাবক হিসেবে আমি গ্রন্থকে দেখি না। আমি জিজ্ঞাসাপ্রবাহের বিষয়ে উৎসুক। একখানা বই আর কীইবা করতে পারে জগতের জিজ্ঞাসাপ্রবাহে!

উত্তরা, ঢাকা॥ ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সেলিম রেজা নিউটন

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

Rabindranath Tagore

যেহেতু ভঙ্গি যার যার– দৃষ্টি সবার, সুতরাং এ বইয়ের কোনো স্ট্যান্ডার্ড দৃষ্টিভঙ্গি নাই। এবং যেহেতু বানান যার যার– ভাষা সবার, সেই হেতু এ বইয়ের প্রমিত বানানরীতিও নাই। অরীতিপ্রবণ এবং অপ্রথামুখর বৈচিত্র্য, মুক্ততা আর আখেরি

উদ্দেশ্যগত সহমর্মিতা এই বইয়ের অন্তঃসলিলা ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'স্বাধীনতা-প্রিয়তা' শব্দটি এই বইয়ের দিশা-অভিসারী শব্দ। 'মার্কসীয় মনীষা' নামে এর দ্বিতীয় ভাগের রচনাগুলোতে দেখা যাবে লেখকেরা কীভাবে সনাতন মার্কসীয় চিন্তা-ঘরানার মধ্যে থেকেও আন্তরিকভাবে লালন করে চলেছেন তাঁদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার পিপাসা। আর, প্রথম ভাগে সম্পর্ক-জিজ্ঞাসার 'নারীবাদী নিরীক্ষণ' তো স্বতঃই নারী-স্বাধীনতা তথা মনুষ্য-স্বাধীনতার বাসনাকে আত্মস্থ করে নিয়েই আছে। উপরন্তু তৃতীয় ভাগে সম্পর্ক-সন্ধিৎসার 'স্বাধীনতাশীল পাঠ' সম্পর্কের স্বাধীনতাজনিত বঙ্গ-ভারতীয় ধারার[১] এক পশলা ধারণা দেবে। এই অংশের তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পাঠ বঙ্গ-অঞ্চলের জনসামাজিক পরিসরে সম্পর্কজনিত স্বাধীনতাশীলতার আদিম ও সুপ্রাচীন ধারাগুলোকে শনাক্ত করেছে। স্বাধীনতা-নীতি ও মুক্ত নারী-পুরুষের মুক্ত সম্পর্কই তন্ত্রসাধনার গূঢ় ও অন্তর্গত ইশারা। বঙ্গ-অঞ্চলে তন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতার আলাপ সূত্রপাতহীন।[২] তন্ত্র এ অঞ্চলে স্বাধীনতাশীলতার অনাদিকালাগত অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসা। এই ভাগে কলিম খানের অবিস্মরণীয় পুরাণ-বিশ্লেষণও আমার এ দাবিকে সমর্থন করে বলে আমার ধারণা। আদি তন্ত্র থেকে শুরু করে মাঝখানে সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্র ও সহজিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র হয়ে এবং বাংলার ও ভারতবর্ষের আরও অজস্র লোকধর্মের রসে জারিত হয়ে অজস্রপথে ক্রমবিকশিত হয়ে আসছে যে ধারা, হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ সেই আদিম বঙ্গভারতীয় স্বাধীনতাশীল সামাজিক চিন্তা-ধারারই বিচিত্র উত্তরসূরী।

এ ছাড়া, এমনিতে, এই পুস্তকের রচনা সব বিভিন্ন– বৈচিত্র্যপিয়াসী। এ বইয়ের বিষয়-দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যই বলে দেবে সম্পর্কের স্বাধীনতা নিয়ে বিশেষ কোনো থিওরি বা শাস্ত্র রচনা করার ব্যাপারে এর প্রবল আপত্তি আছে। থিওরি এবং শাস্ত্র স্বভাবতই বৈচিত্র্যবিরোধী। উভয়েই আগাম বিশ্বাসের, অন্ধ বিশ্বাসের, অভ্যাসে চলে। অন্যদের কাছ থেকেও দাবি করে অভ্যাস– দাবি করে শাস্ত্রীয় কর্তব্যবোধ ও ভালোমন্দের মুখস্থ কোড মোতাবেক সম্পর্কযাপনের অভ্যাস। পক্ষান্তরে, প্রেম বা সম্পর্ক স্বভাবতই যাবতীয় কর্তব্যবোধকে অস্বীকার করে – এদের মূলভাব অনুরাগ ও আনন্দের। অনুরাগ-আনন্দ-বৈচিত্র্যের সম্পর্কসাধনাই এই গ্রন্থের আরাধ্য অভিজ্ঞান।

---

১ এ প্রসঙ্গে আমার *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য গ্রন্থে* উপস্থাপিত 'বঙ্গভারতীয় অরাজপন্থা'র ধারণা (পৃষ্ঠা ১২৭) এবং 'নৈরাজ্যের নিত্যতা'র ধারণা (পৃষ্ঠা ১১১–১১৭) দেখা যেতে পারে।

২ স্বাধীনতাশীলতার 'স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ' হিসেবে তন্ত্রকে বিচারের ক্ষেত্রে আমার *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য গ্রন্থের* 'তন্ত্র সংঘ তাও জেন সহজ সুফি ও নৈরাজ্য' (পৃষ্ঠা ১৬০–১৬৭) অংশটি দ্রষ্টব্য।

এইডা কিসু হইল !

খুব তাড়াহুড়া করে এই বই। বলতে গেলে আচমকা। কখনো না কখনো করতেই হতো এরকম বই। তাই বলে সেটা যে এখনই করতে হবে সে কথা ক-দিন আগেও বিবেচনায় ছিল না। আসলে সম্পর্কের ভোগান্তি যখন তিল তিল করে চূড়ায় ওঠে তখন সেই দুর্ভোগের বিবরণ ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করাটা ফরজ হয়ে ওঠে। আর সেই ফরজও ওঠে চূড়ায়। সুতরাং নিরুপায়ভাবে বেপরোয়া প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়ে ওঠে বাধ্যতামূলক। লেখা-সংগ্রহ শুরু করাটাকে সূচনা ধরলে সর্বোচ্চ দুই মাসের কাজ এই বই। যত দুর্বলভাবেই হোক, অসম্ভবটা সম্ভব হতে পারল সবাই কিছু না কিছু কাজ করার কারণে – ব্যক্তিগতভাবে এবং দল বেঁধে আড্ডা দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

নামটা মাথায় আসে রংপুরে নিমার সাথে *সামাজিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান* বিষয়ক কোর্স অধ্যয়ন করতে গিয়ে। ঐ কোর্সের অংশ হিসেবে প্রেম, বিবাহ, পরিবার, ও সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কপ্রবণতাগুলোকে পরিষ্কার করে তুলতে যেয়ে তিনি ক্লাসে পড়িয়ে বসেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'। কৌতূহল হয়। নতুন করে পড়ি গল্পটা। মাথার ভেতরে পাক খেতে থাকে। নিমার সাথে শেয়ারিং হয়। দাবি করে বসি আমি তাঁর কাছে এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ। সেটি রচিতও হয়। এবং 'স্ত্রীর পত্র' রচয়িতা মৃণালের তথা রবীন্দ্রনাথের 'অভ্যাসের অন্ধকার' কথাটা মাথায় গেঁথে যায়।

ওদিকে বাধ্যতামূলক এক কাজে ঢাকায় গিয়ে বন্যা-মানসের বাসায় রাত্রিযাপন -আড্ডায় বসে মানসের কাছে আমি আব্দার করে বসি সম্পর্কজনিত তাঁর সবগুলো রচনা আমাকে গুছিয়ে দিতে। মানস সে সব খুঁজেপেতে একত্র করে পাঠিয়েছেন আমাকে। আসলে এ নিয়ে মানসের বিস্তর রচনা আছে, আমার তিনটা আর নিমার একটা আছে, নিশ্চয়ই চেনাপরিচিত-বন্ধুদের কাছে আরও দু-চারটা পাওয়া যাবে বা তাঁদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া যাবে– এই হিসাবই আমাকে উৎসাহিত করে এবং মানসের কাছে আমি এই বইয়ের প্রস্তাব পেশ করি। মানস বিনাদ্বিধায় কবুল করলে বইটার কাজে আমরা নেমে পড়ি। এবং অচিরেই একটা ঢাউশ জিনিসে পরিণত হয় সেটা। এ বইয়ের ভিত্তি-রচনা হিসেবে কাজ করেছে মানসের আটটা রচনা। ওঁর আরও দুটো লেখা যে আমি অক্ষর-মেরামতির সময়াভাবে ছাপতে পারি নি সেই দুঃখ আমাদের দুজনার যৌথভাবে সম্পাদিত বই না বেরুনো পর্যন্ত যাবে না। এতগুলো লেখা এবং নিজের লেখা ভূমিকা নিয়ে ওর নিজেরই একটা বই হয়ে যেতে পারত দিব্যি।

রেহনুমা আপা তাঁর লেখা ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। বইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। এ্যানী, সায়দিয়া, সুস্মিতা লেখা চাওয়া মাত্র সাড়া দিয়েছেন। সায়দিয়া নিজেরটার পাশাপাশি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ্যানীর লেখার লিংক পাঠিয়েছেন। পরে

এ্যানী ওঁর আরো একটা লেখার খবর আমাকে দিয়েছেন ফেসবুকে। (মনিরুল ইসলাম) কচি ভাইয়ের দুর্দান্ত লেখাটার খোঁজ আমাকে এ্যানীই জানান। যোগাযোগ হিসেবে (আব্দুল হাকিম) লালা ভাইয়ের নম্বরটাও উনিই দেন আমাকে। কচি ভাই ফেরান নি। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও লেখাটা নতুন করে পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। মুইন ভাইয়ের লেখাটার সন্ধান পাই *গ্রন্থ ডট কম* নামের উন্মুক্ত অনলাইন লাইব্রেরিতে। পরে তাঁর সাথে যোগাযোগও করিয়ে দেন এ্যানীই। মুইন ভাই সানন্দে অনুমতি দেন। সফট কপি দেন। কিন্তু একটা নতুন লেখা লেখার তীব্র তাড়না অনুভব করে এমনকি লেখাটা শুরু করে অনেক দূর পর্যন্ত লিখেও শেষ করতে পারেন নি এ্যানী। সেটা মিস করছে এই বই। তাঁর উচ্চতর গবেষণার কাজে চরম ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত যোগাযোগ থেকেছে তাঁর সাথে খুঁটিনাটি নানান কিছু নিয়ে– তিনি নেদারল্যান্ডস গিয়ে পৌঁছানোর পর পর্যন্ত। এ্যানীর কাজ এই বইকে এর বর্তমান চেহারার প্রাথমিক আদলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুস্মিতা গোটা সংসার সামলে, প্রচুর বন্ধু-আগমন সামাল দিয়ে, নতুন একটা স্বতঃস্ফূর্ত লেখা লিখে দিয়েছেন এই বইয়ের জন্য। সে আর লালন সুস্মিতা আমাকে পরিপূর্ণ ছুটি না দিলে এই বইয়ের কথা ভাবাও যেত না। প্রবাসে একা-মা হয়ে সন্তান-সংসার সামলে, উচ্চশিক্ষার সাঁড়াশি চাপ মোকাবেলা করে, নাসরিন খন্দকার যেভাবে তাঁর লেখাটা লিখলেন তা দেখার মতো। ক-দিন ফেসবুক-চ্যাটে বসে তা দেখার সুযোগও হলো। তিনি আয়ার্ল্যান্ড থেকে লেখার খসড়া ফাইল পাঠালেন, আমি সেটার অক্ষর-মেরামত-মতামত করে পাঠালাম, তিনি পরিমার্জনা করলেন, আবার করলেন, আবার করলেন, রেফারেন্স যোগ করলেন, আমি রাজশাহীতে বসে সেগুলো অ্যাডজাস্ট করতে থাকলাম, তিনি কাজ করলেন উইন্ডোজে, ম্যাকে – আমি উবুন্টুতে। নাসরিনের ধৈর্য আর আন্তরিকতায় নিঃশব্দে হাঁ করে থেকে গেলাম। রংপুরে বসেও নিমা যে এই বইয়ের কত প্রকারের কত কাজ করে দিয়েছেন তার শেষ নাই। বন্ধু-সহকর্মী বখতিয়ার বাদল শেষ মুহূর্তে মনে করিয়ে দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধ্রুপদী লেখাটার কথা।

হরপ্রসাদের সেই লেখা ইলোরা সুলতানা নিজেদের বাসা থেকে খুঁজে বের করে কম্পোজ করে দিয়েছেন নির্ভুল বিন্যাসে। কাজলার প্রিন্স ভাই নিজে লেখা কম্পোজ করে দিয়েছেন চটজলদি, সাথে কম্পোজ করার বাণিজ্যিক লোকও ঠিক করে দিয়েছেন। কবি-ফটোগ্রাফার দঈত আন নাহাল কম্পোজ করে দিয়েছেন কলিম খানের লেখার ফুটনোট ছাড়া অংশ।

খুলনার সংস্কৃতি-সংগঠক, আবৃত্তিকার, চিত্রনির্মাতা কাজল (ইসলাম) ভাইকে একেবারে অন্তিম মুহূর্তে অনুরোধ করলাম 'থার্ড জেন্ডার'দের সম্পর্ক-সংসার নিয়ে লিখতে। তাঁদের সাথে কাজল ভাইয়ের দীর্ঘদিনের ভালোবাসার সম্পর্ক। হাজারটা সাংগঠনিক কাজে ব্যতিব্যস্ত ছুটোছুটি অবস্থার মধ্যেও কাজল ভাই রাজি হয়েছেন।

এবং সবার শেষে উড়ে এসে সে রচনা জুড়ে বসেছে এ বইয়ের কপালে।

মামুন হুসাইন তাঁর লেখা ছাপার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর আক্ষরিক-অর্থে-অকল্পনীয় ব্যস্ততার মধ্যে লেখাটার প্রুফও দেখে দিয়েছেন তিনি নিজে। সে লেখা আমাকে ইমেইল করে পাঠিয়েছেন *রাঢ়বঙ্গ* ছোটকাগজের সম্পাদক ড. অনুপম। আর, বিজয়ে কম্পোজ করা সেই লেখা ইউনিকোডে কনভার্ট করে দিয়েছেন নির্ঝর শাহরিয়ার।

বইটার বেশিরভাগ অংশেরই প্রাথমিক প্রুফ দেখার কাজ হয়েছে *ম্যাজিক লন্ঠন* ছোটকাগজের কাওসার বকুলের সাথে আমার বিভাগীয় কর্মকক্ষে বসে। একটানা একাঘরে ওঁর সঙ্গ ছিল টনিকের মতো। জরুরি মুহূর্তে চোখের পলকে কলিম খানের বই জোগাড় করে দিয়েছেন বন্ধু-সহকর্মী কাজী মামুন হায়দার রানা। প্রুফ দেখার জন্য বকুলকে জোগাড় করে দেওয়ার কাজটাও করেছেন তিনিই। বিরাট এই বইয়ের দ্বিতীয় প্রুফ দেখার কাজে একেবারে শেষভাগে এসে আমার সহকর্মী শাতিল সিরাজ শুভ যোগ দিয়ে একাই আড়াই শ পাতা দেখে দিয়েছেন অতি অল্প সময়ে। এ ছাড়া মেলা পাতা করে প্রুফ ঝটিকা গতিতে দেখে দিয়েছেন সহকর্মী মাহবুব অনিন্দ্য, *চিহ্ন* ছোটকাগজের রফিক সানি, এবং *ম্যাজিক লন্ঠন* ছোটকাগজের মাহমুদ সেতু। বেশ কয়েকটা লেখার প্রুফ দেখেছেন নিমাও।

গ্রন্থ ডট কম এবং *মুক্তধারা নেটওয়ার্ক*-এর সংগঠক শশি, ইস্রা, রকি জুতা-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করেছেন যখন যেমন প্রয়োজন। কত্ত কিসিমের কাজ যে এঁরা তিনজনে করেছেন! একদিন আমার আর শশির যখন বেহাল অবস্থা তখন একটা পুরো বেলা সময় দিয়েছেন মিউজিকের শিক্ষার্থী অর্ঘ্য।

বইয়ে মুদ্রিত তন্ত্র বিষয়ক যে মারাত্মক দরকারি রচনাটা ছাপা হয়েছে সেটির সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল সুস্মিতা চক্রবর্তীর কল্যাণে। বইটা তিনি ফটোকপি করে নিয়েছিলেন ইংরেজির প্রবাদপ্রতীম অধ্যাপক, কবি অসীম কুমার দাসের (একেডি) কাছ থেকে। সম্প্রতি একেডি আবার সেই মূল বইটা তাঁর বোনের কাছ থেকে নিয়ে আমাকে দেন ওখানকার স্কেচগুলো স্ক্যান করার জন্য। নামের ইংরেজি অনুবাদেও সাহায্য করেছেন একেডি। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গেকার সেই স্কেচগুলো স্ক্যান ও এডিট করে দিয়েছেন নির্ঝর শাহরিয়ার। এ বইয়ের ফ্ল্যাপের জন্য আমার ছবিও তুলে দিয়েছেন তিনি।

জিএনইউ লিনাক্সভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম উবুন্টু ১৩.০৪-এর লিব্রা অফিস, ইঙ্কস্কেপ, এবং গিম্প সফটওয়ার দিয়ে এই বই বানানো। লিনাক্স-কারিগরিতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন সারিম খান, মিয়া মোহাম্মদ হোসাইনুজ্জামান শামীম ভাই এবং আসকার ইবনে আব্বাস।

নানা স্থানে অবস্থানরত, নানা রকমের পেশা-লিঙ্গ-বয়েসের, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি-

ওয়ালা অনেকগুলো মানুষ মিলে যে এত দ্রুত সময়ের মধ্যে এরকম একটা বই মোটামুটি খাড়া হতে পারল— সেটা স্রেফ তাঁদের মধ্যকার বন্ধুত্বের টানে। বন্ধুত্বই এই বই বাঁধাইয়ের আসল সূত্রধর। বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া আর কৃতজ্ঞতা জানানো— এইডা কিসু হইল!

কিন্তু এই বই প্রকাশের জন্য আগামী প্রকাশনীকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেই হবে। অনেক হাঙ্গামার মধ্যেও তাঁরা যত্ন করে ধৈর্য ধরে এ বই ছেপেছেন তার জন্য শুকরিয়া জানানোর বিকল্প নাই।

বাইনারি চিন্তার বিপদ এবং শব্দার্থের পরিপ্রেক্ষিত

শব্দের অর্থ নির্ভর শব্দের ব্যবহারের ওপর, শব্দের পরিপ্রেক্ষিতের ওপর। একটা শব্দের এক এবং অদ্বিতীয় টাইপের কোনো ধ্রুব অর্থ থাকে না। একই শব্দের থাকে একাধিক শব্দার্থ, থাকে নানান অর্থব্যঞ্জনা। কালো যে অর্থে বর্ণবাদ বোঝায়, যেসব বিশেষ পরিস্থিতিতে বোঝায়, সেই ধরনের কোনো অর্থ-পরিস্থিতি *অভ্যাসের অন্ধকার* কথাটার মধ্যে আছে বলে মনে করার কোনোই কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। অন্ধকার বলতে আবশ্যিকভাবে বর্ণবাদী 'কালো' বোঝায় বলে মনে হয় না আমার। অন্ধকার অন্ধকারই। আলো ছাড়া বাঁচি না আমরা। প্রাণের স্ফূরণের জন্য আলো (সূর্যালোক) অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। গৎবাঁধা, মুখস্থ, বিচারবিবেচনাহীন, পাইকারি অভ্যাস সমাজে-সম্পর্কে যে অন্ধকার তৈরি করে তা থেকে বেরুনোর কথা বলা ছাড়া পথ কোথায়? অন্য দিকে, কালো অবশ্য-অবশ্যই রাতকে বোঝায় তা-ও কিন্তু না। রাত প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার নয়। রাতের নিজস্ব আলো আছে, রঙ আছে। এমনকি যেসব প্রাণী (মানুষসহ) আক্ষরিক অর্থে রাতের অন্ধকারের সাথে সখ্য গড়ে তোলে, তাদের চোখ রাতের অন্ধকারে রাতের রূপই দেখে, রাতের আলোই দেখে— অন্ধকারে কানা হয়ে থেকে অন্ধকারকে দেখা যায় না। শাদা-কালো, আলো-অন্ধকার, দিন-রাত, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সৎ-অসৎ, চোর-পুলিশ, বড়লোক -গরিব, দেহ-মন, ভাব-বস্তু, নারী-পুরুষ প্রভৃতি বাইনারী ধারণাকে অনড় ধরে নিয়ে তা দিয়ে জগৎবিচারের বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা এক ব্যাপার, আর নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা আরেক ব্যাপার।

যখন আমরা বইয়ের শিরোনামে দেখি 'অভ্যাসের অন্ধকার: প্রেম বিয়ে পরিবার ও সম্পর্কজিজ্ঞাসা' তখন অন্তত এটুকু ধারণা তো করতে পারি যে এখানে প্রেম, বিয়ে, পরিবার ও সম্পর্ক বিষয়ক গৎবাঁধা অভ্যাসের, মুখস্থ অভ্যস্ততার, তথা ইনডকট্রিনেইশনের বিষয়-আশয় নিয়েই কথাবার্তা হতে যাচ্ছে। বইয়ের শিরোনাম এক নজরে দেখার সময় পাঠক যদি এটুকুও বোঝেন তাহলেই চলে। উপরন্তু, 'অভ্যাসের অন্ধকার' শব্দবন্ধটা রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' থেকে নেওয়া। 'অভ্যাসের

অন্ধকার’ বলতে রবীন্দ্রনাথ নিজে কী বোঝান সেটা উপলব্ধি করার সুযোগও থাকছে সেই রচনা থেকে। আর সেই রচনাটা তো এই বইয়ে থাকছে। আবার ‘স্ত্রীর পত্র’ নিয়ে নিয়ামুন নাহার নিমার লেখা একটা পর্যালোচনাও এই বইয়ে থাকছে। সেখানেও ‘অভ্যাসের অন্ধকার’ নিয়ে কথা আছে। ‘অভ্যাসের দাসত্ব’ বা ‘অভ্যাসের শৃঙ্খল’ বোঝাতেই ‘অভ্যাসের অন্ধকার’ কথাটা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন বলেই যে ঐ শব্দবন্ধটাকে পবিত্র জ্ঞান করেছি বা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি, তা কিন্তু না। রবীন্দ্রনাথকে আমি লিবার্টারিয়ান স্পিরিট থেকে দেখি। এই দেখাটা এই বইতেই আমার ‘সম্পর্ক স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ’ রচনাতে দেখা যাবে। এ ছাড়া আমার ‘রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজম বলশেভিজম’ নামে অন্য একটা রচনায় এবং *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* নামে বইয়ের ‘মুক্তিপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক একটা অংশে রবীন্দ্রনাথকে এই চোখে দেখার ব্যাপারটা আমি তুলে ধরেছি। এ ব্যাপারে *রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা-প্রিয়তা* নামে পৃথক একটা বইও আমার যন্তরমন্তর ঘরে যন্ত্রস্থ-মন্ত্রস্থ হয়ে আছে। *অভ্যাসের অন্ধকার* নিয়ে পরিকল্পনা করার সময়ও রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-পরায়ণতার, তথা স্বাধীনতাশীলতার, ঐ স্পিরিটই আমাকে প্রাণিত করেছে। এই বইয়ের প্রত্যেকটা লেখার মুখে ঠাকুরের আঁকা একখানা করে ছবি রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতাশীলতার স্পিরিটের প্রতি আমার অঞ্জলিরই স্মারক। মুশকিল হলো, রবীন্দ্রনাথকে ‘মুক্তিপরায়ণ রবীন্দ্রনাথ’ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে আমাদের অভ্যাস ব্যথা পায়। রবীন্দ্রনাথ আসলে একাধারে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ এবং স্বাধীনতাশীলতার সাধক। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সাথে মুক্তিপরায়ণ স্বাধীনতা-শীলতার সম্পর্ক আদতে অতীব ঘনিষ্টই বটে।[৩] একই ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম কন্ট্রাডিকশন থাকতেই পারে, কিন্তু কারো মধ্যে একাধারে উদারনীতিবাদ এবং স্বাধীনতাশীলতার উপস্থিতি কোনো কন্ট্রাডিকশন নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার সময়ও রবীন্দ্রনাথকে আমার প্রয়োজন পড়ে তাঁর স্বাধীনতাশীলতার কারণেই। সম্পর্ক প্রশ্নে নারী-পুরুষের নিজ নিজ অটোনমি বা সম্পর্কের স্বাধীনতাই আমার কাছে মৌল ইশারা। সেই ইশারা ‘স্ত্রীর পত্র’ রচনায় প্রকটভাবে আছে। রবীন্দ্রনাথের ‘পারিবারিক দাসত্ব’ নামে অন্য যে রচনাটা এ বইয়ে থাকছে সেখানেও তা দুর্দান্ত রকমের স্পষ্টতার সাথে পরিস্ফুট হয়ে আছে। এসব কারণে সূচিপত্রে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ আছেন বইয়ের তিনটা ভাগের শেষ ভাগে যার সেকশন-শিরোনাম ‘সম্পর্ক-সন্ধিৎসা: স্বাধীনতাশীল পাঠ’। সেই কারণেই ‘স্ত্রীর পত্র’ থেকে ঐ শব্দবন্ধটা চয়ন করা। সম্পর্কে-সমাজে-সাহিত্যে-বিদ্যায়তনে-রাজনীতিতে

৩ এ নিয়ে আমি আমার উপরোক্ত *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* গ্রন্থের ‘নৈরাজ্যবাদ এবং আলোকায়নের মুক্তিমুখীন চিন্তাধারা’ শীর্ষক তৃতীয় ভাগে আলাচনা করেছি।

যাবতীয় সব অভ্যাসের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারটা এই নামের মধ্যে ইমপ্লায়েড আছে বলে আমার মনে হয়। আমার ধারণা, এমনকি সদা-অভ্যস্ত পাঠকেরাও 'অভ্যাসের অন্ধকার' বলতে 'অভ্যাসের দাসত্ব' বা 'অভ্যাসের শৃঙ্খল' বুঝবেন।

সম্পর্কপ্রণালীর সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন

সম্পাদনাকর্মও এক প্রকার রচনাকর্মই বটে। রচনাকর্ম মানেই আত্মপক্ষ সমর্থনের, বিশ্লেষণের, নিজেকে বুঝে নেওয়ার একটা চেষ্টা। লিখনই চিন্তন। লিখনে আরোগ্য। রচনাকর্ম মাত্রেই সেই অর্থে নিজের ও নিজেদের ভোগান্তির বিবরণ। বিদ্যমান পরিস্থিতির বিবরণ এবং কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃজনের খসড়া ছবি পেশ করা। মানে ভবিষ্যতের পরিস্থিতির বিবরণও বটে। এই বই হাজির করার জন্য দায়ী আমাদের সামাজিক-ব্যক্তিক-সাম্পর্কিক অনন্ত দুর্ভোগ।

দুর্ভোগ সম্পর্ক নিয়ে। অথচ সম্পর্ক নিয়ে কথা নাই। অধ্যাপকেরা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সমস্যা নিয়ে, নিজেদের নিয়ে, লেখেন না। ডাক্তাররা ডাক্তারি-ইন্ডাস্ট্রির ভেতরকার খবর প্রকাশ করেন না। (ব্যতিক্রম: লেখক-চিকিৎসক-অধ্যাপক মামুন হুসাইনের *হাসপাতাল বঙ্গানুবাদ*।) বিচারকেরা তো আইনতই বিচার-প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে পারেন না। দম্পতিরা দাম্পত্যের গুমোর প্রকাশ করেন না। বিবাহিতরা বিবাহের অন্তহীন নবায়ন ঘটাতে থাকেন। পরিবার থেকে সেনাবাহিনী পর্যন্ত আমাদের যাবতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান – মৌলিকত – আমাদেরই প্রশ্নাতীত সম্মতি ও আনুগত্যের পবিত্র সব পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। অথচ আমরা সবাই জানি – নিজের নিজের ক্ষেত্রে – এই প্রতিষ্ঠানগুলো সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ অচলায়তনে পরিণত হয়েছে আসলে।

সমস্যার চেয়েও বড় কথা সমস্যা নিয়ে আমরা কীভাবে কতটা আলাপ করি অথবা নীরবতার সাধনা করি। খুনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুন নিয়ে আমাদের কথাবার্তা-বলাবলির প্রবণতাগুলো। আমাদের বলাবলির ধরন-ধারণই বিদ্যমান সম্পর্ক-কাঠামোগুলোকে পরিবর্তন-প্রতিরোধী করে তুলেছে। আমরা সেসব দেখতে পাই না। সেসব নিয়ে কথাবার্তা বলি না, শুনি না। আমাদের চোখে অভ্যাস। শ্রবণে অন্ধকার।

কেন আমরা চোখে দেখি না? কেন আমরা মনে রাখি না যে: দেয়ালেরও কান আছে, আর কানেরও দেয়াল আছে? কারণ তোমার চোখ দেখে না, দেখে তোমার দেখার অভ্যাস। অভ্যাস আমাদেরকে অন্ধ করে দেয়। তখন আমরা দেখি প্রশিক্ষণ দিয়ে। দেখি যার যার প্রিয় প্রিয় মতাদর্শের চশমা দিয়ে। দেখি নিজের নিজের লেখাপড়া দিয়ে। আবাল্যবার্ধক্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়েপিটে তৈরি করা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আমাদের চোখ নিরাপদে থাকতে চায় আইনের শাসনের দণ্ডবিধির পাহারায়।

ক্যামেরার নজরদারিতে। অধিপতি ধারার শিল্পসাহিত্য, মিডিয়া, শিক্ষালয় এবং শাস্ত্রধর্ম নিরন্তর নবায়ন-পুনঃনবায়ন উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করে চলে অভ্যাসের অন্ধত্বকে। অভ্যাসের অন্ধকারকে।

অভ্যাস আসে প্রশিক্ষণ থেকে। ক্রমাগত কন্ডিশনিং থেকে। দীক্ষায়ন প্রকৌশল থেকে। প্রশিক্ষণ যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ অসারতা উৎপাদন করতে থাকে চেতনা — আমরা চলি অভ্যাসে, সচেতনভাবে নয়। পা ফেলি অভ্যাসে, সচেতনভাবে না তাকিয়ে। ফলত হোঁচট খাই এবং দোষারোপ করতে থাকি কপালকে। অভ্যাস চলে চেতনাশক্তি-চর্চার অভাবের জোরে। আমরা যতক্ষণ সচেতন থাকি ততক্ষণ দূরে থাকে অভ্যাস। অভ্যাস মানে চেতন-শক্তির অচেতন হয়ে থাকা। অভ্যাস মানে আমাদের অন্তর্গত-অন্তর্জাত চৈতন্যের শিখাকে সুপ্ত রাখা। অভ্যাস হলো আলোর অভাব। চৈতন্যের অভাব। অভ্যাস তাই অন্ধকার।

আলো আছে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিচার ও অনুসন্ধানে। চেতনার আলো তো আর স্বয়ংক্রিয় অভ্যাসে জ্বলে না। প্রশ্ন দিয়ে, সংশয় দিয়ে, বিচার-বিশ্লেষণ-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে, যুক্তিবোধ ও ভেদজ্ঞান দিয়ে, অনুমান ও প্রমাণ দিয়ে নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে আলোময় করে রাখতে হয়। তবেই চেতনা কাজ করে ঠিকঠাকভাবে। মুখস্থবিদ্যা দিয়ে, তোতাপাখির বুলি দিয়ে, কী-করিলে-কী-হয় মার্কা প্রশিক্ষণ দিয়ে সচেতনতার চর্চা করা যায় না। চেতনার কোনো বাঁধা পথ নাই। চেতনা এক নিরন্তর ও বিচিত্র অনুশীলন-প্রবাহ।

অন্ধকার বলতে তাই বলে ব্ল্যাকনেস নয়, ডার্কনেস। অন্ধকারের রঙ কালো নয়। কালো নিজে একটা রঙ। কিন্তু অন্ধকারের কোনো রঙ নেই। অন্ধকার রঙের অভাব মাত্র। অন্ধকার আসলে আলোর অভাব মাত্র। প্রশ্নটা তাহলে অন্ধকার নিয়ে নয়, আলো জ্বালা নিয়ে। আলো দিয়ে অন্ধকারকে দৃশ্যমান করে তোলা নিয়ে। দৃশ্যমান হয়ে উঠলেই দূরীভূত হয় অন্ধকার। আলোঢালা দৃশ্যরাশি ফুটে ওঠে আমাদের রচনায়, অনুশীলনে। অনুশীলনও এক প্রকার রচনা। রচনাকর্ম নিজেও তো এক চর্চা। সুতরাং আমরা কীভাবে কথা-চালাচালি করি, লেখালিখি করি, কিংবা নীরবতা পালন করি তা মারাত্মক রকমের জরুরি ব্যাপার।

কীভাবে আমরা চুলের স্টাইল করি, কীভাবে হাঁটি, কীভাবে আমাদের আশ-পাশকে ব্যাখ্যা করি, কীভাবে সঙ্গম করি, কীভাবে আদালতে-শিক্ষালয়ে-সেনা-সংস্থায় আমরা নিজেদের ‘বাস্তবতা’ শেখাই, কীভাবে আমরা বাবাগিরি-ব্যাটাগিরি-নারীগিরি-এমপিগিরি-কবিগিরি প্রভৃতি করতে থাকি বিনাদ্বিধায়-বিনাপ্রশ্নে তার সবই আমাদের কালাগত অভ্যাস ও সুপ্রতিষ্ঠ প্রচলন থেকে আসে। এর বাইরে কিছু দেখলেই আমরা সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠি। যাবতীয় ‘অপর’কে দেখি আপত্তির চোখে। সবাই কেন আমাদের মতো হবে না? ‘আলাদা’ হবে কেন? তাহলে তো সমাজে

‘বিশৃঙ্খলা’ দেখা দেবে! ‘নৈরাজ্য’ দেখা দেবে! সুতরাং ‘অপর’কে হতে হবে আমার মতো। পাহাড়িদেরকে হতে হবে সমতল বাঙালি। বরকে হতে হবে বউয়ের মতো। প্রেমিকাকে প্রেমিকের মতো। বিএনপিকে আওয়ামী লীগের মতো। চোরকে পুলিশের মতো। শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষকের মর্জি মতো। আর ‘অপর’ যদি নিজের মতো করেই জীবনযাপন করতে চায়, তাহলে তাকে শাসন করতে হবে। রীতিনীতি, বিধিবিধান, আইন-অভ্যাসের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে, সাইজ করতে হবে। আর আন্তরিকভাবে অন্ধ অনুগতদেরকে দিতে হবে পদক এবং পুরস্কার। এইভাবে সংসার থেকে সচিবালয় পর্যন্ত যাবতীয় সম্পর্করাজি আইন ও দণ্ডবিধির নিরিখে নির্ধারিত-পরিচালিত-প্রবর্তিত হতে থাকবে। সম্পর্ক বলতেই কর্তৃত্বপরায়ণ হায়ারার্কি বোঝাবে। গুরুর ওপর গুরু, তার ওপর গুরু; এবং গোলামের নিচে গোলাম, তার নিচে গোলাম। সম্পর্ক মানেই তাই গোলামির গুরুতন্ত্র। সম্পর্ক মানেই আমলা-তান্ত্রিক। সম্পর্ক তখন লাভক্ষতি-নাম-ক্ষমতার হিসাবনিকাশ সম্বলিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক। সম্পর্ক মানেই রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক। যেমন ‘ঘুমিয়ে থাকে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে’, তেমনি জাগ্রত থাকে রাষ্ট্রপিতা সব নাগরিক-অন্তরে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান-গুলো হয়ে ওঠে একেকটা ছোট ছোট রাষ্ট্র। পাড়ার ১৫ জনে মিলে পাঠাগার গড়ে তোলা হলো তার মধ্যে সভাপতি-সম্পাদক-গঠনতন্ত্র-বহিঃষ্কার-দণ্ডবিধি। পরিবারে মা-বাবা-গুরুজনদের আধিপত্য কিংবা গণতান্ত্রিক ভোটাভুটি। প্রেম মানে বিশেষ একপ্রকার বিজনেস পার্টনারশিপ। বিবাহ মানে আবহমান কাল ধরে বহনীয় এক আইনি চুক্তি। এই চুক্তি রীতিমতো আমাদের দণ্ডবিধির অন্তর্গত। এক কথায় বললে, অভ্যাসের অন্ধকার আমাদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ককে পরিণত করেছে কোনো না কোনো প্রকারের আইনি সম্পর্কে। পরিণত করেছে কোনো না কোনো প্রকারের কর্পোবিজনেস-সম্পর্কে। আবার, ঘুরিয়ে দেখলে, আইনি সম্পর্ক মানেই বাণিজ্য-সম্পর্ক এবং বাণিজ্য-সম্পর্ক মানেই আইনি সম্পর্ক। কেননা শাস্ত্র ছাড়া, শাস্ত্রধর্ম ছাড়া আইন চলে না। আইন ছাড়া শাস্ত্র চলে না। আর বাণিজ্যই এ যুগের শাস্ত্রধর্ম, এ যুগের মতাদর্শ। কাজেই, আইন আর বাণিজ্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র।

পরিণামে সাজা খাটে সম্পর্ক। নারীপুরুষ সম্পর্ক। সর্বপ্রকার সম্পর্ক। আইনি আনুগত্যের অভ্যাসে সবাই ‘অপর’কে চোর মনে করে, সবাই নিজেকে পুলিশ মনে করে। এক দিকে সততা-অসততার খণ্ডিত মূল্যবোধ ও সন্দেহ-পুলিশগিরির আন্তরিক কর্তব্যবোধ, এবং অন্য দিকে লাভক্ষতির বাণিজ্যবোধ – এই দুইই আমাদের যাবতীয় সম্পর্ক-বিচারের কষ্টিপাথর। এই বিচার মোতাবেক ‘অপর’কে অসৎ ধরে নিয়ে জগৎবিচার করাটাই আমাদের সততা-নিষ্ঠার নীতি। অপরের অসততাই আমাদের নিজেদের সততাবোধের মানদণ্ড। যাবতীয় সততা-ধারণার মতোই যৌন-সততা ও সম্পর্ক-সততা নামক ধারণাগুলিও এমনভাবে তৈরী যে

অন্যকে/অপরকে অসৎ বলে দোষারোপ করতে না পারলে নিজের সততা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না। সততার ধারণা মানেই চোর-পুলিশ ধারণা। অসৎ চোর ছাড়া পুলিশের সদাসতর্ক সততার নিরাপত্তা থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কোনো সৎ মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। কারণ এই পদ্ধতিতে সততার ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসততার ধারণার ওপর। অসততাই এখানে প্রাথমিক – সততা সেকেন্ডারি, গৌণ। এই ধারণা-প্রণালীতে যেখানে অসৎ মানুষ নাই সেখানে সৎ মানুষের ধারণা গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্পর্কগুলো সব টম-অ্যান্ড-জেরি সম্পর্ক হয়ে পড়ে।

মনুষ্য-প্রশ্নটা আমার কাছে আদতে সম্পর্কের প্রশ্ন। নারী-প্রশ্ন নয়। শ্রেণী-প্রশ্ন নয়। মতাদর্শিক শুদ্ধতার প্রশ্নও নয়। সে সব প্রশ্ন তো আছেই। পুরুষাধিপত্যের, শ্রেণী-আধিপত্যের, পুঁজি-আধিপত্যের, ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের প্রশ্নগুলো চরম গুরুত্বপূর্ণ – সন্দেহ নাই। সেসব প্রশ্নকে আমাদের যার যার মতো করে ফয়সালা করতেই হবে। কিন্তু সার্বিক বিচারে, প্রশ্নটা আমার কাছে সম্পর্কের প্রশ্ন। সম্পর্কের স্বাধীনতার প্রশ্ন। স্বাধীন সম্পর্ক চর্চার প্রশ্ন। চুক্তিভিত্তিক ও বাণিজ্যভিত্তিক আইনি-রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে বন্ধুত্বভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের দিকে উত্তরণের প্রশ্ন। প্রশ্নটা আমার কাছে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বতন্ত্র থেকে ব্যক্তি-গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের যথা-সম্ভব-আত্মকর্তৃত্বের দিকে যথাশীঘ্র-যাত্রার প্রশ্ন। সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট এসব প্রশ্ন নিয়েই এই বই।

বিশেষ দুজন ব্যক্তির সম্পর্কযাপনের মধ্যকার আলো-অন্ধকার-আবছায়া এ বইয়ে আমার আগ্রহের বিষয় না। এতে আমার আগ্রহ মানুষে-মানুষে সম্পর্করচনার সেই আর্থ-রাজনৈতিক পাটাতনটির প্রতি, যা আমাদের সম্পর্করাশিকে ডুবিয়ে রেখেছে আইনি-রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক সম্পর্কের গাড্ডায়– খোদ মানবীয় সম্পর্ক জিনিসটাকে আড়াল করে রেখেছে অপরিচয়ের অন্ধকারে। এই পাটাতনটাকে শনাক্ত করার সাথে সম্পর্কের যাবতীয় খুঁটিনাটির বিস্তৃতি নিয়ে আলাপ তোলার কোনো বৈরিতা নেই। পাটাতনটা তৈরি করা হয়েছে তিলতিল অভ্যাসের অনাদি অন্ধকার দিয়ে। এই সর্বব্যাপক অন্ধকারকে না দেখে আলো-অন্ধকারের যান্ত্রিক যুক্তিপ্রণালী প্রয়োগ করে খোদ সম্পর্ক জিনিসটাকেই অন্ধকার-অস্পষ্ট-আবছায়া বলে ভাবাটা নিতান্তই আত্মঘাতী হবে। সম্পর্ক হলো সেই জিনিস যা দিয়ে মানুষ শুধু অপরকে চেনে না, নিজেকেও চেনে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল যেমন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন বিন্দুর সাথে তাঁর সম্পর্কের চোখ দিয়ে। সম্পর্কই অপরিচয় ঘোঁচায়। ঘোঁচায় অপরিচয়ের অন্ধকার। তৈরি করে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত তাগিদ। আত্মপ্রকাশ বলতে উপলব্ধিরই প্রকাশ। উপলব্ধি আসে আবার যাপন থেকে। অথচ যাপন নিজেও আত্মপ্রকাশই বটে! উপলব্ধি আর যাপন তাই আলাদা কিছু না।

উপলব্ধিই যাপন হয়ে ওঠে, আবার যাপনই উপলব্ধি। এ দুই দেহ-মনের মতোই অবিভাজ্য। অবিভাজ্য বলেই পুস্তক রচনার মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো মাধ্যেম বিচিত্র উপলব্ধির অজস্র আত্মপ্রকাশের সার্থকতা। পুস্তক আকারে উপলব্ধির আত্মপ্রকাশ অনিবার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে আমাদের সম্পর্কযাপনের ওপর। কীভাবে করে, কতুটুকু করে, কত মিটার বা কত লিটার করে, কখন করে– তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘড়ি-নিক্তি ধরে পরিমাপ করে দেখতে পারি না। যা পরিমাপ করতে পারি না, তার কোনো অস্তিত্ব নাই– এরকম মনে করার কোনো কারণ দেখি না। পরিণামে পুস্তকের প্রভাব ও কার্যকরিতা সম্পর্কে আমার মনে সংশয় আসে না। পুস্তক প্রণয়নের এ ছাড়া আর কীইবা কারণ থাকতে পারে– হাততালি-পুরস্কার-প্রশংসা-নাম-খ্যাতির অবান্তর প্রসঙ্গগুলোর কথা বাদ দিলে? সহজ হাততালি পাওয়ার জন্য, পাওয়ার মতো, যে এই বই নয়– তা তো বোঝাই যায়। বাকি থাকে সম্পর্ক-উদযাপন আর আনন্দময় আত্মপ্রকাশ। আত্মপ্রকাশের আনন্দই স্বাধীনতা।[৪]

পশ্চিমপাড়া, রাবি: ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫

---

৪ বাংলা ভাষায় স্বাধীনতাবোধের প্রকাশ আমি এখন রবীন্দ্রনাথের কাছ্ থেকে শিখছি বলে তাঁরই 'সঙ্গীতের মুক্তি' রচনা থেকে শেষ এই বাক্যটা নিজের মতো করে খাড়া করলাম। মনুষ্য-স্বাধীনতা তথা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ও রাষ্ট্রের বিপরীতে সামাজিক আত্মশক্তির বিকাশ ইত্যাদি প্রভৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-বহির্ভূত বাংলা রচনায় ভালো তিনটা লেখার কথা কোথাও শুনেছি বলেও তো মনে পড়ে না। (শুনতে পেলে আনন্দিতই হবো অবশ্য!)

সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা: নারীবাদী নিরীক্ষণ

সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা:
নারীবাদী নিরীক্ষণ

সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা: নারীবাদী নিরীক্ষণ ২৭

নাসরিন খন্দকার

প্রেমের মাত্রা ও মাত্রিকতা

Rabindranath Tagore

'দুইটা না, পাঁচটা না, আমার একটা মাত্র বউ ... একমাত্র প্রেমিকা ... বা প্রেমিক' – প্রেমের পাত্র বা পাত্রীর বর্ণনায় এই একমাত্রিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হলেও মাত্রাতিরিক্ত 'প্রেম' প্রেমের মানদণ্ডে যেন একটি ইতিবাচক বিষয়। আমি কথা বলছি প্রেম নামক ধারণাটির সাধারণ অর্থ নিয়ে, এর মাত্রা ও মাত্রিকতা নিয়ে, যেখানে প্রেম হচ্ছে একটি 'মাত্রাতিরিক্ত আবেগ'– একটিমাত্র পাত্রের প্রতি। প্রেম প্রত্যয়টিকে সাধারণ অর্থে নারী-পুরুষের মধ্যকার আকর্ষণ/ভালোবাসা হিসেবেই দেখা হয়, যদিও দেশ, মাতৃ বা পিতৃ ইত্যাদি শব্দের পরে বসিয়ে দেশপ্রেম, মাতৃ বা পিতৃপ্রেম বলেও একে প্রকাশ করা হয়। তবে সেটা বিষেশায়িত অর্থ। আমি প্রেমের এই সাধারণ ধারণাকেই একটু উল্টেপাল্টে দেখতে চাইছি এই লেখায়। ফলে কথা বলছি, প্রথমত প্রেমের প্রচলিত সংজ্ঞা নিয়ে। দ্বিতীয়ত বলব প্রেম নামক অনুভূতি যার প্রতি নিবেদিত হয় বা জন্মায় বা জন্মায় বলে ধারণা করা হয় তাকে/তাদেরকে

নিয়ে। প্রথমেই বলে রাখছি আমি প্রেমকে সমালোচনামূলকভাবে (বিশ্লেষণী অর্থে, নেতিবাচক অর্থে নয়) দেখছি এবং আমার অবস্থান প্রচলিত ধারণাকে আত্মস্থ করার বিপরীতে। উপরন্তু, আমি নারীবাদী অবস্থান থেকেই মূলত একে বিশ্লেষণ করতে চাই। সেটি করতে গিয়ে আমি শুরু করব পশ্চিমের নারীবাদী ধারণা থেকে (নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিশ্লেষণ[১])। সেখান থেকে আমি ফরাসী নারীবাদী দর্শনে নারী-পুরষের সম্পর্ক বিশ্লেষণে প্রেমের বিশ্লেষণ হাজির করব। সেখান থেকে ভাষাগত ধারণার সাথে অনুভূতির নির্ধারণবাদী সম্পর্ক দেখাতে এবং প্রেম-ভালোবাসার উত্তরাধুনিক সম্ভাবনা নিয়ে মিশেল ফুকো এবং জুডিথ বাটলারের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রেম নামক বিষয়টিকে সন্দেহ/প্রশ্নের মুখে রাখা এবং সেখান থেকে ক্রমাগত নতুন সম্পর্ক-কাঠামো সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে বলব। তত্ত্বীয় এই আলোচনাগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে এবং আমাদের বাংলাভাষী চিন্তা ও জীবনে এর সম্পর্ক দেখাতে আমি কিছু বাংলা গান এবং তার কথার মাধ্যমে প্রেম-ভালোবাসার এই বিশ্লেষণী আলোচনা হাজির করব।

প্রেম নিয়ে বুভেয়ার-এর সমালোচনা:
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই

নারীবাদী তত্ত্বে ও আলোচনায় প্রেম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও নারী-পুরুষের ক্ষমতা-সম্পর্ককে চিহ্নিত এবং তা মোকাবেলা করতে গিয়ে নারীবাদীরা বিয়ে বা যৌন সম্পর্ককে যতটা বিশ্লেষণের মধ্যে এনেছেন, প্রেমকে ততটা কেন্দ্রে দেখা যায় নি। কিন্তু আমরা দেখি, সিমোন-দ্য-বুভেয়ার প্রেম বা নারী পুরুষের 'রোমান্টিক ভালোবাসা' ধারণার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, নারীর জন্যে তার নিজস্ব সত্তাকে বঞ্চিত রাখা এ রোমান্টিক ভালোবাসার কেন্দ্রীয় দাবী। নারী তার বিশেষ এবং একমাত্র ভালোবাসার পুরুষটির জীবনভঙ্গি, দর্শন, মতামত, বন্ধুতা, শত্রুতা সমস্ত কিছু নিজের করে গ্রহণ করে। প্রেমিকা-নারী তার প্রেমিক-পুরুষের চোখে ভালোবাসা দেখতে চায়। আর সেটাই তার জন্যে সবচেয়ে বড় চাওয়া হয়ে উঠে। সেই জন্যে প্রেমিক যে বই পড়ে সে সেই একই বই পড়ে। প্রেমিক যে গান পছন্দ করে সেই নারীও সেই একই গান পছন্দ করতে থাকে। সে তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ ভুলে প্রেমিকের ছাঁচে নিজেকে তৈরী করে।

---

১ নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ (second wave feminism) মূলত গত শতকের ৬০ ও ৭০-এর দশকের ঘটনা। এ সময় প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রে এবং তার প্রভাবে সারা ইউরোপে সমঅধিকার, নাগরিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও ভোটাধিকারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের সমান মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে একটা বিপ্লবী প্রজন্মের উত্থান ঘটেছিল। বিশেষত এইসব অধিকারের প্রশ্নে এই ধারার নারীবাদীরা সোচ্চার।

বুভেয়ার যে সময়ে নারী-পুরুষের এ রোমান্টিক প্রেমের সমালোচনা করছেন, বাংলার সংস্কৃতি-গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়পর্বেরই পশ্চিমা রোমান্টিক প্রেমের আমদানী করছেন বাংলায়। আর তার মধ্য দিয়ে বাংলায় ভদ্রমহিলার নতুন ইমেজ, নারী-পুরুষের নতুন সম্পর্ক প্রস্তাবিত হচ্ছে। রোমান্টিক/আত্মিক প্রেমের স্তম্ভ রচিত হচ্ছে। প্রেম তখন তার দৈহিক/জৈবিক আকর্ষণ বা বন্ধন ছাড়িয়ে আত্মিক বন্ধন হিসেবে প্রস্তাবিত হচ্ছে। প্রেম তখন 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো, তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো'। সার্বিক সমর্পণের এই রূপকেই বুভেয়ার নারীর জন্যে স্ব-বঞ্চনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কেননা, প্রথা-বিরোধী ছন্নছাড়া রোমান্টিক কবি বায়রনও বৃটিশ রোমান্টিকতার ধারক হয়ে দার্শনিক রুশোর মতোই বলে যাচ্ছেন, 'পুরুষের জন্যে প্রেম জীবনের একটি বিষয় মাত্র, আর নারীর জন্যে তা সার্বিক অস্তিত্ব'। তো এই সবটুকু অস্তিত্ব দিয়ে প্রেমিক-পুরুষের আত্মতে বিলীন হওয়াই রোমান্টিক প্রেমের দাবী হলে, নারীর জন্যে তা ফাঁদ বৈকি।

প্রেমের প্রচলিত দাবী আর সংজ্ঞার প্রতি বুভেয়ার-এর কঠোর সমালোচনা পরবর্তী কালে নারীবাদীরা গ্রহণ করেন এবং এ প্রেমের সম্পর্ক নারীর জন্যে কতটা বঞ্চনার তা তুলে ধরেন। কিন্তু মুশকিল হলো, বিংশ ও একবিংশ শতকের নারীর জীবনে প্রেমের গুরুত্ব ও দাবী তাতে কিছুমাত্র খাটো হয় না। এমনকি সচেতন ও স্বাধীনচেতা নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে – যেখানে নারীকে তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের কোনো মূল্য না দিয়ে কেবল যৌনবস্তু হিসেবে দেখা হয় – সেখান থেকে মুক্তির একটা দরজা হিসেবে প্রেমকে বিবেচনা করে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার 'সুন্দর' আহবানকে ক্ষমতা-সম্পর্কের মতো অসুন্দর মানদণ্ডে বিচার করার নারীবাদী চোখরাঙানিকে বরং সেই নারীরা বাধা হিসেবে দেখতে থাকে। প্রেমকে সমালোচনা করতে গিয়ে নারীবাদ আরো অজনপ্রিয় হয়ে উঠে। খটমট, বেরসিক নারীবাদী সমালোচনা তখন নারীর জীবন ও তার চাওয়ার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায়।

ফরাসী নারীবাদ: তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা?

বেরসিক নারীবাদের সাথে নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষার এরকম একটা সংকট থেকে বের হবার রসিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় ফরাসী নারীবাদী দার্শনিকদের প্রস্তাবনায়। যারা প্রেমকে বাতিল করেন না, বরং উদযাপন করতে চান নারীর কর্তা হয়ে উঠার মাধ্যমে। তাঁরা নারীর কর্তাসত্তা উদযাপনের মাধ্যমে ভিন্ন ধরনের প্রেমের কথা বলেন। তাঁদের বক্তব্যে নারী এ নতুন ধরনের প্রেমের কর্তা– যে কর্তা একক বা অখণ্ড না। তাঁরা এক অঙ্গে বহু সত্তার কর্তা হবার কথা বলেন, প্রেমকে শরীরের লেখনীতে নিয়ে আসেন। আত্মসমর্পণ থেকে নারীর শরীর আর মনের কার্তেসীয় বিভাজনকে বুড়ো

আঙুল দেখিয়ে শরীর-মনের বিভাজন ভেঙে দেন। প্রেমের পুরুষতান্ত্রিক একক সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে এসে বহুমুখী আত্ম আর বহুমাত্রিক প্রেমে নারী ও তার শরীরকে কর্তা হিসেবে আহবান করেন।

প্রেমের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পরস্পরের এককসত্তা দেয়া-নেয়ার বিষয়টিকে স্বত্ব ও সত্তার সাথে যুক্ত করে বাতিল করে দেন দার্শনিক জ্যঁ-লুক ন্যঁসি (Jean-Luc Nancy)। ন্যঁসি বলেন, প্রেমে যে সত্তাকে দেবার কথা বলা হয়, তা আসলে প্রদান-কারীর স্বত্বাধিকারে থাকে না। এই দেয়া আসলে 'কিছু না' দেয়া, তাই মূলগতভাবে স্ববিরোধী। একেই ন্যঁসি বলছেন 'বিচূর্ণ প্রেম' (shattered love)। আর এই দেয়া-নেয়ার চক্র থেকে প্রেমকে মুক্ত করতে গিয়ে একক বা অখণ্ড সত্তা আর স্বত্ব-এর ফাঁদ থেকে মুক্ত করবার কথা বলেন ইরিগারে। ইরিগারে বলেন, 'ভালোবাসা' কোনো উপহার না। তিনি সেই প্রেমের কথা বলেন, যেখানে একজন অপরকে স্পর্শ করে নিজকেই স্পর্শ করে, নিজের অনেক অনেক সত্তাকে স্পর্শ করতে পারে। তারা তখন অসংখ্য সত্তাকে এলোমেলো করতে থাকে একটা সাজানো কাঠামোর ভেতর থেকে এদেরকে বের করে আনার জন্যে।

ইরিগারে যে বহু সত্তার কথা বলেন, তা একের মধ্যে অনেক সত্তা, অনেক আত্ম'র ভালোবাসা, যুদ্ধ, সহবাসের কালাইডোস্কোপ তৈরি করে। তখন আমার মনে পড়ে গীতিকার জাহিদ হাসান পাপ্পুর লোকপ্রিয় গান:

তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা?
তোমার ঘরে বাস করে মন কয় জনা?
একজনে ছবি আঁকে এক মনে ও মন,
আরেক জনে বসে বসে রঙ মাখে,
আবার সেই ছবিখান নষ্ট করে কোন জনা ... কোন জনা।

ঠিক যেরকমভাবে আরেক ফরাসী নারীবাদী ইলেন সিসু (Helene Cixous) প্রশ্ন করেন, 'আমি কারা?'

ইরিগারে'র প্রেম দ্বারা নারীর কর্তাসত্তা উদযাপন করার প্রস্তাবকে অনেকে নির্যাসবাদী প্রবণতা বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু ডায়ানা ফাস দেখান যে, নারী-সত্তার এই প্রস্তাব আদতেই কোনো একমুখী নির্যাস না। এটি নারীর একটি অনির্যাস-মূলক নির্যাস, এটি এক বা দুই না – বরং আলোর মতো অগুনতি, অসীম, গণনার বাইরে।

অন্যদিকে রোজি ব্রাইদোত্তি ফরাসী নারীবাদের এই তত্ত্বকে নব্য-বস্তুবাদী চিন্তার সাথে যুক্ত করে বলেন, নারীর এই কর্তাসত্তা মূলগতভাবে দেকার্তের দ্বিবিভাজনকে

খারিজ করবার শক্তি রাখে। এখানে নারীর শরীরনিহিত (এমবডিমেন্ট)[২] সত্তার ধারণাটি জৈবিক বা সাংস্কৃতিক কোনোটাই না, বরং এই দুইয়ের বিভাজনকে ছাড়িয়ে পারস্পরিক নির্ধারণবাদী যোগাযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এটি চিহ্ন, বস্তু এবং সমাজ – এই তিনের মাখামাখি একটা অবস্থাকে প্রকাশ করে। এখানে শরীর ও সংস্কৃতি উভয়ে উভয়ের নির্ধারক, প্রভাবক। ফলে শরীরী প্রেম বলে যেমন কিছু থাকছে না তেমনি আত্মিক প্রেম বলেও কিছু নাই।

জুডিথ বাটলার: আমি তো প্রেমে পড়িনি, প্রেম আমার উপরে পড়েছে

জুডিথ বাটলার ফরাসী দার্শনিক জ্যঁ-লুক ন্যান্সি'র প্রেম সম্পর্কিত বিশ্লেষণ হাজির করে দেখান যে রোমান্টিক প্রেমের ধারণায় গোড়াতেই গলদ। ন্যান্সি বলেন, প্রেম যদি সমর্পণ হয়ে এক আত্মার আরেক আত্মাতে বিলীন হওয়া বোঝায়, তাহলে প্রেমকে ধারণ করবার বা দেবার বা নেবার জন্যে তো কোনো সত্তাই আর রইল না। ফলে এটা একটি অসম্ভব অবস্থা। তাই বাটলার প্রেম নিয়ে সন্দেহ করবার কথা বলেন।

বাটলারের কাছে প্রেম একটি ভাষা/চিন্তা-কাঠামো, যা কিনা নাটক নভেল বা গান-কবিতার মাধ্যমে আমাদেরকে এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা শিখিয়ে দেয়। প্রেমে পড়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমরা তখন ভাবতে থাকি এটা কি প্রেম? নাটক-নভেলে পাওয়া প্রেমের কাঠামোর সাথে তখন আমরা তাকে মিলিয়ে দেখি। এর মাত্রা মাপি। তাহলে প্রেম যেখানে একটি মাত্রাতিরিক্ত বা মাত্রা-ছাড়ানো অভিজ্ঞতার কথা বলে, সেটি আসলে ভীষণভাবে মাত্রার মধ্যেই সংজ্ঞায়িত থাকে। ফলে আমরা আদতেই প্রেমে পড়ি না, বরং 'প্রেম' নামক ধারণাটি তার নির্দিষ্ট মাত্রা নিয়ে আমাদের উপরে পড়ে। বাটলার তাই এই মাত্রাকে প্রশ্ন করার, তার দিকে সন্দেহ নিয়ে তাকাবার কথা বলেন।

কিন্তু ব্রাইদোত্তির আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, নব্য-বস্তুবাদী তত্ত্বে[৩]

---

২ নারীবাদী বিশ্লেষণ শরীর/মন, সংস্কৃতি/প্রকৃতি বা নারী/পুরুষের এই ধরনের দ্বি-বিভাজনের সমালোচনা করেছে। কিন্তু বর্তমানে নারীবাদী তত্ত্বে শরীর বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হচ্ছে। যার কেন্দ্রীয় মনোযোগ দৈনিক জীবনযাপনে জৈবিকতার/শরীরী অভিজ্ঞতা ও তার গ্রথিত দশার আলোচনায়। শরীরনিহিত এ অভিজ্ঞতা শুধু-মাত্র বস্তু, বা এর সাংস্কৃতিক দশা দ্বারা নির্ধারিত না, বরং এরা সকলেই সকলের সাথে মিশে আছে।

৩ নারীবাদী কারান বারাদ, ডোনা হারাওয়ে ভাষার বা চিহ্নের প্রতি অতি গুরুত্বারোপের সমালোচনা করে বলেন, নারীবাদীরা জৈবিক নির্ধারণবাদকে মোকাবেলা করতে গিয়ে সমাজ বা সংস্কৃতির উপরে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন যে শরীর এবং তার

এসে প্রেমের আরো নতুন সম্ভাবনা তৈরী হয়। শরীর-মনের দ্বিবিভাজন ভেঙে পড়লে প্রেম, কাম এসব বর্গ আর তাদের দেয়াল ভাঙতে থাকে। ভাঙতে থাকে একগামী-বহুগামী-বিষমগামী সব সংজ্ঞা আর তাদের অনড় সমালোচনাও। সবগুলো ইতি ও নেতি মানবিক অনুভূতির নানান কম্বিনেশনই কালাইডোস্কোপের মতো আমাদের পরস্পরের অনুভূতির নক্সা তৈরি করে, কোনো বিশেষ নাম না। আধুনিক এই দ্বিবিভাজনের সংজ্ঞার বেড়াজাল থেকে ভালোবাসার মুক্তির সম্ভাবনা তৈরী হয়। সেখানে যেমন নাই সমাজের সীমানা তেমনি পলিটিকাল কারেক্টনেসের দ্বিবিভাজন। এই দুইয়ের চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে চলার হাজারো পথ তৈরী হয়, অন্তত অনুভূতিতে। ব্যথার সাথী আর সহমর্মীকে যৌনতার টানাপোড়েন থেকে মুক্তও করা যায়, যুক্তও করা যায়। কিন্তু সমাজের ব্যাকরণে তাকে জায়গা করে নিতে পারতে হবে, সেই সাথে নতুন ব্যাকরণের জায়গা খোলা রাখতেও হবে।

সোনাবন্ধুর পিরীতি?

জুডিথ বাটলার বা মিশেল ফুকো তাদের জীবন এবং তত্ত্ব দিয়ে নারী-পুরুষের বিষম-কামী প্রেমের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। জুডিথ বাটলার দেখান সমকামী যৌনতার উপরে ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা যৌনতার নিষেধাজ্ঞার সবচেয়ে প্রাথমিক দিক। মুক্ত ও মানবিক সম্পর্ককে কাঠামোবন্দি করার সবচেয়ে প্রথম নিষেধাজ্ঞা। ফলে এই কাঠামোকে প্রশ্ন করতে গিয়ে নতুন ধরনের সম্পর্ক কী হতে পারে তা নিয়ে বলতে গিয়ে ফুকো বন্ধুত্বকে জীবন-চর্চার কেন্দ্রে রাখতে চান। কেননা, মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে একমাত্র বন্ধুত্বই এমন একটি খোলা কাঠামো, যার মধ্যে সব সম্ভাবনা থাকে। যা যেকোনো পথে চলতে পারে। এটি কোনো রকম মাত্রাহীন – কিংবা বলা যায়, এটি মাত্রাতিরিক্ত-এর মাত্রাকেও প্রশ্ন করতে পারে। সমকামী/বিষমকামী অথবা একগামী/বহুগামী – এই সব ধরনের লেবেল থেকেও তা বের হয়ে আসার সম্ভাবনা রাখে। বন্ধুত্ব নিয়ে ফুকোর আলোচনায় মনে পড়ে যায়, বাংলা লোকগীতির সোনা-বন্ধুর পিরীতির কথা। 'সোনাবন্ধু' সেই জন, যে লিঙ্গ/বিবাহ/বৈধ-অবৈধ ব্যাকরণ থেকে প্রেমকে বের করে আনে পিরীতে, যে পিরীত আত্ম আর শরীরের মাঝে

অভিজ্ঞতা মনোযোগ থেকে সরে গেছে। তারা ফুকো বা জুডিথ বাটলার-এর মতো চিহ্ন নিয়ে মনোযোগের সাথে সাথে, বস্তু বা শরীরের গুরুত্ব নিয়েও ভাবতে চান। তাঁরা বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনার যোগসূত্র ও পারস্পরিক নির্ধারণ ক্ষমতার প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা বলেন, বস্তু ও ভাষার এই বিভাজন আরেক ধরনের দ্বিবিভাজন তৈরী করে। তাঁরা দেখান যে, বস্তু-শরীর-সংস্কৃতি সকলেই সকলের নির্ধারক। বস্তু ধ্রুব ও সমাজ/সংস্কৃতি আপেক্ষিক এরকম বাইনারি ধারলার বিরোধিতা করেন। আর একেই নব্য বস্তুবাদী তত্ত্ব বলা হচ্ছে।

বিভাজন টানে না। তিস্তা নদীর ঢেউয়ের রূপকে যে পিরীতের জ্বালাকে প্রকাশ করতে পারে। যৌনতা সেখানে শ্লীল/অশ্লীল বাহাসের বাইরে শরীর/মনে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটা থাকে। সোনাবন্ধুর জন্যে 'অঙ্গ জ্বলিয়া যায় রে' বলতে পারে ভালোবাসার আত্মিক সমর্পণের ধার না ধেরেই। এই জ্বলন যৌনতাকে শরীর-মনের বিভাজনে এমনকি যৌনতার সাথে ভক্তির পার্থক্যেও ভাগ করে দেখতে দেয় না। শরীরী প্রেম আর অশরীরী প্রেমের মধ্যকার উঁচুনিচু মর্যাদার বিতর্কে তার কী যায় আসে? সে তো তার জ্বালায় জ্বলছে। প্রেমের আগুন নেভাতে তাই কালাকে অভিযোগ করে বলা যায় যে, কেন তুই এই আগুন নিভাইয়া গেলি না।

প্রেমের মাত্রা কতটা হবে, তার সংজ্ঞা কী, কার প্রতি নিবেদিত? প্রেম কি একমাত্রিক? বা একটি পাত্রেই সমর্পিত? এইসব প্রশ্ন তুলতে পারলেই তবে আমাদের উপরে এসে পড়া প্রেমের কাঠামোর বাইরে বহু সম্ভাবনা, বহু পথ, বহু পথের ভালোবাসার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যেতে পারে। অসীম প্রেমের কর্তা-হতে-পারা নারীর জন্যে জৈবিক নারী-পুরুষের লেবেল থেকে বাইরে যাবার অসীম পথের সন্ধানই হতে পারে সোনাবন্ধুর পিরীতির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ।

মেইনুথ ইউনিভার্সিটি, আয়ারল্যান্ড: ৩০শে জানুয়ারি ২০১৫

গ্রন্থসূত্র

মানস চৌধুরী (২০০০)। ''সোনাবন্ধু'র পিরীতি এবং ভালোবাসার সুশীল ডিসকোর্স'', *সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান,* এস. এম. নূরুল আলম, আইনুন নাহার এবং মানস চৌধুরী (সম্পা.), নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। (বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ভাগে রচনাটি সংকলিত।)

মানস চৌধুরী (২০০১)। '''সূক্ষ্ম প্রেমে'র অর্থ: নিম্নবর্গীয় গানে যৌনতা এবং নারীর আত্মসত্তা'', *চর্চা: নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধ সংকলন*, জহির আহমেদ এবং মানস চৌধুরী (সম্পা.), নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। (বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ভাগে রচনাটি সংকলিত।)

Barad, K. (2003) ''Posthuman Performativity: Toward An Understanding Of How Matter Comes To Matter,'' Levi Bryant: ''Grounds for a Realist Ontology'' in The Democracy of Objects.

Beauvoir, S. (1884) The Second Sex, translated by H. M. Pashley, Harmondsworth: Penguin.''

Braidotti, R. (2003) ''Becoming Woman: Or Sexual Difference

Revisited'' in Alison M. Jagger and Iris Marion Young (eds.) A Companion to Feminist Philosophy, Sage.

Cixous, Helene (1994) ''Preface'' in Sellers, Susan (eds), The Helene Cixous Reader, Roughtledge, USA.

Feldman, S (2009) ''Reclaming Sexual Difference: What Queer Theory Can't tell Us about Sexuality'' in Jounal of Bisexuality, Vol. 9. Issue 3-4, pp. 259-278.

Irigaray, L (1980) ''When Our Lips Speak Together'' in Signs, Vol. 6, No. 1, Women: Sex and Sexuality, Part 2 (Autumn) pp. 69-79.

Irigaray, L (1985) This Sex Which Is Not One, Cornell University Press

Foucault, Michel (1997) ''Friendship as a Way of Life'', ''Sexual Choice, Sexual Act'', in Ethics: Subjectivity and Truth: The Essential Works of Foucault, 1954-1984, Vol.1, (The New Press: New York), pp. 51-57.

Spivak, G. C (1981) ''French Feminism in an International Frame'', Feminist Readings: French Texts/American Contexts, pp. 154-184, Yale University Press.

Weisser, Susan Ostrov (2001) Woman and Romance: A Reader, New York University Press, USA.

সায়দিয়া গুলরুখ

যোনিদেশ

Rabindranath Tagore

তৃতীয় দৃশ্য

ঢাকা শহরের জনদরদী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কল্পস্কোপি পরীক্ষাকক্ষকে দৃশ্যায়ন করা হবে। এই দৃশ্যে আছে চারটি চরিত্র। চারজনই নারী। একজন ডাক্তার। একজন নার্স। একজন আয়া। এবং একজন রোগী। ডাক্তারের পরনে গোলাপী সালোয়ার কামিজ। মাথায় ওড়না। চোখে প্রচণ্ড বিরক্তি। চশমা না থাকলে যে কেউ বিরক্তির আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। হাতে বেশ কটা সোনার আংটি। নার্সটির পরনে হাসপাতালের ইউনিফর্ম। আকাশী নীল রঙের সালোয়ার কামিজ। রোগীকে অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে কল্পস্কোপির রুমে আনার দায়িত্ব নার্সের। আয়ার পরনে গাঢ় নীল রঙের ইউনিফর্ম। রোগীর পরনেও ডাক্তারের মতন সালোয়ার কামিজ। নার্স ও আয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, তারা ঠিক জানেন না, তাদের কি করণীয়। কল্পস্কোপির রুমটা ছোট্ট। সাথে লাগোয়া বাথরুম। এক পাশে টেবিলের উপর পুরানো মডেলের ডেস্কটপ। টেবিলে বেশ কিছু ফাইল। আর অন্যদিকে রোগীর জন্য একটা উঁচু টেবিলের মতন দেখতে বিছানা রাখা। টেবিলটির পায়ের কাছে বড় একটা যন্ত্র। যন্ত্রটি

দেখতে অনেকটা সায়েন্স ফিকশন মুভির বামুন সাইজ রোবটের মতন। উপরের অংশের কম্পিউটার স্ক্রীনটা হল রোবটের মাথা। চারটা পা। একটা হাত, একটাই আঙ্গুল। আঙ্গুলের নখ একটা ম্যাগনিফায়িং লেন্সসহ ক্যামেরা। ডাক্তার নারীর যোনীতে এই ক্যামেরাটি ঢুকিয়ে সাধারণত সার্ভিক্স, ভালভার ম্যাগনিফাইড ইমেজ উৎপাদন করে।

মঞ্চে একটা লাইট। লাইটটা রোগীর জন্য পাতা খালি বিছানায় ফোকাস করা। বৃত্তাকার আলোর প্রান্তে কালো চেয়ারে বসা ডাক্তারের বিরক্ত মুখ দেখা যাচ্ছে। অস্থির, পা দুলাচ্ছেন। নার্স রোগীর ফাইল ও রোগীসহ মঞ্চে প্রবেশ করে। ত্রিশ সেকেন্ড পরে আয়া এসে ঘরে ঢোকে। রোগীর চোখে-মুখে স্পষ্ট বিপন্নতার ছায়া। মঞ্চ পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যায়। ত্রিশ সেকেন্ডের অস্বস্তিকর নীরব-অন্ধকারাচ্ছন্নতা। আয়ার উপর আলো জ্বলে ওঠে।

: পায়জামা খোলেন।

: আহ্‌হা ! প্যান্টিও খোলেন।

মুহূর্তেই আয়ার উপর আলোটি নিভে যায়। পরক্ষণেই নার্সের উপর আলো পড়ে।

: বিছানায় গিয়ে শোন।

: না, চাদর দিতে পারবো না।

: আরো নীচে যান, হ্যা পা ফাঁক করেন, বেশি করে ফাঁক করেন না।

: আহ্‌হা ! আরেকটু নীচে যান।

নার্সের উপর আলোটি নিভে যায়। পরক্ষণেই ডাক্তারের টেবিলের আলোটি জ্বলে ওঠে। ডাক্তার আয়ার এগিয়ে দেয়া প্লাস্টিকের গ্লাভস পরে নেয়। হেঁটে রুমের অন্য প্রান্তে রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আলো ডাক্তারের সাথে সাথে চলে। আয়া একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়। আধানগ্ন রোগীর যোনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ারে বসেন তিনি। নার্স এবং আয়া পাশে দাঁড়ানো। রোগির যোনীতে ক্যামেরা ঢুকিয়ে ডাক্তার রোগীর সাথে কথা বলছেন। কম্পিউটার স্ক্রিনে যোনীদেশ ও ডিম্বাশয়ের ছবি প্রজেক্টরের মাধ্যমে মঞ্চের দেয়াল জুড়ে ভেসে ওঠা। প্রজেক্টরের আলো ছাড়া সব আলো নিভে যায়। দেয়াল জুড়ে, এমাথা-ওমাথা ছড়ানো, একটি নারীর যোনিদেশের ছবি। একটা গুহা মুখ। গোলাপী মাংস। পিঁপড়ার মতন কালো কালো বাল। আর সরু সরু লাল শিরা-উপশিরা। আধা মিনিট পরে মঞ্চ আবার আলোকিত হয়। ডাক্তারের মুখ আর রোগিনীর অনাবৃত ফাঁক করা পা দেখা যায়।

: পরীক্ষা করতে এসেছে !

: চুল ফেলে আসবেন না? পরিষ্কার করেনি, দ্যাখো কাণ্ড!

বাসর রাতে অপরিষ্কার যোনি দেখে স্বামী যেমন চমকে ওঠে, নিরাশ হয়, ডাক্তারের চেহারাও ঠিক তাই। অপমান সত্ত্বেও ফিক করে হেসে ফেলে রোগী। মঞ্চের বাইরে থেকে রোগীর মনের ভাবনাগুলো একটি নারীকণ্ঠ ফিসফিস ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য দেয়ার মতন করে বলে যায়। রোগী যখন মনে মনে কথা বলে, তখন মঞ্চের অভিনেত্রীরা নীরবে কাজ করে। ডাক্তার ক্যামেরা নাড়া-চাড়া করে। যন্ত্রের চোখ যোনিদেশে ঘোরা-ফেরা করে। পিতৃতন্ত্র কণ্ঠ পায়।

: কি, বাচ্চা হয় না?

: সার্ভিসাইটিস আছে?

: হুমম ... সাদা সাদা লাগছে

: আপনার বায়োপসি করতে হবে

: মর্জিনা, ওনার সাথে কে এসেছেন? তাকে আরও এক হাজার টাকার রিসিট কাটতে বল।

: কি? একা এসেছেন!

: আরেকটু পা ফাঁক করুন!

: রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের কাজ হচ্ছে সন্তানের জন্ম দেয়া।

: আপনি তো কোনও সহযোগিতা করছেন না! ব্যাথা তো পাবেনই।

ক্যামেরার যোনিদেশে নড়াচড়ার সাথে সাথে প্রজেক্টরের ছবিও মঞ্চের দেয়ালে নড়াচড়া করে। রোগীর মুখে উষ্মা ও ব্যাথার ছাপ। অযত্নের হাতে ডাক্তার তার যোনীর ভিতর ক্যামেরার তার ঘোরায়। রোগী উফফ্ করে ওঠে। ডাক্তার ভ্রূক্ষেপ করে না। নির্বিকার, যন্ত্রের চক্ষু দিয়ে রোগীর সার্ভিক্সের ছবি দেখে। স্ক্রীণে ভেসে ওঠে টকটকে লাল-গোলাপী শিরায় মোড়ানো সার্ভিক্সের ছবি।

: বুঝলেন, জরায়ু ব্যাবহার না করে ফেলে রাখলে আজকে ক্যান্সারের দুশ্চিন্তা কালকে সিস্ট, পরশু ফাইব্রয়েড

: আহ্হা! পাটা ফাঁক করুন! রিল্যাক্স করুন। কাঠের পুতুলের মতন পড়ে আছেন, ব্যাথাতো পাবেনই।

ডাক্তারের টেবিলে শুয়ে শুয়ে রোগীর ডেট রেপের (date rape) কথা মনে হয়। অন্তরঙ্গ মুহুর্তে যদি পরিচিত পুরুষ বেপরোয়া হয়ে ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা করে তাকে অনেক সময় সম্মতির সম্পর্কে ধর্ষণ বলা হয়। কল্পস্কোপির টেবিলে শুয়ে রোগীর ডেট রেপের কথাই মনে হয় বারবার। অসুস্থতার কারণে সে নিজে পয়সা দিয়ে

ডাক্তারের টেবিলে শুয়েছে, এই কল্পস্কোপি পরীক্ষাতে সম্মত হয়েছে। শরীরের উপর যন্ত্রের হাত-চোখের রূঢ় চলাফেরা, অপমানের উথাল-পাথাল, চেনা-জানা পরিসরে এভাবেই বুঝি চলে অনাচার। অপমানে 'উফ্‌ফ্‌' করে ওঠে।

আয়া রশিদটি নিয়ে মঞ্চে পুনর্প্রবেশ করে। ডাক্তার মুখ ঘুরিয়ে রশিদটি দেখে নেয়।

: আপনার সিস্টের অপারেশনটা কবে হয়েছিল?

: কোন হাসপাতালে করলেন?

: আচ্ছা, ডা. তায়েবা এখন সিস্টেকটমিও করেন!

রোগী ডাক্তারের প্রশ্নের অন্যমনস্ক জবাব দেয়। নিজের ভাবনার জগতেই ডুবে থাকার চেষ্টা করে। ভাবে, বায়োলজি বইগুলো সব সেকেলে হয়ে গিয়েছে। প্রযুক্তির এই জমানায় পুরুষাঙ্গের কত রকমফের! ছোটবেলার বিজ্ঞান বইয়ের কথা মনে পড়ে। টেক্সটবুক বোর্ডের ভাষায় মনের কলমে বই লিখতে শুরু করে। ভুলে যেতে চায়, সে অর্ধনগ্ন শুয়ে আছে ডাক্তারের টেবিলে। মঞ্চের বাইরের নারীকণ্ঠ এই অংশটি আনুষ্ঠানিক, খানিকটা খবর পড়ার ঢং-য়ে, পাঠ করে। 'বর্তমান যুগে পুরুষাঙ্গ প্রধানত দুইপ্রকার: জৈবিক ও যান্ত্রিক। যান্ত্রিক পুরুষাঙ্গ আবার কয়েক প্রকার হয়। কোনটা নারীর যৌন-আনন্দের জন্য বাজারজাত করা হয়। যেমন ধরা যাক কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ, ডিলডো বা ভাইব্রেটরের কথা। এগুলোর অবশ্য বাংলাদেশে তেমন চল নাই। অনেক পুরুষাঙ্গ আবার নারীর দেহকে বশে আনার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে, যেমন কল্পস্কোপি, আল্ট্রাসাউন্ড ম্যাশিনের গায়ে ঝোলানো ক্যামেরা সম্বলিত পুরুষাঙ্গ। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য, ভার্জিনিয়াতে নারীরা এমনই একটা যান্ত্রিক পুরুষাঙ্গের স্বরূপ উন্মোচন করেন। সেখানে গর্ভপাতে আগ্রহী নারীর জন্য ভ্যাজাইনাল আল্ট্রাসাউন্ড (যোনিপথে ক্যামেরা ঢুকিয়ে ভ্রূণের ইমেজ উৎপাদন করা হয়) বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।' এখানে ধারাভাষ্যকারের স্বর বদলে যায়, রোগীর মনের খেদ ঝরে পড়ে। আইনটির একটি প্রাথমিক খসড়াতে নাকি ক্যামেরার স্ক্রিনটি কোথায়, কোনদিকে রাখা হবে সেটিও উল্লেখিত ছিল। প্রস্তাব করা হয়েছিল, স্ক্রিনটি নারীর চোখের সামনে এমনভাবে রাখা হবে যাতে গর্ভপাতে ইচ্ছুক 'মা' প্রাণবন্ত ভ্রূণের ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পায়। সম্ভব হলে, ভ্রূণের হার্টবিটকে লাউডস্পিকারে বাজিয়ে শুনাতো! আইনপ্রণেতারা বোধহয় ভেবেছিলেন, কোনও মা কি নিজ ভ্রণের হৃদস্পন্দন শুনেও না শোনার ভান করে থাকতে পারে! বীতশ্রদ্ধ রোগী ভাবে, কিন্তু ভ্রূণের ছবি আর হৃদস্পন্দন শুনেও যদি নারীর মনে 'মাতৃভাব' জাগরিত না হয়। তখন? তখন কি হবে? তখন নারীর অনুভূতিকে বশে আনার জন্য আর কি নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করবে? এইসব বিতর্কের কথা ভেবে রোগী রাগে-

দুঃখে ‘উহ্’ করে ওঠে। মঞ্চের বাইরে ধারাভাষ্যকারের কণ্ঠে ক্রোধ ঝরে পড়ে। অনেকেই এ আইনটিকে রাষ্ট্র অনুমোদিত ধর্ষণ (state sanctioned rape) বলছেন।

এসব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রোগী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। হঠাৎ বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চলে যায়। যোনিপথে ক্যামেরার তার ঝুলে থাকে। ডাক্তার হাত গুটিয়ে নেয়। অন্ধকার মঞ্চ জেনারেটরের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে। আধুনিক জীবনে নারীদের দুর্ভোগের চেহারা অন্য। ভেবেই গায়ে কাঁটা লাগে। আসলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছায়ায়, নাকি আগুনে, আগুনই হবে নারীর দেহ পোড়ে। একেক দেশে, একেক অঞ্চলে সেই আগুনের রঙ ভিন্ন। ডাক্তারের অসতর্ক হাতের নড়াচড়ায় রোগীর চিন্তায় ছন্দপতন ঘটে। আয়া, ডাক্তারের ব্যাগ গোছাতে উদ্যত। নার্সটি রিপোর্ট কার্ড এগিয়ে দেয়।

: একটু সাদা সাদা দেখতে পাচ্ছি।

: আমি রিপোর্টে লিখে দিয়েছি। আপনার ডাক্তারকে দেখান।

: এখন যান, আমার বাসায় যাওয়ার এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে ...

সালোয়ার, প্যান্টি পরে রিপোর্ট হাতে, খানিকটা বিভ্রান্ত চিত্তে রোগী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মঞ্চ নাটকের তৃতীয় দৃশ্যটি এখানেই শেষ হয়। মঞ্চের আলো নিভে যায়। প্রজেক্টরে এতক্ষণ যোনিদেশের যে জীবন্ত ছবিটা ছিল তা অন্ধকারে হারিয়ে যায়। আবছা আলোয় মঞ্চসহকারীদের ছায়ার নড়াচড়া দেখতে পাওয়া যায়। পরের দৃশ্যের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করছে তারা। একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চ এনে মঞ্চে রাখে। ঢাকার অদূরে একটি গ্রামে চাঁদের হাসি ক্লিনিকের বারান্দারূপে মঞ্চ সাজানো হচ্ছে। দেয়ালে পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রাণালয়ের পোস্টার। অন্ধকারেই ৫ জন নারী মঞ্চে এসে বসে। দুজন অন্তঃসত্তা। ডাক্তার আপা এখনও আসেননি। ...

[একটি মঞ্চ নাটকের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, কয়েকটি ছেঁড়া পাতা]

এখানে মুদ্রিত রচনাটি ‘ঠোঁটকাটা’ নামে ‘একটি নারীবাদী দল-এর ব্লগ’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। http://thotkata.net/2013/05/18/যোনিদেশ-2/।

নাসরিন সিরাজ এ্যানী

ধর্ষণ ও নারী-পুরুষের বেড়ে ওঠা

Rabindranath Tagore

ধর্ষণ কেন ঘটে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকে পুরুষের যৌনতা ও আক্রমণাত্মক চরিত্রের অস্বাভাবিক বা বিকৃত ব্যবহারকে (behavior) দায়ী করেন। স্বাভাবিক পুরুষ থেকে এভাবেই ধর্ষণকারীকে পৃথক করা যায়। এটা ঠিক যে, ধর্ষণের সাথে যৌনতা এবং আক্রমণ এই দুইয়ের যোগ রয়েছে, কিন্তু আমাদের মেনে নিতে যত কষ্টই হোক না কেন যৌনতা এবং আক্রমনাত্মক বা আগ্রাসী চরিত্র আলাদা আলাদাভাবে বা মিশ্রভাবে স্বাভাবিক ও দরকারী পুরুষালী বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত।

মিনমিনে মেনিমুখোকে কি পুরুষ বলে? পুরুষ মানেই তো শৌর্য-বীর্য। তাহলে কি ধর্ষণের কারণ সামাজীকিকরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে? সমাজে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে ধর্ষণ কত দূরের?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, সমাজ নারী পুরুষের যে আদর্শ ছাঁচ তৈরী করেছে তার মধ্যেই ধর্ষণের মূল বীজ রোপিত। সমাজ নারীত্ব হিসেবে নিষ্ক্রিয়তা ও নাজুকতার যে আদর্শ ছাঁচ তৈরী করে ধর্ষণের মাধ্যমে আসলে সেটিই আগ্রাসী পুরুষত্ব দ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্যাথি রবার্টস তার বিশ্লেষণে সমাজের তৈরী করা নারীত্বের তিন ধরনের নিষ্ক্রিয়তার কথা উল্লেক করেন। ক. মজ্জাগত নিষ্ক্রিয়তা যেটাকে আবার অনেকে প্রকৃতি প্রদত্ত বা জন্মগত নিষ্ক্রিয়তা বলে থাকেন। নারীর বৈশিষ্ট্য বলতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সাধারণভাবে জানি সেগুলোর কথা ভেবে দেখুন। একজন মানুষের বৈচিত্রহীন একঘেয়ে কার্যকলাপ আর সিদ্ধান্ত নিতে না পারার নিঃশব্দ জীবন দেখতে পাবেন। খ. দ্বিতীয় নিষ্ক্রিয়তায় নারীকে সমাজ কাজ করতে দেখে ঠিকই কিন্তু সেই কাজকে পুরুষের সহযোগী বা সহকারী বা অধীনস্ত হিসেবে দেখা হয়। গ. তৃতীয় ধরনের নিষ্ক্রিয়তা হল সমাজের মন গড়া নিষ্ক্রিয়তা। এর মানে নারীটি যাই করুক বা বলুক না কেন সেটা আগে থেকেই অনুমান করে নিয়ে সেই কাজকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনা। সত্যিকার রক্ত মাংসের নারীর আচরণ, কার্যকলাপের সাথে এই তিন ধরনের নিষ্ক্রিয়তার মিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নেই কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হল এই তিন ধরনের নিষ্ক্রিয়তা দিয়ে নারীর সত্যিকার কার্যকলাপকে ঢেকে ফেলা হয় তথা সত্যিকার নারীকে মুখোশ পরানো হয়।

নারী সম্বন্ধে এই তিনটি নিষ্ক্রিয়তার ধারণা এতো বেশী শক্তিশালী যে, মা বা ঘরের স্ত্রীকে বলা হয় 'কোন কাজ করে না'। সেই একই নিষ্ক্রিয়তার ধারণার কারণেই একজন পুরুষ রাস্তায় চলতে চলতে নারীর প্রতি মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় কিংবা শরীর স্পর্শ করে। সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির বলে পুরুষেরা পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখতে ধর্ষণের ইচ্ছা পোষণ করে বা ধর্ষণ করে। আর বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা সেই ইচ্ছাকে উৎসাহিত করা কিংবা কার্যকর করার জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। শুধু ধর্ষণই নয় দুর্বল ও সুবিধা বঞ্চিতদের শোষণ নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতেও এই সমাজ ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় কোন উপায় নেই। উপরন্তু সামাজিকীকরণের দ্বারা যাবতীয় বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়া চলে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের যে বৈষম্য, নারী ও পুরুষের যে আদর্শ মডেল সমাজ তৈরী করেছে সে হিসেবে ধর্ষণ ঘটাটাই খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

ধর্ষণকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে আইনের বইগুলোতে যে সংজ্ঞা রয়েছে সে থেকে জানা যায় যে, ধর্ষণ হল সে ধরণের যৌন-আগ্রাসন যেখানে নারীর অনুমতি ছিল না বা নারীর পক্ষ থেকে বাধা ছিল। কিন্তু নারীত্বের ধ্বজাধারী বৈশিষ্ট্য হল আত্মরক্ষায় অপারগ এমন একজন যে তার নিজের

আত্মরক্ষাহীনতা সুযোগ গ্রহণকারী একজন পুরুষের জন্য অপক্ষো করে। সমাজে যে শুধু ভরণ পোষণের জন্য নারী পরনির্ভর হিসেবে বেড়ে ওঠে তাই নয় তার শরীরী রক্ষাও অন্যের ওপর নির্ভরশীল বলে বিবেচিত হয়। সে কারণে লক্ষ্য করবেন যে আইনের মারপ্যাঁচে জেরার মাধ্যমে এটিই প্রমাণের চেষ্টা করা হয় যে নারীটি যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্ক্রিয় ছিল কি না বা 'নারী' ছিল কি না। এবং নারীত্বের আদর্শ ছাঁচের বাইরের বৈশিষ্ট্য যেমন, সক্রিয়তা, আত্মনির্ভরশীলতা বা পরমুখাপেক্ষিতার অভাব নারীটিকে দুশ্চরিত্র বা খারাপ প্রমাণ করে। অর্থাৎ, নারীর অবস্থা এখানে শাখের করাতের মত । ভালো নারী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে গেলে নারীকে হতে হবে নিষ্ক্রিয় বা পরোক্ষ ভাবে সক্রিয় যে সব সময় নেতৃত্ব চর্চার জন্য পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আবার পুরুষ সেই নেতৃত্বের চর্চা (যেটি পুরুষরা সম্মিলিত ভাবে সমাজের বিভিন্নস্তরে ও কর্মকাণ্ডে করে থাকে) করলে তাকে ধর্ষণ হিসেবে প্রমাণও করতে হবে।

এবারে আসি নারী পুরুষের যৌনসম্পর্ক বলতে আমরা যে স্বাভাবিকতাকে সত্য হিসেবে জানি সে বিষয়ে। মোটা দাগে বলতে গেল নারীর জন্য যৌনতা এবং সন্তান জন্মদান একসূত্রে গাঁথা। জন্ম নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি এবং ঔষধ আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত সন্তান জন্মদান থেকে আলাদা করে যৌনসুখ নারীর কোন বিষয় ছিল না। এটি একচেটিয়াভাবে পুরষের। নারীর কাছে এটি একটি পরোক্ষ ক্রিয়া যেখানে সে পুরুষকে তৃপ্তি দান করে বা পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়। এমনকি এও ধারণা করা হয়ে থাকে যে, যদি নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষটি তৃপ্ত হতে গিয়ে ব্যাথাও দেয় সেটিও নারীর জন্য আনন্দ দায়ক। বা সে আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করবে। আর যৌনসম্পর্কের ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় যে, নারীটি যৌনমিলন চায় কি চায়না বা সম্পর্কটি উপভোগ করছে কি করছেনা সেটা নিয়ে পুরুষটির নির্বিকার থাকা বা সেটিকে বিবেচনায় না আনা। এবং সম্পর্কটির মধ্যে শুধুমাত্র যৌনমিলন ছাড়া অন্য কোন গভীর কারণ না দেখানো। এখন, বৈবাহিক সম্পর্ক বা দুজনের অনুমতি সাপেক্ষে যে স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক সেক্ষেত্রেও এরকম জানা যায় যে, নারীর আবেগ অনুভূতির পরোয়া না করে তার আপত্তিকে ধর্তব্যে না ধরে পুরষরা নরীর সাথে যৌন-ক্রিয়া করে। এবং নারীত্বের নিয়মানুযায়ী পুরুষের প্রয়োজন মেটানো এবং তাকে তৃপ্ত করা নারীর প্রথম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারীকে শুধু দেখা যায় কিন্তু তাকে শোনা যায়না। অন্যভাবে বলতে গেলে এই নিয়মানুযায়ী পুরুষেরা নারীরা কি বললো বা করলো তা উপেক্ষা করে বা বাতিল করে। যেমন নারীর 'না' কে 'হ্যাঁ' ধরা বা 'না' টা একেবারেই না শোনা। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক আর যৌন-আগ্রাসন একাকার হয়ে যায়।

আবার দেখুন, প্রতিদিনকার সামাজিক কার্যকলাপে নারীকে 'নেই 'এর সারিতে

ফেলে দেয়া খুবই স্বাভাবিক একটি আচরণ। যেমন অচেনা কাউকে সম্বোধন করতে স্যার ব্যবহার, নারী-পুরুষের যৌথ জাত হয়ে যায় ম্যান কাইন্ড/মানবজাতি বা ইতিহাস হয়ে যায় হিউম্যান হিস্ট্রি বা মানব ইতিহাস। এই বিষয়টি শুধু ইংরেজী বা বাংলা শব্দের ব্যবহারের বা ব্যাকরণগত বিষয় নয় এটি প্রকাশ করে মনোজগতে বা চিন্তাজগতে নারীর অনুপস্থিতি বা বিশেষ অর্থে উপস্থিতি এবং ভাব প্রকাশে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শুধুমাত্র পুরুষকেই দেখার প্রবনতা। এই প্রবনতাটি আমাদের অন্তর্মূলে এতো গভীরভাবে গেঁথে গেছে যে ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সামনে আসলে বা এই স্বাভাবিক প্রবনতাটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে কেমন একটা লেজে-গোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়।

নারী ও পুরুষ বোধক শব্দ রয়েছে তাদের ব্যবহারও রয়েছে কিন্তু যথাযথ প্রকাশ বা অপ্রকাশ নির্ভর করে সমাজে বিদ্যমান নারী ও পুরুষের বৈষম্যমূলক সম্পর্কের ওপর। সমাজে নারীর কথা না শোনা (শুধু কান দিয়েই নয়) এবং শব্দ ব্যবহারে নারীর নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে দেখানো কিংবা ধর্ষণের সময় নারীর বাধা বা 'না' কে না শোনা এক সূত্রেই গাঁথা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৮ সালে আগস্ট থেকে শুরু হওয়া ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলন চলাকালে ধর্ষণের পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মত ও বিতর্ক চলছিল। এই সময়ে বাংলা বিভাগের এক শিক্ষক তার ক্লাশে মন্তব্য করেছিলেন, 'চিনি খেতে মিষ্টি, এখন এটাকে জোর করে খাওয়ালেও মিষ্টিই লাগবে।' এই মন্তব্যের মাধ্যমেও আসলে প্রকাশ পায় যৌনতা সম্বন্ধে সমাজে বিদ্যমান ধারণা যেখানে নারীর মত বা ইচ্ছা বা উপভোগ একেবারেই অনুপস্থিত বা অস্বীকৃত। তাই পুরুষালী দৃষ্টিভঙ্গি তথা সমাজে বর্তমানকালে বিদ্যমান প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী ধর্ষণ হয়ে যায় যৌনমিলন বা একটি যৌন-ক্রিয়া। কিন্তু নারীর কাছে তা সহিংসতা, আক্রমণ আর বেদনা।

এবারে আসি নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক বলে আমরা যেগুলোকে জানি তার মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশের আলোচনায়। দেখা যায় যে, নারীর পরনির্ভরশীলতা কিংবা পুরুষের কর্তৃত্বের বর্বর বহিঃপ্রকাশ ভালোবাসা হিসেবে পরিগনিত হয়। এ ক্ষেত্রে ক্যাথি রবার্টসের দেয়া দশ বছর আগেকার লন্ডনের একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। 'একবার এক পুরুষ তার স্ত্রীর মাথা কিভাবে ফাটলো ব্যাখা করছিলেন এই বলে যে, 'অনেক সময় তুমি যে ভালোবাসো তা প্রকাশের একমাত্র রাস্তা– শারিরীক শাস্তি'।' আমাদের দেশেও কিন্তু স্বামীর পিটুনিকে ব্যাখ্যা করতে একই ধরণের কথা আপনি শুনতে পাবেন যে, 'স্বামী যেমন ভালোবসবে তেমনি শাসনও করবে'।

আবার, দম্পতি পরিবার ধারণা মালিকানা ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে

উঠেছে। ‘তুমি আমার, আমি তোমার’—ভালোবাসার সব কথা মালিকানাত্বের দাবী দাওয়ায় ভরা। এবং এগুলো শুধু ভালোবাসার কথাই নয় এগুলোর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন ঘটে। দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমে একটি পুরুষ যেমন একটি নারীর ওপর মালিকানার অধিকার পায়। পুরুষ সঙ্গীটির এই হেন মালিকানার প্রতি নারীটির অনুভূতি হচ্ছে:— পরম নির্ভরতা। সামাজিক সাধারণ বোধ বুদ্ধিতেই এই পারস্পরিক মালিকানা ও নির্ভরতার সম্পর্কের স্বীকৃতি রয়েছে। যেমন আরেকটি ধারণা মীথের মত সমাজে গেঁথে আছে আর তা হল, নিজের শারিরীক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেকটি নারীরই একটি পুরুষের দরকার আর পুরুষ ছাড়া নারীর জীবন সে তো কোন জীবনই নয়।

স্মরণ করুন মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের কথা যখন ঘরের সোমত্ত মেয়েটির ধর্ষিত হবার আশংকায় অভিভাবকরা মেয়েদের বিয়ে দিতে শুরু করলেন। যেন নারীটি প্রকৃত মালিকের কাছে পরম নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছে। ধর্ষিত নারীটির বেদনার চাইতে পরিবারে/সমাজে বড় হয়ে ওঠে পাকিস্তানী সৈন্যের দ্বারা নারী সম্ভোগের বিষয়টি। সহিংসতার চাইতে বড় হয়ে ওঠে পর পুরষের (বা পর জাতের) সাথে যৌনমিলনের, সতীত্ব সংরক্ষণ বিষয়টি। নারীর শরীরের প্রকৃত মালিক পরিগনিত হচ্ছে পুরুষ। তাই দেখা যায় যে সেই পুরুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নারীর ওপর আক্রমণ হয়েছে। অতীত এবং বর্তমান কালেও বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধে পুরুষের অহমিকা, ইজ্জত, মান-সম্মানকে আঘাত করতে নারীর ওপর যৌন-আক্রমণ ঘটেছে।

একেকটা সময় আসে যখন আমরা ধর্ষণের খবরা খবর বেশী পেতে শুরু করি। আম কাঁঠালের যেমন একটা মৌসুম থাকে যেন ধর্ষণেরও একটা মৌসুম আসে। সেই মৌসূম যেন হঠাৎ করে আমাদের ‘বিবেককে’ নাড়া দেয় আর আমরা কিছু ‘নর পশুর’ ‘বিকৃত’ কার্যকলাপ দেখে শিহরিত কিংবা বিস্মিত হই। নারী যে পুরুষের অধীন, ভোগ্য যৌনজ পণ্য হিসেবে বিবেচিত তার শুরু এঙ্গেলসের মতে সেই তবে থেকে যবে থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। আর প্রতিনিয়ত তার অস্তিত্ব আমাদের আশে পাশে শ্বাস নেয়া বায়ুর মত। তবে তার মানে এটা ধরে নেবেন না যে নারীরা চুপ করে বসে আছে বা খুব সহজে ছেড়ে দিচ্ছে তার ওপর যাবতীয় নিপীড়নকারীকে। কখনই ভুলে যাবেন না ১৯০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ হাজার টেক্সটাইল নারী শ্রমিকদের ডাকা হরতালের কথা যার ফলে সেখানকার কারখানাগুলো ১৩ সপ্তাহ বন্ধ ছিল। ভুলে যাবেন না ৮ই মার্চের ইতিহাসের কথা। যে বন্ধুর আর দীর্ঘ পথ নারী তখন থেকে হাঁটতে শুরু করেছে তার এখনও শেষ হয়নি ঠিকই কিন্তু সেই লড়াইয়ে প্রত্যেকটি নারী আর সহযোদ্ধা পুরুষরা স্বপ্ন দেখে সকল বৈষম্যের গোড়া তুলে ফেলার। স্বপ্ন দেখে সমতার সমাজের।

(১৯৯৮ সালে প্রকাশিত ক্যাথি রবার্টসের Women and Rape বইটি ধর্ষণ নিয়ে একটি চমৎকার নারীবাদী বিশ্লেষণের উদাহরণ। তিনি লন্ডনের 'রেপ ক্রাইসিস সেন্টার' এর কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করেছেন অনেক বছর। পরবর্তীতে তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোকে তিনি পিএইচডির গবেষণা কাজে লাগান। ক্যাথি রবার্টস তাঁর এই বইটির জন্য ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের গবেষণা করেছিলেন। বইটি পড়তে গিয়ে আমি আমার আশেপাশের সমাজকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের যে সূত্র খুঁজে পেয়েছি এই লেখাটি সেই অনুপ্রেরণায় লেখা।)

আদি প্রকাশ: আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত *নতুন পাঠ*, ২০০৪

নাসরিন সিরাজ এ্যানী

বাল্টিক সাগরে এক রাত

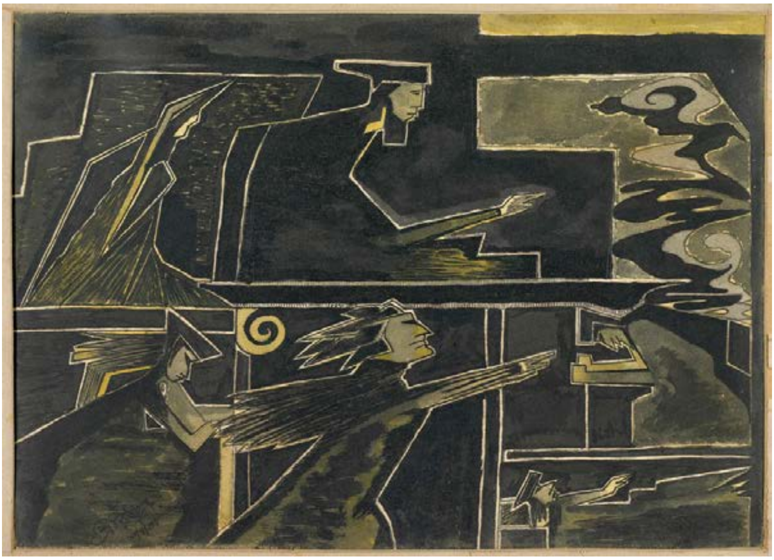

Rabindranath Tagore

স্কুলে থাকতে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি লেখা পড়েছিলাম। নাম রসগোল্লা। গল্পের বিষয়বস্তু ইউরোপীয় এক এয়ারপোর্টের কাস্ট পুলিশের রসগোল্লা চিনতে না পারা এবং গল্পের নায়ক ঝান্ডুদার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ব্যাপক রসবোধ। ঝান্ডুদা সারাজীবনের জন্য আমার মগজে গেঁথে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর চামড়ার ব্যাগটার কারণে। সেটায় নানান দেশের, নানান এয়ারপোর্টের আগমন ও বহির্গমনের টিকেট সাঁটা যা প্রমাণ করে ঝান্ডুদা কত অহরহ বিদেশ ভ্রমণ করেন। সৈয়দ মুজতবা আলী ঝান্ডুদাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি দেশে ফিরছেন না দেশের বাইরে যাচ্ছেন। তখন থেকে বড় হয়ে ঝান্ডুদার মত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবো এরকম স্বপ্ন দেখেছি শুধু। মাঝে মাঝে সৈয়দ মুজতবা আলীকেই মনে হত ঝান্ডুদা। ইচ্ছে হত তাঁর মত পনেরটা ভাষা জানবো। মনে মনে নজরুলের কবিতা আওড়াই, 'থাকবোনাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ, যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।' অবশেষে আমার প্রথম বাংলাদেশের সীমানা পার হবার সুযোগ ঘটে ১৯৮৪ সালে। তখন আমার বয়স মাত্র দশ। সেই গল্প

আরেকদিন বলবো। আজকের গল্পের সময় কাল ২০১০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। ভাইকিং লাইনের একটি জাহাজে চড়ে বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে যাচ্ছি ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি থেকে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে। এটা এক রাতের একটি ভ্রমণ। সেই ভ্রমণে ফরাসী এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণের সাথে কাটানো কিছু সময় নিয়ে এই গল্প।

ভাইকিং লাইনের সাত তলা বিশিষ্ট জাহাজের সবচেয়ে উপরের তলায় রেস্তোঁরায় বসে রাতের খাবার হিসেবে রেড ওয়াইন আর সালাদ খাচ্ছিলাম। জানালার পাশেই টেবিলটা। খাবারের ফাঁকে ফাঁকে কখনও নোট খাতাটা নাড়াচাড়া করছি, আবার কখনও জানালার স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঢেউয়ের সাথে ভেসে যাওয়া বরফের টুকরো দেখছি। রেস্তোরাঁর একটি কোনায় বিষাদের গান করছে একটি গানের দল। এমন সময় তরুণটি আমার টেবিলে এসে বললো, 'আমি তোমার সাথে বসলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না!' সাথে সাথে আমার মাথায় সৈয়দ মুজতবা আলী চাড়া দিয়ে উঠলেন। বিদেশ বিভূঁইয়ে তিনি নতুন নতুন লোকের সাথে আড্ডা দিয়েই ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়ে হয়েছিলেন। কিন্তু আমি বিদেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখি – বিশেষ করে ইউরোপে এসে – লোকে অপরিচিতদের সাথে তো কথা বলেই না এমনকি ফিরেও তাকায় না। এমন না যে তারা অমানবিক বা অসামাজিক। সাহায্য চাইলে তারা আন্তরিকভাবেই এগিয়ে আসে কিন্তু 'প্রাইভেসি' নিয়ে তাদের জ্ঞান ব্যাপক টনটনে। আর পৃথিবীর আমরা সবাই তো এক ভাষায় কথা বলি না তাই আসলে চাইলেও বিদেশীদের সাথে মন খুলে আলাপ করা যায় না। তো যা বলছিলাম। সৈয়দ মুজতবা আলীর মত একটা দারুণ আড্ডা দেবো এই আশায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ তরুণটির দিকে তাকিয়ে সহাস্যে আমার সাথে তাকে বসতে বললাম। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

প্রথমে বলে নিই কিভাবে আমি এই জাহাজে এসে পৌঁছালাম। জানেন তো পৃথিবীতে আজকাল সীমান্ত পারাপার নিয়ে ব্যাপক কড়াকড়ি! একদিকে যাদের পাসপোর্ট নেই তাদের জন্য বরাদ্দ রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীর তাড়া, জেল-হাজত আর গুলি, আর অপরদিকে আমাদের – যাদের বাংলাদেশী সবুজ পাসপোর্ট আছে– ভিসা পাওয়ার জন্য পোহাতে হয় অনেক দুর্ভোগ। বিস্তর টাকা পয়সা আর আইন-সিদ্ধ দলিলপত্র না থাকলে আপনি নির্বিঘ্নে সীমানা পার হতে পারবেন না। যে সময়টার কথা বলছি তখন আমি এক বছরের একটা বৃত্তি পেয়ে পড়ছি নেদারল্যান্ডে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই চেষ্টা তদবির করে আমার জন্য 'বসবাসের অনুমতি'র ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে আমি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত ২৭ টি দেশেই প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই অনুমতির শর্ত ছিল যে আমি লেখাপড়া ছাড়া আর কোন পেশায় জড়াতে পারবো না। অবশ্য লেখাপড়ার চাপের

কথা বিবেচনা করলে আমার পক্ষে অন্য কোন কাজ করা সম্ভবও ছিল না। এই অবস্থায় ঈস্টারের ছুটিতে চার দিনের জন্য ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি বেড়াতে গিয়েছিলাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠীর খালা ও মামা থাকেন সেখানে। জাহাজ ভ্রমণের দারুন আইডিয়াটা মামাই দিয়েছিলেন। ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে দাওয়াত দেয়ার সময় বলেছিলেন: 'আমাদের এখান থেকে জাহাজে চড়ে বাল্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম যেতে পারবে। সারা রাতের জাহাজ ভ্রমণ। জাহাজে আছে ডিস্কো, ক্যাসিনো এরকম নানা পদের বিনোদনের ব্যবস্থা। সকালে স্টকহোম বেড়িয়ে সেখান থেকে উড়োজাহাজে করে আমস্টারডাম চলে যেও।' ৪০ ইউরো খরচ করে আমার জন্য জাহাজের টিকেটও কিনে রেখেছিলেন মামা। এমনকি আমাকে জাহাজে তুলে দিতে তাঁর মেরুণ রঙের গাড়িতে চড়িয়ে সমুদ্র বন্দরে নিয়ে এসেছিলেন। টিকেটের বিল দেখিয়ে কেবিনের চাবি – একই সাথে যেটা জাহাজে উঠার ইলেকট্রনিক পাস – কাউন্টার থেকে বুঝে নিলাম আমরা। কেবিন পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে আসলেন মামা। দেখালেন কিভাবে নিজের রুম খুঁজে বের করতে হবে সাত তলা বিশিষ্ট এই জাহাজে। রক্ষে যে প্রতি তলাতেই সিঁড়ির কাছে জাহাজের প্রতি তলার প্ল্যান দেয়া আছে। নির্দেশ করা আছে 'আপনি এখন কোথায় আছেন'।

ফ্লোর প্ল্যানের দিকে তাকিয়ে দেখি টাইটানিক জাহাজের মত এটাতেও নীচের ফ্লোরগুলো হল কেবিন। কম দামী থেকে বেশী দামী কেবিনগুলো অপেক্ষাকৃত উপরের ফ্লোরগুলোতে। একদম উপরের ফ্লোরগুলোতে আছে রেস্তোঁরা, ডিস্কো, ক্যাসিনো। বাচ্চাদের খেলার জন্য জায়গা আছে এই জাহাজে, আছে গায়ে গরম জলের ভাপ দেবার ঘর।

পৃথিবীর এই প্রান্তে বছরের এই সময়টায় আবহাওয়াকে জঘন্যই বলা চলে। বরফ পড়া শেষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই দেখলাম আকাশটা মেঘলা আর বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি আর তার সাথে হীম শীতল ঝড়ো হাওয়া। যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট বরফ মুক্ত করা হয়েছে কিন্তু বসতবাড়ি সংলগ্ন বাগান আর কৃত্রিম বনে বরফের স্তুপ। শুনেছি স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলোতে রোদের অভাবে নাকি আত্মহত্যার হার খুব বেশী। নিজের চোখে সব দেখে এই সব কানকথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না। এতো সুন্দর দেশ। ইচ্ছে করে খোলা চুলে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে দুই ফিতার স্যান্ডেল পায়ে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু শীতের কারণে ঘরের বাইরে বের হওয়াই মুশকিল। আর বের হলেও আঁটসাঁট জ্যাকেট-জামা-জুতা -মোজা পরতে হয়। এসব কার ভালো লাগে? তবে সাগর পাড়ে গিয়ে আমি সত্যিই অভিভূত হয়ে গেলাম। বরফে ঢাকা সাগর অন্যরকম সুন্দর। আমার চির চেনা সে নীলের বদলে সাদা। ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তাল নয় বরং স্থির এবং কঠিন। সাঁতার কাটার

কোন উপায় নেই তার বুকে। তবে বন্দরে গিয়ে দেখি বরফ ভেঙ্গে ঠিকই ভেসে বেড়াচ্ছে বিশাল বিশাল জাহাজ।

জাহাজের কেবিনটা ছোট হলেও এর মধ্যে দুটো দোতালা বিছানা, একটা আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল পাতা। কেবিনের ভেতরেই বাথরুম। ছোট্ট ঐ বাথরুমে ঢুকে তো আমি তাজ্জব। আর দশটা দামী হোটেলের মত সেখানে গোসল করার জায়গাটা পর্দা টেনে আলাদা করা, বেসিনের একটা কল দিয়ে গরম পানি আরেকটা দিয়ে ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা, বেসিনের পাশে পানি খাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটা প্লাস্টিকের গ্লাস, টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ, ফ্রেশ টাওয়েল, পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা। 'ওহ্ কি দারুণ!' ভেবে যেই না আমি কেবিনে ফিরে জানালার পর্দা সরিয়েছি অমনি ফুশ করে আমার সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। ভেবেছিলাম জানালা দিয়ে সাগরের ঢেউ দেখা যাবে। কিন্তু জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি কাঁচের জায়গায় নিরেট কাঠের দেয়াল তোলা। কিছুতেই আমি এই বদ্ধ ঘরে থাকবোনা সিদ্ধান্ত নিয়ে, ফ্রেশ হয়ে, কেবিন ছাড়লাম। কেবিনের বাইরে বের হয়েই শুনি স্পীকারে ঘোষণা বাজছে। যদিও সেটা ফিনিশ ভাষায় কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হল না এই ডাক জাহাজটির একদম উপরের ফ্লোরে যাবার জন্য, যেখানে আছে সকল আকর্ষণ, আর সেখানেই আমার সাথে ফরাসী নাগরিক সেই তরুণের পরিচয়।

বসতে বলার পরপরই বুঝলাম আমার নতুন এই বন্ধুটি একটু টলছে। তাঁর হাতে একটি বিয়ারের গ্লাস তখনও ছিল। নাম কী, কোন দেশ থেকে এসেছি, কোন উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছেড়েছি এসব প্রশ্ন দিয়েই আলাপ শুরু করি আমরা। বলল ও মায়ের সাথে প্যারিসে থাকে। তার মা ও বাবা সুদান থেকে ফ্রান্সে অভিবাসন করেছিল। উদ্দেশ্য সুদানের অশান্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া ও সন্তানদের ভালো স্কুলে পাঠানো। ওর এক ভাইও আছে, সে বেশ কয়েক বছর হল বিয়ে করেছে এবং তাদের একটি সন্তানও আছে। একটু পরেই দেখলাম ওদের। বাচ্চাটিকে বাগিতে চড়িয়ে তারা রেস্তোঁরা থেকে ক্যাসিনোর দিকে চলে গেল। বুঝলাম আমার নতুন বন্ধুটি তার ভাইয়ের পরিবারের সাথে ঈস্টারের ছুটি উপলক্ষে বেড়াচ্ছে। আমার আর ওর ইংরেজীতে কথপোকথনে দক্ষতা খুব বেশী ভালো না। তার পরও আমরা আলাপ চালিয়ে গেলাম। ও প্রশ্ন করলো আমার বয়স কত, বিয়ে হয়েছে কি না। আমি হাসিমুখে মেনে নিলাম যে আমাকে দেখতে সত্যিকার বয়সের তুলনায় অল্পবয়স্ক লাগে। আর আঙ্গুলে আঙ্গটি পরা না পরা দিয়ে যে বাংলাদেশের মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থা বোঝা যায়না সেটাও বললাম। ব্যাখ্যা করলাম বাংলায় বিবাহিত হিন্দু মেয়েদের সিঁদুর ও মুসলমান মেয়েদের নাক ফুল পরার কথা। আবার দুটোর কোনটাই না পরার বিষয়েও যে আমাদের দেশের লোক উদার সেটাও তাকে বললাম। ও জানালো ওর বয়স ৩০ এবং তার কোন গার্ল ফ্রেন্ডও নেই। এরপর আমাকে সে তার

সাথে নাচবার আমন্ত্রণ জানালো। বললো, ‘জানো, আমি তোমাকে অনেকক্ষণ থেকেই খেয়াল করছিলাম। তোমার সাথে কথা বলার সাহস জোগাড় করতে আমি বেশ কয়েকটা বিয়ার খেয়ে ফেলেছি। এমনিতে আমি পান করি না।’ আমি হেসে ওর সাথে নাচতে যেতে রাজী হতেই সে বলল, ‘আমি একটু টয়লেটে যাবো। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তুমি প্লিজ যেও না। আমার তোমাকে ভালো লেগেছে। আমি এখুনি আসছি।’ আমি ওকে উত্তর দিলাম, ‘আমারও তোমাকে ভালো লেগেছে। আমি এই টেবিল ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। তুমি নিশ্চিন্তে ফ্রেশ হয়ে এসো।’

ইউরোপের তরুণরা কিভাবে মেয়েদের প্রেমের প্রস্তাব করে সে প্রসঙ্গে লন্ডনে অধ্যয়নরত আমার এক বাংলাদেশী পুরুষ বন্ধুর সাথে আমার একটি আলাপের উল্লেখ এখানে না করলেই নয়। সে মন্তব্য করেছিল যে, ‘আমরা যতই ভাবি না কেন যে ইউরোপীয়রা প্রেম বা সেক্সের ব্যপারে বেশ উদার ও মুক্ত বাস্তবে কিন্তু তারা সেরকম না। তারা এতো হিপোক্রেট যে আকুন্ঠ মদ্য পান করে বেহুঁশ না হওয়া পর্যন্ত অপরিচিত একটি মেয়ের সাথে তারা এসব আলাপ করতেই পারে না।’ ফরাসী তরুণটির চলে যাবার দিকে তাকিয়ে আমার এই কথপোকথনটি মনে পড়লো আর আমি আমার খাতাপত্র গুছিয়ে ব্যাগে ঢুকালাম। না পালিয়ে যাবার কোন পরিকল্পনাই আমার নেই। আমার পরিকল্পনা জাহাজটির নাচের ফ্লোরে যাওয়া। খেতে বসার আগে সেটা আমি সরেজমিনে দেখে এসেছিলাম। তখন সেখানে শিশুদের জন্য গান ও নাচ চলছিল। এখন প্রাপ্তবয়স্করা দখল করে নিয়েছে নাচের জায়গাটি। আস্তে আস্তে তাদের ভীড় বাড়ছে সেখানে। শিশুদের ঘুমাতে পাঠানো হয়েছে কেবিনগুলোতে। এখানে বলে নেয়া ভালো যে, মামার সাথে যখন আমি জাহাজে ভ্রমণ নিয়ে আলাপ করছিলাম তখন তিনি আমাকে নিশ্চিত করেছিলেন যে জাহাজে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি বেশ কড়া। যেমন, ড্যান্স ফ্লোরে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে ডাকলেই আমি বাউন্সারদের (নাচের ফ্লোরের জন্য নিরাপত্তাকর্মী) সাহায্য পাবো। এমন ভরসা পেয়ে উদ্দাম হয়ে নাচার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করবো তেমন মেয়েই আমি নই। আমি নাচতে খুব ভালোবাসি। তাই বলা ভালো আমি এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম। নাচের সঙ্গী হিসেবে একজন তরুণকে পাওয়ায় সুযোগটি একটি নতুন মাত্রা পেল। বাংলাদেশে এভাবে নাচের সুযোগ গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান, দূর্গা পূজার মণ্ডপ, আর পাঁচতারা হোটেলেই শুধু পাওয়া যায়। উপরের কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই তরুণটি ফিরে এলো। হাসি মুখে আমাকে বললো, ‘আমি ভেবেছিলাম ফিরে এসে তোমাকে আর দেখতে পাবো না। তুমি যে আমাকে ফেলে রেখে চলে যাওনি তার জন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমি কি তোমাকে একটা ড্রিংক কিনে দিতে পারি।’ আমরা দু’জন হাত ধরে নাচের ফ্লোরের

দিকে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটির সরলতায় মনে হল ও যে বলেছে ওর বয়স ৩০ তা সত্যি নাও হতে পারে। ড্রিংক কেনার সময় আমি কাউন্টারের একজন পুরুষ কর্মীকে বললাম যে আমি নাচতে যাচ্ছি এবং আমার ব্যাগটি তাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে চাই। সে মহানন্দে আমার ব্যাগটি কাউন্টারের এক কোনায় রেখে দিল আর আমাকে উপহার দিল একগাল হাসি আর চোখ টিপি। চোখটিপির অর্থ বাংলাদেশ আর ইউরোপে এক না। ইউরোপে সাধারণতঃ এটা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ হিসেবেই ধরা হয় অতএব আমি নিশ্চিন্ত মনে আমার ফরাসী বন্ধুর সাথে এগিয়ে গেলাম। ড্রিংক কেনার সময়ই আমার বন্ধুর পরিবারের লোকজনের সাথে আমার আবার দেখা হল তবে তাঁরা দূর থেকেই হাত নেড়ে, উল্লাস ধ্বনি করে আমাদের নাচে যোগ দিতে উৎসাহ দিল।

নাচানাচি করে প্রায় আধঘণ্টা পরে ক্লান্ত হয়ে আমরা আবার একটা টেবিলে ফেরত আসলাম। টেবিলগুলোতে এখন আলো আগের চেয়ে অনেক বেশী কোমল। ঘুমাতে যাবার সময় হয়ে এসেছে, ডি.জে বাজাচ্ছে শান্ত আর রোমান্টিক একটি সুর। আশে পাশের টেবিলগুলোতে যুগলরা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। আমার বন্ধুটি আমাদের জন্য আরেকটি ড্রিংক নিয়ে আমার কাছকাছি এসে বসলো এবং বলল, ‘আমি কি তোমাকে একটি চুমু খেতে পারি? তুমি চাইলে আমরা আমাদের ঘরে যেতে পারি। আমার নিজের একটি আলাদা কেবিন আছে। সেটাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে আমরা না হয় তোমার কেবিনে যাই।’ সৈয়দ মুজতবা আলী কি এরকম কোন প্রস্তাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন? কোন গল্পে তো এরকম পড়িনি– মনে মনে এসব ভাবছিলাম আমি, কিন্তু মুখে হাসি ধরে রেখে উত্তর দিলাম, ‘না আমি সেটা চাই না। আমার তোমাকে অনেক ভালো লেগেছে। অনেক ভালো নাচো তুমি। কিন্তু আমি তোমার সাথে ঘুমাতে যাবো না।’ আমার উত্তরে ও ভাবলো আমি যৌন-রোগ সংক্রমণের ভয়ে ওকে মানা করেছি। বললো, ‘তুমি ভয় পেয়ো না। আমার কাছে কনডম আছে।’ এ কথা শুনে আমার পেট ফেটে হাসি পেল। বোধহয় একটু জোরেই হেসে ফেলেছিলাম কারণ দেখলাম সামনের টেবিলে বসা একটি যুগলের মধ্যে মেয়েটি ঘুরে আমার দিকে তাকালো। আমার সাথে চোখাচোখি হতেই মুচকি হেসে সে ঘাড় ঘুরালো। আমার বন্ধু ভাবলো আমি ওকে বিশ্বাস করছি না। তাই ‘এই দেখো’ বলেই পকেট থেকে ওর ওয়ালেট বের করে আমাকে খুলে ভেতরের জিনিষপত্র দেখালো। আমার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বললো, ‘আর এটা হল আমার নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট। আমি যে সত্যিই ফ্রান্সের নাগরিক এটা তার প্রমাণ।’ তৃতীয় বিশ্ব থেকে ইউরোপে অভিবাসন করা একজনের জন্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ এই কার্ড সেটা আমি বাংলাদেশী হিসেবে ভালোই জানি। কার্ডটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম এবং বললাম, ‘তোমার বয়স মাত্র ২৩! আর তুমি বলেছো তোমার বয়স ৩০!!’ এরপর

আমরা দু'জনেই হাসিতে ফেটে পড়লাম। আমার বন্ধুটি হাসতে হাসতে বললো, 'আমার সত্যিকারের বয়স বললে তুমি আমাকে পাত্তাই দিতে না। ভাবতে আমি বাচ্চা। আমাকে সবাই বাচ্চা ভাবে। আমার কোন গার্ল ফ্রেন্ড হয় না।' আমিও হাসতে হাসতে বললাম, 'আমার তোমার আচার আচরণেই ধারণা হয়েছে যে তুমি একটা বাচ্চা।'

আমার কেবিনে ফেরার সময় হয়। আমার বন্ধুটি বলল সে আমাকে লিফ্‌ট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চায়। কাউন্টার থেকে আমার ব্যাগটি সংগ্রহ করে আমরা লিফ্‌ট পর্যন্ত একসাথে আসি। ও বলে, 'আমি কৃষ্ণাঙ্গ সে জন্যই কি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে?' আমি বললাম, 'একদম না। তুমি সুন্দর। কিন্তু কাল সকালে আমার অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে। প্লেন ধরতে হবে। আমি ক্লান্ত।' বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিদায় বেলায় চুমু খাবার রেওয়াজ নেই কিন্তু ফ্রান্সে আছে। জানি না সুদানের সংস্কৃতি কি রকম। আমার বন্ধুটি ফরাসী কায়দাতেই বিদায় নিতে চাইলো। আমাকে নিশ্চিন্ত করলো চুমুটি হবে বন্ধুত্বপূর্ণ আর সে আমাকে আর অনুসরণ করবে না। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেবিনে ফিরতে ফিরতে স্মরণ করলাম সৈয়দ সাহেবকে। সালাম মঁসিয়ে।

এখানে মুদ্রিত রচনাটি 'ঠোঁটকাটা' নামে 'একটি নারীবাদী দল-এর ব্লগ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। http://thotkata.net/2013/05/18/যোনিদেশ-2/।

সুস্মিতা চক্রবর্তী

সম্পর্ক-সঙ্গ-সমাচার

Rabindranath Tagore

তিন পাগলে হলো মেলা নদে এসে
তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে

আনোয়ারা পাগলীর সাথে পরিচয় ঘটেছিল রাজশাহীর ওলীবাবার মাজারে। পরিচয়ের পর্ব থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তার সাথে কেমন জানি সখ্য তৈরি হয়েছিল। লম্বাচওড়া এক নারী। সাদা থান পরিহিতা, হাতে একটা লম্বা লাঠি, চুলগুলো চূড়া করে বাঁধা। দারুণ ডাকসাইটে সে নারী। প্রথম রাতেই তিনি আমাকে তার স্বভাবজাত হাসিতে আপন করে নিয়েছিলেন। আমি তখন মাজার নিয়ে গবেষণারত। রাত-বিরাতে মাজারে ঘুরি আর প্রচলিত সমাজ-কাঠামোর বাইরে তাদের ভিন্নতর সাংস্কৃতিক-চর্চা পর্যবেক্ষণ করি। মাজারের নারী-পুরুষের সাথে আলাপ করি। তাদের অনুমতি নিয়ে সে সকল রেকর্ড করি। ছবি তুলি। তো সেই আনোয়ারা পাগলীর সাথে খুব সহজে আমার ভাব জমে ওঠে। তিনিও তার ভালোলাগা অকপটে আমায় জানান। তার কাছ থেকে শুনি তার জীবনাভিজ্ঞতার অন্যরকম গল্প। একজন নারী হিসেবে তার অপ্রচলিত জীবনযাপনের কথা শুনতে শুনতে তার সাথে বিভোর হয়ে থাকি। সেও নানা প্রশ্ন করে আমার সম্পর্কে। নানা কিছু জানতে আন্তরিক চেষ্টা

চালায়। এভাবে পারস্পরিক আলাপে কাটে সেই রাতটি। পরদিন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। বিদায়ের সময় সে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে। এমন শক্তপোক্ত পরিণত নারীর আলো-আলো চোখের জলাভাস আমার দৃষ্টি এড়ায় না। আমায় তিনি সামনের ওরশে কানপাড়ায় (রাজশাহী থেকে বিশ কি.মি. দূরে) কালাচাঁদের মাজারে যাওয়ার দাওয়াত দেন। গবেষক হিসেবে এ দাওয়াত আমার জন্য তখন খুবই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু অল্পসময়ের হলেও তার সাথে অন্যরকম যোগাযোগের একটা মৃদু টান অনুভব করি। কানপাড়ায় দেখা হবে কথা দিয়ে আসি তাকে। তার পরের মাসে কানপাড়ার ওরশের রাতে গিয়ে উপস্থিত হই। আমায় পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন পাগলী। সে সুযোগে আমি তার তার কাছ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অন্যরকম গল্প শুনি। সে গল্পের চরিত্র স্বয়ং তিনি নিজে। জীবনের পঞ্চাশটি বছর তিনি পার করেছেন পরম্পরাগত ধর্মসাধনা-সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থেকে। তিনি দেহাত্মবাদী ঘরানার মানুষ যেখানে ধর্মীয়ভাবে দেহসাধনার নানা স্তর অতিক্রম করতে হয়। সে সাধনা একেবারেই আমাদের চেনা জগতের সাথে মেলে না। দেহসাধনায় তিনি আর তার স্বামীপ্রেমিকটি যুগল সাধনা করেছেন দীর্ঘ বছর যেখানে যৌনতা-প্রেম এক অন্য পর্যায়ে আচরিত হয়। নারী-পুরুষের সেই যুগলসাধনায় গুরু লাগে। তাদেরও একজন গুরু ছিলেন যার কাছে তারা এই দেহসাধনার শিক্ষা করেন। সেই সাধনায় নারীটি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার মাসিকের দ্বিতীয় দিনে তারা তিনজন মিলে সেই সাধনা করতেন। সে সাধনা অটলের সাধনা। পাগলীর ভাষায়, ‘জ্যান্তে মরা প্রেম সাধনা’। কামকে প্রেমের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করার সাধনা। সেখানে যৌনতার চর্চায় তিনজনই অংশগ্রহণ করতেন। গুরু প্রধানত পথ দেখান; সে পথে তারা দুই নারী-পুরুষ শিষ্য দেহসাধনায় এগিয়ে যেতেন। এই সাধনা দীর্ঘ সময়ের। উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি ও তার স্বামীপ্রেমিকটি গুরু হতে পেরেছিলেন তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির ধারায়। নারী হিসেবে তিনিও গুরুর মর্যাদায় ভূষিত হন। তখন তিনি বনে যান পাগলীমা-গুরুমা। এভাবেই তিনি আমায় জানাচ্ছিলেন তার জীবনের অন্য রকম সম্পর্কচর্চার ইতিবৃত্ত। সাধনপরবর্তী সময়ে উত্তীর্ণ তারা ফের নতুন শিষ্যকে একই ভাবে শেখান দেহসাধনার চর্চা। এভাবে গত কয়েক বছর ধরে তারা নিজের ভক্ত-শিষ্য তৈরি করেছেন যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রেমের-আত্মার। ইতোমধ্যে তার প্রেমিক-স্বামীটি দেহান্তরিত হয়েছেন। আগে সারা দেশের মাজারে-ওরশে ভক্ত-শিষ্যদের সাথে তারা পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। সদা প্রেমের আনন্দে পাগলপারা হয়ে মানুষসঙ্গ করতেন। গানবাজনা-সাধনার মধ্য দিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন পাগলী তার জীবনের অনেক অনেক বছর। এখন তিনি সম্পূর্ণ একা। তবে তাদের অসংখ্য ভক্ত-শিষ্য নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আর তাদের সাথে সম্পর্কিত থেকেই এখনকার দিনগুলো তার কাটে বিভিন্ন মাজার-খানকা-আখড়ার ওরশে আর

সাধুসঙ্গে। এভাবে নিজের জীবনের অনেকখানি গল্প তিনি আমায় শোনান। রাত বাড়ে, আমরা দুই নারী এগিয়ে চলি ওরশের মহাসমাবেশের মধ্যে যেখানে তখন দারুণ সব দেহবাদী ঘরানার গানের আসর চলছে। গান শুনতে শুনতে আমরা পরস্পর আরও ঘন হয়ে বসি। এক বয়স্ক নারীর সাথে এভাবেই আমার অন্যরকমের সম্পর্ক আরও খানিক নিবিড় হয়ে ওঠে। তারপর থেকে, যেখানেই ওরশে গেছি আনোয়ারা পাগলীর সাথে দেখা হয়েছে। তার সাথে অন্যরকম প্রেমের সম্পর্ক-সময় কেটেছে বরাবরের মতোই। পাগলী তখন একলা, যাযাবর। পথে-পথে মাজারে-আখড়াতে তার দিন কাটে। তার কাছে আমার ঠিকানা লিখে দিয়ে রেখেছিলাম। এর মধ্যে আমারও গবেষণা-সফরের বিরাম ঘটে। অনেক দিন মাজারে-ওরশে যাই না। ওখানকার কারোর সাথে দেখা হয় না। অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এরকমই এক বিকালে হঠাৎ করেই আনোয়ারা পাগলী হাজির হন আমাদের বাড়িতে। তাকে দেখে সামনে এগিয়ে যাই। আমায় কাছে পেয়ে আবেগে টেনে নেন তিনি। তার সাথে হাত মেলাই, বুক মেলাই। তাকে আগের চাইতে আরও বয়স্ক লাগে। শিশুর মতোন আমার সাথে মেতে ওঠেন পাগলী। কুশল-বিনিময়ের পর তাকে নিজের ঘরে এনে বসাই। সঙ্গী-সন্তানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। তার চোখে তখন খুশির ঝিলিক খেলে। সেই দিনটি পার হয় তার সফরের নানা কাহিনী জানার মধ্য দিয়ে। পাগলীর সাথে এভাবে এক অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিই দিনটি। পরদিন হাসিমুখে বিদায় নেন তিনি। যাওয়ার সময় হাতে হাত মিলিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। আবার কখনো দেখা হয়ে যাবে জানান আমায়। এরপর বছর খানেক তার আর দেখা পাই না। আমিও জীবনজীবিকার ব্যস্ততায় ডুব দিই। বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতেই ফের দেখা হয় তার সঙ্গে আমারই পেশাগত-সূত্রে পাওয়া কাজের কক্ষে। দারোয়ান তাকে আমার কাছে নিয়ে আসে। গরীবী বেশভূষার পাগলী এই নারীটি দৃঢ় স্বরে আমার নাম করায় আর দেখা করতে চাওয়ায় তাকে নিয়ে দারোয়ান সম্ভবত ইতস্তত বোধ করে কিংবা কে জানে হয়তোবা তাকে ধমকাধমকি করে। সে দূর থেকে আমায় দেখে দারোয়ানের দখল থেকে প্রায় ছোটার ভঙ্গিতে আমার কাছে এসে স্বস্তি পায় আর দারোয়ানের উদ্দেশ্য জানায়, এ জায়গায় আমি না থাকলে সে কখনোই আসতো না, আমাকে খুঁজতে বাধ্য হয়েই সে এখানে হাজির হয়েছে। টের পাই, এই শিক্ষিত-পরিসরে আমায় বের করতে তাকে বেশ নাকানিচুবানি খেতে হয়েছে। দ্রুত তাকে নিয়ে নিজের কামরায় ঢুকি। পাগলী বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে আমায় দেখেন। তার চোখে আনন্দ দেখি, প্রেম দেখি। আমরা একসাথে অনেক সময় পার করি নিজেদের আলাপচারিতায়। চা-সিঙ্গারা খাই। সিগারেট ধরাই। সেও সিগারেট চায়। তাকে প্যাকেট থেকে সিগারেট বাড়িয়ে দিই। তারপর সে প্রথমবারের মতো অকপটে আমাদের সম্পর্কটাকে চিহ্নিত করে। তার মুখের সেই কথাটি আজও মনে পড়ে:

‘তুমার সাথে আমার আত্মা দি বানাই থুছি প্রেম।’ টের পাই, সত্যি আত্মা দিয়েই বানানো এমন সম্পর্ক তা না হলে এতটা পথ পার হয়ে, এত হয়রান হয়ে এক বৃদ্ধা-পাগলী আমার কাছে আসেন কী করে! তাকে পেয়ে খুশি লাগে খুব। অনেকক্ষণ তার সাথে কাটাই। সে আমারে অটলে থেকে সারা দুনিয়ার মানুষের সাথে কামের নয়, প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত থাকার বীজমন্ত্র শেখান। সেসব কথাবার্তা রেকর্ড করে রাখি। ঘণ্টা তিনেক একত্রে থেকে তিনি বিদায় নেন। বিদায়ের সময় তাকে ক’টা টাকা নির্বোধের মতো গুঁজে দিই। তিনিও আপত্তি করেন না। পাগলীর সাথে সেবারই আমার শেষ যোগাযোগ। ইতোমধ্যে কেটে গেছে অনেক বছর। তার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না। ফলে, জানি না, পাগলী কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না। তবুও জীবনের কোনো কোনো একান্ত প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন স্মৃতি হাতড়াই তখন এ হেন পাগলীর সাথে অন্যরকম প্রেমের-অনুরাগের সম্পর্ক-যোগাযোগের চমৎকার চিত্র মাথায় নাড়া দিয়ে যায়। ভালোলাগার এক অন্য আনন্দ চৈতন্যে ভর করে। বৈচিত্র্যে ঘেরা মানুষের জীবনসংস্কৃতির ভিন্ন এক চরিত্র আর তার চর্চার চেহারা অনায়াসে হৃদয়পটে আজও কোথায় যেন জেগে থাকে!

ওলো সই, ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই

হাতপা ছড়িয়ে মনের ভাব উজাড় করতে পারার মতো সুযোগ সহজে মেলে না। তার সাথে একদা সে সুযোগ ছিল। সে আসলে আনন্দে গড়গড় করে গল্প করতাম আমরা। পথে-পথে, দোকানে চা-পান-বিড়ি খেতে-খেতে কিংবা রিক্সায় ঘুরতে ঘুরতে। কখনো মনে হতো না, সে পুরুষ আর আমি নারী। তাকে নিজের মতোই আরেকটা মানুষ মনে হতো। সইয়ের মতো লাগতো তাকে। ছোটোবেলার সেই সই যাকে অনেক অনেক কাল আগেই চিরতরে এক অচেনা বদ্ধ কুয়ায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। তার সাথে কখনোই নিয়মিত দেখা হতো না। সে আসলে কিংবা আমি গেলে তবেই দেখা হতো আমাদের। সেটাও অনেক অনেক সময় পার করে। মাঝে অনেক কাল তার সাথে তেমন যোগাযোগই ছিল না। কয়েক বছর পর সেই সই যখন তার নব্যপ্রেমের কথা মোবাইলে বার্তা দিয়ে জানাল, তার প্রেমিকাকে নিয়ে বেড়াতে আসার ইচ্ছা জানাল, খুব ভালো লেগেছিল সেদিন। তারপর সেই বন্ধু আর তার প্রেমিকার সাথে দারুণ সময় কেটেছিল আমাদের। কী এক মায়া ছিল এই সম্পর্কে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সইয়ের প্রেমিকাও অনায়াসে আমার বন্ধুতে পরিণত হলো। সেই সম্পর্ক আজও অটুট। এখন তার-তাদের কুশল পেতে ভালো লাগে। মাঝে-মধ্যে দেখতে যেতে ইচ্ছা হয়। তখন তাদের সাথে কাটিয়ে আসি ক’দিন। সে দিনগুলো দারুণ আন্তরিকতায় আর আনন্দে-বন্ধুত্বে হাসিময় হয়ে ওঠে। সেই

হাসিতে মল নেই। এক নির্মল-নিবিড় সম্পর্ক যা কেবলই পরিণত হয়। প্রাণে প্রাণ মেলাবার শক্তি আনে। সংহতি আনে।

হঠাৎ রাস্তায় আপিস-অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়া মুখ চমকে দিয়ে বলে, বন্ধু ...

তার সাথে সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। নারীবিষয়ক একটা পত্রিকার স্বপ্ন দেখলাম একদা। এ কাজে অন্যতম সহচর ছিল সে। প্রতিদিনকার বিকাল-সন্ধ্যা তার সাথে একত্রে কাজে পার হতো। একসাথে পড়া, অনুবাদ করা, গল্প করা, হেঁটে বেড়ানো, চা-সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি ছিল ঐ সময়কার নিত্যদিনের ঘটনা। একত্রে কাটানোর সেই সময়গুলো অনেক আন্তরিক বন্ধুত্বে কেটেছে। কখনো পূর্ণিমার মায়াভরা রাতে কিংবা ঘোরতর বর্ষার মধ্যে পদ্মার ধারে আমরা হেঁটে বেড়িয়েছি রাতের পথ ! এরপর সেই বন্ধুটিকে তার জীবিকার কারণে দূরে চলে যেতে হয়েছিল। তার সাথে দীর্ঘ সময় তেমন যোগাযোগই হতো না। কিন্তু আজও যখনই তার সাথে দেখা হয়, টের পাই বন্ধুতার এক বোধ। সেই বোধের খুব তেমন ক্ষয় হয় না। বন্ধুতার সেই বোধেরই এক টুকরা অনুরণন ঝরে পড়ে। যখন কালে-ভদ্রে হলেও পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে।

বন্ধু মানে সহজ কোনো মেঘের দেশে দুঃখশোকেও হাতের সাথে হাতটা মেশে

আমি তারে দোস্ত বইলা সম্বোধন করি। পরিণতকালে তার সাথে দেখা হলেও সে আমার ছোটবেলাকার সহপাঠী। কিন্তু শিক্ষার্থীজীবনে তার সাথে আমার খুব তেমন নিবিড় বন্ধুতা হয় নাই। অথচ, জীবনের একেবারেই পরিণত পর্যায়ে তার সাথে আমার নতুন করে সম্পর্ক-যোগাযোগ ঘটে। ক্রমে সে যোগাযোগ সময় আর চর্চার কারণে নিবিড় হয়ে ওঠে। এখন প্রতিদিনই একবার করে পরস্পরের খোঁজ না নিলে ভালো লাগে না। আমার দোস্তের দরদী মন। অনেক দরদ দিয়ে সে গান করে। তার গান শুনলে প্রাণ জুড়ায়। কখনো মন বেশি খারাপ হলে তাকে ফোনে গান শোনানোর আবদার করি। দোস্ত কথা রাখে। তার গানের আকুল করা সুরে মন ভালো হয়ে যায়। অকপটে দোস্তকে বলা যায় নিজের অনেক কিছু। নিজের আনন্দ-বেদনা সব। বাড়ি (কিশোরগঞ্জ) গিয়ে ব্যাগটা ফেলেই দোস্তকে ফোন দিই। সেও তখন অপেক্ষায়, বুঝতে পারি। অনেক সময় কাটাই একত্রে। তখন ঘোরাঘুরি, খাওয়া-দাওয়া-গানাবাজনা সব চলে। একবার খুব মন খারাপ। দোস্তরে বললাম হাওরে যাব। হাওরের উথালপাথাল ঢেউয়ের ভেতর নৌকায় বসে সময় কাটাব। তখন রোজার সময়। দোস্ত রোজা রাখে। কিন্তু আমার জন্য হাওর-সফরের ব্যবস্থা করে। নিজে সাথে থাকে। আমিও এক ফাঁকে রোজাদার দোস্তর জন্য সামান্য ইফতার কিনে রাখি।

তারপর হাওরে একত্রে নাও ভাসাই। সাথে আরও একজন বন্ধু থাকে। আমি হাওরের অপরূপ জলে পা ভেজাই। নিজের অনেক বেদনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই যেন হাওরের জলে! একলা-আনমনা হয়ে থাকি। দোস্ত আমারে ঘাঁটায় না। নিজের মতো থাকতে দেয়। নামাজের সময় নৌকায় বসেই দোস্ত নামাজ সারে। তারপর গান ধরে। সে গানে আকুল হয় মন, আকুল হই আমি। দাঁতের যন্ত্রণায় তখন বেশ ভুগছি। কথা প্রসঙ্গে দোস্ত জানে। তারপর নিজেই দাঁতের ডাক্তার ঠিক করে রাখে। রাজশাহী থেকে মায়ের বাড়ি গিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই। আমি বারণ করলেও দোস্ত আমার সাথে বসে থাকে যতক্ষণ না দাঁতের চিকিৎসা শেষ হয়! এমন কত সব ঘটনার সাথে দোস্ত জড়িয়ে থাকে। এই সব মায়ার-বন্ধুত্বের কোনো তুলনা চলে না! ফিরে আসার সময় প্রত্যেকবার দোস্তর সাথে হাত মেলাই। মনে স্বস্তি লাগে। অন্তর জুড়িয়ে যায় যখন দোস্ত আমারে বলে: 'তুমি আমার কলিজু-দোস্ত'! এরকম 'কলিজু-দোস্ত'-এর জন্য সর্বদা শুভাশিস জমে থাকে কলিজায়!

বন্ধে মায়া লাগাইছে ...

তার সাথে পরিচয় ঘটে এক কর্মশালায়। তারপর ঘটনাচক্রে তিনি আমার শহরে আসেন বছর খানেকের জন্য। আসার আগে যোগাযোগ করেন। তার জন্য একটা বাড়ি খোঁজার দায়িত্ব দেন আমায়। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বের হই। তিনি একা থাকবেন। এই সমাজে একা এক নারীর জন্য বাসা ভাড়া পাওয়া খুব সহজ হয় না। বাসা খুঁজতে গিয়ে নানা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ঘটে। অতঃপর আমারই এক সহকর্মীর বাড়ির একটা ফ্ল্যাট তিনি ভাড়া নিতে পারেন। সেখানে আমার সামান্য ভূমিকা থাকে। তারপর, প্রায়দিনই তার সাথে যোগাযোগ ঘটতে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষক সেই বন্ধু তার গবেষণার অনেক কিছু লেনদেন করে আমার সাথে। দিন বাড়ে, তার সাথেও বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। যখন-তখন ফোনে কথা হয়। সুযোগ পেলেই দেখা করি। তার বাসায়, না হয় আমার বাসায়। গবেষণার কাজের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে করতে আমরা বক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতাও বিনিময় করি। তিনি বিয়ে করেন নি। উচ্চশিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায় সম্পন্ন করছেন। তার অনেক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার মেলে। আবার অনেক কিছুর সাথে মেলেও না। সেসব সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্ক-যোগাযোগ সচল থাকে। কখনো মন খারাপ হলে সে আমার কাছে চলে আসে। একসাথে হাঁটি পথে-পথে। কখনো রিক্সায় ঘুরি অচেনা পথ ধরে। পদ্মা নদীর তীরে বসে কত দিন কফি খাই। গল্প করি। এভাবে নিত্যদিনের জীবনে সেও যুক্ত হয় বন্ধুর মতো। তার জীবনযাপনের নানা কিছুর শ্রোতা হই আমি, সে আমার। এভাবে দেখতে দেখতে দিন পার হয়। কাজের ব্যস্ততায় যোগাযোগে ভাটা হলে ছুটির অবসরে তা খানিকটা পুষিয়ে নিই একত্রে আড্ডা-আলাপে। আমার

পরিবারের সাথেও খানিক সখ্যতা গড়ে ওঠে তার। প্রায়ই বিকালে দুজন একত্রে ক্যাম্পাসে চা খাই, সিগারেট খাই। তারপর হেঁটে, গল্প করে ফিরি। নিজেদের কাজের-লেখালেখির অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। সেরকমই এক চমৎকার সন্ধ্যায় হঠাৎ সে আমার হাতে হাত রেখে বলে, 'তোমারে ভালোবাসি'। আমিও তার হাতটা ধরে থাকি খানিকক্ষণ। অনুভব করি, একলার এই শহরে তার মনে আমি অনেকখানি জায়গা নিয়ে নিয়েছি। ভাবতে ভালো লাগে যে, সম্পর্কহীনতার এ কালেও আমাদের মধ্যে ঠিকই এরকম নিটোল সম্পর্ক অনায়াসে আচমকা ঘটে গেছে। মানুষের সঙ্গকাতরতা বেঁচে থাকে এভাবেই। কখনো কোথাও তা ঝলকে ওঠে ঠিক। এভাবে সদালাপে-সুখে-দুঃখে সময় কাটানো এ সম্পর্ক। এখানে কোনো বস্তুগত লেনদেন নেই। কেবল আছে প্রাণের এক নিবিড় টান। সে টানেই দুলে ওঠে এই সম্পর্কসুতা!

যত দূরে দূরে দূরে যাবে বন্ধু, একই যন্ত্রণা পাবে, একই ব্যথা ডেকে যাবে

শিক্ষকতা জীবনে যে ক'জন শিক্ষার্থীর সাথে একত্রে কাজে-অকাজে কেটেছে তার মধ্যে সে একজন। শুরুতে সে আমার কেবল শিক্ষার্থী হলেও পরের দিকে তার সাথে সম্পর্কের মাত্রা এমনই নিবিড় হয় যে, সে আমার-আমাদের পারিবারিক বন্ধুতে পরিণত হয়। তার চমৎকার স্বভাবে আমরা মুগ্ধ থাকি। তার সাথে সম্পর্কের সমস্ত কৃতিত্ব মনে হয় যেন একা তারই। এমন সদ্গুণাবলীর মানুষ সহজে দেখা যায় না। তার সাথে গবেষণার কাজে ঘুরে বেড়িয়েছি রাত-বিরাতে এ দেশের নানান মাজারে। সেখানে সর্বদাই তার সহযোগিতার সচল হাত বাড়ানো দেখতাম। একত্রে কাজ করতে করতে ক্লান্তি এলে খানিক চাঙ্গা হতে তার সাথে অনেক সময় বাইরে বের হয়েছি। নিজের অনেক সমস্যা অকপটে তার সাথে শেয়ার করেছি। সেও তার সমস্যা অনায়াসে বলতে পারত আমার কাছে। একদা, অধিকার রক্ষার আন্দোলনে আমার সঙ্গীকে রাষ্ট্রের রোষানলে পড়ে জেলে যেতে হয়। সন্তানকে নিয়ে আমি তখন একা। চরম বিপদের সে সময়ে ঠিকই সে তার স্বভাব-সহযোগিতায় আমাদের কাছে চলে আসে। তাকে পেয়ে অনেক ভারমুক্ত লাগে। ভরসা করে নিজের ছোট্ট সন্তানকে তার কাছে রেখে জীবিকা চালিয়েছি তখন। আমার সন্তানকে তখন সে আগলে রেখেছে পরম ভালোবাসায় আর যত্নে। এরকম কত কত সুখের আর বিপদের দিনের বন্ধু সে আমার। ঢাকায় (চাকরিসূত্রে সে তখন ঢাকায় বাস করে) কোনো কাজে গেলে তাকে ফোন দিতেই সে নিজের কর্মব্যস্ততা গলিয়ে হাজির হয়ে যেত কত দিন! অচেনা রাস্তায় আমার সমস্যা হবে ভেবে সাথে সাথে থাকত। কত যে উপকারে সিক্ত হয়েছি তার কাছ থেকে সে কথা বলে শেষ করা যাবে না। একবার পারিবারিকভাবে আমরা সমুদ্র-সফরে বের হই। তাকে সে সফরে যুক্ত করি। সেখানে বেড়ানোর কত কত

আনন্দস্মৃতির সেও আমাদের সাথের সমান ভাগীদার। তারপর সময়ের সাথে সাথে তারও কর্মজীবনের সূচনা ঘটে। আমাদের প্রিয় আরেক শিক্ষার্থী-বন্ধুর সাথে তার প্রণয় আর পরিণয় হয়। সে পরিণয়ের সূচনায় আমরাও আনন্দে গিয়ে সামিল হই। তার-তাদের যৌথজীবনের খুশিতে ছুঁয়ে যায় মন। এখনও অবসরে কখনো একা, কখনো পারিবারিকভাবে আমরা তার ডেরায় হাজির হই। আমাদের পেয়ে সেরকমই আন্তরিকতায় আর বন্ধুত্বে মেতে ওঠে তারা। কখনো ছুটিছাটায় হানা দেয় আমাদের সংসারে। তাদের পেয়ে আনন্দ লাগে খুব। প্রাণে খুশির তুফান বয়ে যায়। আপনার-আপন হয়ে ওঠার এ হেন বন্ধুত্বের সম্পর্কের সামনে নিজেকে সদা নতজানু লাগে!

এক ফালি মেঘ, এক ফোঁটা জল, রঙধনুকের একটি কণা, একটি নিমেষ ধরতে চেয়ে আমার এমন কাঙালপনা

এক মানুষ সম্পর্ক পাতে অন্য মানুষে। কোনোরূপ প্রয়োজন ছাড়াই এ সম্পর্ক ঝলকায় চোখে-মুখে, প্রাণে-চেতনায়। মাথায় আলোড়ন তোলে। বুকের মধ্যে এর অনুরণন অনুভব করা যায় পলে পলে। সারাক্ষণই তাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কাছে পেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় আদুরে-বিড়াল হয়ে তার পায়ে পায়ে ঘুরি। মনে হয় তাকে আগলে রাখি একান্তে। তাকে কাছে পেলেই তখন সর্বসুখ লাগে। সে দূরে গেলে মনে তীব্র অসুখ ছড়ায়। এমন যে সম্পর্ক তাকে ভালোবাসি মুখে না বললেও চলে। লিখে না জানালেও অপর জনের বুঝতে তেমন অসুবিধা হয় না। যোগাযোগ ঘটে যায়। এক আত্মা অপর আত্মার সাথে ক্রমাগত যোগাযোগে লিপ্ত হয়। এক আত্মার সাথে অপর আত্মার এমন যুক্ততার যে তীব্র বাসনা তাই তখন প্রেম।

এমন অচেনা প্রেমই এসেছিল জীবনে। সে এক অন্যরকম রূপকথা সময়। রক্তের কিংবা জাগতিক প্রয়োজন সাপেক্ষে সম্পর্ক-ছকের বাইরে এমন যে সম্পর্ক-কাতরতা সে কাতরতা পেয়ে বসেছিল মনকে। জগতের অন্য সকল কিছুই তখন এ হেন অনুভবের কাছে তুচ্ছ। কোনোরূপ বাধা তখন আর বাধা নয়। পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকাই তখন বাঁচার অন্যতম আনন্দ। অথচ, জীবনজগতের কত রকমের আয়োজনে পরিপূর্ণ পৃথিবী-প্রকৃতি। জীবিকার প্রয়োজনীয় হাতছানি। জগত-সংসারে কত রকমের আবশ্যিক-অনাবশ্যিক কাজ। তবুও সকল কিছুকে উপেক্ষা করে আমরা এ ধরনের যুক্ততা-যোগাযোগে আচ্ছন্ন ছিলাম। এ যোগাযোগ সদা প্রেমময়। সহজ সে প্রেম। কোনো লেনদেন, বিশেষ কোনো শর্ত সেখানে তখনও বলবৎ হয় নি। সমাজের নানা প্রকারের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে আমাদের সে যুক্ততা তখন কেবলই ঘন হয়ে আসছিল। না, তার গায়ের রং কি, চোখের গড়ন কিরূপ, সে যথেষ্ট মেধাবী কি না, লম্বায় সে ঠিক কত ইঞ্চি, তার পরিবারের অবস্থা কী, বয়স ঠিক কত, ব্যাংক-ব্যালেন্স আছে কি না ইত্যাকার কোনোপ্রকার প্রশ্নও তখন মনের কোণে

উঁকি দেয় নি। শুধু তার সঙ্গ আর কথাই ছিল আস্থার পাটাতন। সে পাটাতনে সাহসে সহজ হাসিমুখে দাঁড়াতে কোনো দ্বিধা-ভয়-সংস্কার কিচ্ছু ছিল না। এমনকি, এ সম্পর্কের গন্তব্য কোথায় তা নিয়েও কোনোরূপ চিন্তা ছিল না। সাধারণভাবে নারী-পুরুষের যে লিঙ্গীয় ভিন্নতা বা বৈষম্য সেগুলো তখনও এখানে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি! সকল বোধটুকু জুড়ে ছিল সে সম্পর্ক। অন্তরে-আত্মায়। সহজপ্রেমের যৌথতায় গা ভাসিয়েছিলাম আমরা। সব কিছু একত্রে করার ঝোঁক পেয়ে বসেছিল আমাদের। প্রকৃতির সব রূপরসকে একত্রে নিংড়ে পান করতে চেয়েছিলাম বোধ হয়। সূর্য-করোজ্জ্বল ভোরবেলা, রোদেলা দুপুর, সন্ধ্যার মায়া কিংবা নিশুতি রাতের শুনশান নীরবতা সব কিছুই তখন অন্যরকম লাগছিল।

আমাদের পরিচয়-সূচনা-সময় ছিলো বর্ষার শেষ আর নিবিড় প্রণয় হয়েছিল কার্তিকের চূড়ান্ত কুয়াশায়। চরম শীতের কুয়াশামাখানো গভীর রাত্রিতে নিজের ছোট্ট ঘর ছেড়ে তাকে বিদায় দিতে পথে নামতাম। সে তখন সাইকেল নিয়ে আসত। প্রতিদিন বিদায়ের সেই সময়টা নানাভাবে দীর্ঘ হতো। তারপর তাকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে ফের অপেক্ষা, আবার কখন দেখা হবে ভেবে। কী এক ঘোর ভর করেছিল সর্বাঙ্গে-আত্মায়। আমাদের সব কাজ তখন প্রায় একসাথে। একসাথে ভর দুপুরে ছাদে বসে কবিতা-পড়া, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় গল্পে-গানে-কবিতায় মুখর হওয়া, একত্রে সেমিনার করা, পড়ালেখা করা, ঘরের কাজ করা, নিজেদের লেখা তাজা কবিতার হাস্য-বিনিময় করা ইত্যাদি-প্রভৃতি। জীবনের এই অন্যরকম সুন্দর সময়গুলো তখন স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ততায় আর সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ ছিল। একমাত্র প্রেমই ছিল এই সম্পর্কের মুক্ত হাওয়ার পারাপার। এ হেন প্রেমময় সম্পর্কের কালপর্বে আমরা যথেষ্ট পরিণত। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক সহকর্মীর। তারপর প্রেম-বন্ধুত্ব। এর আগেও জীবনে প্রেমের সম্পর্কের একটা অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু এই সম্পর্কের বোধ আর গভীরতা সেখানে এমন করে টের পাই নি কখনো। জীবনে অনেক চড়াই-উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পোড়খাওয়া কম ছিল না। নারী হিসেবে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা নিয়েও সর্বদা নিজের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টাই কম-বেশি করতাম। বিশেষত নিজের এই স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বের খবর টের পেতাম বলেই নারী হিসেবে বিশেষত শিক্ষা-স্বাবলম্বিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতাম। জীবনের নানা ঘাটা-আঘাটার লড়াই পার করে ভুলেই ছিলাম যে, বুকের একদম গহীনে অন্যরকম এক কাঙালপনার প্রবলভাবে বসতি ছিল। সেই কাঙালপনাটারই চরম প্রশ্রয় জুটেছিল আরেক কাঙালের সাথে তীব্রভাবে যুক্ত হয়ে। প্রেমের এই কাঙাল-পনার যুক্ততার বোধই বোধ হয় দুইজন পরিণত স্বাধীন মানুষকে তীব্র আদর-ভালোবাসায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে কিংবা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে তারই রেশ ধরে গত পনের বছর ধরে আমরা একসাথে আছি। মানুষের বিশেষত নর-

নারীর সম্পর্ক-যোগাযোগ নিয়ে নিজের খুব তেমন বোঝাপড়া ছিল না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শিখতে হয়েছে অনেক কিছু। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়েছে। নিজেদের কাজের ক্ষেত্রও আলাদা হয়েছে। সে সব স্বতন্ত্র পরিসরে স্ব-স্ব যুক্ততা ভিন্ন হয়েছে। সংসারেও সন্তানের কল্যাণে সম্পর্ক অন্য মাত্রায় বাঁক নিয়েছে। সেসব অভিজ্ঞতায় এটুকু বোধ জন্মেছে যে, নারী-পুরুষের সম্পর্ক-যোগাযোগে নিজেদের প্রচলিত মনোজগতের রূপান্তর ছাড়া একে সজীবভাবে দীর্ঘ দিন বহন করা সম্ভব নয়। মনোজগতের রূপান্তর, পারস্পরিক বোঝাপড়া-আস্থা-সমঝোতা-সহযোগিতা-সহমর্মিতা-শ্রদ্ধাবোধ-ভালোবাসা-মায়া-মমতা – এগুলোই পারে একসাথে থাকা দুজন পরিণত-স্বাধীন মানুষের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে। এগুলো আয়ত্ত্ব করা খুব সহজ নয়। নানা অভিজ্ঞতায় পার হতে গিয়ে সম্পর্ক কখনো রক্তাক্ত হয়। সম্পর্কে টানাপোড়েন চলে। তারপরও কোথায় যেন এক নিবিড় টান থেকেই যায়। সম্পর্ক-রসায়নের নানাকিছু শিখতে শিখতে আর ঠেকতে ঠেকতে একটা আস্থার-আশার আলো তীব্রভাবে জাগিয়ে রেখে একত্রে বাঁচার চেষ্টা চালাই। সেই চেষ্টাটাই সম্পর্ককে হয়তোবা আজও গতিশীল রাখে। কোথাও একটা মায়া, একটা ভালোবাসার বোধ জেগে থাকে। এই সব বোধের শিক্ষা আর চর্চা করতে করতেই জীবন এগিয়ে যায়, সম্পর্কও পরিপক্ক হতে থাকে। ভুলগুলো শুধরানোর চেষ্টা চালাই। কখনো পারি। কখনো পারি না। নিজের মনোজগতের রূপান্তরের খোঁজ নিতে নিতে বাঁচি। কখনো একলা। কখনো যৌথতায়।

নানাসূত্রে মানুষ অসংখ্য সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। কখনো পারিবারিক-ব্যক্তিগত-সংসারের আবহে, আবার কখনো পাবলিকপরিসরে। সম্পর্ক পুরোনো হয়, কখনো ব্যবহার-অনুপযোগী হয়। আবার নতুন সম্পর্ক হয়। কখনো পুরোনো সম্পর্ক নতুন-রূপে ফিরে আসে। অনেক সম্পর্কের মাধুরী চিরতরে হারিয়ে যায়। আবার কিছু সম্পর্কের মাধুরী সহজে হারায় না! তবে যে-কোনো পরিণত সম্পর্কই মুক্ত হাওয়ায় বিকশিত হতে চায়। সেই মুক্ত হাওয়া বয় স্বাধীনতার নামে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে। সমতার নামে। মর্যাদার নামে। পারস্পরিক বোঝাপড়া-শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসার নামে। আধিপত্যশীল-সমাজ-সংস্কৃতি যেমন সমাজের বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয় একইভাবে আধিপত্যশীল সমাজ-সম্পর্কও সম্পর্কের বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুমাত্রিকতাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়। মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির মতো তার বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্ক নিয়েও তাই বুদ্ধিবৃত্তিক-ভাবনাচিন্তা করার পটভূমি হাজির হয়। বাস্তবের মানুষ প্রতি-দিনই নানামাত্রিক সম্পর্কতারে জড়িয়ে থাকে। জীবনের বিচিত্র সব আয়োজনে আর প্রয়োজনে!

রাবি-ক্যাম্পাস: ২৭ জানুয়ারি, ২০১৫

মানস চৌধুরী

সম্পর্ক: নিরন্তর আত্মকে খোঁজা, এমনকি আত্মোৎসব

Rabindranath Tagore

সামাজিক বিজ্ঞানে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিয়ে যেসব পঠন হয়েছে তা গুণগতভাবে মুখ্যত বিবরণীমূলক। সেখানে নানান সম্পর্ক, বিভিন্ন সমাজে, কোন্ ধরনের পদবাচ্যতা আর দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে বিরাজমান থাকে, অনুশীলিত হয় তাই নিয়ে বিস্তর আলাপ হয়েছে। আর সাহিত্যে সম্পর্ক সাধারণভাবেই অনুভূতিমালার একটা রাজ্য। এই ভিন্নতা সম্ভবত এই দুই শাস্ত্রের পাটাতনের মধ্যে সহজাত হয়ে উঠেছে।

এগুলোর বনিয়াদ নিয়ে আর প্রশ্ন ওঠে না। সাহিত্য ও সামাজিক বিজ্ঞানের এই ভিন্নতা ছাড়াও সম্পর্কের জিজ্ঞাসা আমাকে আন্দোলিত করে। ক্রমাগত আমি অনিশ্চিত হয়ে উঠেছি সম্পর্ক মূলত একটি অনুভূতি-সাপেক্ষ বিষয় নাকি বিবরণী-সাপেক্ষ বিষয়। বিষয় নাকি অনুশীলন। এই অনিশ্চয়তা আমাকে কোনো অশান্তিতে ফেলে না। বরং সম্পর্ক নিয়ে উপলব্ধির জমিন তৈরি হয়েছে আমার এই অনিশ্চয়তাকে ঘিরে।

ঘুম থেকে না-উঠতে পারার বিহ্বলতা সমেত যখন পথের পাঁচালীর অপু শেষ বিকেলে মায়ের মনিবের বাসার নিচের ছোট্ট কুঠুরির জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে, তখন সমস্ত চরাচর সমেত আর অন্তর জুড়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি তৈরি হয়। এক প্রগাঢ় শূন্যতা অপুর মনে, কিংবা অপুর পাঠকের মনে, বিরাজ করে। শূন্যতার সেই আপাত নিরর্থকতার মধ্যে নানাবিধ সম্পর্করাজি মাথায় খেলা করে–অপুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক, মারা যাওয়া দিদির সম্পর্ক, ফেলে আসা নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে সম্পর্ক, এমনকি আমার সঙ্গে অপুর সম্পর্ক। হয়তো সম্পর্ক মানে নিরন্তর স্মৃতির উৎপাদন, স্মৃতির সঙ্গে অবিরত বোঝাপড়া করতে থাকা, কিংবা হয়তো বোধগম্য স্মৃতি-উৎস আবিষ্কার করে চলা। কিন্তু সম্পর্ক পর্যালোচনায় আমি যে ব্যস্ত ছিলাম না তা দিব্যি মনে আছে। বরং এক ভারী অনুভূতি পুষে রাখতাম কোথাও; জগতের দিকে তাকাতাম সেই ভার সমেত। শেষ বিকেলের অপু একটা উদাহরণ মাত্র। সাহিত্য ও যাপিত জীবনের এরকম অজস্র ভার তখন কাঙ্ক্ষিত ছিল। বহন যেহেতু ঐচ্ছিক, তাই ভারটাও কাঙ্ক্ষিত। এতকাল পরে এই আমার উপলব্ধি, ফয়সালা।

এরকম একটা বক্তব্য দেয়া সম্ভব হলো কারণ সম্পর্ক নিয়ে নানান রকম অভিমানাত্মক অনুভূতি আমি মোকাবিলা করতেই চেয়েছি। এটা উত্তরকালের অনুশীলন। আদৌ এই মোকাবিলার মাধ্যমে আর কোনো ভার আমার সৃষ্ট হয় কিনা, নাকি ভার হচ্ছে যাপনের একটা অবশ্যম্ভাবী সহগ–সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিজ্ঞাসা। আমি মনে করতে পারি ইচ্ছাকৃত অভিবাসী সাবেক শিক্ষার্থীরা মাঝে মধ্যেই জানান 'দেশ' নিয়ে তাঁদের হাহাকারের কথা। হয়তো 'দেশ' নিয়ে, হয়তো কতগুলো চেনা পরিসর নিয়ে, কতগুলো মানুষের অনেকদিন-ধরে-দেখা মুখ আর তার অভিব্যক্তি নিয়ে, হয়তো নানান কথামালা নিয়ে। কিংবা আসলেই হয়তো কিছু খাবার আর মৌসুমী ফল নিয়ে, বাংলাদেশের ঋতু নিয়ে, যেমনটা তাঁরা প্রায়শই বলে থাকেন। আবার হতে পারে এসবের বাইরে 'দেশ' বলে আসলেই কিছু নেই। কিন্তু কখনোই তাঁদের এসব হাহাকারের সঙ্গে মানানসই করুণ উত্তর আমার করা হয়ে ওঠে না। আমি বলে বসি 'বাংলাদেশে আসতে তো ভিসা লাগে না। চলে আসুন।' কিন্তু এই একই কথা তাঁদেরকে বলা সম্ভব নয় যাঁরা ঢাকা শহরের প্রান্তিকতা থেকে বের হতে পাড়ি জমিয়েছেন। একটা অবধারিত খান্দানের মধ্যে বড় হননি যাঁরা। আমার এরকম

খসখসে একটা উত্তরের কারণে ওই প্রান্তের মানুষটি আহত হন হয়তো। কখনো আহত হন, কখনো ক্ষুণ্ন হন, কখনো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এবং বলতে শুরু করেন জীবনযাপনের এমন সব ব্যবস্থাপনা-সঙ্কটের কথা যা শুনলে শ্রোতামাত্রই তাঁর বিদেশবাসের পক্ষে থাকবেন। ফলে আমার তরফে চ্যালেঞ্জটুকু বড়জোর সেন্টিমেন্টালিটি থেকে প্রবাসী সেই মানুষটিকে সরিয়ে নিয়ে আসে। আমার প্রতি তাঁর ক্ষোভের কাছে তখন 'দেশ' নিয়ে হাহাকারটুকু ম্লান হয়ে যায়।

প্রায়শই বলা হয়ে থাকে মহানগরের সম্পর্কগুলো শুকনো ধরনের আর মফস্বল কিংবা গ্রামের সম্পর্কগুলো অনেক আন্তরিক। এই ধারণাটা প্রায় একটা তাত্ত্বিক কাঠামোর মতো দাঁড়িয়ে গেছে। নানান রকম সাহিত্য আর চলচ্চিত্রে তো বটেই, এমনকি সাধারণ আলাপ-আলোচনাতেও এটা একটা প্রতিষ্ঠিত ধারণা। সম্পর্কের গভীরতা কিংবা যাকে আন্তরিকতা বলা হয়ে থাকে তার এরকম সরল স্থানিক মানচিত্র নিয়ে প্রশ্ন করা দরকার। নগর আর মফস্বল বা গ্রামের সম্পর্ক অনুশীলনের শর্তগুলো স্বতন্ত্র, পরিপার্শ্ব স্বতন্ত্র, মানুষের চলাচলের গতি স্বতন্ত্র। সর্বোপরি নগর আর মফস্বলের সম্পদের প্রকৃতি আর তার ব্যবস্থাপনা খুব ভিন্ন জিনিস। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝবার জন্য এই ভিন্নতাগুলো আমলে আনা খুব জরুরি বলে বিবেচনা করি আমি। আন্তরিক আর অনান্তরিকতার মূল্যায়ন, নইলে, এক ধরনের আবেগাচ্ছন্ন বিচার মাত্র। বাস্তবতা নয় কিছুতেই। আন্তরিক আর শুকনো—এই দুইভাবে দেখার সঙ্গে স্বার্থের প্রসঙ্গটাও জড়িত। নগরের সম্পর্ক নিয়ে যে অভিযোগটা করা হয়ে থাকে তার মূল জায়গা হলো এখানে সম্পর্ক স্বার্থসংশ্লিষ্ট। এবং 'স্বার্থ' যেন কিছুতেই থাকতে নেই।

সাহিত্যে এবং পাবলিক ডিসকোর্সে 'নিঃস্বার্থ' সম্পর্ককে গাঢ় ভক্তিভাবে এমন মূল্যায়ন করা হতে থাকে যে 'স্বার্থ' প্রসঙ্গটা নিয়ে কোনোরকম আলাপ করা 'নীচতা' আর 'হীনতার' পরিচায়ক হয়ে পড়তে বাধ্য। 'স্বার্থ' ধারণাটিকে একটা একপেশে লোভ হিসেবে দেখা হয়। আমার বক্তব্য এই নয় যে সম্পর্কের মধ্যে এরকম একপেশে সব অনুশীলন থাকে না কিংবা বাস্তবিকই মানুষের নানাবিধ লোভ কাজ করে না। কিন্তু নিঃস্বার্থ সম্পর্কের অনুসন্ধান কিংবা জয়গান রাজনৈতিক দিক থেকে আমার নিরর্থক মনে হয়। স্বার্থই তো সম্পর্কের মুখ্য চাবিকাঠি। তাই হবার কথা। মানুষের সমাজের ইতিহাসও সেদিকেই স্বাক্ষ্য দেয়। বাংলাতে স্বার্থ কথাটার মানে ক্রমাগত নেতিবাচক দাঁড়িয়েছে। এখন যেভাবে এটা প্রযুক্ত হয়, সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো বটেই, তা হচ্ছে 'ফায়দা লোটার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায়' বা এরকম কিছু। এই কথাটি বলার সময়ে মনে পড়ছে ইংরেজিতে যাকে 'ইন্টেরেস্ট' বলা হয় তার অর্থ এতটা বিচারমূলক নয়। 'নিঃস্বার্থ' সম্পর্কের জয়গানের সাথে সম্পর্কিত করেই দেখা সম্ভব 'নিষ্কাম' সম্পর্কের বিষয়টিকেও। যৌন-পরিমণ্ডল যে আমাদের একটা অব-

ধারিত বাস্তবতা, সেটা যে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান– সেগুলো লক্ষ্য করার জন্য আলাদা করে গবেষণা করার দরকার পড়ে না। তবুও নিষ্কাম সম্পর্ককে অধিকতর মর্যাদা দিয়ে দেখার চল আছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা নানাবিধ সকাম লক্ষণকে কুণ্ঠিত করে রাখে। একটা লুকোচুরির প্রচেষ্টা ছাড়া সংশ্লিষ্টদের পক্ষে বিবিধ কিছু ভাবা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

'কাঙক্ষা', 'স্বার্থ', 'কামনা' এসব অনুভূতিকে কিংবা অনুশীলনকে আমি এক পংক্তিতে রাখবার পক্ষপাতী। যদি 'কাঙক্ষা'ই না থাকে তাহলে সম্পর্কের কী থাকে! কিংবা যদি চলমান সম্পর্ক থেকে কাঙক্ষা অপসৃত হয়ে পড়ে তাহলে? কোনো নিয়ামক ছাড়া মনুষ্য-সম্পর্ককে অনুধাবন করা যাবে কীভাবে! মনুষ্য সঙ্গের কাঙক্ষা আসলে ঠিক কোথায় কীভাবে কাজ করে তার একটা ধরন চিহ্নিত করা খুব কঠিন। কিন্তু সঙ্গ-লিপ্সা মানুষের খুব নৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য। এই লিপ্সাই প্রায় বেঁচে থাকা। এই লিপ্সার অনুপস্থিতি মৃত্যু। প্রায়শই আশপাশের মানুষজনকে বলতে শুনি 'কথা বলার মানুষ নেই।' কিংবা 'মন খুলে কথা বলার জন্যও তো কাউকে দরকার।' পারিবারিক, বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে তো বলা হয়ই, সাধারণভাবে যাকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলা হয়ে থাকে তার মধ্যেও আকছার এই বেদনাবিধুর আকাঙক্ষাটি ব্যক্ত হতে থাকে। তাহলে বলাবলির সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, লিপ্সার সম্বন্ধটি কী? ভাষালীলার বাইরে আদৌ কি লিপ্সা কোথাও অস্তিত্বমান? কথা বলবার জন্য আপনি 'কাউকে' খুঁজছেন। এখানে 'কেউ'টি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোন আপনার কথা বলবার আকাঙক্ষাটিই কি আরও প্রাথমিক, আরও নিয়ামক নয়? তাহলে আপনি এখানে কারণ, 'কেউ'টি উপলক্ষ বা উছিলা। একটু সরল হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও বলা যায় এরকম অজস্র উছিলার সামনে অস্তিত্বমান থাকেন একেকজন মানুষ। তাঁর সেই নিজের অস্তিত্বমানতাই এখানে মুখ্য। তিনি অন্যের সঙ্গে ভাষালীলা সম্পর্কিত হন তাঁর নিজেরই কারণে। কাঙক্ষা এখানে খোদ তিনি নিজেই।

পারিবারিক সম্পর্কের নানাবিধ বন্ধন ও মমত্ববোধের গল্প বলা হতে থাকে, কিন্তু টানাপড়েন ও ক্রুরতা নিয়ে আলাপ হবার চল কম। ধরাই হয়ে থাকে বন্ধনের প্রগাঢ়তা স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার সমূহে বেশি। এরকমভাবে পাবলিক আলাপ-আলোচনা হবার রেয়াজ আছে। কায়িক পরিশ্রমের প্রলেতারিয় শ্রেণীর মানুষজনের পরিবারে সেসব বন্ধন কাজ করে বলে শহরের স্বচ্ছলরা খুব একটা ভাবেন না। অন্য শ্রেণীর জীবন উপলব্ধি করা অবশ্যই দুরূহ, এমনকি মোটামুটি সমধর্মী পরিবারগুলোর মধ্যেই স্থানান্তর-করা পরিবার সমূহ এবং স্থিত পরিবারগুলোর মধ্যে বাস্তবতা আর অনুশীলনের বিস্তর ফারাক। ধরা যাক, যেসব পরিবার বহুদিন ধরে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত; এবং যেসব পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য পেশাগত সমৃদ্ধির জন্য ঢাকা শহরে কিংবা অন্যত্র যাচ্ছেন এবং দীর্ঘকাল

থাকছেন। কিংবা সেই সূত্র ধরেই ঢাকায় আরেকটা প্রজন্মের থাকাথাকি শুরু হয়ে গেল। এই দুই ধরনের পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক টান, যদি থাকে, প্রকাশের ভাষা আলাদা, মাধ্যম বা উপায় আলাদা, এর বহিঃস্থ আচরণবিধি আলাদা। একটা ডাক চিঠির জন্য দু'তিন বার পোস্ট অফিসে কিংবা পিয়নের কাছে খোঁজ লাগানোর বিশেষত্ব ঢাকায় একান্নবর্তী কিংবা নিউক্লিয়ার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে অনুধাবন কঠিন। ডাকঘর একটা কথার কথা। পত্রলিখন বিলুপ্তপ্রায় একটা অনুশীলন শহরে। ঠিক এতটাই নয় কিন্তু শহরের পরিসরের বাইরে। কিংবা স্বচ্ছল পরিবারগুলোর বাইরে। এখনো।

পারিবারিক সম্পর্কের তুলনায় 'বন্ধুত্বের' সম্পর্কগুলো অনেক জটিল, অনেক পরিব্যাপ্ত। বিদ্যাজগতে পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে যত অনায়াসে বর্গীকরণ করা সম্ভব কিছুতেই তা 'বন্ধুত্ব' নিয়ে সম্ভব না। একটা পরিমাপযোগ্য, অন্যটি অনন্ত। এত অজস্র ধরনকে, অনুশীলনকে 'বন্ধুত্ব' নামে ডেকে ফেলা হয় যে তার কোনো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ্যাকাডেমিতে বন্ধুত্ব নিয়ে অনুধাবন যতটাই বিরল এবং দুরূহ, পাবলিক আলাপে ততটাই প্রবল। প্রায় যে কোনো আড্ডাতেই এক বা দুইজন আগ্রহী বক্তা পাওয়া সম্ভব যাঁরা বন্ধুত্ব নিয়ে তত্ত্ব তৈরি করছেন। চমকপ্রদ হলো সেসব অনুসিদ্ধান্তের একটি অন্যটির সঙ্গে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, রীতিমত বৈরিতামূলক।

বন্ধুত্ব নিয়ে আমার কোনো ডগমা্যা বা নীতিবাদী অবস্থান নেই। চলতি ভাষায় যাকে নৈর্লিপ্তি বলা হয় তা আছে আপাতগ্রাহ্যে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু একটা বিবরণী দিতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি মানেই এই প্রসঙ্গে নৈর্লিপ্তির দাবি অসঙ্গত। বরং এটা একটা পরিস্থিতি। যাঁদের সঙ্গে আমি একটা কাঠামোর মধ্যে ঐচ্ছিক বা ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে সম্পর্কিত তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নাকি শত্রুত্ব সেটা কিছুতেই সবচেয়ে জরুরি জিজ্ঞাসা মনে হয় না আমার। এমনকি এই বিষয়ে ফয়সালা করে ফেলতে হবে এমন কোনো তাগিদও আমি টের পাই না। বন্ধুত্ব আর শত্রুত্ব নিয়ে আমার এই অমীমাংসার চল কেবল আমার প্রান্তে নয়, আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, দ্বিতীয় প্রান্তেও সমান সচল থাকে। এমনকি তৃতীয়পক্ষেও, যিনি বা যাঁরা আমাকে বন্ধুত্বে/শত্রুত্বে দেখেন। শর্তসাপেক্ষে যুক্ত থাকা যখন হকিকত, তখন হয়তো 'বন্ধুত্ব' বা 'শত্রুত্ব' আদৌ কোনো প্রসঙ্গই নয়। আগেই বলেছি, হাজার রকম চর্চাকে 'বন্ধুত্ব' বলা হয়ে থাকে। তারপরও আকর দিক বিবেচনায় যাকে অন্যেরা বন্ধুত্ব বলে থাকেন, আমি সেটা অনেকের সঙ্গেই অনুভব করি না। ক্রমাগত বয়স্ক কালে আমি বুঝি যে কথিত বন্ধুত্ব কারো সঙ্গেই আমি টের পাই না। হয়তো অন্যরাও টের পান না; নাহলে তো নিশ্চয়ই বলতেন। বা মানানসই কোনো আচরণ, ক্রিয়াদি আমরা পালন করতাম। আবার শিথিল তালিকার সেসব মানুষেরা যে অবন্ধু এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াও

আমার হয়ে ওঠে না। পরস্পর শত্রুত্ব ঘোষণাও না করে থাকি আমরা। ফলতঃ এক সংজ্ঞাহীন সম্পর্কে থেকে যাই আমরা, বন্ধুশাস্ত্র অনুযায়ী। বন্ধুত্ব আর শত্রুত্বের মাঝে নিরপেক্ষ এক পরিসর আছে কি? আবার তারই মধ্যে কারো কারো সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা, কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো, দেখা দিতে থাকে। বন্ধুত্ব তাই আমার কাছে, আমার জন্য অস্পষ্ট এক ধারণা/অনুশীলন, অহেতুও। এসব সমেতই কিন্তু মানুষজনকে আকছার বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকি, কিংবা অন্যেরা আমাকে থাকেন।

যেসব প্রিমাইজ বা পূর্বানুমানের উপর বন্ধুত্ব দাঁড়ানো সেগুলোকে সন্দেহ করা, প্রশ্ন করা বেশি জরুরি লাগে আমার, খোদ 'বন্ধুত্ব' চর্চার চেয়েও। প্রিমাইজগুলো সাহিত্যে সচল, এমনকি পাবলিক জবানে, আইডিয়ায় আর মর‍্যালে। বন্ধুত্ব নিয়ে, সাধারণভাবে সম্পর্ক নিয়ে, এগুলো রেটরিক/বাগাড়ম্বর। মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে বন্ধুত্ব হচ্ছে সফলদের কিংবা 'সফল' এবং 'সাফল্যকামী'দের একটা মিথোজীবী নেটওয়ার্ক। একজন অন্যজনে প্রবিষ্ট আছেন বিশেষ ব্যবসাক্ষেত্রে, কিংবা ব্যবসা-কালীন 'হাইহ্যালো' পানাহারে। এইসব সম্পর্করাজির শব্দমালা লিপিবদ্ধ করতে পারলে চিত্তাকর্ষক হবে। যে ভাষারাজ্যে এই বন্ধুত্ব বিরাজমান তা নিয়ে অসীম আগ্রহ আমার। সনাতনী সামাজিক বিজ্ঞানের বিবরণীমূলক সম্পর্ক অন্বেষণ আর এই আগ্রহ মৌলিকভাবে আলাদা।

আমরা উচ্চারণ করি, তাই আমরা সম্পর্কিত। আমরা পরস্পর ভাষালীলা করি, তাই আমরা সম্পর্কিত। আমার ভাষার শরীরে আপনি স্থান পান, তাই আমরা সম্পর্কিত। আমার ভাষা পরিশেষে আমারই এক উৎসব, তাও আমরা সম্পর্কিত। আপনার অনুপস্থিতি এই উৎসবকে অনস্তিত্বমান করে তোলে। এই আমার স্বার্থ।

উত্তরা, ঢাকা: ১৮ই জুলাই ২০১১

কালের খেয়া, দৈনিক সমকাল, ২২শে জুলাই ২০১১

মানস চৌধুরী

কায়ামন: প্রেম, ভালোবাসা, যৌনতা, অধিকল্পনা

Rabindranath Tagore

এক।

আমার বন্ধুটি কেবল সাহিত্যের ছাত্রই নয়, রীতিমতো রোমান্টিক। এমনিতেই ইংরেজিতে পড়া লোকজনকে ‘সাহিত্যের ছাত্র’ বললে অনেকেই নাখোশ হন। তাঁদেরকে লিটেরেচারের স্টুডেন্ট বলতে হয়। এমনকি ইদানীং তাতেও কুলায় না। বলতে হয় ইংলিশে পড়ে। সাহিত্য বা লিটেরেচার পড়ার চেয়েও তামাম বাংলাদেশে কী জানি একটা বিষয় ঘটেছে। কিন্তু সেটা মূল বিষয় নয়। আমার বন্ধুটি, হয়তো ২০-২৫ বছর আগের ঘটনা বলেই, সাহিত্যের ছাত্র পরিচয়ে গৌরব বোধ করতেন। আর বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে তাঁর অসীম আগ্রহ ও ভক্তি বলবৎ ছিল। এতে করেও পুরোটা বোঝানো গেল না। পুলকিত হতেন যেসব ইংরেজি বাণী পড়ে সেগুলো বাংলা অনুভূতিতে হৃদয়ঙ্গম করবার একটা দারুণ আকুতিও কাজ করত তাঁর মনে।

ফলে মুখে মুখে দু'চার পঙক্তি তর্জমা করার একটা অনুশীলন তাঁর ছিল। এই কাজটাতে তাঁর একজন সঙ্গী ছিলাম আমি। আমাদের মধ্যরাত্রিকালীন আড্ডা-গুলোর অন্যতম একটা কাজ ছিল এটা। খেলার মতোই। আবার দুজন মিলে একটা আত্মমগ্নতা। নিজেদের খেয়াল-খুশি আর তথাকথিত সৃজনশীলতার একটা অন্তরঙ্গ উদযাপন। হয়তো অহমিকাও। কিন্তু ওই বয়সে সেটা দারুণ উত্তেজনাকর ছিল।

এই কাহিনী প্রায় শিবের গীতের মতোই এল। আসলে বন্ধুটিকে মনে পড়ছে কেবলমাত্র করুণ রসাত্মক প্রেম করবার (বা না করবার) তাঁর দুর্দান্ত সামর্থ্যের কারণেই নয় কেবল, বরং রোম্যান্টিক যুগের কবি জন কীটসের একটা চরণ মনে করতে গিয়ে। চরণখানি ওরকম কোনো মধ্যরাতে সেই আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল। খালি চরণ নয়, আস্ত কবিতাখানিই পড়ে শুনিয়েছিল। এত বছর পর যদ্দুর মনে পড়ে সেটা ছিল 'ওডস অন আ গ্রেশান আর্ন'। ভুলভাল থাকলে তা একান্ত আমার বিমুগ্ধতায় ভাঁটা পড়বার কারণে। কিন্তু দীর্ঘ ওই কবিতাটির মধ্যে, গাঢ় বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অন্ধকারে ডুবে থেকে, যে চরণখানি আমাদের দুজনকেই বাড়াবাড়ি আপ্লুত করে দিল তা হচ্ছে 'হার্ড টিউনস আর সুইট, বাট দোজ আনহার্ড আর সুইটার'। আমার বন্ধুটি তখন তার নবাগত যৌবনে, সাহিত্য ও সঙ্গীতের নানাবিধ কষ্টার্জিত নান্দনিক বোধ সমেত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'আধুনিক' ললিত ও শিল্পকলায় স্নাত হয়ে, এক সহপাঠিনীর প্রেমে নিপতিত। নেহায়েৎ নৈমিত্তিক নিপতন। বহু বছর আগের ক্যাম্পাসেও লোকজন এরকম পতনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আগামী দিনের ক্যাম্পাসে, বা বাইরেও, এরকম অজস্র পতন সমেত জগৎসংসার চলমান থাকবে। কিন্তু কীভাবে যেন আমার বন্ধুটি এই নৈমিত্তিক ঘটনাকে গাঢ় একটা ভঙ্গি দিতে পেরেছিল। দিনের পর দিন তার এই নিপতন খোদ তাকে এমন গম্ভীর, ও প্রায় বিষণ্ন, করে তুলেছিল যে তার সঙ্গে আটপৌরে কোনো যোগাযোগ করা দুঃসাহসের কাজ ছিল লোকজনের জন্য। তার সহপাঠীদের সিংহভাগই সেই চেষ্টা বিশেষ করতও না। বরং তার সঙ্গে মূলত ভারীমনস্ক যোগাযোগই তারা করত। আমি ছিলাম একটু কনিষ্ঠ, অসাহিত্যের ছাত্র, এবং মূলত রাত্রিকালীন সহচর। ফলে তার ওই গম্ভীর-বিষণ্ন ভঙ্গি অন্য যে কারো তুলনায় আমার অবলোকন করতে হতো বেশি। আমি কিছুতেই একটা ন্যায্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারতাম না যে কেন প্রেমে নিপতন গাম্ভীর্য ও বিষাদের ফলাফল বয়ে আনতে পারে কারো জীবনে (বা হৃদয়ে)। কিন্তু এ নিয়ে বিশদ আলাপও আমি করতে চাইতাম না ওর সঙ্গে। কারণ আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে দীর্ঘ একটা আলাপে আমার সেই ফয়সালাতেই পুনরায় পৌঁছাতে হবে যে 'প্রেম হচ্ছে নিজের বিয়ের ঘটকালি নিজে করা'। তার প্রেমকে একটা 'বিফল প্রেম' হিসেবে গোড়াতেই ধরে নিয়ে বন্ধুটি তার মনের প্রেমরাজ্যে বিরাজ করছে। আর 'বিফল প্রেম'-কে যদি ভেঙে অর্থোদ্ধার করার প্রচেষ্টা করি তাহলে সেটা দাঁড়াবে

‘পরিবারের না-মানা’ কিংবা ‘বিয়ে না হওয়া’ ইত্যাদি। এরকম সরল মানেতে মহৎ প্রেমের পর্যবসন সাহিত্যানুরাগী আমার বন্ধুটিরও প্রাণে সইতো না, আমি নিশ্চিত। আর বাকি থাকে খোদ নায়িকারই ‘নারাজ’ হওয়া বা থাকা। তবে আমি নিশ্চিত অন্য অনেক নান্দনিক মানুষের মতোই তার নায়িকার ‘নারাজ’ হবার চেয়েও ‘দ্বিধা-শঙ্কা-অস্পষ্টতা’ই প্রধান ছিল।

তো, এই অংশটাও প্রায় শিবের গীতই হলো। আসলে ওই মধ্যরাতের আবৃত্তি পর্বের মধ্যে বন্ধুটির গম্ভীর মনোজগত, সাহিত্য ও ললিতকলার প্রতি অনুরাগ, আমাদের দুজনের আড্ডার গভীরতা – এর সবই ওই রাতের পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছিল। এ সময়ে কীটসের ওই পঙক্তিখানি একেবারে বিশেষ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। ‘হার্ড টিউনস আর সুইট, বাট দোজ আনহার্ড আর সুইটার’। আমরা দুজনে অনুবাদ করে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম: ‘শ্রুত সুর মধুর, অশ্রুত আরও’। যে মিলন কখনো ঘটবে না সাব্যস্ত করে সেই ফয়সালাকেই সৌধের মতো লালন করছিল আমার বন্ধুটি; সেই ফয়সালার সৌধটাকেই প্রেম হিসেবে আবিষ্কার করছিল সে; আর সৌধটাকে বন্দনা করেই প্রেমের মহত্ত্বে গম্ভীর হয়ে পড়ছিল সে। হয়তো চারপাশের বহু মানুষই এভাবেই জগতের প্রেমকে লালন করেন, প্রেমের জগতে বসবাস করেন। হয়তো, সেই রাত্রিটিতে সৌধটি আবারও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই উদ্ভাস কীটসের একটি অভিব্যক্তি বাংলানুভূতিতে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করে পুলকিত ও ব্যথিত হই আমরা। আমি একভাবে, বন্ধুটি অন্যভাবে।

দুই।

আমরা ছোট সেই টিলাটির উপর যখন বসি তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঠিক ওই সময়ে নতুন করে বসতে যাওয়া একা-একা কখনোই হতো না। এমনকি একা একা ওই টিলা বা পাহাড়টিতে চড়তে যাওয়াও হতো না। আমার নবপরিচিত বন্ধুনীটি দুদিন আগেই এই সান্ধ্যভ্রমণটি পরিকল্পনা করেছিল, প্রস্তাব করেছিল। তখন সদ্যোপরিচয় ও নিবিড় আকর্ষণের উত্তেজনায় রাতভর ভজন শুনবার কোনো নিমন্ত্রণ জানালেও রাজি হবার সম্ভাবনা ছিল। আর এটা তার থেকে অনেক আকর্ষণীয়। প্রস্তাব হলো, সন্ধ্যার আগে তার স্কুটিতে চেপে শহরের বাইরে কোথাও যাব, সেখানে একটা পাহাড়ে বসে সন্ধ্যা হওয়া দেখব, চুপচাপ বসে থাকব, কোনো একটা পানীয় সমেত, তারপর গাঢ় অন্ধকার নামলে আমরাও পাহাড় থেকে নেমে চলে আসব। এরকম একটা প্রস্তাবের সকল উপাদানই বাহুল্য, কেবল সহযাত্রাই নিজগুণে লোভনীয়। তার মধ্যে চুপচাপ থাকার পরিকল্পনাটি বিশেষভাবে বাহুল্য। অন্যদেশে অন্যভাষী সেই বন্ধুনী দোর্দণ্ডপ্রতাপে ইংরেজি বলেন, বলবারই কথা। আমি ততটাই ঢ্যাবসা-ভাবে এক দুই ভাঙা বাক্যে কাজ চালাই। ফলে আমাদের দুজনের বাক্যালাপে অধিক

-ক্ষণ চুপচাপ থাকাই দুজনের জন্য অধিকতর আকর্ষণীয় ও নিরাপদ ছিল। কিন্তু তার প্রস্তাব আমার ভাষাদক্ষতার চেয়েও রাত্রির আগমন-গাম্ভীর্যের কারণে বলেই আমার মনে হয়েছে।

এই প্রথম কোনো নারী সারথির সঙ্গে বাইকারোহণ আমার। কিন্তু সেটা কেবল নয়। প্রস্তাবিত বিকেলটা আসবার আগের দুদিন কোনোমতেই জগতে সচল ছিল না। কোনো প্রহরই যেন কাটে না। সেটা সেলফোনের কাল না। থাকলে এই অপেক্ষার গুরুভার সৌন্দর্য সম্ভবত খানিক ফিকে হয়ে যেত। বিকেলটাতে এই অশ্বারোহী আমাকে যেখান থেকে হরণ করবার কথা সেখানে আমি বসে অপেক্ষাও করলাম অপ্রয়োজনীয় রকম আগেভাগে। সে এল অবশ্য স্বাভাবিক সময়েই। তারপর আমাকে জানতে চাইল আমি তৈরি কিনা। আমার আর ইংরেজি দক্ষতা দিয়ে পুরোপুরি বোঝানো হলো না যে কী নিবিড়ভাবে আমি তৈরি। আমি মাথা নেড়ে তার বাইকের পিছনে একটা পোঁটলা হাতে বসে পড়লাম। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পেরুলাম। তারপর শহরের লোকালয়। বাতাসে তার চুলগুলো আমার মুখ ঢেকে দিচ্ছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই অধিকাংশ সময়েই অনাহূত এই চুল বিরক্তি তৈরি করত। অথচ সেই বিকেলে চুলগুলো আমি কাঙ্ক্ষাই করে গেলাম। এমনকি যখন তা আমার মুখে এসে পড়ছে না, তখন তা আমি মনে মনে আমন্ত্রণ করতেও থাকলাম। বন্ধুনীটি অবশ্য এই চুলের জন্য মানানসই দুঃখপ্রকাশ করে রাখলেন। কিন্তু এও আমি নিশ্চিত যে তার সামান্যই সন্দেহ ছিল আমার উচ্ছ্বাস নিয়ে। হয়তো সে নিজেও খুশি ছিল যে হেলমেট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা জারি করবার জন্য পুলিশরা সেই শহরে টহল দেয় না।

এই রাস্তাটা অনন্ত হলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। আমরা ছোট্ট পাহাড়টির চূড়ার কিছু আগেই স্কুটিটি রাখি। তারপর হেঁটে হেঁটে আরও উঁচুতে গিয়ে বসি। পোঁটলা থেকে পানীয় বের করে গিলি। কথা প্রায় বলিই না। কথার বিশেষ দরকারও নেই। পাশাপাশি বসে বিলীয়মান আলোটাকে পশ্চিম আকাশে দেখতে থাকি। কিংবা আলো দেখাটা নিমিত্ত মাত্র। ওই বিলীয়মান আলোর মধ্যে গাঢ় অন্ধকারের আবির্ভাবকে দেখি। কিংবা দেখি খোদ আমাদেরকে। আমাদের দারুণ জলজ এক জীবনকে। পাশাপাশি বসে-থাকাকে। অল্প কয়েক ঘণ্টা পরেরই আমাদের সূচিনিষ্ঠ জীবনের প্রতি আমাদের আলতো প্রত্যাখ্যানকে। কিংবা এসবের কিছুকেই না। আমরা কিছুই না-দেখার এক মায়াবী সান্নিধ্যকে লালন করি। তারপর অন্ধকার আরও গাঢ় হলে আমাদের বসে-থাকার কোনো অছিলাই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন আমরা ফিরব বলে সাব্যস্ত করি। কে প্রথম ফিরবার ডাক দিই তা আর মনে পড়ে না। কিন্তু আমি আবারও নিশ্চিত, আমাদের দুজনের যেই সেটা করে থাকুক না কেন সেটা খুব দুরূহ ডাক ছিল। কিন্তু ফিরবার প্রাক্কালে আমার ভাঙা ইংরেজিতে আর বন্ধুনীর চোস্ত ইংরেজিতে আমরা ঠিক করি পরের কোনো বর্ষা কিংবা শীতে

আমরা রাত্রিকালীন বাসে করে লোনাভালা যাব। আমরা দু'তিন দিন লোনাভালা থাকব। লোনাভালার দারুণ বৃষ্টি, দারুণ মায়াবী বৃক্ষরাজি আর নিসর্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এল। কিন্তু আমার মনে হলো লোনাভালা যদি প্রখর মরুভূমিও হতো তাও একই রকম উত্তেজনাকর প্রস্তাব মনে হতো আমার।

বিস্ময়ের না যে ওই শীত কিংবা বর্ষাটি আর কখনো আসেনি। আমাদের যুগলযাত্রাটিও হয়নি। এমন নয় যে আমি চাইনি, হয়তো এমনও নয় যে ওই বন্ধুনীটিও চাননি। কিন্তু নিছকই নানাবিধ ঘটনাচক্রীয় বিষয়াদি যেমন আমাদের জীবনে ঘটে এটা সেরকমই একটা বিষয়। এমনও হতে পারে সেদিনের সেই অনাগত রাত্রির পাহাড়চূড়াতে আমাদের কল্পিত সেই সহযাত্রার যে মায়াবী অর্থ, যে মাহাত্ম্য ছিল ওই পাহাড় থেকে নেমে এলে, নৈমিত্তিক জীবনে সেই অর্থই আর অবশিষ্ট ছিল না। হতে পারে। কিন্তু না-যাওয়া সেই লোনাভালা একটা অস্পষ্ট দূরাগত স্মারকের মতো রয়ে গেছে। যেন এক এপিটাফীয় ঘোষণা তার। যেন তা আমৃত্যু রয়ে যাবে। সহযাত্রাটি ঘটে গেলে আর পাঁচটা ঘটনার মধ্যে আদৌ স্মৃত হতো কিনা সন্দেহ।

তিন।

কিন্তু প্রেম কি ভাঙে? নাকি প্রেম অবিনশ্বর, ভাঙে কেবল শর্ত কিংবা ক্রিয়াসূচি? কল্পনা আর অধিকল্পনার বাইরে প্রেম আদৌ কোনো সার্বভৌম অনুভূতি কি? কিংবা ক্রিয়া? প্রেমকে অনুভূতি হিসেবে কম বিবেচনা করে ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করলে অনেক গম্ভীর মানুষই মনোকষ্ট পান দেখি। আবার ক্রিয়ার বাইরে অভিব্যক্তির আধার কীইবা আছে? আবার প্রেমসংক্রান্ত ক্রিয়াগুলোর তালিকা বানালে সেই তালিকা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না। আমার এই বক্তব্য নিয়ে যাঁদের সংশয় আছে তাঁরা নিজেরাই প্রেমসংক্রান্ত ক্রিয়াগুলোর একটা তালিকা নিজেরাই বানাবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। দুয়েকটি ইন্দ্রিয়ময় এলাকা ছাড়া কোনো ক্রিয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা মুস্কিল হবে। এমনকি এক বাইকে চড়ে যাওয়া কিংবা কীটসের একটা পঙক্তি বাংলাকরণ করাও। তাহলে থাকে অনুভূতির জগতে ভরসা করা। তাতে বিপদ একটুও কমে না। যদি অনুভূতির জগৎই এত মুখ্য হবে তাহলে অপ্রাপ্তির কী এমন বেদনা তৈরি হয় যাতে বিষাদের পদাবলী রচিত হতে থাকে। নিজ অনুভূতি রাজ্যে রাজা কিংবা রানী হয়ে বসে থাকতে কে বাধা দিচ্ছে! এক অজস্র আনন্দরাজ্যেই তো তাহলে বসবাস করা যায়। তাছাড়া 'ভাঙা প্রেম' প্রসঙ্গটিই তো তখন আর আসে না। ভাঙার উপলব্ধি সম্ভাব্য ঘটমানতার ছেদেই কেবল জন্মে। কিংবা কাঙ্ক্ষিত ঘটনাবলীর। নিজ রাজ্য থেকে বাইরে এসে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না করলে কোনো কিছুই তো ভাঙে না। সকল অটুট অনুভূতির একান্ত মালিক হয়ে থাকা যায়।

গহীন কোনো মনোরাজ্যে একটা সুর আছে আপনার। সুরটা আপনি ছুঁয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঠিক আকারটা দিতে পারেন না। কিন্তু আপনার অজস্র সংগ্রহের মধ্যে কোথাও সেই সুরলিপিটা আছে। ধরা যাক সাবেকী একটা রেকর্ডের চাকতিতে অজস্র বৃত্তাকারে সেই সুরটা আঁকা। আর আপনি অনেক খোঁজাখুঁজি শেষে রেকর্ডটা পেয়েও গেলেন। তারপর বাজাতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন রেকর্ডটার সুরলিপি ভাঙা। ওটা আর সেই সুরটা আস্ত বাজাতে পারে না। নিবিড় আকাঙ্ক্ষা আর অবসাদে রেকর্ডটা নিয়ে বসেই রইলেন। মনে মনে সেই সুরটাই সংগঠিত করতে চাইলেন, জড়ো করতে চাইলেন যা আসলে আর আপনি পারেন না। সুরটা পুরোটা দানা বাঁধছে না। সুরটা পুরোটা দানা বাঁধলে তো আর সারাদিন ধরে রেকর্ডটা না খুঁজলেও চলত। রেকর্ড খুঁজে পাবার পরেও খোঁজা আর আপনার শেষ হলো না। রেকর্ডটা ভালো থাকলেই আপনার এই অনুসন্ধান আর অসীম হতো না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৩

কালের খেয়া, দৈনিক সমকাল, ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৩

মানস চৌধুরী

বেযোগাযোগ: কী ফারাক বন্ধু কিংবা প্রতিবন্ধুতে?

Rabindranath Tagore

প্রথম উপলব্ধি দ্বিতীয় মৃত্যুর পর!

বিপুল যখন মারা যায় তখন আমি পাঁচের কাছাকাছি। বড়দের কাছে শুনেছি ও গোদ রোগে মারা গেছিল। কেউ একজন মরে গেলে তার বা আশপাশের মানুষের কী হয় সে বিষয়ে বাস্তবে কোনোরকম ভাবনা গড়ে ওঠেনি। মানুষজনের থমথমে মুখ দেখেছি। তাছাড়া পরে বিপুলকে আর দেখতে পাইনি কখনো। শোক বলে যে অনুভূতিমালার কথা বলা হয়ে থাকে সেই অনুভূতির কিছুমাত্র আমার ছিল বলে মনে করতে পারি না। বরং ছিল বিহ্বলতা। সেই বিহ্বলতার খানিকটা নিশ্চয় পরের দিনগুলোতে বিপুলকে আর দেখতে না পাবার কারণে, কিন্তু আমি প্রায় নিশ্চিত সেটা এই কারণেও

যে একটা সঠিক অনুভূতির জন্য হাতড়াচ্ছিলাম। হাতড়ানিকে বিহ্বলতা ছাড়া আর কী নামে ডাকা যায়! গভীরভাবে ভাবতে বসলে আমার এমনকি, ইদানীং, এও মনে হয় যে অন্যের মৃত্যুর পর কী কী ধরনের বহিঃপ্রকাশ থাকতে হয় সেটার একটা শক্ত-পোক্ত বিধিমালা আছে চারপাশে। হতে পারে বিপুলের মারা-যাওয়ার অভিজ্ঞতা, আনকোরা বলে, কোনো বিধিনিষেধ শিখে না-উঠবার বিহ্বলতায় পড়েছে। হতে পারে।

কিন্তু যখন কায়েদুরের ছোটবোন তিনদিনের জ্বরেই মারা গেল তখন এই বিচ্ছেদের অর্থ মালুম করতে আমার বেশি কসরৎ করতে হয়নি। বয়সে তখন আমি আর একটু বড়। হয়তো নয় বা দশ। শৈশবের এলাকা ছেড়ে আরেকটা জায়গায় তখন আমাদের পোঁটলা-পুঁটলির সংসার। কায়েদুর ছিল ভীষণ শান্ত, অথচ ভীষণ উদ্যমী। গার্হস্থ্য অর্থনীতি ভালো বুঝতাম না বলে কেন স্কুলের পর কায়েদুর মাঝেমধ্যেই বাদাম বিক্রি করতে যেত সেটা নিয়ে ভাবতাম মাঝেমধ্যে। কিন্তু আবার ওর অমিত প্রাণশক্তি দেখে গর্ব লাগত। বন্ধু শব্দটা তখন দস্তুর ব্যবহার করি অসংশয়ে। শব্দটা কানে এলে, কিংবা বইয়ে পড়লে, জ্ঞাত শাস্ত্রের ছলকানি বোধ করি। আর শব্দটা উচ্চারণের সময়ে একটা গাঢ় আত্মবিশ্বাস ঝিলিক মারতে থাকে। যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রাজ্ঞ অধিকারবোধের একটা চাবিকাঠি। সেই কায়েদুর বোন মারা যাবার পর যেন আরেকটা কায়েদুর, এমনকি আরেকটা প্রাণী। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে, কিংবা তাকাতে আতঙ্ক বোধ করতে-করতে একটা তামাম ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা সাঙ্গ হয়েছিল আমার। মাত্র অল্প ক'টি দিনেই, এবং ভাষার বাহ্য কোনো সেতু ছাড়াই। কায়েদুরের মুখ বেয়ে, কিংবা মুখের উছিলায় আমি পরিক্রমা করছিলাম বিস্মৃত নানান সব পকেট। বিপুল থেকে শুরু করে নান্নুকে কবে অসহিষ্ণু কনুইয়ে ঠেলে দিয়েছি সেসব অবধি। একটা পর্যায়ে বোনটা আর কোথাও নেই, কেবল কায়েদুরের মুখ। আবার আরেকটা পর্যায়ে যেন কায়েদুরের মুখটাও কোথাও নেই আর, আছে কেবল বিচ্ছেদের অবোধগম্য নিরাকার পাণ্ডুলিপি। সেই থেকে মৃত্যুরা সব বিচ্ছেদ। আবার বিযুক্তিরাও মৃত্যু। একেকটি অটুট মৃত্যু। অগণ্য এবং নিরন্তর।

'আঁখি জেগে থাকে বন্ধু...'

প্রথমবার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় যখন এই গানটি শুনি তখনও আমি দশের নিচে। আমার জন্মস্থান এবং প্রথম বিচরণলোক বরগুনা ছেড়ে চলে এসেছি। এটা একেবারে দৈবাৎ যে শৈশবে বরগুনায় আমার সাথিদের একজনের নাম ছিল আঁখি। সেই আঁখির কোনোরকম রূপকল্পনা আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। কিন্তু মেহেরপুরের প্রথম বছরগুলোতে সম্ভব ছিল। শৈশবের একটা চেনাজানা আঁখিকে আমি তখন কল্পনা করতে পারতাম। এবং গানটা একটা আজব অনুরণন সমেত

মাথায় ঘুরঘুর করতে শুরু করল, করতেই থাকত পরে। আঁখিদের বাড়িটা ছিল তালুকদার বাড়ি। বিরাট বড়। তাতে অনেক গাছপালা, দুইটা পুকুর তার মধ্যে একটা পদ্মপুকুর এবং ওর ঠাকুমা ছিলেন। বাড়ির তিনটা ঢুকবার-পথের মধ্যেরটা দিয়ে ঢুকলে ঠাকুরঘর বা মন্দির বাঁ-হাতে। আর তার পাশের টগর গাছটার ফুল মন্দিরপাশের পুকুরটাতে পড়ে থাকত। সেই বিরাট গাছপালাওয়ালা বাড়িটার আরেক প্রান্তে ছিল একটা কামরাঙ্গা গাছ। সেই গাছ থেকে সাদাশাড়ি-পরা ঠাকুমা কামরাঙ্গা পেড়ে দিচ্ছেন আমাদের দু'জনকে। একটা প্রান্তসীমাহীন কিন্তু নিশ্চিত দৃশ্য। এর বাইরে আরও অজস্র গাছের স্মৃতি এখন কেবলই একটা জমাট সবজেটে অন্ধকারের মতো। কিন্তু স্মৃতিচারণের সেই নিয়মিত কালে হয়তো নিশ্চিন্ত কিছু হাতড়ানি সম্ভব হতো, এখন সেটাও মনে নেই। যতোটা মনে পড়ে কাগজ-কলম নিয়ে আঁখিকে আমি চিঠি লিখতেও বসেছিলাম কখনো। পাঠানো হয়নি হয়তো, আর পাঠালেও পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকটি বালসুলভতার বাইরে এটা কোনো নয়া সংযোজন হতো বলে মনে হয় না।

ফলে এখানে মুখ্য বিষয় চিঠিখানা পাঠানো বা না-পাঠানো নয় কিন্তু আঁখিকে আবিষ্কারের এই প্রচেষ্টাটা নিয়ে আমি ভাবি। সেই নিপাট শৈশবে যখন সত্তার কোনোরকম যৌনরূপ গড়ে উঠেছে বলে স্বীকৃতি নেই, তখন কেন একজন 'সমবয়সী' এবং 'নারী'কে যোগাযোগের তাগিদ স্বতন্ত্র এবং খাঁ-খাঁ লাগা! কেনই বা রুমাপিসিকে এইরকম একটা চিঠি লেখার ইচ্ছে/তাগিদ/অনুভূতি হয়নি! নাকি হয়েছিল এবং স্মৃতিসেন্সরশিপে পড়ে গেছে তা?! রুমাপিসি যিনি আমাকে এক-নাগাড় গল্প পড়ে শোনাতেন নিবিড় মমতায় আর উৎসাহে, এবং ছিলেন আমার পয়লা বিস্ময়-মুগ্ধতা। বয়স আর লিঙ্গবোধ তাহলে মাথায় খোদাই করা হতে থাকে। এমনকি এত শৈশবেই! তাহলে সামাজিক খোদাইকৃত লিপিমালার বাইরে আমাদের অনুভূতির কী অর্থ, যদি নিজেরাই তা বদলে বা পল্টান দিতে না চাই!? দেখতে পাই, এসব ধারণার ব্যাপারে সসংশয়ী দূরত্ব চতুষ্পার্শ্বের অনুভূতি-চর্চায় কেন্দ্রীয়। যেন এসবের অর্থ সকলেরই জানা। আমরা কি মূলগতভাবে তাহলে হিপোক্রেইট?! নাকি এসব নাগরিক অভ্যাস আমাদের!

কল্পলোকের বন্ধু আর স্বর্গলোকের বন্ধু

ধরা যাক তার নাম মেরাজ। আমার থেকে বয়সে অনেকটা বড়। এবং পাড়ায় তখন জ্ঞাতিসম্পর্কের যা রেওয়াজ তাতে তাকে আমার মামা ডাকবার কথা। কিন্তু তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকতে বলে এক কৌতুকের চোখে আমায় নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। আমার সাহসে কুলালো না এবং তিনি সেটা জানতেন। ফলে রফাও করলেন তিনিই। পরস্পরকে আমরা বন্ধু সম্বোধন করব। বয়সে দ্বিগুণেরও বেশি

একটা মানুষের সঙ্গে এরকম সমতার সম্পর্ক তখন আমার জন্য নতুন। বা এর আগে এই নিমিত্তগুলো তৈরি হয়নি। নানান সব গল্প তিনি আমার সঙ্গে করতেন, বা শুনতে চাইতেন আরও বেশি। আধাকল্পনা আর আধা নিজের মেধায় আমার শিশুসুলভ আস্থা মিশিয়ে আমি নানা কিছু বলে যেতাম। আমবাগানের নিচের মাচায় তিনি যখন বাতাস খেতেন কিংবা আম পাহারা দিতেন তখন পা ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে আমি শব্দাবলির রাজ্য বানাতাম। মেরাজ সচ্ছল পরিবারের ছিলেন। মাঝেমধ্যেই আমাকে কিনে দিতেন কিছু, বা চাইতেন বোধহয়। এভাবে চলল না। কখন যেন আমার স্কুলের সূচি বদলে গেল, তিনিও বোধহয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর আমাদের দেখা হয় না। হঠাৎ একদিন একটা বিদেশী চিঠি এল। এই প্রথম। উত্তেজনায় খুলে দেখি বন্ধু সম্বোধনে এক দীর্ঘ চিঠি তিনি লিখেছেন। আর তাঁর ছবি। তিনি যে বিদেশ গেছেন আমি জানতাম না। আরও টাকা বানাবার জন্য তিনি সিঙ্গাপুর চলে গেছিলেন, তাঁর কুড়ি-ঊর্ধ্ব বয়সে। অগ্রজদের সঙ্গে সখ্য এরপরে খুব নিয়মিত একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নাসির ভাই ... মনা ভাই ... রবু ভাই ... কথা ... কথা ... কথা ... শব্দের রাজ্য আর মূর্ত করবার খেলা ... শব্দাবলির সঙ্গে আমার প্রণয়কালের সূচনা এরকম করেই ধীরে ধীরে পোক্ত হতে থাকে।

আমি ভাবতে থাকি আমার আত্ম-অবয়ব ইমারতের মতো বানিয়ে তুলতে এইসব স্থপতিরা, ধরা যাক নাসির ভাই, কি কখনো জানেন? জানা কি জরুরি?! বা কখনো আমাকে তালিকাকারে বলতে হলে আমিই কি সেসব স্থপতিদের ভূমিকা একটা একটা করে স্পষ্ট করতে পারব?! পারা কি সম্ভব?! পারা কি জরুরি?! কিংবা আরও ভয়ানক প্রশ্ন। ইমারতটা ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে কি আমি লিপ্ত? আর কিছুতে কি আমি লিপ্সু? আর কিছুর পথে আমি কি অভীপ্স? ... নিজের অবয়ব ছাড়া আর কিছু কি আমরা ধারণ করি?! কিংবা কারণ করি?! কোথায় থাকেন 'বন্ধু'রা? নিজ অবয়বের মধ্যে একটা কুঠুরি কিংবা অলঙ্কার হয়ে, এমনকি হয়তো নিরাপত্তা আর দম্ভের প্রহরী হয়ে?! নাকি নিজ অবয়বের বাইরে কোথাও স্বতন্ত্র 'বন্ধু'রা বাস করেন! আদৌ করেন?

... সেই থেকে মৃত্যুরা সব বিচ্ছেদ।
আবার বিযুক্তিরাও মৃত্যু।
একেকটি অটুট মৃত্যু।
অগণ্য এবং নিরন্তর।...

কিন্তু দাশরথী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটা অন্তিম কথামালা আমার আর হলো না। তিনি আমার দাশু জ্যেঠু। হিসেব মতে বাবার বন্ধু, আসলে তাঁরও অগ্রজ বন্ধু। একটা রহস্যজনক আগুনে পৌরসভার বাজারে তাঁর কাঠের ৫ হাত গুণন ৫ হাত

কুঠুরিটা পুড়ে যায়। অনেকের দোকানই পুড়ে যায়। তাঁর দোকানটা ছিল হোমিওপ্যাথ ডাক্তারির অফিসঘর। এই আগুনের আগ পর্যন্ত তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। আসলে তিনি অনেক কিছু ছিলেন। ছোট্ট শহরের শিক্ষাসংগঠক ছিলেন। সহায়সম্পত্তি আর শ্রম দিয়ে স্কুল তৈরি করেছিলেন। সেই স্কুল নামজাদা হলো, কিন্তু তিনি ছিলেন বিস্মৃত। বিস্মৃত প্রতিষ্ঠাতা। একটা জটিল রোগে পা বেঁকে যাবার আগ পর্যন্ত তিনি ফুটবলারও ছিলেন। শুনেছি। দারুণ পড়ুয়া ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পড়া শেষ করেননি। আর ছিলেন নিভৃত গবেষক। কিন্তু আমার শৈশবে তাঁর একমাত্র লোকজ্ঞাত পরিচয় ছিল অকৃতদার এক লুঙ্গি-পরুয়া হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। আমার শৈশবের বয়সে তিনি দশ-কুড়ি বছর বাড়তি বোনাস দিয়ে দিয়েছিলেন অনায়াস ভঙ্গিতে। আমি হেঁটে হেঁটে তাঁর দোকানে যেতাম। রুগি থাকলে বলতেন 'খোকা বস, তোর সঙ্গে আলাপ আছে।' আর রুগি না থাকলে হাতের বইটা পাশে রেখে বলতেন 'তারপর বল কী খবর?' কিংবা 'তোর সঙ্গে রাজীব গান্ধী নিয়ে আমার আরও কথা আছে।' বা এরকম। ফলে বড় হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার অনেক উপায় ছিল না। কিন্তু আগুন লাগার পর তিনি আর ডাক্তার থাকেন না। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি দূরারোগ্য রুগি হয়ে পড়েন। কিন্তু সেটা অনেক বছর পরের কথা। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। খবর পাই দাশু জ্যেঠু চলৎশক্তিহীন। ততদিনে কথার পাহাড় জমিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে অভিসারের জন্য তৈরি হচ্ছি। কিংবা সেই অভিসারটাকে এখন শনাক্ত করছি। আমি খবর পাই দাশু জ্যেঠু বাকশক্তিরহিত। ... বাক ... শক্তি ... রহিত ...। ওই জড়বস্তুটার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাক এবং শক্তি দুই-ই অপ্রস্তুত থাকে। আমি মেহেরপুর গিয়েও শুয়ে-থাকা রুগিটাকে দেখতে যেতে চাই না। যাই না। তারপর ফিরে আসবার আগে একটা বিহ্বল চকিত দেখা করতে গিয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকাই। তিনিও তাকান। এরপর আমাকে সংশয়ের রাজ্যে আর বেশিদিন না-রেখে তিনি মারা যান। আমি খবর পাই। ... এরকম...। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে আরও শৈশবের চাঁদসি দাদুর কথা। যদিও তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমি পাইনি। এমনকি তিনি মরে গিয়ে থাকলেও পাবার সম্ভাবনা নেই। কিংবা তাঁর মৃত্যু হয়েছে তখনই যখন আমি অনেক অনেএএএএক বছর পর খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে বের করেছি বরগুনার একটা প্রতিষ্ঠিত বাড়ির মালিক হিসেবে। এবং ডাক্তার নূরুল হক, আমার চাঁদসি দাদু, আমার পরিচয় জেনেও আমাকে আর 'ধোনভাই' বলে ডাকতে পারলেন না যে নামে তিনি আমার জন্মের পর ছয় বছর অবধি ডেকেছিলেন। আসলে কোনো নামেই তিনি আর ডাকতে পারলেন না। একটা কুড়ি-ঊর্ধ্ব হঠাৎ-দেখা 'যুবকে'র সামনে দ্বিধাগ্রস্ত তিনি এক লহমায় পুরোটা কালকে মুছে দিলেন। ... এরকম...।

আমি নিশ্চিত দাশরথী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, কিংবা তাঁর উছিলায়, আমি রচনা

করব আরেক প্রস্থ লিপিমালা। এই এখন যেমন করছি। কিংবা হামিদ বা হামদাকে যেমন আমার গল্পের নায়ক বানিয়েছি। এমনকি আমি নিজে ভিলেইন হয়ে হামদাকে নায়কের মর্যাদা দিয়ে আমার দ্বিতীয় গল্পটাই লিখেছি। হামদা বেঁচে আছে এবং ভ্যান চালাচ্ছে। দাশরথী বেঁচে নেই এবং বর্ণিল ডাক্তারি করছে না। কিন্তু আমি জানি, এই লিপিমালাগুলো নিজগুণে, আমার অস্তিত্বসাপেক্ষ। আর আমি এও জানি এই লিপিমালাগুলো এপিটাফিয়। একেকটা শব্দরাজ্যের স্মারক-লক্ষণা। একেকটা প্রণয়ের প্রস্তরখণ্ড যাতে ওই প্রস্তরটা দাঁড়িয়ে থেকে ঘোষণা দেয় ওখানে আমি ছিলাম। ... আমি। জলের মতো, আর পাথরের মতো।

পত্রমিতালী থেকে ফ্রেন্ডসার্চ

চিত্রবাংলা পত্রিকাটি পয়লা কোথায় দেখি এখন মনে পড়ে না। কিন্ত পয়লা এর উপস্থিতিতে একটা শিরশিরে উত্তেজনা বোধ হয় যখন এতে পত্রমিতালী অংশটি লক্ষ্য করি। স্কুল ফাইনাল তখনো দিইনি। বোধহয় নবম বা দশম শ্রেণীতে পড়ি। যে বন্ধুর বাসায় আবিষ্কার করি সেখানে মাঝেমধ্যে আমরা ক্যারম খেলতে যেতাম। কোনো এক অজ্ঞাত এবং রহস্যজনক কারণে সেই বন্ধু তখনই ইংরেজি গান শোনার অভ্যাস রপ্ত করেছে। সেই পাঁড় মফস্বলের দোকানগুলোতেও তখন বনি এম কিংবা মাইকেল জ্যাকসনের লভ্য ক্যাসেটগুলোর বাংলাদেশী সংস্করণ পাওয়া যায়। এবং যে গুটিকতক নিম্ন-পনেরো কিশোর [এবং কিশোরী] তা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে সেই সহপাঠী বন্ধু তাদের মধ্যে প্রধান। তখনই সে কারো সাহায্য ছাড়াই দুলাভাইয়ের মোটর সাইকেল চালাতে পারে। রহস্য পত্রিকার প্রথম জমানাতেও সে ছিল প্রথম দিকের গ্রাহক বা পাঠক। এমনকি একমাত্র। ফলে সে ছিল সভ্যতায় প্রাগ্রসর, আমাদের সকলের থেকে। ফলে এটা সঙ্গতই যে পত্রমিতালীওয়ালা একটা পত্রিকা ওর বাসায় দেখে আমি অবাক হইনি। বরং তাজ্জব হয়েছিলাম এরকম একটা ব্যবস্থা দুনিয়াতে আছে জেনে। এবং বহুদিনের এক অমীমাংসিত বিস্ময় হঠাৎ করেই খোলাসা হয়ে গেছিল আমার কাছে। মেজমামা'র এক 'পেন ফ্রেন্ড' তাকে কলম, পত্রিকা আরও কীসব যেন ডাকযোগে পাঠিয়েছিল। আমি তখন অনেক ছোট, যখন ইউএস মিলিটারিও ইমেইল ব্যবহার করে না। কীভাবে বিদেশের ঠিকানা যোগাড় করে পোস্টাপিসে গিয়ে চিঠি পাঠিয়ে এই বন্ধুলাভ ঘটেছে সে কথা মেজমামা বোঝানোর চেষ্টা করলেও আমার মুখ হাঁ আরও বেড়েই যেত। কলমটি আমাকে কখনোই তিনি ধরতে দেননি। উত্তরকালে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে সেটার কারণ এর গায়ে মুদ্রিত নগ্ন নারী-ছবি। যাহোক, চিত্রবাংলায় সেই পত্রমিতালী অংশ বন্ধুলাভের একটা অজানা জগৎ সম্বন্ধে অভিভূত করে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, এতে মুদ্রিত আত্ম-বিজ্ঞাপনগুলো সেই মোহকে প্রলুব্ধ করেছিল একটা সম্ভাব্য 'ব্যক্তিসত্তা'য়।

ওই ক'টি অক্ষরে কেমন জ্বলজ্বল করছে একেকটা ব্যক্তি এবং কেমন অকপট তাঁরা তাঁদের কাঙ্ক্ষাকে মেলে ধরছেন! এক অদ্ভুত নিমন্ত্রণ। নানা কারণে নিজের একটা বিজ্ঞাপন কখনো আর লেখা হয়নি, কিন্তু একটা আনদেখা জগতের হাতছানি হয়ে বহুকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমাকে।

বরং, উত্তরকালে, সাধারণ হিসেবে যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় বাস করছি, এরকম মিতালী পাতাতে দিব্যি উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এতদিনে ভঙ্গি আর মাধ্যম আমূল বদলে গেছে শহুরে পেশাজীবী মানুষজনের জন্য। ইমেইল এখন 'বন্ধু'লাভের উপায় বা মাধ্যম। এখানে মানুষ 'বন্ধু' খোঁজেন, সাথি খোঁজেন, বিয়ের অংশীদার খোঁজেন। আরও নানান কিছু খোঁজেন। খুঁজতেই থাকেন। ক্রমাগত তাঁরা খোঁজেন ... যতক্ষণ না একটা নিবিড় অন্বেষণের অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর ঘুম ভেঙে হঠাৎ একদিন যখন মনে পড়ে যে অমুকের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই, তখন ইমেইলে লেখেন 'কী হে আওয়াজ নেই কেন!' ও প্রান্ত থেকে উত্তর আসে 'ভীষণ ব্যস্ত।' ইদানীং এই আমার ভার্চুয়্যাল 'বন্ধু'চর্চা।

সবাই ব্যস্ত। সবারই কি ব্যস্ত থাকার কথা না? কিন্তু কেনই বা সবাই ব্যস্ত থাকবে? হোয়াইট কলার পেশাজীবীদের ব্যস্ততা কী নিয়ে? এমন হতেও পারে যে ব্যস্ততা একটা ভঙ্গি, এমন একটা ভঙ্গি যা নিঃসীম নিপাট অবোধগম্যতা থেকে তৈরি হয়েছে। এমন এক অবোধগম্যতা যা সমকালকে ঠাহর করতে চাইবার, বা না-চাইবার, নিরন্তর অনুশীলন। এমন একটা ভঙ্গি যা নিয়ে গুছিয়ে বসে কখনো ভাবা হয়ে ওঠেনি। হতেও পারে। তার মধ্যে হঠাৎ করেই এক ইমেইল বান্ধব একটা বই পাঠিয়ে দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণ-ইতিহাস নিয়ে। হঠাৎ। কিংবা হামবুর্গ থেকে একটা খেলনা টেলিভিশন কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আরেক বান্ধব। আবার ঢাকায় আমার একটা নিবাস নিশ্চিত করতে নিউজিল্যান্ডের ইমেইল বান্ধব ঢাকায় খোঁজ লাগাচ্ছেন। একটা ভোঁতা জীবনপ্রবাহে এগুলো ছলকানির মতো গায়ে জলের পরশ দিয়ে যায়। নতুন বৃষ্টিতে স্নানের উত্তেজনা মেখে তখন পরের প্রহরে নিশ্চিত উড়তে ইচ্ছা করে। ঠিক তখনি। কেবল তখনি।

তথাপি ৩৬ চৌরঙ্গী লেনের সেই বৃদ্ধা

কিন্তু বিষয়টাকে একদম অন্যভাবে ভাবা যায়। আচ্ছা, যদি ও প্রান্ত থেকে উত্তর আসত 'আমি জানি না কী আওয়াজ দেব, হাতড়ে হাতড়ে আমি আওয়াজ পাচ্ছি না; কোনো ভাষা আর তৈরি হচ্ছে না', তাহলে কিন্তু সঙ্কটটা একদম অন্য জায়গায় থাকত। হঠাৎই নিরর্থকতার একদম মুখোমুখি হয়ে যেতে পারতাম। 'বেযোগা-যোগ'-এর অন্তঃসার দেখে ফেলতে পারতাম। অনেকটা বাসায় ঢুকবার পথে গলির মুখেই অপেক্ষমান যমদূতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার মতো।

সেটা আমাদের জ্যান্ত কিংবা ভার্চুয়্যাল বান্ধবেরা বলুন বা নাই বলুন, পরিস্থিতি কিন্তু তাই। নিরন্তর শব্দ হাতড়াচ্ছে আমার চারপাশের মানুষেরা। তাদের সেই হাতড়ানি বিহ্বল অস্থিরতার মতো পাক খেতে থাকে, আর ঘন মেঘের একটা দেয়ালের মধ্যে অভিমন্যুর মতো ঘিরে ফেলে। ধরা যাক আমাকেই।

ক্রমাগত তাঁরা খোঁজেন
যতক্ষণ না
একটা নিবিড় অন্বেষণের অবসাদ
ঘুম পাড়ায়ে দেয় তাদের ...

সেই বৃদ্ধার গল্পটি একটা মেটাফরের মতো। খাবার বানিয়ে পুঁটলি করে নিয়ে তিনি গেছিলেন পুত্রবৎ স্নেহ করতেন যাকে তাঁর বাসায়, তাঁর জন্মদিনের কথা মনে করে। সেই পুত্র বৃদ্ধার বাড়িতে নিয়মিত আসত। প্রায়শঃই ওর বান্ধবীকে নিয়ে। কাচের বাইরে থেকে বৃদ্ধা দেখতে পেলেন জন্মদিনের উৎসব চলছে। নিতান্ত অনাহূত আর উপেক্ষিত বোধ করলেন তিনি। না, আসলে নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। তিনি আর দরজায় টোকা দিলেন না। বৃদ্ধাটি বাসায় ফিরতে থাকলেন। তার সাথি হয়েছিল একটা কুকুর। বৃদ্ধার ধারণা হয় হাতের খাবারের লোভেই কুকুরটি পিছু নিয়েছে। বৃদ্ধা কুকুরটিকে সেই খাবার দিতেও চাইলেন। কেবল একটা শর্ত সমেত। বৃদ্ধার বাসা পর্যন্ত কুকুরটিকে সাথি থাকতে হবে। বৃদ্ধা ভাবেন, খাবারটা আগে দিয়ে দিলে কুকুরটা ফিরেও যেতে পারে। তিনি একা ওই পথটা পাড়ি দিতে চাইছিলেন না। অপর্ণা সেনের ছবিতে নৈঃসঙ্গের চিত্ররূপ এই বৃদ্ধাকে আশ্রয় করাতে বয়স একটা গহীন অর্থ পেয়েছে। সেটা গুরুতর। প্রায় চড় লাগিয়ে দেয় দর্শকের মস্তিষ্কে।

আবার সে কারণেই আমি বৃদ্ধার ওই অভিযাত্রাকে মেটাফর ভাবি। অসতর্ক থাকলেই মনে হতে পারে বার্ধক্য নৈঃসঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। তা তো নয়। নিরন্তর সঙ্গপিপাসু মানুষ সঙ্গপিপাসার ভাষা হাতড়াতে থাকেন। আর পান না। আবার ভাষা যখন পান, তখন ভাষা বিনিময়ের কোথাও কোনো সুড়ঙ্গ থাকে না। তারপর কেবল খাবারের একটা পোঁটলা হাতে 'গৃহে' ফেরেন মানুষ। 'গৃহ'—যেখানে মানুষে ঘুমায়, যেখানে ঘুম থেকে উঠে সকালের আলো দেখে। এই সংজ্ঞাতেই কেবল সকলের গৃহ থাকে, এমন একটা পরিসর যেখানে মানুষ 'ফিরতে' পারেন। নগর শ্রমিকরা 'ফেরেন' তাঁদের কলোনিতে। নগর ভিক্ষুকেরাও 'ফেরেন' তাঁদের আগের রাত কাটিয়েছেন যে রাস্তায়। গার্মেন্টস শ্রমিকেরা ফেরেন তাঁদের পাড়াতুতো এজেন্টের ঠিক-করে-দেয়া চার চৌকির কুঠুরিতে। নগরের প্রান্তিকেরা 'ফেরেন' ঠিক আগের রাতেই যেখানে ঘুমিয়েছিলেন। আর নগর-অস্থিরেরা ফেরেন নিশ্চিত ছোট কিংবা বড় ফ্ল্যাটে। এভাবে 'ফিরতে থাকেন' তাঁরা। একা একা।

সম্পর্কের কর্পোরেটায়ন (নিশ্চয়ই মুদ্রায়নের পরের স্তর)

'বন্ধু' ধারণা নিয়ে আমার অনেক সংশয় আছে। প্রথম কারণ হলো মানুষে এত অর্থে এটার ব্যবহার করে থাকে যে আসলে পরিশেষে নিরর্থক হতে বাধ্য। কিন্তু মুখ্য কারণ হচ্ছে এই শব্দটার উপর সাধারণত অনেক ওজন দেয়া হয়ে থাকে—নৈতিকতার, আদর্শের এবং ফিল্যানথ্রপিকতার—আর আমার পাথুরে আর অকেজো মনে হয়। অকেজো মনে হয় কারণ সেই ওজনটা আসলে অনুশীলনে সিদ্ধও নয়। অনুশীলন একদম ভিন্ন। নাগরিক 'বন্ধুত্বে' এর সঙ্গে আছে মধ্যবিত্ত 'জীবনাচরণের' (লাইফ-স্টাইল) একটা বিদঘুটে ঐক্য। সর্বোপরি, মধ্যবিত্ত বন্ধুত্বের একটা স্তরে একে অযৌন প্রমাণের মরিয়াভাব থাকে। এর সবগুলো কারণই আমাকে এই বর্গ/পদ/ধারণা নিয়ে সংশয়ী করেছে। আমার ঈমান এমন পাৎলা বলেই কিনা জানি না, বন্ধু বলতে যা কিতাবে লেখা হয়ে থাকে, কিংবা যেসব মীথ দাঁড়িয়ে আছে, সেমতো কিছু আমার নেই। যা দু'চারজন ছিলেন, হয়তো আমার নিজের মুদ্রাদোষে, বা মুদ্রাগুণে, বিগত হয়েছেন আমার থেকে। সেই থেকে আবার বিযুক্তিরাই মৃত্যু!

এরকম একটা চলমান দুর্ঘট আটত্রিশ বছর বয়সের অভিযাত্রার অবধারিত অংশ বলেই হয়তো, বন্ধুত্ব নিয়ে আমার কোনো ডগম্যা নেই, কিংবা নেই কোনো মর‍্যালিস্ট অবস্থান। যা আছে তাকে নৈর্লিপ্তি বলার সমস্যাটা আবার তাত্ত্বিক; তাহলে তো আমি এ বিষয়ে লিখতেই বসতাম না। বিষয়টাকে বরং একটা পরিস্থিতি হিসেবে দেখা যায়। অনেকগুলো মানুষের চেহারা আমার মাথায় ক্রিয়া করে যাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নাকি শত্রুত্ব সে নিয়ে কেবল আমি দ্বিধান্বিত তা নয়, বরং তৃতীয় পক্ষও নিঃসংশয় হতে পারেন না। এমনকি আমি এই মীমাংসা নিয়ে বিশেষ ভাবিতও নই। লোকজন যাকে বন্ধুত্ব বলে সংজ্ঞা দিতে থাকেন, কিংবা ঘোষণা, সেটা অনেকের সঙ্গেই আমি টের পাই না। এমনকি ক্রমাগত বয়স্ক হতে হতে আমি টের পাই, হঠাৎ কোনো রাতে কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠে, কিংবা সারাদিনের যে কোনো সময়ে, যে কথিত বন্ধুত্ব কারো সঙ্গেই আমি টের পাই না। অন্যরাও যে টের পান সেরকম কিছু বলেন না। কিংবা অব্যক্ত কোনো ক্রিয়া থেকেও আমার মালুম হয় না। কিন্তু তাঁরা যে অবন্ধু এরকম কোনো ফয়সালাও আমার হয়ে ওঠে না। হয়নি। শত্রুত্ব ঘোষণারও কোনো সুযোগ বা কারণ থাকে না। ফলতঃ এক সংজ্ঞাহীন সম্পর্কে থেকে যাই আমরা, বন্ধুশাস্ত্র অনুযায়ী। কিন্তু অন্য সময়ে আবার সাক্ষাতের বাসনা করি। এমনকি সেই সাক্ষাৎলাভে কী লাভ হবে সে ব্যাপারে কোনোরকম ধারণা ছাড়াই। ফলতঃ বন্ধুত্ব, আমার জন্য, নেহায়েৎ ধোঁয়াচ্ছন্ন এক কনসেপ্ট, অহেতু যদি নাও বলি। তবে আমি টের পাই নানান মানুষ পরস্পর বন্ধু হয়ে থাকেন এবং কখনো কখনো আমি এমন কিছুর মধ্যে থাকি যাকে অনেক মানুষ বন্ধুত্ব বলে অভিহিত করে

থাকেন। বিষয়টাকে না-সংমিশ্রিত হয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এবং অনায়াসে আমি, এসকল জিজ্ঞাসা সমেতই, মানুষজনকে বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকি; অন্ততঃ এ কারণেও যাতে সমতটের প্রচেষ্টা নিয়ে তাতে সংশয় তৈরি না হয়।

বন্ধুত্ব-ভাবনা কতকগুলো প্রিমাইজ বা পূর্বানুমানের উপর দাঁড়ানো। কিন্তু মনুষ্য-সম্পর্ক তো আইডিয়া নয়, ক্রিয়া। পরন্তু যেসব প্রিমাইজ লোক-মুখেমুখে মীথ, তাই নিদারুণ লোভনীয়, কিংবা কিতাবে কিতাবে মহার্ঘ্য, সেসব খুব দ্রুত বদলে গেছে। এবং বদলটা কেবল যেসব সম্পর্ককে বন্ধুত্ব বলা হচ্ছে তারই নয় বরং তামাম মনুষ্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ঘটছে। একটা বৌদ্ধিক সংশয় হিসেবে আমি ভাবতে প্রবৃত্ত হই এরকম বন্ধুত্ব কিছু কখনো ছিল না, কোথাও ছিল না। কারোরই ছিল না। এই সংশয় মাথায় নাড়াচাড়া করতে করতে আমি আবার সতর্ক হয়ে উঠি। নিজেকে শাসন করি এই বলে যে: এভাবেই একটা পেশাদার ঈর্ষা সুগঠিত হয়। ফলে বৌদ্ধিক সংশয় প্রত্যাহার করে নিই।

সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের শিক্ষক কাবেরী গায়েন একটা চিত্তাকর্ষক গবেষণা করেছেন (নারী ও প্রগতি, সংখ্যা ৩, ঢাকা)। তাঁর বক্তব্য, পুরুষদের বন্ধুত্বের কাহিনী ইতিহাসে কিংবা সাহিত্যে যেরকম প্রতিষ্ঠিত সেরকম নারীদের বন্ধুত্ব নয়। এসূত্রে, তাঁর প্রতিপাদ্য হচ্ছে গ্রামের নারীদের বন্ধু নেই। যদি আমি তাঁর বক্তব্য ধরে থাকতে পারি, তাহলে আমার তখন থেকেই মনে হয় গ্রামের নারীদের সখীজগৎ যে সুবিন্যস্ত ছিল সেটারও বহু আলামত আছে। ক্ষুদ্রঋণ এবং অপরাপর উন্নয়ন প্রকল্প সেই সখীজগৎ থেকে নারীদের উৎখাত করেছে। এ নিয়ে নিশ্চয় আরও আলাপ করতে পারব আমরা। যেসূত্রে এই প্রসঙ্গ এখানে টানছি তা হলো অন্ত্যজ মানুষের বন্ধুজগৎ থেকে, এমনকি গোটা কর্মলোক থেকে, আধুনিকতার প্রকল্পগুলো তাঁদেরকে উচ্ছেদ করেছে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে।

কিন্তু মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের কী বন্ধুত্ব ক্রিয়াশীল আছে?

সফলদের একটা নেটওয়ার্ক! কিংবা 'সফল' এবং 'সাফল্যকামী'দের একটা মিথোজীবী নেটওয়ার্ক। একজন অন্যজনে প্রবিষ্ট আছেন বিশেষ ব্যবসাক্ষেত্রে, কিংবা ব্যবসাকালীন 'হাইহ্যালো' পানাহারে। কিংবা 'সফল' বসেন কাচঘেরা অফিসে, অন্য 'সফলে'র সঙ্গে মোবাইল-সংলাপ ওইদিনের লাঞ্চমেনু নিয়ে, পরবর্তী বিজনেস/কনফারেন্স ট্রিপ নিয়ে, নিদেন পক্ষে পরের প্রজেক্ট ও তার প্রসপেক্ট নিয়ে; অথবা অন্যত্র ক্যামপেইন প্রগ্রাম নিয়ে, টিভির পরের প্যাকেজের স্পন্সর খুঁজবার সম্ভাবনা নিয়ে, পরের কন্ট্রাক্টটা পাবার জন্য কার সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে তা নিয়ে; কিংবা আরও অন্যত্র কোন 'বড়' লেখক কাকে বই বের করবার জন্য 'উৎসাহ' দিচ্ছেন, প্রকাশককে উপযাচক হয়ে বলছেন তা নিয়ে, কোন এনজিও ডিরেক্টর কাকে যে-কোনো-বেতন চেয়ে নিয়ে জয়েন দিতে বলছেন...। ইত্যাদি।

বছরে কয়েকটা ইভেন্টে পরস্পরের বাসা পর্যন্ত আসা যাওয়া—বাচ্চাদের জন্মদিন, ম্যারেজ ডে, বড়জোর বিশ্ববিদ্যালয়-এ্যালামনাই উৎসব। আমি কল্পনায় এইসব সম্পর্করাজির শব্দমালা শুনতে চেষ্টা করি। চেষ্টা করি বুঝতে যেকোনো ভাষারাজ্যে এই বন্ধুত্ব বিরাজমান। কল্পনা করা ছাড়া আমার জ্ঞাত হবার রাস্তা নেই কোনো। কিন্তু এর নাম আমি জানি। কর্পোরেট-বন্ধুত্ব। সম্পর্কের এই পর্যবসন/রূপান্তরকে বন্ধুত্বের কর্পোরেটায়ন বলতে পারি।

আমার কিছুই যায় আসে না।

শব্দের রাজ্যে প্রণয় কিন্তু শব্দপ্রণয়ের কামজ্বর নিয়ে আমি দিন গুজরান করি। মস্তিষ্কে শব্দের রাজ্য। রাজ্যে মস্তিষ্কের শব্দ। শব্দে রাজ্যের মস্তিষ্ক। প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আমার শব্দাবলির সঙ্গে, মস্তিষ্কের সঙ্গে, কিংবা রাজ্যের সঙ্গে। এমন এক রাজ্য, হয়তো, যা কেবল শব্দাবলিতে সৃজিত মূর্ত ও গতিশীল হয়, আমাকে লিপ্সু করে তোলে। আমি নিশ্চিত হতে পারি না।

এই কাঙ্ক্ষা আসলে একটা অভিযাত্রা। বন্ধু বা অবন্ধুতে কিছু ভেদ নাই। বন্ধু বা শত্রুতেও ভেদ নাই। এমনকি এসব বর্গবিভাজন কোথাও কোনো অর্থসিঞ্চন করে না। করে কেবল অভিযাত্রা, লিপ্সা। আসঙ্গ একটা অভিযাত্রা। অধুনা কালে গন্তব্য নিশ্চিত জেনেও এই অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রা ছাড়া 'আমি'টাই লুপ্ত হয়ে যায়। যে মৃত্যুজ্ঞান বিযুক্তিকে মূর্ত করে তুলেছে, সেই মৃত্যুজ্ঞান পুনর্স্থাপন করবার জন্য এই অভিযাত্রা ছাড়া রাস্তা নাই কোনো। আমি জানি।

মৃত্যুই কেবল সঙ্গলিপ্সার অন্ত ঘটায়। অন্যের মৃত্যুতে এই খতিয়ান দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রতিটি মৃত্যু। প্রতিটি অটুট মৃত্যু। এবং অগণন। তুলনায়, 'নিজ' এর মৃত্যু অনায়াস ও সাশ্রয়ী।

লিপ্সার অন্তে মৃত্যু। অথবা অনন্ত লিপ্সার মৃত্যু। এই আমার পদ্ধতি।

পশ্চিম শেওড়াপাড়া, ঢাকা ১৯শে জুলাই ২০০৭

আর্টস, বিডিনিউজ, ২৯ মার্চ ২০০৯

মানস চৌধুরী

বাসনার লিপিকার আর স্মৃতিকল্পলোকের মেটাফর

Rabindranath Tagore

মায়া বহুত গোলমেলে একটা বস্তু মানে অবস্তু, প্রত্যয়। বাংলা ভাষাজগতে মায়া শব্দটা এত বিচিত্র সব ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে হাল আমলের শাস্ত্রীয় বাংলা পাঠের আকালের মধ্যে এরকম উদাহরণ বিশেষ উৎসাহী করবে না অনীহ পাঠককুলকে। কিন্তু প্রত্যয়টি সর্বব্যাপ্তও বটে। খুব কম মানুষই এই ধারণাটি প্রয়োগ না করে নিকট বা দূর সম্পর্কের অনুভূতি বা ঘোষণাকে সাঙ্গ করতে পেরেছেন। ঘোষণার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি আমি। বাহ্য ভাষা ও ভঙ্গি জগতে মায়া থাকা একটা আবশ্যিক মানবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখার চল আছে। মায়ার পক্ষে ভালোমতো সাফাই না পরিলক্ষিত হলে তাকে মায়াহীনতা হিসেবেই পাঠ করা হবে যা কিনা নির্মমতার নামান্তর, এবং নির্মমতা চরম এক মন্দ বৈশিষ্ট্য। মন্দ

বৈশিষ্ট্যে পর্যবসিত হবার এই আশঙ্কায় সচেতন মানুষজনের সার্বক্ষণিক বিবরণীতে মায়া-মমতা একটা উপাদান হিসেবে বিরাজমান থাকে। মায়া আর মমতার কোনটা যে কী তার ফারাক করা বিশেষ কঠিন। হয়তো সেকারণেই বাংলা ভাষায় মায়া আর মমতা যুগলবন্দি হয়ে থাকে।

'জগৎ মায়াময়' মার্কা একটা বেদশাস্ত্রীয় জ্ঞান কীভাবে যেন পরিচিত হয়ে গেছিল। হিন্দুশাস্ত্রের দু'চার পাতা পড়তে হয়েছে নেহায়েৎ পরীক্ষা পাশের জন্যই। এর বাইরেও দু'চারটা বই নেড়ে চেড়ে দেখেছিলাম। সেরকম কোনো একটা উৎস থেকেই এই জ্ঞানলাভ হয়ে থাকবে। এমন নয় যে শাস্ত্রীয় এই প্রজ্ঞাকে লঘু করা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু শাস্ত্রীয় এলেম না-থাকলে যা হয় আরকি! ছোট ছোট গৌণ আলামতে ভারী বিষয়বস্তুর পর্যবসন ঘটে থাকে। যাহোক, শাস্ত্রীয় এই মায়া নিয়ে যতই আলাপ-আলোচনা তর্ক-ব্যাখ্যা হোক না কেন, আমার কিন্তু ভাবতে ভাবতে এই 'মায়া'কে নিউটনীয় অভিকর্ষ কিসিমের একটা ধারণা মনে হয়। এ কথা ঠিকই যে সনাতনী 'মায়া' বিশেষজ্ঞগণ নিউটনীয় অভিকর্ষের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এবং আমার এই সহজ ফয়সালাতেও তাঁদের সায় থাকবে না। কিন্তু তাতে কী! জগতের বস্তুপিণ্ড সব মায়ার মধ্যে আবদ্ধ এরকম ধারণা ছোটবেলাতে মারাত্মক বিভ্রান্ত, এরপর উত্তেজিত, এবং পরিশেষে নিস্তেজ করেছিল। ঠিক কাছাকাছি সময়েই ধারণা জন্মেছিল যে দেবী দুর্গার অন্য নাম মহামায়া। মায়া সংক্রান্ত উপলব্ধি কিছুমাত্র তাতে উপকৃত হয়নি। এরই মধ্যে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে গীতা পড়তে গিয়ে দেখি যে সেখানে পাতার পর পাতা মায়ার সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বোঝাপড়া নিয়ে একটা ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তাব করছেন শ্রীকৃষ্ণ। এসব পূর্বনির্ধারিত গুরুতর গোলোযোগের মধ্যে নবম শ্রেণী থেকে পদার্থবিজ্ঞানের একটা বই এসে পড়াতে জগতের সকলকিছু অভিকর্ষ আর মাধ্যাকর্ষণে নিপতিত হয় এবং মায়ার ধারণাজগতের কবল থেকে আমি মুক্তি পেয়ে যাই।

বাংলাভাষার সাম্প্রতিক ব্যবহারে খুব সীমিত হয়ে পড়েছে যদিও, 'মায়া'র একটা ভিন্ন অর্থ স্বতন্ত্রভাবেই রয়েছে। প্রতিবেশী হিন্দিতে বোধহয় সেটা আরও প্রবলভাবে পাওয়া যায়। কুহক বা ইন্দ্রজালীয় বাস্তবতা, যে অর্থে মায়াজাল বলা হয়ে থাকে। জাদুকরদের ক্রমাগত ইংরেজি ভাষানিষ্ঠার কারণে এই অর্থটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এখানে মায়া বোধহয় একটা কলা, একটা অনুভূতি নয়। চিত্তাকর্ষক হলো এই কলা জাদুকরের থাকলে তা উপভোগ্য, সাধারণ্যে থাকলে তা নিন্দনীয়। কেউ কাউকে মায়াজালে বেঁধে ফেলেছেন এটা প্রায়শই প্রশংসনীয় কোনো কর্মকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে না। বিশেষত, নারীজাতির সদস্যদের জন্য এটা বিশেষ কদাকার কর্মকাণ্ড হিসেবেই বিবেচিত। প্রায় কল্পলোকের ডাইনিসুলভ একটা ভূমিকার উদাহরণ হিসেবে এগুলোর উল্লেখ ঘটে। নির্মমতার বিপরীতে মায়া-মমতা যেমন

সদ্‌গুণ হিসেবে বিবেচিত, তেমনি সারল্যের বিপরীতে মায়াজাল-বিস্তার প্রায় অপরাধের পর্যায়ের একটা কাজ বা তৎপরতা। গ্রামদেশীয় সমাজে জাদুটোনা বলতে যা বোঝানো হয় কথিত এই মায়াজাল প্রায় সেই গোত্রের নিন্দনীয় পর্যায়ের চর্চা হিসেবে বিবেচিত। আবার, ছলা-কলা, কিংবা আরও কর্কশভাবে যাকে ছলনা বলা হয়ে থাকে এটি প্রায় সেই সাম্রাজ্যেরই একটা বিষয়বস্তু। কলাবিদ্যা কাঙ্ক্ষিত হতে পারে। তার কিয়দংশ ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে চর্চিত হলেই তা ছলা-কলা, কিংবা কারো স্বার্থের প্রতিকূলে গেলেই।

সাধারণ অপণ্ডিত মানুষজন মায়া বলতে একেবারেই ভিন্ন জিনিস বোঝেন। মায়া-মমতার জগতটাকেই বোঝেন তাঁরা। প্রধানত, সম্পর্কিত মানুষজনের প্রতি টানের একটা অনুভূতি। কিংবা হয়তো অনুশীলন। কিংবা টানের ঘোষণা। বা সব-গুলোই একত্রে। আবার টানটা সাধারণভাবে মনুষ্য সমাজের প্রতিই। অন্যান্য প্রাণী বা জন্তুর প্রতি। আবার জড়বস্তুর প্রতিও। কিন্তু কেতাব-শিক্ষিত মানুষজন সহজে তাঁদের মায়া বিষয়ে বলতে পারেন না। সেটা ব্যক্ত করার অস্বস্তিতে হোক, আর অনুভব করার দুরূহতাতেই হোক। কিন্তু অন্ত্যজ মানুষজন কতো অনায়াসে বলতে পারেন 'পেট পুড়ছে' কিংবা 'পরাণ পোড়ায়'। পেট কিংবা পরাণ যাই পুড়ুক, এমনকি অনভ্যস্ত শহুরে কানও অনায়াসে সে কথার মর্ম অনুধাবন করতে পারেন। এই ভাষা, এই অনুভব, এই উচ্চারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না যদিও। শহুরে প্রশিক্ষণ নানারকম অনুভূতি জগতের মধ্যেই বেশুমার প্রতিষ্ঠান মিশিয়ে দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক শাসন অনাবিল অনুভূতি ধারণের এবং অভিব্যক্তির বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি 'পেট পুড়ছে' বা 'পরাণ পুড়ছে' শোনার পরও নিজ অনুভূতি জগতের সঙ্গে এই ঘোষণার কোনো সংমিশ্রণ ঘটে না। কোনোদিনই এরকম একটা অভিব্যক্তি তাঁদের হয়ে ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা-তে এই লৌকিক মায়া-মমতা নয়, বরং ছলা-কলার দুনিয়াই অবলম্বন করা হয়েছে। 'কুহক' শব্দটিও সেখানে উচ্চারিত। ছলা-কলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিপত্তিতে পড়তে হয়নি। তিনি নারী নন, তিনি রচয়িতা এবং এটি সাহিত্যের দুনিয়া। মায়ার খেলা-তে মায়া হচ্ছে নারী-পুরুষের প্রেমপ্রবাহের বনিয়াদ। কিন্তু এটা কিছুতেই মমতা নয়। মায়া এখানে আকাঙ্ক্ষার বীজ, ক্ষেত্র, এমনকি উপায়। রবীন্দ্রনাথকে এখানে নিমিত্ত হিসেবে টানা হয়েছে। প্রেমশাস্ত্রের সঙ্গে মায়ার সংযোগ নিয়ে আলাপের একটা সূত্রপাত হিসেবে। আকাঙ্ক্ষা কিংবা বাসনা প্রায়শই দেখা হয়ে থাকে মায়ার বিপ্রতীপ হিসেবে। জুটিবদ্ধতার ক্ষেত্রে এটি একটি কর্কশ পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। মায়ার অনুপস্থিতিতে কামনা বা শরীরী সংশ্রবের আকাঙ্ক্ষা একটি অপরাধ বিশেষ। সাথির ঠিক কী কী বৈশিষ্ট্যকে মায়া হিসেবে দেখা হবে তা যে খুব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে বা বোধগম্য হয় তা নয়। কিন্তু যৌন-পরিমণ্ডলের

নানানরকম উৎকণ্ঠার মধ্যে এটি অন্যতম। হয়তো নৈর্লিপ্তিকে ঠিকমতো সামাল দিতে না পেরে, কিংবা হয়তো উন্মুখতার যথেষ্ট পরিলক্ষণযোগ্য স্বাক্ষরের অভাবে এই সঙ্কট দেখা দেয়। কিন্তু যখন এই অনুভব সাথিদের একজনের ভিতর সংক্রমিত হয়, এবং উচ্চারিত হয় তখন তা গুরুতর সঙ্কটের আভাসবহ।

কিন্তু মায়ার খেলা-র উছিলায় যে ক্রীড়ারাজ্য নিয়ে কথা হচ্ছে সেখানে মায়া-হীনতার কোনো সুযোগই নেই। সেখানে নারী আর পুরুষ (এমনকি পুরুষ-পুরুষ, নারী-নারী) পরস্পর সন্নিকট হতে থাকেন মায়ার রাজ্যের নিয়মে। এই মায়া এই টান তাঁদের অস্তিত্বের সকল উদ্ভাসের মধ্যে বিকশিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। আধুনিক ইংরেজিতে যাকে বলে 'লজ অব এ্যাট্রাকশন'—আকাঙ্ক্ষার বিধিমালা। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যটিতে যেমন, ইংরেজি অভিব্যক্তিটিতেও মানুষজনের এই সন্নিকট হবার প্রক্রিয়াটিকে প্রায় প্রাকৃতিক হিসেবে দেখা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-চারিতাতে আকর্ষণ/আকাঙ্ক্ষার এই রাজ্যকে প্রাকৃতিক হিসেবেই দেখা হয়। কখনো কখনো প্রাকৃতিক হিসেবে দেখার এই চল এত বিপজ্জনক যে আক্রমণ আর আকর্ষণের ফারাক নিয়ে প্রবক্তারা গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক মানেই তো আর হকিকত নয়। প্রাকৃতিক হোক বা না হোক, পরস্পর সন্নিকট হবার যে প্রেমপ্রবাহ (বা কামনাপ্রবাহ) সেই সন্নিকট হবার বিধিমালা কিংবা সূত্রাবলীই তাহলে মায়া। মায়ার আবেশেই মনুষ্যকুলের অন্তত দুইজন সদস্য পরস্পরে আকৃষ্ট হন, উন্মুখ হন, ধাবিত হন, সন্নিকট হন, মিলিত হন। খেলাই বটে! প্রায় রসায়নশাস্ত্রীয়। ম্যাজিক! বিধাতার লীলা হিসেবে দেখতে আমার বিশেষ সমস্যা নেই, কিন্তু সুবিধাও নেই। এর জটিলতা অবোধগম্যই থেকে যায়। কিন্তু যদি এই আবেশের একজন গুণগ্রাহী, রসগ্রাহী বা গ্রহীতা কেউ হতে চান, তাঁর জন্য কারিগরিটা কী? সম্ভবত ভাষা। ভাষার লীলা, হতে পারে, সেই 'মায়াজাল' সৃষ্টি বা বিস্তার করবে যাতে সন্নিকট হবার সুড়ঙ্গ তৈরি হবে। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম এই কারিগরি। যদি একটুও ভোঁতা কিছু ঘটে, যদি একটুও ছন্দোপতন ঘটে অনায়াসে কথিত এই ভাষালীলা, ম্যাজিক, নিমেষে 'এবিউজ' হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। পাত্র, পরিস্থিতি ও পারঙ্গমতা ভেদে কলা ছলায় পর্যবসিত হতে পারে। তখন সন্নিকট হওয়া নেহায়েৎ অসম্ভব।

মায়ার এই খেলাটুকু নানান মাত্রায় ও রঙে, নানান ছন্দে ও রঙ্গে আমৃত্যুই আমাদের সঙ্গে থাকে বোধহয়। বিষয়টাকে কেবল স্থূল যৌনক্রিয়া দিয়ে অনুধাবন সম্ভব নয়। হয়তো আরও কার্যকরী অনুধাবন-বর্গ হচ্ছে লিপ্সা। আসঙ্গ লিপ্সা। কখনো কোনো জানালায়, চলতি কোনো বাসে, রাস্তার ওপারের রিক্সায়, চা কিংবা কফির দোকানের টেবিলে, সিনেমা হল কিংবা শপিং মলের লাইনে, পুকুর পাড়ের রাস্তায় কোনো চকিত মুখ টোকা দিয়ে যায় না? পরে সেই মুখের মালিক কিংবা মালকিন কি চিনচিনে একটা ব্যথার মতো পুনরায় ফিরে আসেন না? কিংবা মুখ নয়,

আরও টুকরো কিছু। চোখ, চোখের পাতা, হাতের আঙুল, আঙুলের নখ, পরনের পাঞ্জাবি কিংবা শাড়ি, পায়ের পাতা, কানের দুল, কিংবা ঝুলে থাকা গোঁফ। হয়তো একেবারেই অনবধানের একটা চকিত চাহনি। অসম্পর্কের মধ্যকার এই টুকরো টুকরো মনুষ্য-অনুষঙ্গ কি কখনো উচাটন করে না? হয়তো অনেকেরই করে না। হয়তো চিন্তামগুলীর, কাঙক্ষামগুলীর উপর অপার শৃঙ্খলাবোধ থেকে এই উচাটন মন থেকে অনেকেই মুক্ত। অথবা হতে পারে টুকরো এসব কাঙক্ষা থেকে অপসারণ ঘটে প্রতিষ্ঠানের গভীর শাসনবিধি থেকে। কিন্তু অন্যেরা এইসব টুকরো মনুষ্য-অনুষঙ্গে চিনচিনে এক কাঙক্ষা অনুভব করেন। সেই টুকরোটি কখনো হয়তো আবার ফিরে আসে–সকালের আধাঢোকা আলোয় একবার ঘুম থেকে উঠে, আবার সন্ধ্যেবেলার মশা আর অবসাদে ঘোলাটে চোখে আরেকবার; কিংবা রাতে বিছানায় শুয়ে থাকা বিদ্যুতের আলোয় আরো একবার। হয়তো সেই টুকরোটি ভোকাট্টা ঘুড়ির কাগজখানার মতো ফুরফুর করে উড়বে; কিংবা নদীর ভাপানো-কাঁপানো পর্দার মত নাচবে। ঝালরের মত দুলবে। গভীর গাঢ় বিষাদমাখা এক মায়া। গভীর, গাঢ় হয়তো, কিন্তু অপ্রবহমান। আবার কখনো আরেকটি টুকরো এসে দোলা দেবে যখন, এই বিষাদ ম্রিয়মান হবে। যে সম্মিলন এমনকি ঘটেনি কখনো সেটারও উঁকিঝুঁকি থাকে। যে স্মৃতি একরৈখিকভাবে পুঞ্জিভূত হয়নি, সেই স্মৃতির একটা লক্ষণা হয়ে টুকরোটি কোথাও থেকে যায়। টুকরোটি আবার যখন ভেসে ওঠে নেহায়েৎ দৈবচয়নে, তখন ওই বিষাদের রঙটাও উদ্ভাসিত হয়।

মনুষ্য সঙ্গ লিপ্সা কামনার রাজ্যের দরজা। আমার বেলায় এমনকি ঘোরতর অপরিচিত মানুষের সঙ্গও। এমনকি কখনো কখনো সেটাই প্রবল, সেটাই মুখ্য। আর জোড়া লাগাতে না-পারা টুকরোগুলো, একটু আগেই যা বললাম, চিনচিনে এক বেদনা তৈরি করে। কী জানি নেই! তাই মায়াকে আমি কামনার দুনিয়া থেকে বিযোজিত করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলার মায়াও আমার উপলব্ধিতে অনেক কামনাঘনিষ্ঠ।

পুরনো অনেকগুলো চিঠি যখন একত্রে পুড়িয়ে ফেলবার জন্য জড়ো করলাম, বহুদিন আগে, তখন আমার আর এতটুকু পিছুটান নেই। অথচ বহ্ন্যুৎসবের আগের দিনগুলোতে এই ফয়সালায় পৌঁছানোর জন্য নিজেকে তালিম দিতে হয়েছে। নানানজনের বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন রকম আবেগাশ্রয়ী চিঠি। কোনোটার খামে আলাদা মনোযোগ দিয়ে নকশা আঁকা হয়েছে, কোনোটার ভিতরে ফুলের পাঁপড়ি, কোনোটাতে অপেক্ষার বার্তা, কোনোটাতে একটা বৃষ্টিরাত্রির দীর্ঘ বিবরণী। এসব পত্র এমন এক গচ্ছিত পরশপাথরের মতো হয়ে গেছিল যে নানান অবসরে সেগুলোর সঙ্গে নিবিড় মুলাকাত ঘটাতাম। খুলে খুলে বারবার পড়া, ছুঁয়ে ছুঁয়ে কিছু একটা স্পর্শ, সাজিয়ে সাজিয়ে বারবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তুলে রাখা। সেই নিবিড়তা এমনকি

খোদ পত্রকারদেরকেও ছাপিয়ে গেছিল। প্রগাঢ় এক মায়া! সেই মায়া কি পত্রগুলোর সঙ্গে, নাকি ভিতরে লিপিবদ্ধ আর প্রদর্শিত কাঙ্ক্ষাগুলোর সঙ্গে, নাকি খোদ পত্রকার -দের সঙ্গেই—এখন নয় কেবল, পুড়িয়ে ফেলার কালেও তা আবিষ্কার সমূহ দুরূহ ছিল। কখনোই এগুলোর সৎকারের কথা কল্পনাতেও আসত না। অথচ একটা নতুন নিবাস ব্যবস্থাপনাতে ওগুলোকে আবর্জনা হিসেবে সাব্যস্ত করলাম। পয়লায় বুদ্ধিজাত ফয়সালা। প্রগাঢ় এক মায়া এই ফয়সালাকে উল্টে দিতে চাইল বারংবার। এই কয়টা চিঠির আর কতটুকুই বা জায়গা লাগবে! সঙ্গে করে নিয়ে যাই না কেন! কিন্তু বুদ্ধির প্রখর অনুশীলন বারংবার এই লক্ষণার রাজ্য থেকে মেটাফরের শাসন থেকে আমাকে মুক্তি দিতে চাইল। একটুও পিছুটান রইল না। একটা ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনার বিষয় হলো এই অগ্নিসংযোগ।

তারপর, অনেক বছর পর, নিছকই ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে, একটা মৃত্যু সংবাদ শুনি। টাটকা সংবাদও নয়। আমার শ্রুতিগোচর হবার আগেই তাঁর মৃতদেহ মাটিতে বিলীন হয়ে যাবার কথা। তারপরও আমার প্রথমেই মনে পড়ল সেই চিঠি দুটোর কথা, আমাকে তিনি যা লিখেছিলেন আর আমি যা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার আগেই পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। স্মৃতিকল্পলোকের লক্ষণার দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে। হয়তো এক মুহূর্তের জন্য! কিন্তু দিব্যি গভীর এক মায়া, একটা অন্তর্গত বেদনা, আমাকে আচ্ছন্ন করল। পুড়িয়ে ফেলা সেই চিঠি দুটোর জন্য। কিংবা মায়া হয়তো চিঠির শরীরে লিপিবদ্ধ লিপ্সা আর কাঙ্ক্ষার জন্য যা অধরাই থেকে গেছিল, অধরা থাকাই যার পরিণতি ছিল, শুরু থেকেই, হয়তো কেবল চিঠিতে লিখবার জন্যই সেগুলোর উৎপত্তি, যাপনের জন্য নয়। কিংবা মায়া সেই বৃষ্টির রাত্রিটির জন্য পত্রকার যা দেখেছিলেন, লিখেছিলেন; আমি যা অবলোকন করিনি। কিংবা মায়া সেই বৃষ্টির রাত্রিটিতে সেই পত্রকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে থাকতে না-পারার অনুভবকে ঘিরে।

কিন্তু একবারও মনে হলো না তাঁর মৃতদেহের কথা। অনন্তকালের এক যাত্রা একটা মুহূর্তের মায়াতেও জায়গা পেল না।

উত্তরা, ঢাকা ২০শে মার্চ ২০১২

কালের খেয়া, দৈনিক সমকাল, ২৩শে মার্চ ২০১২

মানস চৌধুরী

সোনাবন্ধু'র পিরীতি এবং ভালোবাসার সুশীল ডিসকোর্স

Rabindranath Tagore

পূর্বকথা

লেখাটি এক হিসাবে গান নিয়ে। এক দিকে বাউল বা লোকসঙ্গীত যা কিনা নিম্নবর্গীয় সঙ্গীতচর্চার বিষয়, অন্য দিকে শহুরে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর গান হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীত – এই দুই পরিসর লেখাটিতে বিবেচিত হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই গানের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাজারে পাওয়া যায় এমন শব্দফিতে বা ক্যাসেট। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় লিখিত সংকলন সহজলভ্য বলে সেটিকেও ব্যবহার করা গেছে। যদিও লেখাটি গান নিয়ে, তবুও গান নিয়ে লেখা বলতে যা বোঝায় তা এটি নয়। গানের ডিসকোর্স বুঝবার একটা চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। আধিপত্যশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্যান-ধারণাতে প্রেম-ভালোবাসার যে বৈশিষ্ট্য তা মূলগতভাবে নিম্নবর্গীয় ধ্যান-ধারণা হতে আলাদা। মধ্যবিত্ত নীতি-নৈতিকতা বোধের পরিসীমা প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতিকে অবদমিত করেছে। গানের মধ্যেও সেই নৈতিকতা-

বোধ প্রকাশিত। ‘সুশীল ডিসকোর্স’ বলতে এখানে ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণীর বাৎচিত বা ডিসকোর্স বোঝানো হয়েছে যার সূত্র হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেছে নিয়েছি। ‘সোনাবন্ধু’ ‘কালাচাঁদ’ ‘কালিয়া’ ‘পরাণবন্ধু’ ‘রাই বিনোদিনী’ এসবই লোক সঙ্গীত কিংবা বাউলসঙ্গীতে প্রেমাস্পদ মানুষকে সম্বোধন করার পদ। ‘সোনাবন্ধু’র পিরীতি বলতে নিম্নবর্গীয় মানুষজনের প্রেম-ভালোবাসা বোঝানো হচ্ছে।

এই বিষয়ে কাজ ও লেখালেখির একটা সূত্রপাত হিসেবে ভাবছি বর্তমান লেখাটিকে। বাউল গান কিংবা লোকসঙ্গীত অথবা মধ্যবিত্তের গান কোনটাই প্রচুর সংখ্যায় বিবেচিত হয়নি এই লেখায়। প্রান্তিক হলেও যে বাউল চর্চা চলছে তার প্রত্যক্ষ পরিবেশন দেখাও জরুরী। বর্তমান লেখাটিকে এ বিষয়ে পাঠ করবার একটা প্রস্তাবনা হিসেবেই দাঁড় করাতে চাইছি, এর বেশী কিছু নয়।

কেন নৃবিজ্ঞানীর জন্য এই বিষয়ে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ?

নৃবিজ্ঞান বা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের শাখায় কাজ করছেন – এমন কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, প্রেম-পিরীতি বিষয়ে কিংবা গান নিয়ে গবেষণা বা জ্ঞানার্জন করা নৃবিজ্ঞানীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কেন? এই জিজ্ঞাসা নিয়ে এগুতে চাইলে গোড়াতেই একটা তাত্ত্বিক পূর্বানুমানকে জায়গা দেয়া জরুরী। তা হচ্ছে: প্রেম-ভালোবাসা শ্রেণী নিরপেক্ষ নয় এবং সামাজিক অনুশীলনে এর লিঙ্গীয় পরিসরও নির্মিত। ফলে প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে গবেষণায় মনোযোগ দেয়া একই সাথে শ্রেণী ও লিঙ্গের বিষয়ে মনোযোগ দেয়াও বটে। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী হিসেবে সে দায় কারো না কারো ওপর বর্তায়। আবার, গান অনুভূতি প্রকাশকারী এবং উদ্রেককারী হিসেবে তৎপর ভূমিকা রাখে। গানের ডিসকোর্স বা বাৎচিত বিশেষ সময়কালে, বিশেষ মানুষজনকে বিশেষ প্রসঙ্গ তুলে ধরতে সহায়তা করে। তাই, যে সময়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা ডিসকোর্স বিশ্লেষণকেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে তখন গানের ডিসকোর্সও বাদ পড়তে পারে না। গানে প্রেম-ভালোবাসা একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গানে তা একভাবে নিম্নবর্গীয় গানে অন্যভাবে। তবে গড়পড়তা প্রেম-পিরীতির একটা বিস্তৃত পরিসর গানের জগতে স্থান পেয়েছে। ফলে প্রেম-পিরীতির ডিসকোর্স অনুসন্ধান করবার জন্য গান একটা অর্থবহ জায়গা।

ডিসকোর্সকে বিশেষকালে, বিশেষ স্থানে ক্রিয়াশীল বক্তব্যের সমষ্টি হিসেবে উপলব্ধি করা হচ্ছে জ্ঞানজগতে, যা বিশেষ প্রসঙ্গ, অনুভূতি প্রকাশ করে। শ্রেণীগত পার্থক্যকে যদি নিছক সম্পদের পার্থক্য হিসেবে না দেখি তাহলে ধ্যান-ধারণা বুঝতে ডিসকোর্সও সহায়ক হতে পারে। তেমনি লিঙ্গীয় বৈষম্যকে যদি ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ অনুশীলন দিয়ে বুঝতে চাই, সেক্ষেত্রেও ডিসকোর্স সহায়ক হতে পারে। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কাজ যেমন লিঙ্গ ও শ্রেণী বুঝবার কাজ, তেমনি ডিসকোর্স

বিশ্লেষণ আসলে শ্রেণীগত ও লিঙ্গীয় চৈতন্য বিশ্লেষণ। সামাজিক নৃবিজ্ঞানীর পরিসরেই এই কাজ।

পদ্ধতিগত সংকট

গানের যান্ত্রিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মধ্যেই কতকগুলো সংকট তৈরি হয় যে সংকটগুলির মুখোমুখি না হয়ে গবেষকের উপায় থাকে না। সংকটগুলো কমবেশী গানের লেখকস্বত্ব এবং সময়কালের সাথে সর্ম্পকিত। আধুনিকায়ন প্রকল্প স্পষ্টতই বিশেষীকরণের জন্ম দিয়েছে। সেই হিসেবে অ-লোকসঙ্গীতের সমস্ত জগতই গীতিকার, সুরকার গাইয়ে এবং বাদ্যযন্ত্রীর পরিচয়কে, সেইসাথে ভূমিকাকেও, আলাদা করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় গীতিকার ও সুরকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা স্বতন্ত্র করাই কেবল নয়, সুরের খাঁটিত্ব পরীক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী করবার প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। কিন্তু, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাইরেও নজরুল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গানের পাশাপাশি যেগুলো আধুনিক গান হিসেবে পরিচিত – সেগুলোরও রচয়িতা, সুরকার এবং গাইয়েরা অন্ততঃ চিহ্নিত হয়ে থাকেন। বড় বড় গান-উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে যথেষ্ট খেয়াল রাখে এবং আধুনিক উৎপাদন ও মজুরী-ব্যবস্থায় তা খেয়াল না রাখবার উপায়ও নেই। ফলে এমনকি ক্যাসেটের গানেরও রচয়িতা ও সময়কাল অনায়াসেই জানা সম্ভব কিংবা কিছু ইঙ্গিত হতে অনুসন্ধান করা সম্ভব। এখানে লেখকস্বত্বের সীমারেখা বজায় রাখা লেখকের নিজের কর্তব্যের মধ্যে যেমন পড়ে, তেমনি উৎপাদক ও বাজারজাতকারীর কর্তব্যও বটে। সেই সীমারেখাটা আসলে পণ্যের নির্মাতা চিহ্নিতকরণের সীমারেখা।

উল্টোদিকে, লোকসঙ্গীত বলতে ‘ভদ্রলোক’রা যা বুঝে থাকেন কিংবা বাউলগান আধুনিক পুঁজিবাদী বিশেষীকরণের নিয়মে পড়ে না। এর রেওয়াজ একে-বারেই ভিন্ন। এর চর্চা শরীকি। সেটা নানাভাবেই শরীকি। প্রথমত, যে দল বাউলগান পরিবেশন করেন, বাদ্যযন্ত্রী ও গাইয়ে সহ, তাঁদের অংশগ্রহণ শরীকি। দ্বিতীয়ত, শ্রোতামণ্ডলীর স্পষ্ট ভাব-আদানপ্রদান ঘটে থাকে এই ধরণের পরিবেশনে, সেই অর্থেও এটা শরীকি। তৃতীয়ত এবং মুখ্যত, কোন একটা বিষয়বস্তুকে বা গল্পকে নানানজনই তাঁর গানে বাঁধতে পারেন। ‘গানবান্ধা’র সেই নিয়মে গল্প যেমন বদলাতে পারে, তেমনিই পরিবেশন ঢঙ বদলাতে পারে। এরকম নানা পরিসরের স্বাধীনতা রয়েছে বাউল গানের গাইয়েদের। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, পুরো জগৎটাই কথ্য ঐতিহ্যের, লেখ্য ঐতিহ্যের নয়। গান শেখা এবং শেখানো সবটাই পরম্পরা নির্ভর। তাই পদ দীর্ঘকাল একদম অবিকল থাকতে নাই থাকতে পারে আর সেইটেই গ্রহণ-যোগ্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ‘কপিরাইট’ ব্যবস্থা সেখানে অর্থহীন। তবে গানের মধ্যেই

কোন রচয়িতা উপস্থিত থাকবার একটা চল আছে যা সব ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকরী নয়। লালনের অনেক গানে লালনের পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি যুক্তি দিতে থাকেন তাঁর পদে, যেমন 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে'; কিন্তু অন্য অনেক গানেই তা পাওয়া যায় না। ফলে এসব গানের রচয়িতা বা সময়কাল কোনটাই আবিষ্কার সম্ভব হয় না।

এটা ভাবা সঙ্গত হবে না যে, সমস্যাটা কেবলমাত্র একজন লেখক আবিষ্কার করতে না পারা কিংবা রচনার সময়কাল জানতে না পারার মত সরল। সেটা আপাতঃ সমস্যা। এমনকি একটা কাল্পনিক নিরঙ্কুশ লোকজীবনে সেটা কোন সমস্যাই নয়। বাউলচর্চায় গুরুশিক্ষা হতেই বাউল শেখেন দার্শনিক তথা গানের নির্মাতাকে। কিন্তু, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে, সেই সাথে উৎপাদক ও গানের কারখানাকে। সেক্ষেত্রে সংকটের গভীরতর একটা চেহারা দাঁড়াচ্ছে। দুটো উপলব্ধি দিয়ে সেই সংকটকে চেনা সম্ভব। প্রথম উপলব্ধি হচ্ছেঃ গানের বাজার বিস্তৃত হতে শুরু করার পর 'পল্লীগীতি' বা 'লোকগীতি' বলে একটা জিনিস উৎপাদিত হচ্ছে। টেলিভিশন বা রেডিও প্রধান সারির উদ্যোক্তা হলেও ক্যাসেট কোম্পানীগুলোর উত্থানের পর তা আলাদা গুরুত্বের জায়গায় এসেছে। এসব ক্ষেত্রে গীতিকারকে একদম সাজিয়ে বানানো হচ্ছে। কিছু অ-ভদ্রলোকী শব্দ ও কথা, ক্রিয়াপদের কিছু অ-শহুরে উচ্চারণ এবং লোকসুরের একটা কাঠামো জুড়ে দেয়া – মোটামুটি এই হচ্ছে 'পল্লীগীতি' বানাবার কারিগরী কৌশল। লোক মনোজগৎ ও বাউল চিন্তাপদ্ধতি বুঝতে চাইলে কারখানায় বানানো পল্লীগীতিগুলো সনাক্ত করা জরুরী। বাজারের বাউল গানের সংকলনে খুব কম ক্ষেত্রেই রচয়িতার নাম থাকে; আবার থাকলেও নিশ্চিত হওয়া কঠিন যে বাউলের পদ শহুরে গীতিকার আত্মসাৎ করেননি – যেহেতু বাউল পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী করবার কোন ব্যবস্থা নেই। বানানো 'লোকগীতি' শ্রোতাদের কাছে গৃহীত হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা এক্ষেত্রে অবান্তর প্রশ্ন। সামাজিক বিজ্ঞানীদের এটা বোঝা খুবই জরুরী যে নিম্নবর্গীয় মানুষজনের সঙ্গীতপিপাসু হবার সামাজিক ব্যবস্থা এই মুহূর্তে খুবই সীমাবদ্ধ। সুতরাং, পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা দিয়েই কোন কিছু বিশ্লেষণ করা সঙ্গত হবে না। বানানো 'পল্লীগীতি' ও বাউলসঙ্গীতের একাকার হয়ে যাবার সমস্যা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে। ডন মিউজিকের অত্যন্ত মুনাফাসফল সংকলন দিলরুবার গাওয়া 'পাগল মন'। সংকলিত ১২টি গানের ১১টিই বানানো হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। একটি গান রাধারমণের, সেটা উল্লেখ করাই আছে সংকলনে। এই এগারোটি গানের মধ্যে রাধারমণের 'ভ্রমর কইও গিয়া'র সংযোজন বিস্ময় তৈরি করে। সুরকারের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্মাতা লিখলেনঃ সংগ্রহ। বাউল গানের সুরের বেলায় সংগ্রহ কথাটি অর্থহীন। একটা বিশেষ পদ্ধতিতে বাউল গান চর্চিত হয় এবং তার আসল

শক্তি বাউল দর্শন। গীতিকার-সুরকার বিভাজনই সেখানে সমস্যাজনক। সুরটা নিজে পয়দা করলেন বলে কোন বাউল মনেও করেন না। বাউল দর্শনের চিন্তা পদ্ধতি এবং লোকচেতনা ও লোকসুরের সম্মিলনকে বুঝতে চাইলে দার্শনিক রাধারমণ, রাধাশ্যাম, কাঙাল হরি পাগল আবুলের গান কিংবা লোকমুখে যৌথভাবে গড়ে ওঠা কোন গান চিনতে পারা জরুরী। বাজারে পণ্যকৃত গানের ক্ষেত্রে সেটা খুবই কঠিন।

সংকটকে চেনার জন্য দুটো উপলব্ধির কথা বলছিলাম। দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছেঃ বাউলসঙ্গীত লোকসঙ্গীত এবং লোকচৈতন্য স্থির কিছু নয়; শহুরে ও মধ্যবিত্ত ভাবনাজগতের অভিঘাত তার রূপান্তর ঘটাচ্ছে। বিশ শতকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে শ্রেণীকাঠামোর ধরণ এবং প্রবল শ্রেণীর দাপটকে চেনা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীর দাপটকে শুধু আর্থিক সামর্থ্য দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, যদিও সেরকম একটা মাথামোটা পাঠভঙ্গি বিদ্যাজগতে রয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর চিন্তাজগতের আধিপত্য রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকাকে দখল করেছে। সেটা কিছুটা চেষ্টা করলে দেখতে পাওয়া সম্ভব। এর বাইরেও রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা, গ্রাম পর্যন্ত বহুকাল আগেই পৌঁছে যাওয়া সরকারী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। 'ভদ্রলোকী' আশা-অকাঙ্ক্ষা, মনোজগৎ, বিশ্বসংসারকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি— সবই লোকজীবনে অনুবাদ হচ্ছে। শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সেই অনুবাদ প্রক্রিয়া চালু রাখছে। এর মধ্য দিয়ে লোকচৈতন্যের রূপান্তর ঘটছে, মধ্যবিত্তের কাছে কাম্য-প্রত্যাশিত লোকচৈতন্য ও লোকজীবনের দিকে; সেই রূপান্তরকে এবং দাপুটে মধ্যবিত্তকে বিশ্লেষণ করতে না পারলে ভ্রান্তপঠন হবে। লোকজীবন ও চৈতন্যকে অনড়, অনৈতিহাসিক শ্রেণীকরণ করে বসলে অনায়াসেই যে সমস্যা হয় তা হচ্ছে: রূপান্তরিত লোকচৈতন্যকেই 'খাঁটি' বলে চিহ্নিত করা এবং সেই 'খাঁটি'র মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। বাজার ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্তের দাপট এতে চাপা পড়ে যায়, নিম্নবর্গীয় মানুষজনের প্রতিরোধ চিনবারও উপায় থাকে না। এই সমস্যা এড়াবার একটা সম্ভাব্য প্রাথমিক রাস্তা হচ্ছে সময়কাল চিহ্নিত করা। বাজারের ক্যাসেট সংকলন হতে তা সম্ভব নয়। এমনকি, বাংলা একাডেমীর লোকসঙ্গীতের পদাবলীর যে বিশাল সংগ্রহ রয়েছে — তাও একই সমস্যায় আক্রান্ত। কোন অঞ্চল হতে সংগৃহীত তার উল্লেখ থাকলেও রচনার সময়কাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিহ্নিত নয়।

লোকজীবনের নিম্নবর্গীয় মানুষজনের আলাপচারী বাঙ্ময় (ডিসকার্সিভ) ক্ষেত্রে যে রদবদল ঘটেছে শ্রেণী বৈষম্যের মধ্য দিয়ে, তার ঘটনার জরুরী। বিশেষত যেখানে ডিসকোর্স বা বাৎচিত নিয়ে গবেষণা হচ্ছে সেখানে ডিসকোর্সের এবং তার অর্থের রূপান্তর উপলব্ধি করতে পারা একেবারে প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কোন একটি মাত্র শব্দও ভিন্ন সময়কালে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। বিপরীতক্রমে, শ্রোতা কোন শব্দ বা ভাষ্যের যে অর্থ খাড়া করেন তাও

ঐতিহাসিক। পঠনও কোন স্থির জায়গায় থাকে না। এ বিষয়েও একটা উদাহরণ দিয়ে খোলাসা করা যেতে পারে। দুটো ভিন্ন সময়কালের লোকসঙ্গীত (একটি বাউলের অন্যটি বানানো) এবং একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'অঙ্গ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যেতে পারে। রাধারমণের গান 'ভ্রমর কইয়ো গিয়া'তে 'অঙ্গ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে–

ভ্রমর কইয়ো গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া (রে)।

রবীন্দ্রনাথের গানে 'অঙ্গ' ব্যবহৃত–

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে
তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম জীবনমরণবিহারী।

কিংবা

ঝলকিছে কত ইন্দু কিরণ, পুলকিছে বনগন্ধ
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ

আবার সাম্প্রতিক সময়ের সংকলন 'পাগলমন'-এ দিলরুবার গলায় গানে 'অঙ্গে'র ব্যবহার পাই –

পিরীতি শিখাইয়া বন্ধু রইলা কেন দূরে
রাতে বিছানা কান্দে নিশিরাতের চরে
অঙ্গের বসন এলোমেলা করিল পাগল রে

তিনটি ক্ষেত্রে 'অঙ্গ' শব্দের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন অনুভূতি তৈরী করে তা। 'অঙ্গ' এখানে নিছক শব্দ নয়। ডিসকোর্স বা বাৎচিত বিশ্লেষণ করতে অনুভূতির এই বদল বোঝা জরুরী। রবীন্দ্রনাথের গানে শরীরহীনতার চর্চা চলে এবং অন্য দুইক্ষেত্রে শরীরানুভূতি প্রকাশিত হয় – ব্যাপারটা এত সরল নয়। একটা বিশেষ সময়কালে কোন বিশেষ শ্রেণীতে কোন ভাষা কী অর্থ বা অনুভূতি প্রকাশ করে সেটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই ডিসকোর্স। মধ্যবিত্ত মানদণ্ডে উপরের উদাহরণগুলোর প্রথমটি ও তৃতীয়টি উভয়ই 'অশ্লীল' বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখা প্রয়োজন, দুটো গানের জন্মকাল ও লোকজগতে অনুশীলনের ঢঙ একেবারেই ভিন্ন। বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশের আগে, লোকসমাজের জীবন ও চিন্তারীতিতে 'শ্লীলতার' মধ্যবিত্ত প্রশ্নটিই অবান্তর ছিল। রাধারমণের গানকে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকে'র নীতিনৈতিকতার শাসনের মধ্যে বড়সড়ভাবে পড়তে হয়নি।

এর মানে এই নয় যে, অভিজাত শ্রেণী তখন ছিল না। পক্ষান্তরে, ঔপনিবেশিক সময়কালে এই শতকের মধ্যবিত্ত শহুরে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর গঠন হল যার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য পূর্বতন অধিপতি শ্রেণীর থেকে ঢের ঢের বেশী। সঙ্গীতকে সংজ্ঞায়ন, মান নির্ধারণ সবই সম্ভব হল এর পক্ষে। 'শ্লীলত-অশ্লীলতা'র দ্বিবিভাজন এই শ্রেণীর উত্থানপর্বের সাথে সর্ম্পকিত করে দেখতে হবে। রাধারমণদের গানগুলো উত্তর-কালের প্রবল মধ্যবিত্ত শ্রেণী খারিজ করে দিতে পারল 'অরুচিকর' 'অশ্লীল' হিসেবে। এই মধ্যবিত্ত নীতিনৈতিকতার বোধ, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাপদ্ধতি এবং এর দাপট বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় উদাহরণটির বেলায় প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারখানায় বানানো সে গানটি যে সময়কালে তৈরী হচ্ছে, সে সময়ে 'শ্লীলতা-অশ্লীলতা'র পরিসর নির্ধারিত। শহুরে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণী যে তখন নিজেরই নির্ধারিত শ্লীল পরিসরে সঙ্গীত চর্চা করছে সেতো স্পষ্টই, উপরন্তু এর বিপরীতে নিম্নবর্গীয়দের সঙ্গীত জগতকে অশ্লীল বলে সাব্যস্ত করছে। এই প্রেক্ষিতে 'শ্লীল-অশ্লীল' পরিসরকে চিনে নিয়ে এবং মেনে নিয়ে নিম্নবর্গীয় সঙ্গীতচর্চা ঘটবার অবকাশ আছে। অর্থাৎ শ্রোতামনের কাছে 'অশ্লীল' অনুভূতি উৎপাদন করাই সেই চর্চার লক্ষ্য হতে পারে। বিশেষত যখন আমরা শহুরে গান-উৎপাদক একটা গোষ্ঠীকে ও বাজারকে চিহ্নিত করতে পারছি, তখন এই বিবেচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে একদিকে শহুরে গান নির্মাতার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কাম্য-প্রত্যাশিত লোকজগৎ নিয়ে বানানো 'পল্লীগীতি' বা 'লোকগীতি'র চল রয়েছে; অন্যদিকে বাউল চিন্তাপদ্ধতি ও লোকচৈতন্যের রূপান্তর ঘটবার দাপুটে ব্যবস্থা রয়েছে। এই দুই বাস্তবতাকে চিনতে পারার জন্য বাউল ও ব্যাপক অর্থে লোকসঙ্গীতের সময়কাল ও রচয়িতা শনাক্তকরণ জরুরী। নইলে বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা এবং লোকচৈতন্য অনুধাবন করা, মধ্যবিত্তের পরিসরে, একেবারেই অসম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় জরুরী। গানের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করার বেলায় পদ বা গানের কথাকে তার গায়কী রেওয়াজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা পদ্ধতিগতভাবে গোলমাল বয়ে আনবে। সূক্ষ বিচারে দেখলে এটা ডিসকোর্সের ধারণাগত সমস্যা হতে তৈরী হতে পারে। ডিসকোর্স বা বাৎচিত শুধুই বাক্যাংশ হতে পারে না। বিশেষ সময়কালে বিশেষভাবে ব্যবহৃত, বিশেষ অনুভূতির উদ্রেককারী হিসেবে ডিসকোর্সকে উপলব্ধি করলে, গানের বেলায় তা কেবল বাণী বা পদ হতে পারে না। এমনকি কেবলমাত্র সুরের সংযোজন থাকা না থাকা নিয়েও বলছি না আমি। সুর কখনো গায়কী রেওয়াজ হতে বিযুক্ত নয়, বাউল ঐতিহ্যে তা কথা হতেও বিযুক্ত হতে পারে না। ফলে, গানের ডিসকোর্স তার প্রকাশভঙ্গিসহ বিবেচ্য হতে হবে। গবেষকের জন্য একটা জটিল মোকাবিলার পরিস্থিতি এটা।শুধু সুরজ্ঞান থাকা বা না থাকার প্রশ্ন নয়, কিভাবে বিশেষ সুর ও গায়নশৈলী বিশেষ অনুভূতির সাথে যুক্ত তা অনুধাবন করবার

একটা তাগিদও থাকতে হবে। এমনিতে প্রচার মাধ্যমে বিশেষভাবে ‘লোকসঙ্গীত’ ও ‘বাউলসঙ্গীত’কে উপস্থাপন করা হয়। সেখানে মাঝে মধ্যেই কিছু ‘ভদ্রলোক’ ও ‘ভদ্রমহিলা’ শ্রেণীর গাইয়েরা লোকসঙ্গীত অর্থাৎ বানানো (manufactured) ‘পল্লীগীতি’ শুনিয়ে থাকেন। কিছুটা উচ্চগ্রামের স্বরে, ভাওয়াইয়া হলে স্থানে-অস্থানে গলাটা খানিক ভেঙ্গে গাইয়েরা পল্লীগীতির স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করে থাকেন। এই মুহূর্তে পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্রওয়ালা ব্যান্ডদলগুলো ‘ফোক’ গান গাইছে। লোকসঙ্গীত বা বাউলসঙ্গীতের ধরন চিনতে এগুলো মধ্যবিত্ত গবেষকের জন্য নয়া নয়া সংকট তৈরি করছে যার মোকাবিলার পথ খোদ গবেষককেই করে নিতে হবে।

এতটা সময় জুড়ে পদ্ধতিগত সংকট নিয়ে আলোচনা করবার একটা স্পষ্ট কারণ আছে। আগেই বলেছি, এ বিষয়ে কাজ ও আগ্রহ এখানেই থামিয়ে রাখবার কোন ইচ্ছে নেই আমার। যদিও গানের ডিসকোর্স বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রেম-পিরীতি বিষয়ে মধ্যবিত্ত ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণীর ভাবনাজগৎ, ধ্যান-ধারণা এবং নিম্নবর্গীয় ভাবনা-জগতে, ধ্যান-ধারণার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করার কথা, তবুও পদ্ধতিগত আলোচনা আগামী কাজের পটভূমি হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

দুই শ্রেণীর প্রেম-পিরীতি

শুরুতেই বহুল পরিচিত একটি লোকগীতির পদ তুলে ধরছি। শব্দ সংরক্ষণ প্রযুক্তির সুবাদে আব্বাসউদ্দেন আহমেদের গলায় খুবই জনপ্রিয় হয় গানটি (দেখার সুবিধার্থে পদের ক্রমাঙ্ক দেয়া হল)।

১. সোনাবন্ধুরে কোন দেশেতে যাইবা ছাড়িয়া।
২. আমি কাইন্দা কাইন্দা হইলাম সারা কেবল তোমার লাগিয়া রে।
৩. সুখবসন্ত দিলরে দেখা
৪. আর তো যৈবন যায়না রাখা
৪. আমি আছি বন্ধু তোমার আশায় চাইয়া রে।
৫. পিরীত কইরা এই ফল হইল
৬. জগতে কলঙ্ক রইল রে
৭. কেবল রইল বন্ধু তোমার লাগিয়া রে।
৮. যেই না দেশে যাইবারে তুমি
৯. সেই না দেশে যাব আমি গো
১০. অঞ্জন পক্ষী হইয়া করব আমি দেখা রে।

লোকসঙ্গীতে ভাবাবেগ (passion) প্রকাশের এই রীতি প্রচলিত এবং এরকম নজির পাওয়া যায় অনেক গানে। গানটি বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলো বিষয় সামনে

চলে আসে। গানটির চতুর্থ ও সপ্তম চরণ পড়ে ভাবা সম্ভব যে এর কথক নারী। কিন্তু লোক ও বাউল সঙ্গীতের আত্মসত্তা (subject) মধ্যবিত্ত গানের মত ধ্রুব নয়। এই বিশেষ গানটি পুরুষ গাইয়ে গাইতে পারেন এবং সে রকম রেওয়াজ চলতি তো আছেই, উপরন্তু একে পুরুষের ভাষা হিসেবে ভাববার সুযোগও রয়েছে। শুরুতেই 'সোনাবন্ধু' সম্বোধন লিঙ্গ নিরপেক্ষ। লোকসঙ্গীতে 'সোনাবন্ধু' 'পরাণবন্ধু' 'পাখী' এরকম বহু সম্বোধন লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। সেই সাথে পুরুষ ও নারী বাচক সম্বোধনও কাজ করে। পুরুষ বাচক সম্বোধন হচ্ছে 'শ্যাম কালাচাঁদ', 'কালা-চাঁদ' 'কালিয়া' 'রসের নাগর' (নারী বাচক ব্যবহারও ঘটতে পারে) ইত্যাদি। নারী বাচক সম্বোধন হচ্ছে 'প্রাণসখী' 'সজনী' 'রাই বিনোদিনী' 'রাধিকা' ইত্যাদি। এই ধরণের সম্বোধন বুঝতে চাইলে বৈষ্ণব প্রভাবকে বিবেচনায় আনতে হবে। লোক-সঙ্গীত কিংবা বাউল সঙ্গীতের জগতে 'রাধাসত্তা' ও 'কৃষ্ণসত্তার' উপস্থিতি নিয়মিত। এই দুই সত্তা এক বিচারে বিপরীতার্থক। কিন্তু, আধুনিক চিন্তা পদ্ধতিতে নারী পুরুষের ভিন্নতা যে দ্বিমুখী তীক্ষ্ণ পরিসর বিভাজন তৈরী করেছে সেই প্রক্রিয়া লোকজগতে অনুপস্থিত ছিল। লোকসঙ্গীতেও তাই লিঙ্গীয় সর্ম্পকের একেবারে শক্ত -পোক্ত বৈষম্য ধরা পড়ে না। সেটা বোঝা সম্ভব লিঙ্গীয় ভূমিকার রূপনির্মাণকে বিবেচনা করলে। যে কাম্য নারীত্ব মধ্যবিত্ত আশা আকাঙ্ক্ষাতে পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে নির্মিত হয়েছে মধ্যবিত্ত গানের জগতে সেই নারীত্ব, রমণীয়তা লোকগানের রূপকথা নির্মাণে অনুপস্থিত।

ওগো শান্ত পাষাণ মূরতি সুন্দরী
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি

কিংবা

সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।।
...
মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে
কুসুমপুঞ্জে সে পবনে দুলিবে (প্রেম পর্ব, *গীতবিতান*)

এই উদাহরণগুলো হতে কাঙ্ক্ষিত রমনীয়তার ধারণা স্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে আসলে উনিশ শতকের ও বিশ শতকের গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত পুরুষেরই (শহুরে ও শিক্ষিত) আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়ে। আপাত দৃষ্টিতে আমার এ ধরনের নির্বাচনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হতে পারে। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই আকাঙ্ক্ষিত নারীত্ব নির্মাণের উদাহরণ দেবার মত বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু যদি আমরা লিঙ্গীয় ভূমিকার নির্দিষ্টকরণ খুঁজতে যাই তাহলে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যার মধ্য

দিয়ে মধ্যবিত্ত পুরুষের পৌরুষ এবং তার বিপরীতে নারীর আদল বানানোর প্রক্রিয়া আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের গানে বাস্তব সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির প্রকাশভঙ্গি অনুধাবন সহজ নয় কিংবা সেই প্রকাশগুলোই স্পষ্ট নয়। ফলে আপাত-ভাবে নারী বা পুরুষ কোন আত্মসত্তাই (subject) খুঁজে পাওয়া দুরূহ। হয়তো মধ্যবিত্ত সাবজেক্ট আরও কার্যকরী পদ হতে পারে অনুসন্ধানের জন্য।

দুই শ্রেণীর সঙ্গীতধারায় নারী ও পুরুষের লিঙ্গীয় ভূমিকার পরিসর নিয়ে আলোচনার গোড়াতেই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, লোকসঙ্গীত বা রবীন্দ্রসঙ্গীত উভয় জগতেই একটা বিষম লিঙ্গীয় (hetero sexual) আধিপত্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। এই চর্চার মধ্যে যে পদাবলীগুলো আমরা দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে পাই, তাও বেড়ে উঠেছে একটা বিষমলিঙ্গীয় সম্পর্ককে আশ্রয় করে, তা ইঙ্গিত করে একটা বিষমলিঙ্গীয় সম্পর্কের দিকে। কিন্তু, এক্ষেত্রেও নিম্নবর্গীয় ও ভদ্রলোক শ্রেণীর গানের পদে ও প্রকাশভঙ্গিতে মূলগতভাবেই ফারাক আছে। এখানে পদ বা গানের বাণী নিয়েই বলা সম্ভব সহজে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গানে বিষমলিঙ্গীয় সম্পর্ক অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু, স্পষ্ট করেই বলা যায়, লোকগানের অর্থ সব সময় নিরঙ্কুশভাবে বিষম-লিঙ্গীয় সম্পর্কে পরিসীমিত হয় না। এখানে আমি শুধু গানের বাণী বা কথাগুলো লিখবার সময়কার কার্যকরী অর্থের কথাই বলছি না, বরং কিভাবে কোন গান (চূড়ান্ত বিচারে গানের পরিবেশন শৈলীসহ) শ্রোতা পাঠ করতে পারেন তাও আমার বিবেচ্য। শ্রোতার জন্য গানের পঠন শুধুমাত্র বিশেষভাবে পরিসীমিত হয়ে পড়ছে কিনা সেই ভাবনা থেকেই এই প্রসঙ্গটা তুলছি। মধ্যবিত্ত তথা রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত আত্মা (self) অর্থাৎ 'আমি'কে যদি আমরা পুরুষ কল্পনা করি, তাহলে অনিবার্যভাবেই 'তুমি' হচ্ছেন নারী। এখানে তাঁর নিজেরই শ্রেণীকৃত প্রেম পর্বের গানের কথাই বলছি।

> আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে।

কিংবা

> তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে

ইত্যাদি। উদাহরণে পরিসীমিতভাবে এবং সর্বাত্মকভাবেই বিষমলিঙ্গীয় পাঠ-ইঙ্গিত আছে। লোক ও বাউলঙ্গীতে শিথিলতা আছে যার কারণে সর্বাত্মক বিষম-লিঙ্গীয় পাঠের বাইরেও কোন সম্ভাবনা থাকে।

> গোলেমালে গোলেমালে পিরীত কইরো না
> ...

এক পিরীতে শিব শ্মশানবাসী
আরেক পিরীতে গোরা হল নদেয় নিমাই সন্ন্যাসী
ওরে গীত গোবিন্দ পদ্মাবতী এরাই কেবল কয়জনা

কিংবা

তুই আমারে পাগল করলি রে
ওরে ও গোরা দয়া না করিলি
আবার বিচ্ছেদ সাগরে তুই ভাসাইলিরে।

উদাহরণ দুটির প্রথমটির দ্বিতীয় ছত্র যদি লক্ষ্য করি আমরা কিংবা দ্বিতীয়টির প্রথম ও তৃতীয় ছত্র, তাহলে দেখতে পাব সেখানে এমন প্রকাশভঙ্গি ও প্রসঙ্গ আছে যার সাথে সমলিঙ্গীয় ভালোবাসায় অভ্যস্ত মানুষজনও (বিশেষত পুরুষরা) যুক্ত বোধ করতে পারেন। তাঁদের ভালোবাসাবাসির একটা পাঠ দাঁড় করানো সম্ভব এখানে। পঠনের এই বহুবিধ সম্ভাবনা লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। প্রথম উদাহরণটিতে 'পিরীতে সন্ন্যাসী হওয়া' এবং দ্বিতীয় উদাহরণে 'পাগল করা' ও 'বিচ্ছেদ সাগরে ভাসানো' ডিসকোর্সগুলি লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত। তবে সেটা মূলত একটা বিষমলিঙ্গীয় অর্থে। এখানে, এই বিশেষ দুটি গানে পিরীতের প্রধান অর্থ লঙ্ঘিত হয়েছে। আমি জোর দিতে চাইছি এই লঙ্ঘন বা অতিক্রমণ (transgression) লোকসঙ্গীতের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। গোরা বা নিমাই সন্ন্যাসীকে এই গানের পাত্র বানানোর পেছনে চৈতন্যদেবের, যা গোরার সিদ্ধি-উত্তর খেতাব, বিশ্ববীক্ষা-আধ্যাত্মিক চেতনা কাজ করেছে। লোকসঙ্গীত কিংবা বাউলসঙ্গীতের বড় একটা অংশ সে ঐতিহ্যের সাথেও সম্পর্কিত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবনাজগতে শুচিতার একটা নির্দিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণীকে চিনবার ক্ষেত্রে যৌনতার নিয়ন্ত্রণ ও যৌনাচার শাসন করবার বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এই মূল্যবোধ আশ্রয় করেছে বিয়ে ব্যবস্থার ঐতিহাসিক রূপ নেয়ার মধ্যে। আধুনিক বিয়ে ব্যবস্থা শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যৌনমতাদর্শের সবচেয়ে বড় প্রকাশ। একগামিতাকে (monogamy) শুধু নির্দিষ্ট করে দেয়াই এর বৈশিষ্ট্যমাত্র নয়, বরং অপরাপর নানা সম্ভাবনাকে 'অনৈতিক' চিহ্নিত করে প্রান্তিক করে ফেলাও সেই প্রক্রিয়ার পরিচায়ক। মধ্যবিত্তের গানে একগামিতার জয়জয়কার। আমি বলতে চাইছি না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্তমান বিয়ে ব্যবস্থার জয়গান করতে থাকে কিংবা নারী পুরুষের একগামিতা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। আমি এও বলতে চাইছি না যে, একগামিতা গর্হিত কাজ। যে মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয় যুক্ত হয়েছে স্বাধীনতা ও অবমুক্তির সাথে, সেই শ্রেণীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণকে চিনবার জন্য

প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি মাত্র। সেই শাসন ও নিয়ন্ত্রণ এই বিশেষ আলোচনায় ভালোবাসা ও যৌনতা নিয়ে। এই শাসন ও নিয়ন্ত্রণ নারী ও পুরুষের জন্য আবার ভিন্ন। তবে সে আলোচনা ঠিক এই মুহূর্তে আনছি না। রবীন্দ্রনাথের গানে পাই—

আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে

কিংবা

দুজনে দেখা হ'ল মধু যামিনীরে।

এরকম অজস্র উদাহরণে শাব্দিকভাবেই 'দুজন' কিংবা আমি-তুমির মধ্য দিয়ে 'দুজন' নিরন্তরভাবে উপস্থিত এই যুগল উপস্থিতি। একটা বৈধ প্রেমের রূপ নির্মাণ করে, যে বৈধতা একেবারেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীপরিসীমার ও শ্রেণীক্ষমতার উৎপাদন। মধ্যবিত্তই এখানে বৈধতা-অবৈধতা, শুচি-অশুচি বিপ্রতীপতা (dychotomy) তৈরী করেছে। অথচ লোকগানে পাই—

আমায় এত রাতে কেনে ডাক দিলি প্রাণ কোকিলারে
নিভছিল মনের আগুন জ্বালাইয়া গেলি।
আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বাঁকা (হায়রে)
আমায় আসবে বলে শ্যামকালাচাঁদ নাহি দিল দেখা।
আমার শিয়রে শাশুড়ি ঘুমায় জ্বলন্ত নাগিনী
আমার বৈঠানে ননদী শুয়ে দুরন্ত ডাকিনী।।

মধ্যবিত্ত শ্রোতা অনায়সে একে 'পরকীয়া' বলতে পারেন, কিন্তু সেটা মধ্যবিত্ত বিচারবোধে নেতি অর্থই প্রকাশ করে। এখানে শাশুড়ি ও ননদীর পাহারায় থেকে বন্ধুর সাথে সাথে পিরীতি করছেন প্রেমিকা। এখানে তিনি নারী সত্তা। ননদী, শাশুড়ি, নিয়ে কিংবা মাঝির মারফৎ স্বামী ভিন্ন প্রেমিককে বার্তা পাঠানো — একাধিক লোকগানে পাওয়া যায়। বিপরীতক্রমে, কৃষ্ণসত্তাকে পাই যিনি রাধা ভিন্ন বন্ধুর সাথে পিরীতি করছেন। এখানে কৃষ্ণ ও রাধা সত্তাকে নিছক পুরাণের কৃষ্ণ ও রাধার সাথে একাকার করে দেখলে সমস্যাজনক হবে। বাউল ও লোকদর্শনের অন্তর্নিহিত শক্তি অন্যত্র।

শক্তিটা তাহলে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। লোকসঙ্গীত কিংবা বাউলসঙ্গীতের বাস্তবতা বৈজ্ঞানিক নিমিত্ত (scientific reason) নির্ভর নয়। বৈজ্ঞানিক নিমিত্ত একেবারেই আধুনিক প্রগতিবাদী ডিসকোর্স

পয়দা করা। লোকসঙ্গীতের বাস্তবতা বৈজ্ঞানিক নিমিত্ত নির্ভর নয় বলে সেটাকে অবাস্তব ভাবা যাবে না। অবাস্তব ভাবাটা উন্নাসিক বিচারবোধকে হাজির করবে, সমাজ উপলব্ধিকে নয়। তা বাস্তব এ কারণে যে, নির্দিষ্ট মানুষজন এই গানের সাথে যুক্ত বোধ করেন; তাদের আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই গান অর্থহীন হয় না। চণ্ডীদাসের পালায় পাই–

রজকিনী চণ্ডীদাসরে একদিন কইমাছ ভাজিয়া
খাবার তরে আইন্যা রে দিল ঘটিতে ভরিয়া,
পথের মধ্যে ছোকরা একদল চণ্ডীরে জিগায়
ঘটিত ভইরা কী মাছ আনছো দেখাও তুমি আমায়।
...
এশ্‌কের টানে ভাজা কইমাছ
ভাজ কই তাজা হইয়া এবার করে গড়াগড়ি রে
পিরীত রতন পিরীত যতন রে।

এশ্‌কের টানে ভাজা কইমাছ তাজা হচ্ছে শোন লোক শ্রোতারা এর সম্ভব-অসম্ভব বিচার করতে বসেন না। মাছ তাজা হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এশকের মাহাত্ম্য যেভাবে অনুভূত হল – সেই অনুভূতি লাভটাই এখানে বড় বিবেচ্য। মধ্যবিত্ত যাকে যুক্তিশীলতা (rationality) বলে জানেন তার কোন প্রাসঙ্গিকতা এখানে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। অনুভূতির ঐ বিশেষ প্রাসঙ্গিকতাই ডিসকোর্সকে বুঝতে সহায়তা করবে।

উদাহরণটিতে একটা টানা গল্প আছে। গল্পের বয়ান লোকগানের একটা বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর গাঁথা ছাড়া বাউল দর্শনের তত্ত্বপ্রধান গানে যুক্তিতর্কের ব্যাপক উপস্থিতি থাকে। বয়ান (narration) বা যুক্তিতর্কের এই শৈলী বাউল কিংবা লোকসঙ্গীতের একটা চাঙ্গা দেহ বানায়। মধ্যবিত্ত গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনভাবেই এটা নয়। এই ভিন্নতা দুধরণের আত্মসত্তা (subject) বানানোতে মদদ দেয়। লোকগানের বয়ানে প্রচুর ক্রিয়া (action) থাকে কিংবা থাকে তর্ক করবার যুক্তি। সেই ক্রিয়াতে অংশগ্রহণকারী পাত্রপাত্রী বা সেই যুক্তি প্রদানকারী বাউল মিলে যে লোক আত্মসত্তা প্রকাশ করে তা সক্রিয় (active)। মধ্যবিত্ত আত্মসত্তা ক্রিয়া হতে বিযুক্ত থাকে। একটা নিষ্ক্রিয়তা সেই আত্মসত্তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়। ভালোবাসাবাসির গানে এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ অর্থ বহন করে। চলতি ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের গান বিশ্লেষণে প্রায়শই কতকগুলো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। যেমন 'বিমূর্ত', 'অতীন্দ্রিয়', অথবা বলা হয় 'শরীরকে অতিক্রম করে নিয়েছেন তিনি' কিংবা 'স্বাপ্নিলতাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণ'। একথা সঠিক যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে রূপকের

(metaphor) ব্যবহার প্রচুর এবং তা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। কিন্তু, স্পষ্ট হওয়া দরকার, রূপক ব্যবহার রবীন্দ্রসঙ্গীতকে লোকসঙ্গীত থেকে পৃথক করেনি। রূপক লোকসঙ্গীতেও প্রচুর ব্যবহৃত।

এখানে একটা সরল রাস্তা ভেবে দেখা যেতে পারে। ক্রিয়ার সাথে 'আত্মে'র (self) নিরন্তর বিযুক্ত হতে থাকা রবীন্দ্রনাথের গানকে পৃথক করেছে। আত্মসত্তার এই বিযুক্তিকে মোটের ওপর 'আধুনিক গানের'ই (রবীন্দ্রসঙ্গীতসহ) বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে আধুনিক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গানের অগ্রদূত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গানই বিশেষভাবে ভাবা হচ্ছে। আত্মসত্তার এই বিযুক্তি প্রক্রিয়ায় ক্রিয়া যা কিছু হয় তার বেশীর ভাগই 'নিজ' এর বাইরে। 'নিজ' বা 'আত্মা' একটা স্থির যেন। প্রেম-ভালোবাসার গানে এই বিযুক্তিকরণ প্রেমকে শরীরহীন করে ছাড়ে শেষমেশ। ভাবাবেগ/উদ্বেলতা (passion) তখন চাপা পড়ে যায়। প্রেমের অযৌন-করণের মধ্য দিয়ে আমরা আবিষ্কার করতে পারি অবদমিত (repressed) মধ্যবিত্ত আত্মসত্তা। রবীন্দ্রনাথের গানের দুর্বোধ্যতা বলতে মধ্যবিত্ত পরিসরে যা বোঝানো হয় তা আসলে এই অবদমিত আত্মসত্তার উদযাপন কখনো কখনো। বিযুক্তিকরণকে এক্ষেত্রে অযৌনকরণ, অশরীরীকরণের কারণ ভাবলে ভুল হবে। অযৌনকরণ এখানে উদ্দেশ্য, বিযুক্তিকরণ উপায়। মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর প্রকল্প এটা। যৌন-নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের প্রকল্প, অনুভূতির অবদমনের মধ্য দিয়ে। ক্রিয়া-অক্রিয়ার কথা বলছিলাম। নিম্নবর্গীয় পদে 'বিরলে বসিয়া কান্দি' পাওয়া গেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে পাই 'ভাষাহারা মম বিজন রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা।' নীচে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে হতে ইচ্ছেমত বাছাই করে কতকগুলো ক্রিয়া তুলে ধরছি। সবই প্রেমপর্ব হতে, প্রাসঙ্গিকভাবেই (পাশের ক্রমাঙ্ক গীতবিতানে প্রেমপর্বের গানের ক্রমাঙ্ক)।

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা যাওয়া (১১)
গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে (১৭)
যে ফুল গেছে সকল ফেলে (২১)
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে (২৯)
ছিড়ি মর্মের শত-বন্ধন তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন (৩২)
বাতাসে কী কথা ভেসে চলে আসে (৫৮)

লোকগানে 'নিজ' বা 'আত্ম' সক্রিয় সচল। সেখানে পিরীতির রেওয়াজ ভিন্ন। শরীরকে অনুভূতি হতে পৃথক করবার আধুনিক তাগিদ নেই। উদ্বেলতা (passion) প্রকাশের চল সেখানে আছে। প্রথম উদারণটিতে আবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। গানটির ৩,৪,৯,১০,১১ ক্রমাঙ্কের চরণ বা ছত্রগুলিতে প্রেমিকের বা বন্ধুর ভাবাবেগ

বা উদ্বেলতা প্রকাশিত। 'সুখবসন্ত' দেখা দিল, 'যৌবন ধরে রাখা' কঠিন এবং 'বন্ধুর সান্নিধ্যে' যাবার জন্য অঞ্জন পাখী হওয়ার বাসনা। বসন্তের খুব স্পষ্ট একটা অর্থ লোকচৈতন্যে আছে। তার আগে 'সুখ' বিশেষণের ব্যবহার ভাবাবেগকে স্পষ্ট করেছে, বসন্তের কামোদ্দীপক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। নিম্নবর্গীয় মনোজগতে এই অনুভূতি অবদমনের প্রয়োজন নেই। পিরীতি শরীর হতে ব্যবচ্ছেদ কৃত হয় না।

তোমার দেহভরা রূপের যে রাশি
ও তুমি অধর পুরে দেহ হাসি রে
যোগী ভিক্ষা ধর।

ভিক্ষা এখানে প্রেমের রূপক, বলাই বাহুল্য, অশরীরী নয়। এই উদাহরণটি অবশ্য লিঙ্গীয় রূপনির্মাণের অনির্দিষ্টতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে। কিংবা 'পাগল হইয়ে কোলে বসিয়ে নয়নের জলে বন্ধু আমায় ভাসাইলি', 'ও রসের কালিয়া, কই গেলি কই গেলি আগুন জ্বালাইয়া' ইত্যাদি।

'প্রেমের আগুন জ্বালাইয়া' বলবার মধ্যে অনবদমিত প্রেমাবেগ প্রকাশিত হয়। লোক ঐতিহ্যে, অরূপান্তরিত নিম্নবর্গীয় প্রেম-পিরীতিতে সেটা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় যা গুটিকতক উদাহরণে স্পষ্ট নাও হতে পারে। 'ভদ্রলোকে'র সুশীল বাৎচিতে এই প্রেমাবেগ প্রকাশিত হয় না, গঠিত ভদ্রলোক শ্রেণী এই প্রেমাবেগ প্রত্যাশাও করে না। চূড়ান্ত বিচারে বিয়েমুখী যৌনশাসিত যুগল নির্মাণই (অবশ্যই বিষমলিঙ্গীয়) এই শ্রেণীর প্রেমচর্চা।

পাঠ নির্দেশ

ফরহাদ মজহার, 'লালন ও আমাদের সময়', চিন্তা, বছর ৪, সংখ্যা ৫, ১৯৯৪
ফরহাদ মজহার, 'কে তাহারে চিনতে পারে', চিন্তা, বছর ৭, সংখ্যা ১৬, ১৯৯৮
ফরহাদ মজহার, 'বাংলার ভাবান্দোলন', শৈলী, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১৬, ১৯৯৮
মানস চৌধুরী ও রেহনুমা আহমেদ, 'লিঙ্গ, শ্রেণী ও অনুবাদের ক্ষমতা: বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত বিয়ে ও পরিবার', *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৩৩, ১৯৯৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী, কলকাতা
Asad, Talal, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of power in Christianity and Islam, The John Hopkins University Press, London, 1993
Gramsci, Antonio, Selections from the Prison Notebooks, Orient Longman, Hyderabad, 1996
Hall, Stuart, Representations: Cultural Representation and

signifying Practices, Sage and Open University Press, London, 1997
Foucault, Michel, The Archaeology of Knowledge, Routledge, London, 1997, (1972)

এখানে মুদ্রিত রচনাটি এস. এম. নূরুল আলম, আইনুন নাহার এবং মানস চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত *সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

মানস চৌধুরী

‘সূক্ষ্ম প্রেমে’র অর্থ: নিম্নবর্গীয় গানে যৌনতা এবং নারীর আত্মসত্তা

Rabindranath Tagore

আমি সূক্ষ্ম প্রেমের অর্থ বুঝলাম না
সজনী গো, সূক্ষ্ম প্রেমের অর্থ বুঝলাম না
বিল্বমঙ্গল প্রেম করিল, বেশ্যার প্রেমে পাগল হইল
জাতি কুলের ভয় আর রাখল না
সে যে বেশ্যার প্রেমে হইল দিওয়ানা

প্রেমিক হইলে চিনতে পারে কোন্ জন তোমার সূক্ষ্ম প্রেমের মূল মহাজন
কোন্ সাধনায় কে কোথায় পায় সেই প্রেমসুধা অমূল্য রতন

প্রসঙ্গসূত্র

গত বছর এই ফলিত নৃবিজ্ঞান প্রকল্পেরই আওতায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে যখন প্রবন্ধ উপস্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছি 'সোনাবন্ধু'র পিরীতি এবং ভালোবাসার সুশীল ডিসকোর্স' বিষয়ে, একটা শঙ্কা ছিল। শঙ্কাটা ছিল নৃবিজ্ঞানের পরিধি এবং বিষয়বস্তু যেভাবে অনুশীলিত হচ্ছে তাতে এই বিষয়ে প্রবন্ধ নৃবিজ্ঞানের আকর (core) পরিধিতে বিবেচিত হবে কিনা। প্রবন্ধটা ছিল প্রেম-ভালোবাসা বিষয়ে। প্রেম-ভালোবাসা যে শ্রেণীগত এবং তা বাঙ্ময় (discursive) জগতে নিরন্তর চর্চিত এবং প্রকাশিত – সেই উপলব্ধিটাই প্রবন্ধটির ভিত্তিভূমি দাঁড় করিয়েছিল। আর তাকে বুঝতে পরিসর হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম গান, নিম্নবর্গীয় গান হিসেবে বাউল গান এবং মধ্যবিত্তের গান হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীত। এখন, এ কথা পরিষ্কারভাবেই বলা প্রয়োজন, খোদ নৃবিজ্ঞানে বহুল পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত বিষয়বস্তুর পরিধি যেভাবে নির্মিত হয়েছে এবং নিরন্তর হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াটা নিয়েই আমার জিজ্ঞাসা উন্মুখ বলে শঙ্কাটা আর নেই। আর জ্ঞানকাণ্ডের (discipline) পরিধির সীমারেখা নির্ধারণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা বিষয়েই যদি কথা বলি তাহলে তা আর কেবল নৃবিজ্ঞানে পরিসীমিত থাকে না। বিশেষজ্ঞ বাছাইয়ের প্রক্রিয়া অপরাপর জ্ঞানকাণ্ডের বেলায়ও সমান কার্যকরী। কিন্তু সে প্রসঙ্গে এই আলোচনা নয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে, নৃবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠিত অনুশীলনের দিক থেকে ভাবলে, তিনটি উৎকণ্ঠাময় কিংবা বিব্রতকর জায়গা ছিল: ক) প্রেম-ভালোবাসা, খ) গান, এবং গ) বাউল। গোড়াতেই এটা পষ্টাপষ্টি বুঝে নেয়া কাজের হবে – এই তিন অস্বস্তির প্রসঙ্গ কোথাও কোন এক সূত্রে বাঁধা আছে। পাণ্ডিত্যের (scholarship) দুনিয়ায় এর সবগুলিই কোন না কোন ভাবে স্থূলার্থময়। পাণ্ডিত্যের এই বিবেচনাবোধ, খুবই সাধারণ একটা পর্যবেক্ষণ হিসেবেই বলা সম্ভব, বিদ্যাজগতের (academics) অভিজাত ভিত্তিভূমির সাথে সম্পর্কিত। এই বাস্তবতাটি বিশেষভাবে মনোযোগের দাবী রাখে। নৃবিজ্ঞানের কথাই যেহেতু হচ্ছে, আমাদের বিস্মৃত হওয়া ঠিক হবে না যে এই জ্ঞানকাণ্ডটি বিশেষভাবে নিরপেক্ষতা এবং গবেষণা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কথা বলে আসছে। তাহলে প্রশ্ন চলেই আসে, বাউলদের নিয়ে কিংবা বাউল জীবন ও দর্শন নিয়ে গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীর অংশগ্রহণের মানে কী? নিশ্চয়ই অংশগ্রহণের উৎকণ্ঠাকে আর ছোট করে দেখার উপায় নেই।

কিন্তু, প্রশ্নটাকে ঠিক এই জায়গাতে থামিয়ে রাখা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। কারণ,

প্রেম-ভালোবাসা বা ইত্যকার বিষয় নিয়ে তো নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন[১]। আবার জাতিগত সঙ্গীতশাস্ত্র (ethnomusicology) বলে একটা শাখা নৃবিজ্ঞানের মধ্যেই দাঁড়িয়েছে। তাহলে সঙ্গীতকে নৃবিজ্ঞানের প্রসঙ্গচ্যুত করা হয়েছে তাও বলা যায় না। আর বাউল বা অন্যান্য নিম্নশ্রেণী নৃবিজ্ঞানে রীতিমত গবেষিত বিষয়। লোকশাস্ত্রবিদ্যাকে (folklore studies) অনেক ক্ষেত্রেই নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা হয়, তবে কেবল সেটাই নয়, নৃবিজ্ঞানের তুলনামূলকভাবে পরিচিত পরিধিতেই বাউল নিয়ে গবেষণা হয়, বেদে বা মাছুয়া (জেলে) হলে নৃবিজ্ঞানীরা আরও খুশী হন। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? এই সমস্যাকে চিনবার জন্য আমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে নৃবিজ্ঞানের খোদ কেন্দ্রীয় জায়গাতেই – তা হচ্ছে সংস্কৃতির ধারণা। আমাদের উদ্দিষ্ট মনোযোগ আরও অর্থ বহন করে এই সময়কালে যখন গণমাধ্যমে[২] প্রচারিত পণ্যের বিজ্ঞাপনে বাউলকে নিয়ে আসা হচ্ছে কিংবা বেদেকে কেন্দ্রীয় জায়গায় রেখে নির্মিত চলচ্চিত্র বিপুল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি'র ধারণা এবং সাব-কালচার

এটা বলা আর নতুন কিছু নয় যে, নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির ধারণা একেবারে কেন্দ্রীয়

---

১ উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ম্যালিনোস্কির দুটো এবং মার্গারেট মীডের একটি বইয়ের কথা– ক) Bronislaw Malinowski (1927) Sex and Repression in Savage Society; খ) Bronislaw Malinowski (1929) The Sexual Life of Savage; গ) Margaret Mead (1928) Coming of Age in Samoa, New York।

২ গণমাধ্যম যে 'গণ' নয় সেটা না বোঝা রাজনৈতিক ভ্রান্তি বয়ে আনবে। এ প্রসঙ্গে বাহাস (polemics) চলা জরুরী, একটা চিন্তাসূত্র উল্লেখ করছি সেই তাগিদ থেকেই। এই শব্দমূলটি আধুনিক সমাজে নানাবিধভাবে প্রয়োগকৃত এবং নানা বাঙ্ময় পরিক্ষেত্র (discursive field) রচনা করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে, নিশ্চিতভাবেই, 'গণতন্ত্র'। উদার নির্বাচনী গণতন্ত্র যখন সকল আধুনিক রাষ্ট্রের ঘোষণা এবং আধুনিক সমাজের লক্ষ্য, তখন শব্দমূলটির মৌলিক মানে নির্ধারিত হয়েছে 'গণতন্ত্র' ধারণাটির সাপেক্ষেই। বাঙ্ময় পরিক্ষেত্রকে বুঝতে চাইলে, সম্ভবত, আমাদের গভীরভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে এই পরিক্ষেত্রগুলি পরস্পরকে ছেদ করে। এর একটা মানে হলো ক্ষেত্রগুলো অন্তর্প্রবিষ্ট (intersected) এবং অন্য মানে হলো ক্ষেত্রগুলোর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থের জবরদখল তৈরী করে। এক্ষেত্রে 'গণ' শব্দের অর্থ নিয়ে কথা হচ্ছে। ব্যাকরণের পণ্ডিতরা আরও ভালো বোঝাতে পারবেন যে ধাতুমূল নিয়ে এই গড়াপেটা (manipulation) একই রকম সহজে সম্ভব নয়। তাহলে আমার বক্তব্যের সারাংশ হচ্ছে: 'গণ'-এর উদারনীতিক অর্থ নির্ধারিত হয়েছে 'গণতন্ত্র' দ্বারা; আর বাঙ্ময় পরিক্ষেত্রে অর্থের লড়াই যদি চালাতেই হয় –'গণমাধ্যম' ধরে এগোনো চলবে না, আধুনিক 'গণতন্ত্রে'র শক্তিমান ভিতকে প্রশ্ন করতে পারা লাগবে, এর অর্থ (অসারতা) উন্মোচন করতে হবে। যদি সেইটা আমাদের লক্ষ্য সাব্যস্ত করি আর কি!

গুরুত্বের জায়গায় রয়েছে। বস্তুত, নৃবিজ্ঞানকে উপলব্ধি করা হয়েছে সংস্কৃতির অধ্যয়ন হিসেবে। সংস্কৃতির ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মূলত 'মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি' হিসেবে।[৩] কিন্তু বড়সড় যে প্রশ্নটা এখানে চলে আসে, আবার সেটাই খুব অনুচ্চারিত, তা হলো – কোন্ ধরনের সমাজের মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতি পাঠ করা হয়েছে? কিংবা, নৃবিজ্ঞানের বিকাশ ইয়োরোপে হওয়া সত্ত্বেও ইয়োরোপের সংস্কৃতির পাঠ বা অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞান চর্চার অন্তর্ভুক্ত হলো না কেন? এই প্রশ্নগুলো উত্থাপনের সাথে সাথেই নৃবিজ্ঞানে আকর চর্চাসমূহের পাটাতন সম্পর্কে বুঝে নিতে হয়। সেই পাটাতন হচ্ছে একটা কাঠামোগত অসমতার সম্পর্ক। ফলে, যদিও নৃবিজ্ঞানকে দেখা হয়েছে সংস্কৃতির অধ্যয়ন হিসেবে, এবং যদিও গোড়ার দিকের নৃবিজ্ঞানীগণ কেউই রাজী হতেন না ইয়োরোপের সংস্কৃতি নেই তা ভাবতে, তবুও অধ্যয়ন করা হয়েছে কেবলই অ-ইয়োরোপীয় সমাজকে, তাদের সংস্কৃতিকে।[৪] এখানে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে: ক) নৃবিজ্ঞানে সভ্যতার ধারণা এবং সংস্কৃতির ধারণা পর্যাপ্তভাবে মিশিয়ে গুলিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং খ) ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতা নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি হতে বাদ পড়ার ক্ষেত্রে কতগুলো প্রবল পূর্বানুমান কাজ করেছে।

প্রবল পূর্বানুমানগুলো হচ্ছে: ইয়োরোপ চুড়ান্তভাবে সভ্য এবং সংস্কৃতিবান, ইয়োরোপের সমাজ জটিল সমাজ-সংগঠন নির্ভর, এবং ইয়োরোপের জটিল সমাজ পাঠ করবার জন্য নৃবিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। অন্য কথায় নৃবিজ্ঞান কেবলই সভ্য নয় (অসভ্য) এমন সমাজের পাঠ নেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। শুরুর নৃবিজ্ঞানে এটা ঘোষিত এজেন্ডাই, ফলে অনেক জোর দিয়ে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই এখানে। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একই সঙ্গে সম্পর্কটা পাঠ দেবারও, অসভ্যকে সভ্য করে তুলবার পাঠ। পক্ষান্তরে ইয়োরোপের সমাজ অধ্যয়ন করবার জন্য নানাবিধ বিশেষায়িত জ্ঞানকাণ্ডের (specialised discipline) প্রয়োজনকে বড় করে দেখা হলো, যেহেতু ইয়োরোপের সমাজ বিকশিত ও জটিল। সমাজতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, নন্দনতত্ত্ব, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন-পরিসর বিশেষভাবে ইয়োরোপেই স্থাপিত হয়েছিল, এবং তা নৃবিজ্ঞানের ঢের ঢের আগেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অ-ইয়োরোপের সমাজ-সংস্কৃতি পাঠ করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞান এই সকল শাস্ত্রের একটা সমন্বিত চেহারা

৩ নৃবিজ্ঞানের যেকোনো পাঠ্য বই গোড়ার দিকের এই উপলব্ধিকে জোরে সোরে প্রকাশ করে।

৪ এই বিষয়ে জোরালো যুক্তি পাবার জন্য দেখা দরকার– Henrika Kuklick (1991) The Savage Within: Social History of British Social Anthropology, 1885-1945, Cambridge University Press, Cambridge.

বানিয়েছে। সেটাও সম্ভব হয়েছে অ-ইয়োরোপের সমাজকে সরল ধরে নেয়ার মধ্য দিয়ে।[৫] 'সাদাসিধে এবং গভীর নয়' সমাজের 'যাবতীয় কিছু' পাঠ করতে একটা শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞই যথেষ্ট – এই অনুসিদ্ধান্ত নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছিল আর তা মনে না রাখা আমাদের কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেবে। এই 'যাবতীয় কিছু'-ই সংস্কৃতি হিসেবে ব্যাখ্যাকৃত হয়ে আসছে। আর সেটাই নৃবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞের চর্চার বিষয়বস্তু। এভাবে, সংস্কৃতির ধারণা অ-ইয়োরোপের সমাজকে একটা কপট সমরূপতায় (homogeneity) পরিসীমিত করেছে।

প্রথাগত সংস্কৃতির ধারণা কিছুতেই সামাজিক সম্পর্ক কিংবা কোন বদল বুঝতে কোনও ভাবেই সহায়তা দেয় না।[৬] সংস্কৃত্যায়ন (acculturation) বলে যে ধারণা দিয়ে নৃবিজ্ঞানে বদল বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে সামাজিক সম্পর্কে দাপটের কেন্দ্রস্থ শক্তিকে না চিনে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, এবং বদলকে একটা সয়ম্ভু বিষয় হিসেবে অনুধাবন করা হয়। এই অপরিহার্যতামুখিন (essentialist) দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গেই সাব-কালচার বা উপ-সংস্কৃতির ধারণাকে আলোচনায় নিয়ে এলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। সাব-কালচার ধারণাটি নৃবিজ্ঞানে প্রায়শই কাজ করেছে শূন্যপূরক (filler) হিসেবে। সমরূপতা অনুধাবনে যেখানেই ছেদ পড়েছে সেখানেই সাব-কালচার ধারণা ব্যবহৃত হয়েছে। এই বাস্তবতাটি বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজের ক্ষেত্রে অর্থবহ। সেই সমাজগুলোতে নৃবিজ্ঞান চর্চা গড়ে উঠেছে অথচ দূরের অসভ্য মানুষজন সেখানে অনুপস্থিত। সেখানে সাব-কালচার নিয়ে অধ্যয়ন করা নৃবিজ্ঞানের মুখ্য পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বদেশী নৃবিজ্ঞানীর জন্য, এবং বিদেশী পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীর জন্য। এই সময়কালেই নৃবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় পরিসরে অসভ্যকে পাঠ করবার বদলে অন্য সংস্কৃতিকে পাঠ করবার এজেন্ডা খাড়া হয়েছে।[৭] লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাব-কালচার চিহ্নিত করবার ভিত্তিটা জনমিতিক (demographic)। অর্থাৎ সংখ্যায় কম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করবার

---

৫ সহকর্মী রেহনুমা আহমেদের সাথে ছোট একটা বৈঠক এই প্রসঙ্গটাতে স্পষ্ট হতে আমায় সাহায্য করেছে। তাঁকে ধন্যবাদ।

৬ এ ব্যাপারে খুব পরিষ্কার আলোচনা পাওয়া যায় সেইডারের কাজে। তিনি ইতিহাসবিদ এবং নৃবিজ্ঞানীর কাজে 'শ্রেণী' এবং 'সংস্কৃতি' ধারণার ব্যবহার নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। (Gerald M. Sider (1986) Culture and Class in Anthropology and History, Cambridge University Press.)

৭ জন বিটি'র কাজ এখানে স্মরণীয়। উপনিবেশোত্তর পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণে এবং ব্যাখ্যায় তাঁর গ্রন্থটির ভূমিকা অপরিসীম। (John Beattie (1964) Other Cultures. Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology, London.)

বেলায় এই বর্গ বা ক্যাটেগরী ব্যবহৃত হচ্ছে। সেটা নিশ্চিতভাবেই দুর্বল একটা বিবেচনা প্রক্রিয়া, অন্তত সামাজিক সম্পর্কের জটিল দিকগুলো বুঝতে চাইলে। সাব-কালচার বর্গবিভাজনের ঐটাই বড় সমস্যা যে এটা কিছুতেই বুঝতে দেয় না কিভাবে এই সংস্কৃতি উপ-সংস্কৃতি বা সাব-কালচার। সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ক্ষমতার পার্থক্য ঢেকে দেয় এই ধারণায়ন। আমাদের পরিষ্কার বোঝার প্রয়োজন আছে যে কিছু সংস্কৃতি সাব এ কারণেই যে অপর বর্গ ক্ষমতাশালী বা দাপুটে। ফলে সাব-কালচার, যদি পরিশব্দ হিসেবেও (ধারণা হিসেবে নয়) ব্যবহার করা হয়, কোনভাবেই সামাজিক কিছু বুঝবার নিয়ামক নয়, এটা নিজেই একটা প্রতিফলন, একটা ফলাফল (কারণ নয়)। অর্থাৎ আমি মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি মাত্র যে, সংস্কৃতি একটা সাপেক্ষিক (relational) প্রসঙ্গ আর সেটা কিছুতেই সাব-কালচার পদে ধরা পড়ে না। এক্ষেত্রে কার্যকরী ধারণা হতে পারে 'প্রবল সংস্কৃতি' এবং 'প্রান্তিক সংস্কৃতি' ধারণা-যুগল। ক্ষমতা সম্পর্ক তাহলে বিশ্লেষিত হবার সম্ভাবনা খোদ পদগুলোর (terms) মধ্যেই নিহিত থাকে। এটা ঠিক যে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুখ্যত নিম্নবর্গের গান। কিন্তু সংস্কৃতি বিষয়ক নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার বিষয়ে খোলাসা না হলে গানের মত বিষয়ে আলাপ উত্থাপন খুবই দুরূহ। সারার্থে, সাব-কালচার হিসেবে নিম্নবর্গীয় গান অথবা বাউল গান, চলতি ভাষায় যেগুলোকে লোকগান বলা হয়েছে[৮] আলোচনা করবার কোন কারণ দেখি না আমি। প্রবল মধ্য-বিত্তের বিপরীতে এবং মধ্যবিত্ত সঙ্গীতচর্চার দাপটে নির্মিত উৎখাত প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হিসেবে নিম্নবর্গীয় গানকে উপলব্ধি করবার প্রস্তাব রেখে এগোতে চাইছি আমি।

যৌন-রাজনীতিতে স্বরের গুরুত্ব

এই আলোচনাতে তিনটি গান হতে পদ তুলে ধরছি। তিনটি গান বাছাই করা একটা প্ররোচিত নমুনায়ন (purposive sampling)। প্রথম গানটি প্রথম জমানার গ্রামোফোনের কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[৯] দ্বিতীয় গানটি স্বাধীন বাংলাদেশের একটা ছায়াছবিতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গানটিও উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[১০] এই গান দুটোর জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গ তুলবার বেলায় মনে

৮ বন্ধু সৈয়দ শামীমের নির্মিত একটা টেলিভিশন অনুষ্ঠান বেসরকারী চ্যানেলে প্রদর্শিত হচ্ছে। সেখানে এক পর্বে মধ্যমণি বা প্রধান বাউল অনিল দে এই কথাটা বলেছিলেন: 'আপনারা যাকে শখ করে নাম দিয়েছেন 'লোকশিল্প'।' অনিল দে'র বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রুপ লোকবিশারদ পণ্ডিতদের কেউ কেউ যে নাখোশ হয়েছেন তার আলামত পাওয়া গেছে।

৯ এইচএমভি প্রকাশিত এই গানটি গেয়েছিলেন আব্বাসউদ্দিন আহমেদ। মধ্যবিত্ত শ্রোতার কাছে বিরাট গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে 'পল্লীগীতি সম্রাট' উপাধি এনে দিয়েছিল।

১০ নীনা হামিদ '৭০ এবং '৮০ দশকে গণমাধ্যমে 'পল্লীগীতি শিল্পী' হিসেবে তুলকালাম

রাখা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র নিম্নবর্গীয় মানুষজনই নয়, বরং কলের গানে বাজার ব্যবস্থা করাতে এই গান দুটোর প্রভাব শহুরে কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজনের ওপরও পড়েছিল। নিম্নবর্গীয় গানের সঙ্গে মধ্যবিত্ত কেতাবী শিক্ষিত শ্রেণীর সম্পর্কের কিছু আকর ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনায় রাখলে এই গান দুটো ভিন্ন, আরও অন্য কিছু গানের পাশাপাশি। গ্রহণযোগ্যতার এই ভিন্নতাকে, আমার প্রস্তাব হচ্ছে, দেখা প্রয়োজন গ্রামোফোন নির্মাতাদের উত্থান এবং কলের গানের ভোক্তা হিসেবে সমর্থ শ্রেণীর প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠার প্রাথমিক যাত্রাপথ হিসেবে। এই বক্তব্যও আমি রাখতে চাইছি যে, আধুনিক গণমাধ্যমে নিম্নবর্গীয় গানের আত্তীকরণ ও গড়াপেটা (manipulation) একই সঙ্গে শুরু হয়েছে, এবং ঐ একই প্রক্রিয়ায়।[১১] অন্য গানটি একেবারেই ভিন্ন পরিসরের। এখনও নিম্নবর্গীয় পদ রচয়িতাগণ, বাউল বলতে সাধারণত যাঁদেরকে বোঝানো হয়, যে সকল পদ নিরন্তর রচনা করে চলেছেন, তার মধ্যকার একটি থেকে এই পদগুলো বাছাই করা হয়েছে।[১২]

১.
আমায় এত রাতে কেনে ডাক দিলি প্রাণ কোকিলা রে
নিভা ছিল মনের আগুন জ্বালাইয়া গেলি

আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ব্যাঁকা (হায় রে)
আমায় আসবে বলে শ্যামকালাচাঁদ নাহি দিল দেখা

পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সম্ভবত খান আতার কোন একটি ছায়াছবিতে এই গানটি তিনি গেয়েছিলেন।

১১ এই বক্তব্যটাকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সময়কালে, যখন 'লোকগীতি'র গড়াপেটা নানাভাবে চলমান, মনে হতে পারে এবং অনেক সমালোচকই সেভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, সাবেক কালে কলের গানের লোকগীতিগুলো 'খাঁটি' ছিল। পরিষ্কার করা দরকার, নিম্নবর্গীয় গানের বেলায় খাঁটি-অখাঁটি তর্কটি আমার আগ্রহ নয়। আমার আগ্রহ বরং নিম্নবর্গীয় মানুষজনের সঙ্গীতকে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল স্বর কাদের, প্রতিনিধিত্বশীল পরিচয় কারা বহন করেন এবং করে এসেছেন। এই জিজ্ঞাসাটি ঔপনিবেশিক কালে কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই শ্রেণীর কাছে এটা গানের একটা আলাদা ধরন ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। নিম্নবর্গীয় জীবনবোধ ও দর্শন নিয়ে অনুসন্ধিৎসু কিংবা অনুশীলনকারী নয় এই শ্রেণী। বর্তমানে লালন চর্চাকারীদের সঙ্গে গণমাধ্যমে নিরন্তর দেখা যায় এমন লালন গানের গাইয়েদের পার্থক্য বিচার করেও এই বাস্তবতাটি মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে।

১২ বাউল রশিদ সরকারের বিরচিত এবং গীত পদ এটি। রশিদ সরকার (১৯৯৪?) দয়াল বাবা কেবলা কাবা, জনি রেকর্ডিং হাউজ, নবাবপুর, ঢাকা (গানের সংকলন বা এ্যালবাম)

আমার শিয়রে শাশুড়ি ঘুমায় জ্বলন্ত নাগিনী
আমার বৈঠানে ননদী শুয়ে দূরন্ত ডাকিনী
আম গাছে আম ধরে জাম গাছে জাম
আমি পন্থের দিকে চাইয়া থাকি আসেনি মোর শ্যাম

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে নলের বেড়া
ওরে হাত বাড়ায়া দিতে পার কপাল দেখি পোড়া

২.
যোগী ভিক্ষা লয় না কথা রে কয় না
যোগীর মনে কী তা বোঝা যায় না, যোগী ভিক্ষা ধর

তোমার দেহ ভরা রূপের যে রাশি
তুমি অধর পুরে দেহ হাসি, যোগী ভিক্ষা ধর

পালঙ্কেতে ফুল রে শুকায়
আমার হাসি যে অধরে ফুরায়, যোগী ভিক্ষা ধর

না শুকাতে সেই না ওরে ফুলে
তার মালা গেঁথে গলে লও না তুলে, যোগী ভিক্ষা ধর

তোমার গলে ফুলের রে মালা
ও একদিন শুকায়ে হইব কালা, যোগী ভিক্ষা ধর

ভালোবাসার জল দিয়া
আমি মালা গাঁথব দিয়া হিয়া, যোগী ভিক্ষা ধর

৩.
...এদিকে জুলেখা বিবি আশি বছরের বুড়ি
শুধু প্রেমের কারণে রইল যুবতী নারী।
আশি বছর পরে মাসজ্ঞান নাহি ছাড়ে
অবশেষে পরওয়ারে মিলাইল দুইজনে গো
....
পিরীতি করা পরানের মড়া গো
যে করে সেই জানে

অধুনা জ্ঞানজগতে ডিসকোর্স বিশ্লেষণ বলতে যে পদ্ধতি দাঁড়িয়েছে, তার সূত্র ধরে এই পদমালাগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে পারি আমরা। এই উদাহরণগুলো

হতে কয়েকটা ডিসকোর্সকে শনাক্ত করা এবং ডিসকোর্সগুলির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করাই বড়জোর এই লেখার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় গানে লিঙ্গীয় সম্পর্ককে চিনবার একটা রাস্তা উদ্ঘাটন সম্ভব। এটা খেয়াল রাখা খুবই জরুরী যে এই যাত্রাপথ তৈরি হচ্ছে আধুনিকতাবাদী প্রবল একটা পূর্বানুমানকে নাকচ করে দেবার বৌদ্ধিক লক্ষ্য নিয়ে। বিশ্বব্যাপী দাপটের সঙ্গে স্থাপিত এই পূর্বানুমান হলো: 'আধুনিকতা (সাধারণভাবে) মানুষকে মুক্তি দেয়' এবং '(বিশেষভাবে) নারীর মুক্তি, অধিকার আদায়, অগ্রগতি-এর ক্ষেত্র তৈরি করেছে আধুনিকতার প্রক্রিয়া।' এই পূর্বানুমানের সারাংশ তুলনামূলকভাবে 'বর্তমান' কালকে 'অতীত' কালের চাইতে 'অগ্রসর' প্রমাণে সচেষ্ট। কেবল এখানেই এই পূর্বানুমান পরিসীমিত নয়। আরও দুটো সম্পর্কিত অনুমান এই চিন্তাপদ্ধতিকে মদদ দেয়, শক্তিশালী করে। প্রথমত ধরে নেয়া হয় যে, কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিম্নবর্গীয় মানুষের তুলনায় আগুয়ান (vanguard), ফলে নিম্নবর্গীয় মানুষদের তাঁরা নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত ধরে নেয়া হয় যে, পাশ্চাত্য সহজাতভাবেই জ্ঞানে, শিক্ষায়, সভ্যতায় 'উন্নত', ফলে 'পিছিয়ে থাকা' অপাশ্চাত্যকে পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষাদান করতে সমর্থ এবং হকদার। যেহেতু পয়লাতে কেতাবী শিক্ষিতরাই, বিশেষভাবে উপনিবেশোত্তর সমাজে, পশ্চিমা মন-মানসিকতা, যুক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে থাকেন প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে, তাই এ দুয়ের যোগাযোগ বোঝা সহজসাধ্য। এরকম তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে যুক্তি প্রয়োগের বেলায় স্বাভাবিক ছিল আধুনিক গানের ভাণ্ডার হতে পদমালা ও সঙ্গীতরীতি উল্লেখ করা এবং সেই সূত্রে নিম্নবর্গীয় গানের সঙ্গে তার তুলনা রচনা করা। কিন্তু আধুনিক গান হতে পদ উল্লেখ সমেত কোন তুলনা তৈরি করা এই আলোচনার লক্ষ্য নয়।[১৩]

প্রথম গানটির পদমালায় কয়েকটি শব্দ ও শব্দসমষ্টি ধরে এগোনো যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে: 'মনের আগুন জ্বালাইয়া' দেয়া, 'শ্যামকালাচাঁদ', 'পন্থের দিকে চাইয়া' থাকা। এখানে তিনটি ক্ষেত্রেই শব্দমালাগুলোর বাঙ্ময় বা ডিসকার্সিভ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই অর্থে এগুলো ডিসকোর্স। আবার বাঙ্ময় পরিক্ষেত্র (discursive field) বিচারে এই শব্দমালাগুলো একই ক্ষেত্রে সক্রিয়। এই ডিসকোর্সগুলি যৌনতার প্রসঙ্গসূত্র উত্থাপন করে, আর সেটা খুবই গুরুত্বের দাবীদার। যৌনতার প্রসঙ্গসূত্র এখানে আত্মসত্তার (subject) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, স্থূলভাবে

১৩ আধুনিক গানকে সমরূপী বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, এমনকি এ বিষয়েও আমি সতর্ক যে নানাবিধ ভিন্নতার মধ্যে একটা বর্গ হিসেবে 'আধুনিক গান' উল্লেখ করাই কঠিন। এক্ষেত্রে যে জিজ্ঞাসাকে বিবেচনায় রাখা যেতে পারে তা হলো – এই সকল গানগুলো (প্রচলিত বর্গ বা ক্যাটেগরিতে: ব্যান্ড, হারানো দিনের গান, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইত্যাদি) কী অনুভূতি উৎপাদনে সক্ষম হয়।

বললে, বক্তার 'নিজ'-এর অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ, ব্যগ্রতাকে এখানে অনুধাবন করবার প্রয়োজন আছে। আবার এই প্রসঙ্গগুলো প্রোথিত লিঙ্গীয় সম্পর্কের মধ্যেই, সেটা একেবারে কেন্দ্রে রেখেই উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নিম্নবর্গীয় গানের একটা সাধারণ পাঠ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হ'ল: এই গানের পদগুলি লিঙ্গীয় অর্থে আত্মসত্তাভেদী (inter-subjective) হয়ে থাকে সাধারণ-ভাবে।[১৪] এখানে এই বিশেষ গানটির বেলায় প্রথম স্বরকে নারী হিসেবে চেনা সম্ভব।

আমার বক্তব্য, উল্লেখ করা এই স্বরে নারীর যৌন-অস্তিত্বের ঘোষণা ব্যক্ত হয়। আধুনিক সমাজে নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা, যৌন-অনুভূতি প্রকাশ বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্কের চরম লঙ্ঘন। কেবল তাই নয়, সেই প্রকাশের কদর্থও নির্ধারিত। ফলে, বিদ্যমান লিঙ্গীয় অসম সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে, সেই লঙ্ঘনকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া হয় না। নিম্নবর্গীয় গানে সেটা স্বীকৃত এবং সম্ভব। এর মধ্য দিয়ে নারীর পক্ষে পরিসরের উপর নিয়ন্ত্রণ অনেক পরিব্যপ্ত হয়। পুরুষ আধিপত্যের অপরাপর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নারীর স্বরকে অনুচ্চারিত রাখা একটি। সেই স্বর যখন ব্যক্ত হয় তখন নারীর সামাজিক অস্তিত্বের ব্যাপারে তা বিরাট অর্থ বহন করে, বিশেষভাবে যৌনতার বিষয়ে। এভাবে দেখলে শ্যামকালাচাঁদ পদটি কেবল একটি বিশেষণ মাত্র নয়। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যানের যে লোকজাগতিক পঠন – তার মধ্যেই এই শব্দটিকে স্থাপন করবার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে শ্যামকালাচাঁদ শব্দটির নারী স্বরে উচ্চারণ কতগুলো সম্ভাব্য আচরণ, অনুশীলনকে ইঙ্গিত করে যা বিশেষভাবে নারীর অবস্থানকে, সত্তাকে (identity) স্বীকৃতি প্রদান করে। 'পন্থের দিকে চাইয়া' থাকার ক্রিয়াটিকেও সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠ করবার সুযোগ নেই এক্ষেত্রে। এই সক্রিয়তা[১৫] রাধাসত্তার বিরহ দশার সাথে সম্পর্কিত। স্পষ্টতই বিরহ দশাকে এখানে পুরুষালি দুনিয়ার উপেক্ষার সমার্থক হিসেবে পাঠ করবার সুযোগ নেই। বরং নারীর বহুস্বরকে এখানে আবিষ্কারের সুযোগ আছে। রাধাসত্তার বিরহ দশা, আধুনিক কালে সংগঠিত নারীসত্তার বিপরীতে, খোদ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে।

---

১৪ এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে একটি লেখায়– মানস চৌধুরী (২০০০) "'সোনাবন্ধু'র পিরীতি এবং ভালোবাসার সুশীল ডিসকোর্স," এস এম নুরুল আলম, আইনুন নাহার এবং মানস চৌধুরী সম্পাদিত সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৫ নারীর অবস্থান প্রশ্নে সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তার দ্বিবিভাজিত ধারণার প্রচলিত কাঠামোতে এই ক্রিয়াকে 'অপেক্ষা করা' এবং সেই সুবাদে অ-ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তা হিসেবে পাঠ করার গলদ ঘটবার সুযোগ, প্রবণতা আছে। রাধাসত্তার গঠন, যা বিশেষ ক্ষেত্রে এমনকি লিঙ্গোত্তীর্ণ, এবং বৃহত্তর অর্থে নিম্নবর্গীয় চৈতন্যে প্রেমভাবাপন্ন সত্তার গঠন অনুধাবন করলে সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তার গ্যাঁড়াতে পড়তে হয় না।

সাম্প্রতিক কালে বহুস্বরকে দেখা হচ্ছে সক্রিয়তা হিসেবে, সেইসূত্রে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে। এই বিবেচনাবোধকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে নিম্নবর্গীয় গানে নারীর যৌনসত্তার প্রকাশ এবং সক্রিয়তাকে[১৬] বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। এই বক্তব্য প্রদানের সময় এই বাস্তবতাকে খেয়াল রাখছি যে, মধ্যবিত্ত বিদ্যাজগতে এবং প্রচার মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় গানের পাঠ অপর্যাপ্ত। পাঠ করবার তেমন কোন তাগিদও নেই – আর সেই প্রবণতাটি শ্রেণীগত দেমাক ও দাপটের অনুবর্তী। দ্বিতীয় পদমালাতেও আত্মসত্তা হিসেবে নারীকে আবিষ্কার করা সম্ভব, একই সঙ্গে সম্ভব তার আত্মসত্তার (subject) লিঙ্গান্তর ঘটিয়ে পাঠ করা। কিন্তু তৃতীয় পদমালাতে কথক গল্প বলার দায়িত্ব নেন। ফলে কথকের লিঙ্গীয় সত্তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কথকের বয়ানে উপস্থাপিত লিঙ্গীয় সম্পর্কের ব্যাখ্যা ও সেই সুবাদে লিঙ্গীয় সম্পর্কের ধরন। ‘জুলেখা বিবি’র নারীত্বের অর্থ প্রচলিত এবং প্রবল জ্ঞানতত্ত্বের প্রতি চরম আঘাত করেছে। ‘আশি বছরের বুড়ি’ হয়ে তাঁর প্রেমে ঈশ্বরের সহায়তা পাওয়া আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের লিঙ্গায়িত বয়সবিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করে, এবং সেটাই ঐ বয়ানের (narration) শক্তি। আত্মসত্তা বা সাবজেক্টের এই স্থানচ্যুতি নারীর অবস্থানকে পোক্ত করে। বিদ্যমান মধ্যবিত্ত লিঙ্গীয় সম্পর্কের আকর বৈশিষ্ট্যের সাথে এই প্রক্রিয়া একেবারেই বিপ্রতীপ। লিঙ্গীয় সম্পর্কের বাস্তবতা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন বুঝবার জন্য বিপ্রতীপ এই নিম্নবর্গীয় জ্ঞানজগতের বৌদ্ধিক অনুসন্ধান জরুরী।

এখানে মুদ্রিত রচনাটি জহির আহমেদ এবং মানস চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক ২০০১ সালে প্রকাশিত *চর্চা: নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধ সংকলন* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

---

১৬ বৌদ্ধিক যাত্রাপথে সক্রিয়তা নিয়ে কিছু তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে। সক্রিয়তা বলতে তাত্ত্বিকদের বড় একটা দল চৈতন্যের সক্রিয়তা বোঝেন না। তবে সেই বিষয় নিয়ে বর্তমান আলোচনা নয়।

মানস চৌধুরী ও সায়দিয়া গুলরুখ

যৌনতা ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গ

Rabindranath Tagore

ভূমিকা

আমরা যখন যৌনতা প্রসঙ্গে লেখার উদ্যোগ নিয়েছি, বিদ্যাজগতে বিদ্যমান কতগুলো বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিদ্যাজগতে যৌনতা নিয়ে তেমন কোনও লেখালেখি নেই।[১] এর একটা মানে হচ্ছে যৌনতা নিয়ে কোনও বিশ্লেষণ নেই।[২] বিশ্লেষণহীন এই পরিসরে ভাবনার সূত্রপাত ঘটানো খুবই দুরূহ কাজ। তাছাড়া

১ গবেষণা জগতে হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন এবং জরিনা রহমান খান-এর Potita Nari: A Study of Prostitution in Bangladesh গ্রন্থখানি (সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৯) মনোযোগ অর্জন করেছে। মূলত বেশ্যাদের নিয়ে পরিচালিত গবেষণাটিতে পরোক্ষভাবে যৌনতা প্রসঙ্গ এসেছে। যৌনতাকে একটা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে জায়গা দেয়া আর কোন লেখা স্মরণ করতে পারছি না।

২ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক কর্মতৎপরতার মধ্যে এ কথা বলা খুবই বিভ্রান্তিকর হতে

আমাদের কাজের[৩] মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে: নিশ্চুপতার নিরঙ্কুশ মানে এই নয় যে, বিদ্যাজগতের মানুষজন যৌনতা প্রসঙ্গে সামাজিক প্রবল ধ্যান ধারণা হতে বিযুক্ত। প্রবল ধ্যান ধারণায় সক্রিয় মানুষজনের বিদ্যাজগতে এই প্রসঙ্গে নিশ্চুপতার বিষয়টিকে বোধগম্য করার তাগিদ আমরা বোধ করেছি, কিন্তু সেটা আমাদের লেখার গৌণ প্রসঙ্গ। বিদ্যমান বাস্তবতার দ্বিতীয়টি হচ্ছে: এই প্রসঙ্গে লেখালেখি করা বিপজ্জনক। কিছু অনায়াস প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবার অবকাশ রয়েছে। নিশ্চুপতার পরিমণ্ডলে এই বিষয়বস্তু উত্থাপন করা একটা সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সেই লঙ্ঘনের জের হিসেবে যৌনতা নিয়ে খোদ আমাদের ভাবনাচিন্তাই পাঠকের জন্য বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হয়ে পড়তে পারে। এই চাপ এ প্রসঙ্গে নিশ্চুপতার একটা কারণও বটে। সেই হিসেবে সামাজিক এই চাপ বিদ্যাজগতে যৌনতা প্রসঙ্গে নিশ্চুপতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই নিশ্চুপতায় যৌনতার প্রবল ধ্যান-ধারণা ক্রিয়াশীলই থাকে কেবল। উপরন্তু, শুধুমাত্র লিখিত গবেষণা সাহিত্যের অভাবই নয়, যৌনতাকে প্রশ্নহীন করে ফেলাটা একটা মনোজাগতিক অনুশীলনও বটে। যৌনতার প্রবল ধারণা ও চর্চার মধ্যে অন্তরীত থাকার একটা অর্থ নীরব থাকা। কথা বলা হচ্ছে লঙ্ঘন।

কিন্তু সেই লঙ্ঘনের একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য আমাদের খোদ লিঙ্গীয় সম্পর্ককেই রাজনৈতিক হিসেবে বোঝা প্রয়োজন।[৪] বিদ্যমান লিঙ্গীয় সম্পর্ক বৈষম্যের; পুরুষের ক্ষমতা ও পুরুষালি দাপট এই

পারে যে, যৌনতা নিয়ে বিশ্লেষণ আমরা ঠাওর করতে পারছি না। এ কথা সঠিক যে, এই সংস্থাগুলোতে প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌনরোগ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যৌনতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে বলে মনে করা সম্ভব। পাশাপাশি এ কথাও বলা জরুরী যে, যৌনতার প্রসঙ্গ সেখানে পরিসীমিত হয়েছে যৌনরোগ এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের মধ্যেই কেবল। আমরা যেহেতু যৌনতাকে লিঙ্গীয় এবং শ্রেণীগত সম্পর্কের মধ্যেও অনুধাবন করতে চাইছি, সে কারণেই উন্নয়ন সংস্থার অনুধাবনকে পর্যাপ্ত বিবেচনা করা কঠিন।

৩ আমরা দুজন একত্রে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ফোর্ড ফাউন্ডেশনের গবেষণা অনুদানের সুবাদে। আমাদের সে কাজটি এইডস নিয়ে। বর্তমান লেখাটি সেই কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও আমাদের ধারণায়ন যাত্রাপথের একটা প্রকাশ এই লেখাটা।

৪ লিঙ্গীয় সম্পর্ককে রাজনৈতিকভাবে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে বিস্তর নারীবাদী কাজ স্মরণ করা সম্ভব। এখানে তিনটি প্রকাশনা উল্লেখ করছি যা হতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের একটা রাজনৈতিক পাঠ সম্ভব। ক) সনি এন্ডারমার, টেরী লভেল, এবং ক্যারল ওকউইট্জ সম্পাদিত, A Concise Glossary of Feminist Theory, আরনল্ড, লন্ডন, ১৯৯৭। খ) চেরীস ক্র্যামার এবং পলা এ ট্রেচলার সম্পাদিত, A Feminist Dictionary, প্যানডোরা প্রেস, লন্ডন, ১৯৮৫। গ) জুলিয়েট মিশেল, Psycho-

সম্পর্কের কাঠামোগত উপাদান। এই বৈষম্যের পরিসরে যৌনতাও বৈষম্যবিহীন নয় এবং সে কারণেই যৌনতা প্রসঙ্গে কোন নিরপেক্ষ 'বৈজ্ঞানিক'[৫] পাঠ দাঁড় করানো অসম্ভব। লিঙ্গীয় সম্পর্কের রাজনৈতিক উপলব্ধির মধ্যে থেকে যৌনতা নিয়ে জিজ্ঞাসা উথাপন করবার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই লেখাটা।

নারীর যৌনতা কি বিযুক্ত বিষয়?

বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান, এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নারীর যৌনতা, স্পষ্ট করে বললে নারীর শরীর, বিশেষ একভাবে সামনে এসেছে। গত এক দুই দশকে বাংলাদেশে চলমান তৎপরতার প্রেক্ষিতে এটা অত্যন্ত সহজেই বোঝা যায়। এই সময়কালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিকে বিশ্বব্যাপী চাউর করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের সরকারসমূহ তো বটেই, এই নিয়ন্ত্রণ কাজে সামিল হয় আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নসংস্থা, এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের পণ্যসামগ্রী নিয়ে বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এই বক্তব্যগুলোর উপস্থাপন সরল হলেও এর প্রক্রিয়া কোনভাবেই সহজ সরল বোধগম্য নয়। উন্নয়ন প্রশ্নে জনসংখ্যার যে গুরুত্ব উপলব্ধ হ'ল, পশ্চিমেই, এবং নীতি নির্ধারক মুরুব্বী দেশেই, সেই গুরুত্ব, এবং প্রযুক্তি ধারাবাহিকভাবে পুরুষের পক্ষে যে ভূমিকা নেয় সেই প্রক্রিয়ার পরিসরেই বিষয়টাকে বুঝতে হবে। একদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াল তৃতীয় বিশ্ব, এবং সেটা একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, জনসংখ্যা কমাবার জন্য প্রযুক্তি আবিষ্কার এবং নিরীক্ষার লক্ষ্য হলেন নারীরা[৬], স্পষ্ট করে বললে তৃতীয় বিশ্বের নারীরা।

এই প্রক্রিয়ার আশু ফল হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের জন্য, বিশেষভাবেই, কাঁড়ি কাঁড়ি জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী আমদানি হতে দেখি। তৃতীয় বিশ্বের সকল নারীরাই সমানভাবে

---

analysis and Feminism, পেলিক্যান বুকস, লন্ডন, ১৯৭৪।

৫ জ্ঞানকাণ্ডে বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক বিভাজনটি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়ে আসছে। বিজ্ঞানের এ দাপট এবং নিরপেক্ষতার উদযাপন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কেউ কেউ ধারণা করেন উত্তর-আধুনিকতাবাদ এই মোকাবিলাটা করেছে। কিন্তু স্পষ্ট হওয়া দরকার নারীবাদীরা বিজ্ঞানের পুরুষকেন্দ্রিকতা ও পুরুষমুখিনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, দেখা যেতে পারে – এমিলি মার্টিন, The Women in the Body, ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রেস, মিল্টন কেইন্স, ১৯৮৭।

৬ রায়না র‍্যাপ, 'Moral Pioneers: Women, Men, and Fetuses on a Frontier of Reproductive Technology', মিকায়েলা ডি লিওনার্দো সম্পাদিত এবং ভূমিকাকৃত Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era-তে প্রকাশিত, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৯১।

এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালেন তা নয়। যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির দায়দায়িত্ব অনেক বেশি পরিমাণে বর্তালো দরিদ্র শ্রেণীর উপর, তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রধান কর্তব্য নির্ধারণ হ'ল এই শ্রেণীর নারীদের জন্য।[৭] কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলছে না যে, সুবিধাভোগী শ্রেণীতে জনসংখ্যা প্রশ্ন যে বড় হয়ে দেখা দিল না তার কারণও নারীরাই। আমরা বলতে চাচ্ছি গত এক দেড় দশকের উন্নয়ন ডামাডোলের বেশ আগে থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিষয়বস্তু হয়ে পড়ছিলেন।[৮] নির্ধারিত নারীদের (টার্গেট গ্রুপ) এ সকল সামগ্রীর ভোক্তা বানানোর জন্য যে নিরন্তর কর্মসূচি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে চলেছে তার অনিবার্য ফল হিসেবে একটি নতুন ধারণা সামনে চলে আসে, প্রজনন স্বাস্থ্যের ধারণা।

প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আলাপ আলোচনার বিস্তর একটা পরিমণ্ডল গত কয়েক বছরের উন্নয়ন-বৈশিষ্ট্য। নারীর জন্য বানানো এই বিশাল জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বাজারজাত করার জন্য এর বিকল্প কোন রাস্তাও ছিল না।[৯] সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে দুটো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, যে দুটো আবার পরস্পর সম্পর্কিত। এক, নারীর যৌনতা একেবারেই প্রজনন স্বাস্থ্য আলোচনাতে পরিসীমিত হয়েছে। দুই, নারীর যৌনতাকে অপরাপর বিষয় হতে বিযুক্ত করে দেখা হয়েছে। যে জটিল মনোজাগতিক বাস্তবতা এবং সামাজিক অস্তিত্ব যৌনতার, নারীর জন্য আরও বিশেষভাবে, অনিবার্য পরিসর তা ক্রমাগতভাবে প্রজনন স্বাস্থ্য আলোচনাতে হারিয়ে গেছে। নারীর পুরো শরীরী সত্তা হয় সন্তান ধারণের নয়তো সন্তান নিবারণের দ্বিবিভাজিত আত্ম-

---

৭ People's Perspective, সংখ্যা ৪ ও ৫ (প্রচ্ছদ শিরোনাম: 'Turning Bullets into Contraceptives'), উবিনীগ, ঢাকা, ১৯৯৩।

৮ মধ্যবিত্ত আশা আকাঙ্ক্ষাতে ছোট পরিবারের স্বপ্ন আরও পুরোনো প্রপঞ্চ। সরকারী উদ্যোগে 'পরিবার পরিকল্পনা' নামে যে কার্যক্রম তা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে হতেই শুরু হয়েছে। মূলত ভোক্তা-বেতনভুক এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যতে ছোট পরিবার গঠন সঙ্গতি এনেছে। পরবর্তী পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় ধরেই নেয়া হয়েছে যে মধ্যবিত্ত ইতোমধ্যেই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে 'সচেতনতা' অর্জন করেছে।

৯ এই লেখাটা যখন আমরা লিখছি তখন আমাদের বক্তব্যটা নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে আছি। অস্বস্তির কারণ হল: ইদানিংকালে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিস্তারের ক্ষেত্রে একটা বড়সর পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছি আমরা। পুরুষের ব্যবহৃত একমাত্র যে সামগ্রীটা প্রচলিত সেই কন্ডমের চল যথা সম্ভব বাড়ানোর একটা চোখে পড়ার মত উদ্যোগ খেয়াল করছি। শুধুমাত্র ব্যাপক প্রচারণাই নয়, বরং কারখানা স্থাপন করবার মত বড় ঘটনা ঘটছে (সূত্র: The Daily Star, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃ: ৩, সংবাদ শিরোনাম: 'Law on safe blood transfusion to be enacted: Yusuf'। এইডসের আশংকার সাথে এই তৎপরতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ টের পেলেও বাণিজ্য প্রক্রিয়ার যোগাযোগ শনাক্ত করতে পারিনি আমরা।

বৈরীতায় ভুগবার বাস্তবতায় পড়েছে।

তাহলে, প্রশ্ন আসে, পরিসীমিত হয়ে পড়ার বাইরে যৌনতার আর উদ্ঘাটন কি সম্ভব নয়? আমাদের এখানে লেখালেখির জগতে এক দুস্তর নীরবতা থাকলেও পশ্চিমের বিদ্যাজাগতিক এবং অন্যান্য লেখালেখিতে যৌনতা প্রসঙ্গ বিস্তর উত্থাপিত। উপরন্তু, অপশ্চিমের সমাজে সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষজন বাক্যালাপেও যৌনতা প্রসঙ্গ অনুল্লেখিত রেখে চলেছেন সেটা ভাববার মত তেমন কারণ ঘটেনি।[১০] উদারপন্থী চিন্তাভাবনাতে 'ব্যক্তি অধিকারের' একটা ব্যপ্ত অর্থ তৈরি হয়েছে যেখানে যৌন-অধিকারও একটা গুরুত্ববহ বিষয়। এই চিন্তাধারার লেখালেখিতে যৌনতাকে স্থাপন করা হয়েছে সামাজিক ও মনোজাগতিক পরিসরে, শারীরবৃত্তিক পরিসরে তো বটেই। যৌনতার উপলব্ধিতে কতগুলো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেখানে; যেমন: যৌন-অনুভুতি, যৌন-আকাঙ্ক্ষা, যৌন-সঙ্গী নির্বাচন, যৌন-সক্রিয়তা, লিঙ্গীয় ভুমিকা[১১] ইত্যাদি। প্রজননও সেখানে গুরুত্ব পায়, তবে অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত হিসেবেই কেবল। কিন্তু, 'ব্যক্তি অধিকারে'র ধারণায় নারী পুরুষের সমতা যেভাবে ধরেই নেয়া হয় – তা নিয়ে বলবার অবকাশ আছে। নারীর জন্য যৌন-আকাঙ্ক্ষা, যৌন-সঙ্গী নির্বাচন ইত্যাদি কী অর্থ বহন করে সেটা আমাদের কাছে একটা বড় জিজ্ঞাসা। নারীর সামাজিক অস্তিত্ব নিরন্তর পুরুষ দাপটের মুখোমুখি হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নারীর যৌনতা অনুধাবন করতে 'ব্যক্তি অধিকারে'র ধারণার মুখস্থ প্রয়োগ ক্ষমতার ভেদবিচারহীন হয়ে পড়তে পারে। এমনকি নারীর যৌনতাকে বুঝতে গেলে বুঝতে হবে সেই পরিসরকে যেখানে পুরুষের আধিপত্য তার যৌনতার সাথে ওতপ্রোত সংমিশ্রিত আছে। সত্যিকার অর্থে পুরুষ আধিপত্যের সামাজিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থায় পয়লা অনুসন্ধানের জায়গা, যৌনতার প্রশ্নে, হওয়া দরকার খোদ পুরুষের যৌনতাই।

পুরুষ পরিসর

আমাদের জীবদ্দশায় খুব বড়সড় একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি আমরা দুজন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীক অনুপ্রবেশ, এবং অবশ্যই লিঙ্গীয় সম্পর্কের

---

১০ লেখালেখির জগতে যৌনতা প্রসঙ্গে নীরবতা বিশ্লেষণ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তবে একটা বিষয় উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোধ করছি। প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জন্মশাসনের কথা মাথায় রাখলে পুরো বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। তা হচ্ছে: প্রজনন স্বাস্থ্য ও জন্মশাসনের পরিসরেই কেবল যৌনতা প্রসঙ্গে 'ভারী' আলোচনা/লেখালেখি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল একটা পর্যায়ে। অর্থাৎ আমরা যৌনতার অর্থ-নির্দিষ্টতার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি নীরবতার প্রশ্নে।

১১ দেখুন, চেরীস ক্র্যামার এবং পলা এ ট্রেচলার সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।

রাজনীতিকে একত্রে বোঝাপাড়া করবার একটা পরিস্থিতি ছিল সেটা। উনিশ শ আটানব্বই সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের কথা বলছি।[১২] আন্দোলনটা অনেকগুলো প্রসঙ্গ উত্থাপনের জায়গা করে দেয়। জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন এই বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের রাস্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, নারীর লড়াইয়ের নানা রকম বিতর্ক গড়ে উঠবার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আন্দোলনকারী ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই, তাদের বলাবলিতে-লেখালেখিতে, কেবল ধর্ষণ নয়, তুলে ধরতে চাইছিলেন পুরুষ আধিপত্যের নানান দিকগুলোকে। তাদের আগ্রহ ছিল সেই ব্যবস্থাটাকে চেনানো, পুরুষের সে আচরণগুলোকে শনাক্ত করা, যার মধ্যে কোন নারী নিপীড়িত কিংবা আক্রান্ত বোধ করতে পারেন। এমন নয় যে পুরুষ পরিসর বিশ্লেষণ করবার, পুরুষের ক্ষমতা উন্মোচন করতে চাইবার অন্য কোন তাগিদ বা কারণ ঘটেনি। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী এ বিষয়ে ভাবাভাবির প্রয়োজনকে আমাদের জন্য একেবারে সম্মুখসারিতে নিয়ে এসেছিল।[১৩]

আমাদের বোঝাবুঝিতে পুরুষ পরিসরের গুরত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে পুরুষের যৌনতা। এর একটা অর্থ দাঁড়াতে পারে: পুরুষের সামাজিক অস্তিত্বকে আমরা যৌনতায় পরিসীমিত করে ফেলতে চাইছি। সে অর্থ-সম্ভাবনায় নিছক সতর্কতা থেকেও স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় অসমতার যে কাঠামোগত চেহারা তার মধ্যে পুরুষের যৌনতা রূপলাভ করে এবং একইসাথে তা অসমতাকে পুনরুৎপাদন করে আর সেটাই আমরা ভাবনায় রাখতে চাইছি। আমরা বিস্মৃত হতে চাইছি না পুরুষের যৌনতা এতটাই দাপুটে যে, নারীর পুরো সামাজিক অস্তিত্ব চিত্রিত করবার সামর্থ্য রাখে তা, এবং নারীর যৌন-আচরণবিধির রূপরেখা পেশ করে। এ কথা আলাদা করেই বলার দরকার আছে যে, যৌনতা নিছক শারীরিক বিষয় নয়; মনোজাগতিক যে সকল ভাবনা-আকাঙ্ক্ষা-চিন্তাপ্রক্রিয়া যৌন-অস্তিত্বকে সমুন্নত রাখে এবং বহির্জাগতিক যে সকল আচরণ-অনুশীলন-ক্রিয়া সেই অস্তিত্বকে জায়গা বানিয়ে দেয় – তার সবটাই যৌনতার পরিসর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কতকগুলো বিষয় ভাবার চেষ্টা চালাতে পারি আমরা। মৌলিক কোন্ বৈশিষ্ট্য-গুলো পুরুষ সত্তাকে সংহত করে যার মধ্য দিয়ে পুরুষ সংহতি, এমনকি নিছক

১২ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দুজনই যুক্ত। ’৯৮-তে সায়দিয়া স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষার্থী এবং মানস শিক্ষক।

১৩ এ নিয়ে একটা প্রকাশনা বের হয়েছে যেখানে বিভিন্ন পত্রিকার লেখালেখির সংযোজন ঘটানো হয়েছে – *ধর্ষণ বিরোধী ছাত্রী আন্দোলন: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ’৯৮-তে সংঘটিত ছাত্রী আন্দোলন নিয়ে প্রকাশনার সংকলন*, অশুচি, ঢাকা, ১৯৯৯

আড্ডাতেও, গঠিত হয়। নারীবাদী আলাপ আলোচনায়[১৪] পুরুষের কতগুলো বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা হয়েছে: আগ্রাসী মনোভাব, পীড়ন ও সহিংসতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, এবং নারীর অস্তিত্বকে সর্বাত্মক উপেক্ষা। যৌনতা প্রসঙ্গে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য হাজির করা সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে। মনে হতে পারে পুরুষের সম্ভাব্য[১৫] এ সকল বৈশিষ্ট্য নিছক যৌন-ক্রিয়ার সময়কালেরই ব্যাপার। সাধারণভাবে যৌনক্রিয়া বলতে যা বোঝা হয়ে থাকে তার মধ্যেই কেবল পুরুষের আগ্রাসী মনোভাব, পীড়ন ও সহিংসতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, এবং নারীর অস্তিত্বকে সর্বাত্মক উপেক্ষার আচরণগুলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বরং, পুরুষের সামগ্রিক সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে কিভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রোথিত থাকে, অনুশীলিত হয় এবং পুরুষের যৌন-আচরণ কিভাবে তার সামগ্রিক দাপুটে অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয় তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে, নারীবাদী আলাপ-আলোচনার সূত্র ধরেই, বিদ্ধকারী যৌনসম্পর্ককে (penetrative sex) পুরুষালি বৈশিষ্ট্য হিসেবে শনাক্ত করা হচ্ছে। এর সাথেই সম্পর্কিত হয়ে উত্থাপিত হয়েছে অবিদ্ধকারী যৌনসম্পর্কের লক্ষ্যে নারীর পক্ষে এজেন্ডা নির্মাণের বিষয়টি।[১৬] বিদ্ধকারী যৌনসম্পর্কের মধ্যেই কেবল পুরুষের দাপট বা আগ্রাসী আচরণকে পরিসীমিত করে ফেলবার একটা প্রবণতা এর থেকে স্পষ্ট হয়। এই পরিসীমিতি তাত্ত্বিক বিভ্রাট বয়ে আনতে পারে। আমরা স্পষ্ট করেই বলতে চাই, বিদ্যমান লিঙ্গীয় বৈষম্যের ব্যবস্থায় অবিদ্ধকারী যৌনসম্পর্ক কোনওভাবেই পুরুষের ক্ষমতা লাঘব করে না কিংবা একটা সমতাভিত্তিক যৌনসম্পর্কের নিশ্চয়তা দেয় না। এর বিপরীতে আমরা বরং জোর

১৪ দেখা যেতে পারে – ক) সনি এন্ডারমার, টেরী লভেল, এবং ক্যারল ওকউইট্জ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত; খ) চেরীস ক্র্যামার এবং পলা এ ট্রেচলার সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।

১৫ 'সকল পুরুষইতো আর এক রকম নয়' – গোছের প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা বোধ করছি। পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, পুরুষালি একটা ব্যবস্থাকে চিনবার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা, বিশেষ কোন পুরুষের বৈশিষ্ট্য এখানে অবান্তর প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে লেখালেখির তেমন চর্চা নেই বলেই সতর্কভাবে একটা উদাহরণ তুলে ধরছি। বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার বেলায় দু'চারজন মালিকের বৈশিষ্ট্য যেমন অপ্রাসঙ্গিক, আমাদের বিবেচনায় পুরুষালি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য।

১৬ উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে: লেসলি মাইলসের একটা লেখায় আলোচিত হয়েছে নিরাপদ যৌনসম্পর্কের উদ্যোগ গ্রহণের বেলায় নারীর নাজুক অবস্থানের বিষয়টি। সেখানে নিরাপদ যৌনসম্পর্কের প্রশ্নটি অবিদ্ধকারী (non-penetrative) অনুশীলনের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: লেসলি মাইলস, 'Women, AIDS, and Power in Heterosexual sex: A Discourse Analysis', মেরী এম জার্গেন এবং সারা এন ডেভিস সম্পাদিত Toward a New Psychology of Gender: A Reader-এ প্রকাশিত, রাটলেজ, ১৯৯৭।

দিচ্ছি সামাজিক পরিসরের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণকে, যা প্রথমত তার যৌন-আচরণকে গঠন করে এবং দ্বিতীয়ত আপাত যৌনক্রিয়ার বাইরে পুরুষের যৌন-আচরণকে পরিব্যপ্ত করে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্র ধরেই আবার এগোতে চাইছি। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ছাত্রীরা এমন কিছু নিপীড়নের প্রসঙ্গ এবং শাস্তির দাবি তুলেছিলেন যা ঠিক সাময়িক নয়, বরং দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার প্রকাশ ছিল। এ সকল অভিজ্ঞতাকে তাঁরা চেপে বসা একটা পুরুষ ব্যবস্থার আলামত হিসেবে চেনাতে চাইছিলেন। রাস্তায় হাঁটবার সময়ে কিংবা বাসে সহযাত্রী হিসেবে চলবার সময়ে যে সব ভাষাজ মন্তব্য, শরীরী উৎপীড়ন বা অঙ্গভঙ্গির সম্মুখীন হতে হয় নারীদের সেগুলো নিয়ে বলাবলির একটা চেষ্টা করেছেন তাঁরা। ভেবে দেখলে পরিষ্কার হয়, সবক্ষেত্রে এইসব মন্তব্য বা আচরণ আক্রমণাত্মক হিসেবে নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত। বাসের ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এক তো খোদ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই ক'বছর আগে বাসের একটা ঘটনা নিয়ে দুর্বার আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু সেটাও নয়, বাসে নারীর অভিজ্ঞতার আরও ব্যাপকতা আছে ভেবেই এই প্রসঙ্গ তুলছি। পুরুষ পরিমণ্ডলে একটা ভাষার চল আছে: 'চান্স নেয়া'।[১৭] যেকোনো ছল চাতুরীতে নারীর শরীর স্পর্শ করা বোঝাতে এই পদটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সেই প্রক্রিয়াতে ঘটনাটি আর সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্য পুরুষের সাথে আলাপে বীরগাঁথা হিসেবে তা উদ্ধৃতও হয়। এই ক্ষেত্রে পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক

---

১৭ আমাদের উপলব্ধিতে পুরুষের ভাষা যেভাবে ধরা পড়ছে তাতে 'চান্স নেয়া' কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক। যে সকল বিষয়ে সাফল্যের বিষয়টি বুদ্ধিমত্তার, কিংবা হয়তো চাতুর্যের সাথে জড়িত, সেখানে সিদ্ধিলাভের কৌশলকেই 'চান্স নেয়া' বলা হতে পারে। আশা রাখি আমাদের এই পর্যবেক্ষণ হতে কোনও পাঠক বিচলিত হবেন না এটা ভেবে যে 'শব্দটা তো মেয়েরাও বলে।' একটা বিশেষ শব্দ বা ভাষা-উপাদান কী বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশেষ লিঙ্গীয় রূপ লাভ করে – সেটাই আমাদের মাথায় ছিল মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, পুরুষ পরিসর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেশ সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। চলতি অভিজ্ঞতাতে এমন অনেক কিছু ধরা পড়েছে যা বিশ্লেষণের দাবিদার অথচ প্রত্যক্ষণলব্ধ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করা খুবই দুরূহ। মিশেল ফুকোর ডিসকোর্সের ধারণা সমস্যাটি অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। ডিসকোর্স বলতে কেবল ব্যক্ত ভাষাকে বোঝায় না, অনুশীলনকেও বোঝায়; আবার ডিসকোর্স শনাক্ত করতে পারলে তা ক্রিয়াদি বা অনুশীলনকেও ইঙ্গিত করে। উদাহরণ হিসেবে 'চান্স নেয়া' উল্লেখ করলেই কতগুলো আচরণের ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব হয়। ডিসকোর্স ধারণার জন্য দেখা যেতে পারে – ক) মিশেল ফুকো, The Archaelogy of Knowledge, রাটলেজ (ফরাসী থেকে অনূদিত), ১৯৭২। খ) স্টুয়ার্ট হল সম্পাদিত, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, ওপেন ইউনিভার্সিটি প্রেস এবং সেজ প্রকাশনী, লন্ডন, ১৯৯১।

হয়ে পড়ে বিষমসংগতিপূর্ণ (paradoxical)। শ্রোতা পুরুষের/পুরুষ সকলের তখন একদিকে বক্তা পুরুষের বিজয় প্রক্রিয়ায় অনুপ্রেরণা যোগাতে হয়, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বোধ তৈরি হয় তার/তাদের মনে। চলতি অর্থে একে ঈর্ষা হিসেবে বোঝা যেতে পারে, তবে আমরা জটিল এই মনোজাগতিক প্রক্রিয়া হতে অন্য একটি ধারণা উদ্ঘাটন করতে চাইছি। সেটা হচ্ছে 'ক্ষেত্র দখলের লড়াই' (territorial crisis)। পুরুষের আত্মসত্তার (subject) ক্ষেত্রে এই দখলের বোধ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যা যৌনতার আলোচনাতেও নিয়ে আসা প্রয়োজন।[১৮]

ক্ষেত্র দখলের লড়াই কোন সরল প্রক্রিয়া নয়। একদিকে পুরুষ অপরাপর পুরুষের সাথে এই লড়াইয়ে সামিল হয়, এক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষ অন্য পুরুষেরা। অন্যদিকে পুরুষ যৌথভাবে নারীকে ক্ষেত্রচ্যুত করবার মধ্য দিয়ে দখল কায়েম করে। এই প্রক্রিয়া একাধারে মনস্তাত্ত্বিক ও দৃশ্যমান অনুশীলনগত। 'চান্স নেয়া' একটা উদাহরণ মাত্র, পুরুষের ক্ষমতা প্রক্রিয়ার নানা আচরণ রয়েছে। ভাষা পুরুষের ক্ষমতা ও ক্ষেত্র দখল প্রক্রিয়ার শক্তিশালী হাতিয়ার। অসম সামাজিক সম্পর্কে ভাষার ব্যবহার অসমতার পরিবেশন এবং পুনরুৎপাদন ঘটাতে পারে যুগপৎ।[১৯] ছিঁচকে মন্তব্য (eve teasing) করা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বোধগম্য উদাহরণ।[২০] পুরুষের যৌনতা বুঝতে ছিঁচকে মন্তব্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যদিও এই বিষয়টাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে চাইবেন না অনেকেই। বিশেষত এই অনুশীলনকে বিশেষ এক বয়সের('উঠতি' বয়সের) এবং কখনো কখনো বিশেষ শ্রেণীর ('ছোটলোক' শ্রেণীর) পুরুষের আচরণ হিসেবে নিশ্চিত করে ভাবা হয় বলে পুরুষালি আচরণ হিসেবে এর বিশ্লেষণ করা ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের বিবেচনায়, ছিঁচকে মন্তব্য হতে পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা (male sexual desire) সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। তাই মন্তব্যকারীর সংখ্যার চাইতে আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জটিল মনোগত সেই পুরুষালি পরিজগত যার মধ্যে এই আচরণগুলো বেড়ে ওঠে এবং চূড়ান্ত বিচারে

---

১৮ পুরুষালি সংহতি এবং 'ক্ষেত্র দখলের লড়াই'-কে বিপ্রতীপ করে দেখলে চলবে না। বরং 'ক্ষেত্র দখলের লড়াই'-এর বোধ পুরুষ ঐক্যকে সংহত করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং হিংস্র উদাহরণ সম্ভবত গণধর্ষণ।

১৯ ভাষায় যৌনবাদ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে 'Sexism in Language' টীকা, Feminist Dictionary, প্রাগুক্ত।

২০ সামগ্রিকভাবে ভাষা লিঙ্গীয় বৈষম্য ও সম্পর্ক বুঝতে বিরাট অনুসন্ধানের জায়গা হতে পারে। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যেতে পারে। পুরুষালি ভাষায় আরেকটা চলতি পদ হচ্ছে 'মেয়েদের বুদ্ধি'। নারীদের অবমূল্যায়নের একটি বহুল প্রচলিত পুরুষালি চর্চা। বর্তমান লেখায় সে বিষয়ে আলাপ অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে আশঙ্কা করছি।

বৈধতা লাভ করে। বৈধতা লাভের এই বিষয়টি বোঝা সম্ভব হয় নারীর 'চরিত্র' বিশ্লেষণ করবার সামাজিক রেওয়াজ দিয়ে। মন্তব্যের লক্ষ্য হন যে নারীরা তাঁদের 'চালচলন' অনেক ক্ষেত্রেই বিচার্য হয়ে ওঠে। উপরন্তু, ছিঁচকে মন্তব্যে প্রকাশিত যৌনাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবারও কারণ নেই আমাদের। নারীর প্রতি সরাসরি মন্তব্য করেন না অথবা বিরোধিতা করেন এমন পুরুষদের সমলিঙ্গীয় আড্ডায় সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি হ'ল, সেটা স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন, পুরুষালি আড্ডার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। সবক্ষেত্রে সেটা প্রত্যক্ষভাবে ধরা না পড়তে পারে, যা ছিঁচকে মন্তব্যেরও বৈশিষ্ট্য। পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশের চূড়ান্ত লক্ষ্য দাঁড়ায় নারীর শরীরের নিরঙ্কুশ যৌনবস্তুকরণ (sex objectification)। নারীকে সর্বাত্মকভাবে সামাজিক ক্ষেত্র-চ্যুত করার সাথে তাকে যৌনবস্তুকৃত করে ফেলবার প্রক্রিয়ার নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। বৃহত্তর লিঙ্গীয় রাজনীতিক সম্পর্কের মধ্যকার বিষয় এটা।

এই ভাবনাসূত্রের জের ধরেই অনুধাবন করা সম্ভব হতে পারে নারীর শরীর ও উপস্থিতি নিয়ে পুরুষের নিরন্তর বিচার-মনস্কতা। 'কোথায় কতটুকু চর্বি মানানসই', 'কেমন পোশাক পরলে কী কী হতে পারত', ' হাঁটাটা কোন্ভাবে হলে কিরকম জমত' – ইত্যাদি আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরুষের কাম্য নারীর সম্ভাব্য রূপরেখা পেশই বটে, তার নিজেরই যৌনাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ, শরীকী যৌনকামনা। অসম সম্পর্কের এই নিপাট বিধিব্যবস্থার মধ্যে পুরুষের সন্তুষ্টির প্রশ্ন অনায়াস। যৌনক্রিয়ার যে সীমিত গণ্ডি সেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ বিস্তীর্ণ সামাজিক দখলদারিত্ব সহই ঘটে। এর থেকে এমন ভাববার কোন কারণ নেই যে, পুরুষের যৌনাকাঙ্ক্ষার সাথে নারীর কাঠামোগত পরিপূরকতার সম্পর্কের সম্ভাব্যতা আমরা নাকচ করে দিচ্ছি। এর প্রামাণ্য বরং আমরা টের পাই পুঁজিবাদী সমাজে নারীর শরীর নিয়ে পুরুষালি আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (বিউটি পার্লার, চর্বি কমানোর ফিটনেস ক্লাব থেকে শুরু করে ক্যাবারে, পর্নোগ্রাফ, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি) এবং সেখানে কখনো সখনো নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।[২১] পুরুষ হেজেমনিতে[২২] নারীর অস্তিত্ব যে অর্থ

২১ নারীর এই অংশগ্রহণকে অনেকেই ব্যক্তির মনপসন্দ্ (personal choice) এবং অধিকারের (right) ধারণা দিয়ে বুঝতে চান। আমাদের বিবেচনায় বুর্জোয়া, সেই সূত্রে বিশেষ শ্রেণীর জন্য অর্থবহ, এ ধারণাগুলি পুরুষের দাপুটে ব্যবস্থা বা হেজেমনি উন্মোচন করতে পারে না।

২২ শ্রেণী হেজেমনির চাইতে পুরুষ হেজেমনি শনাক্ত করা আরও কঠিন বলে মনে হয়। এর ব্যাখ্যাও গ্রামসি হতেই বোঝা যায়। সাধারণ বোধবুদ্ধিতে (common sense) ব্যবস্থার কানুন পর্যবসিত হওয়া যদি হেজেমনির বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে পুরুষ ব্যবস্থার কানুনকে আরও প্রোথিত অনুভব করতে সমস্যা হয় না। হেজেমনির ধারণার জন্য –

বহন করে তা সার্বভৌম নয়।

‘আমার শরীর আমার সিদ্ধান্ত’[২৩]: সম্মতি ধারণার সঙ্কট

পুরুষালি আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীবাদী আলাপ-আলোচনায় সম্মতির প্রসঙ্গ উথাপিত হওয়া একটা গুরত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পুরুষালি সহিংসতা ও দাপটের সাথে নারীর জীবন ও অস্তিত্ব, যৌনসত্তাও বটে, কাঠামোগত-ভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কে, যৌনসম্পর্কেও বটে, নারীর সম্মতি ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষিত; সেইটাই পুরুষ আধিপত্যের একটা স্মারক। নারীর লড়াইয়ে সম্মতির প্রসঙ্গ উত্থাপন তাই পুরুষ আধিপত্যকে একটা মোকাবিলা। পুরুষের প্রকাশ্য সহিংসতাকে চিহ্নিত করতে সম্মতির ধারণা কার্যকর হতে পারে।[২৪] এর একটা মানে হতে পারে যে পুরুষের অপ্রকাশ্য সহিংসতারও একটা বিষয় আমরা বলতে চাইছি। সেটা আসলে পুরুষের সামগ্রিক সামাজিক অস্তিত্বেরই ব্যাপার, যাকে আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে চিনবার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, পুরুষাধিপত্যের পরিসরে বিস্তর কর্মকাণ্ড আদতেই সহিংস বলে বিবেচিত হয় না এবং বিস্তর কর্মকাণ্ড এমনভাবে চিত্রিত হয়, সেখানে সম্মতির বিষয়টাই গুরুত্বের সাথে উত্থাপিত হয় না।

এই প্রসঙ্গে লিখবার ক্ষেত্রে, স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের প্রধান আগ্রহ ছিল নারীমুক্তির জিজ্ঞাসা ঘিরে। যদিও উপশিরোনামে ‘সম্মতি’ এবং ‘সিদ্ধান্ত’ একত্রেই ব্যবহার করেছি আমরা, তবুও এ দুয়ের গুণগত পার্থক্য আমাদের বিবেচনায় রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য[২৫] ইদানিংকালে, উন্নয়নসংস্থার ব্যাপক কর্মকাণ্ডের মধ্যে

আন্তোনিও গ্রামসি, Selected Prison Notebooks, কুইন্টিন হোর ও জেফরী স্মিথ, নিউইয়র্ক, ১৯৭১।

২৩ এই শ্লোগানটি অবশ্য গর্ভপাতের অধিকারের দাবিনামা ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে নারী-পুরুষ যৌনসম্পর্কের বেলায়ও এটি অর্থবহ, পুঁজিবাদী সমাজে এর যাবতীয় পরিসীমিত অর্থ সহই। প্রসঙ্গক্রমে, গর্ভপাত নিয়ে নারীর অধিকারের বিষয়ে দেখা যেতে পারে – সুজান হাইমেলউইট, ‘Abortion: Individual Choice and Social Control’, ফেমিনিস্ট রিভিউ সম্পাদিত Sexuality: A Reader, ভিরাগো, লন্ডন, ১৯৮৭।

২৪ আদালতে বিভিন্ন মামলাতে যেভাবে ধর্ষিত নারী সম্মত ছিল বলে ‘প্রমাণ’ হয়ে যায় তাতে এ কথা বলা বেশ কঠিন। এটাও আমাদের একটা বক্তব্য যে বিদ্যমান পুরুষালি কাঠামোতে সম্মতির ধারণার আইনী প্রয়োগ পুরুষের পক্ষে ফায়দা বের করে আনতে পারে।

২৫ বর্তমান চিন্তাজগতে নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে সিদ্ধান্তগ্রহণ যে খুব বড় করে দেখা হচ্ছে সারা হোয়াইট সে ব্যাপারে সতর্ক। ও মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য দিয়ে ক্ষমতার উপলব্ধিকে পরিসীমিত করা হয়। দেখুন – সারা হোয়াইট, ‘Tracing the

‘নারীর ক্ষমতায়ন’ গুরুত্বপূর্ণ আলাপ হিসেবে সামনে আসার পর, নারী সত্তার আরও সক্রিয়তাকে ইঙ্গিত করে, সম্মতির বেলায় সেটা ঘটে না। কিন্তু, বিদ্যমান পুরুষ ক্ষমতার ব্যবস্থায় আদতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা সম্মতি নারীর জন্য তেমন কোন ভিন্ন বাস্তবতা তৈরি করতে পারে কিনা তা আমাদের ভাবিয়েছে। বিশেষভাবে আমরা বুঝবার চেষ্টা করেছি যৌনতার ক্ষেত্রে নারীমুক্তি কী অর্থ বহন করে। এমন নয় যে এই লেখাটা কোন সম্ভাব্য রাস্তা বাতলে দিতে পারে, তবে এই বিষয়ে একটি চিন্তাসূত্রই বড়জোর আমাদের লক্ষ্য।

পুরুষের নানাবিধ ক্ষমতা নিরন্তর পুনর্গঠিত এবং শক্তিশালী হবার মধ্য দিয়ে নারীর কোন সম্মতি কিংবা সিদ্ধান্ত কি তার সক্রিয় সত্তা, চৈতন্য, কিংবা আরও সহজ করে বললে তার ইচ্ছার স্মারক হয়ে ওঠে? আধুনিক[২৬] সমাজে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যৌনতা একটা শাসনের বিষয় হয়ে পড়েছে।[২৭] স্পষ্টতই, নারীর জন্য এই শাসন বিশেষভাবে অর্থবহ। শাসনের এই পরিমণ্ডলে নারীর পক্ষে সম্ভাব্য করণীয় খুবই সীমিত। খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয়, এ এমন এক সময়কাল যখন ভাবা হচ্ছে নারী ক্রমাগত ‘অগ্রসর’ হচ্ছে। বিষমসংগতি হচ্ছে ‘অগ্রসরমান’ এই সময়েই নারীর পক্ষে যেকোনো এজেন্ডা নির্মাণ দুরূহ, যৌনসম্পর্কের বেলায় সেটা আরও কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে সামাজিক উপলব্ধিতে নারীর যৌনতা উপেক্ষিত। কিন্তু এই উপেক্ষাকে চিরকেলে মনে করবার একটা বিদ্যাজাগতিক প্রবণতা আমরা দেখতে পাই। সেটা যে কতটা ভ্রান্ত তা প্রাক্-ঔপনিবেশিক অনুভূতি জগৎ উদঘাটন করবার প্রক্রিয়াতে স্পষ্ট হয়। আমাদের সামনে সমাজ-ইতিহাসের তেমন কোন দলিল না থাকাতে অন্তত সাহিত্য হতে একটা উদাহরণ তুলে ধরতে চাইছি।

Shadows’, Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯২।

২৬ আধুনিক বলতে আমরা একটা বিশেষ সময়কালকে শুধু নয়, বিশেষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে উপনিবেশিত সমাজের রূপান্তরিত দশা বোঝাতে চেয়েছি। বিদ্যমান জ্ঞানজগতে আধুনিকতার অর্থ অগ্রসরতার সমার্থক, এর বিপরীতে ¯পষ্টভাবেই ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আমরা অনুসন্ধিৎসু। আমাদের ভাবনায মদদ যুগিয়েছে তালাল আসাদের চিন্তাপদ্ধতি। দেখুন – তালাল আসাদ, ‘Introduction’, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, দ্য জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, বাল্টিমোর এবং লন্ডন, ১৯৯৩।

২৭ মিশেল ফুকো,‘‘We ‘Other Victorians’,’’ The History of Sexuality: An Introduction, পেংগুইন বুকস, মিডলসেক্স, ১৯৭৬। নারীবাদীরা ফুকোর উপলব্ধিকে লিঙ্গীয় বৈষম্য সম্পর্কে আন্ধা বলছেন। দেখা যেতে পারে – টীকা: Sexuality, সনি এন্ডারমার, টেরী লভেল, এবং ক্যারল ওকউইট্জ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।

রাধার হৃদয়-কানন-বিহারী হে চিরানন্দ ময়
যদু-নন্দন, চন্দন হ'তে স্নিগ্ধ শ্রী-কর দ্বয়।
দু'টি মঙ্গল-কলস কামের এ কুচ-যুগল মম,
আঁকো মৃগ-মদ-পত্র-লেখাটি ও করে হে প্রিয়তম!

মদনের বাণ রোধিতে নয়নে পরেছিনু যে কাজল,
চুম্বনে তব ওগো প্রিয় মোর গেছে মুছে সে সকল।
প্রিয়তম তব নিজ হাতে দাও সে কাজল-রেখা আঁকি,
উজ্জ্বল হোক কজ্জলে পুনঃ প্রিয়ার কমল-আঁখি।[২৮]

এমন নয় যে এই পদাবলী দিয়ে একটা বিশেষ সময়কালের সামাজিক অনুশীলনের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় বা সে চেষ্টা আমরা করছি। কিন্তু নারীর যৌনতা উদযাপিত হবার সামাজিক পরিসর যে ছিল সে ব্যাপারে আমরা দিক্-নির্দেশনা পাই। সামাজিক পরিসরে নারীর যৌনতার প্রাতিষ্ঠানিক উপেক্ষা কোনভাবেই নারীর এজেন্ডা তৈরির সহায়ক পরিবেশ দেয় না। যৌনতার প্রবল ধারণা পুরুষের স্খলনানন্দকেন্দ্রিক (orgasm)। নারীর পক্ষে এ উপলব্ধিতে পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ যে পুরুষালি উপেক্ষা, সহিংসতার সাথে স্খলনানন্দকেন্দ্রিক যৌনতার ধারণার যোগাযোগ আছে। নারীর এজেন্ডার রাজনৈতিক সূচনাবিন্দু তাহলে হতে হয় এই ধারণার বিরুদ্ধে। তবে সেটাও প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। নারীর যৌন-আনন্দের (pleasure) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া নারীসত্তার জন্য জরুরী। বিদ্যমান পুরুষ আধিপত্যের পরিসরে সেই উত্থাপন দুরূহ। যৌনতার ক্ষেত্রে নারীমুক্তির লক্ষ্যে খোদ লিঙ্গীয় সম্পর্কের অসমতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।[২৯]

বন্ধু, সহযোদ্ধা এবং এক সময়ের শিক্ষক রেহনুমা আহমেদের ধীমান যোগাযোগ আমাদের লিখতে উৎসাহ যুগিয়েছে। ওর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সহযোদ্ধা মেঘনা গুহঠাকুরতা আমাদের কাজ নিয়ে সবসময়েই আগ্রহ দেখাচ্ছে, আমাদের জন্য সেটা খুবই আনন্দের। কৃতজ্ঞতা ওঁর প্রতিও।

আদিপ্রকাশ: সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৭৪, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৯

---

২৮ জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* হতে উদ্ধৃত। বাংলা অনুবাদ সদ্রুদ্দীনের (জয় বাংলা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫)। রাধাসত্তার প্রকাশ ঘটেছে এই পদে।

২৯ আমাদের পুরো আলোচনা একটা বিষমলিঙ্গীয় (heterosexual) যৌনসম্পর্কের পরিসরেই স্থাপিত। সেটার কারণ নারী-পুরুষের সামাজিক অসমতাই আমরা উদ্ঘাটন করতে চেয়েছি। তাছাড়া আমরা বিয়ে ব্যবস্থার কোন উল্লেখ করিনি। সেটাও ভেবে চিন্তেই। বিয়ে ব্যবস্থার মধ্যে যৌনতার প্রবল ধারণা ও অনুশীলন যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক এবং বৈধ রূপ লাভ করে সেই প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের পরবর্তীতে লিখবার আগ্রহ আছে।

মানস চৌধুরী ও রেহনুমা আহমেদ

লিঙ্গ, শ্রেণী এবং অনুবাদের ক্ষমতা: বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে

Rabindranath Tagore

ভূমিকা: ‘জ্ঞাতিসম্পর্ক’ পড়ানো

সাত বছর শিক্ষাছুটিতে থাকবার পর ’৯৬ এর গোড়ার দিকে রেহনুমা আহমেদ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যোগদান করে, তখন তার পড়াবার বিষয় নির্ধারিত হয় ‘জ্ঞাতিসম্পর্ক’ কোর্সটি। কিন্তু যেহেতু তার পি.এইচ.ডি. থিসিসের কাজ শেষ হয়নি,

তাই বিভাগীয় শিক্ষকেরা তার লেখাপড়ার সময় করে দেয়ার জন্যে বিভিন্নভাবে সহায়তা করবার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাথমিকভাবে 'জ্ঞাতিসম্পর্ক' কোর্সটি পড়াতে শুরু করে মানস চৌধুরী। এটি প্রথম বর্ষের পাঠ্যসূচীর বিষয়। মানস এই কোর্সটির বিষয়বস্তু দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারা হতে শুরু করে মর্গান, এঙ্গেলস পড়ায়। পরবর্তীতে কোর্সটির বিষয়বস্তু বদলানোর ক্ষেত্রে রেহনুমা এবং মানস সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বনির্মাণ (theorisation)-কে প্রাধান্য দেয়। উপনিবেশকালীন সময়ে জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের অর্থই 'অন্য'কে অধ্যয়ন; আর অন্য মানেই আদিম অর্থাৎ অপাশ্চাত্য সমাজ – এই উপলব্ধির মুখোমুখি হওয়া জরুরী ছিল কোর্সটিতে। কারণ, এই 'অন্য' পশ্চিমের কাছে অন্য। যখন বিংশ শতকের শেষভাগে প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশগুলোতে নৃবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক গঠন নিয়ে বিতর্ক করে বিভিন্ন ধরনের ধারা ও কাজ জন্ম নিচ্ছে – তখন পশ্চিমের ক্ষমতা সম্পর্ক না বুঝে নৃবিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন পড়ে পশ্চিমকে অধ্যয়ন করার।

জ্ঞাতিসম্পর্ক কোর্সটিকে সাজানো হয় দুটো ভাগে ভাগ করে। এক ভাগে রাখা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর কাজগুলো যেখানে মর্গান, মেইন, এঙ্গেলস বিবেচিত হয়। অন্যভাগে বিংশ শতাব্দীর নানাবিধ কাজকে তালিকায় নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে লিওনোর ডেভিডফ ও ক্যাথরিন হল, ক্রিস্টিন ডেলফি, হিলারী স্ট্যান্ডিং এবং তালাল আসাদের কাজ এসেছে।[১] এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল রাখা হয়েছে যে বিংশ শতকে 'জ্ঞাতিসম্পর্ক' আলোচনায় জোরদার বিশ্লেষণী কাজগুলো এসেছে নারীবাদীদের হাত থেকে। এর মধ্যে অগ্রণী কাজগুলো নৃবিজ্ঞানের বাইরের, যদিও ধরেই নেয়া হ'ত জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশেষভাবেই নৃবিজ্ঞানের বিষয় এবং কেন্দ্রীয় বিষয়।

ছাত্রছাত্রীদের দলগত উপস্থাপনার দায়িত্ব দিয়ে পড়ানো হচ্ছিল। এমন নয় যে

---

১ দেখুন Leonore Davidoff and and Catherine Hall, Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class, ১৭৮০-১৮৫০, London, ১৯৮৭; Christine Delphy, 'Sharing the Same Table : Consumption and the Family', C. C. Harris and M. Anderson (eds) The Sociology of the Family, : New Directions for Britain, University of Keele, Sociological Review Monograph ২৮, ১৯৭৯; Hilary Standing, Dependence and Automomy. Women's Employment and the Family in Calcutta, London, ১৯৯; Ges Talal Asad, Some Aspects of Change in theStructure of the Muslim Family in the Punjab Under British Rule (Thesis submitted for the degree of Bachelor of Letters, Exeter College, Trinity Term, ১৯৬১).

দলগত উপস্থাপনাই পড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি, কিন্তু প্রথাগত বক্তৃতা পদ্ধতিতেই শুধু পাঠদান করলে একঘেয়ে হয়ে পড়তে পারে এরকম মনে হচ্ছিল। এ ধরনের উপস্থাপনায় সমন্বয়ের কাজ স্বাভাবিকভাবেই কোর্স শিক্ষককে করতে হয়েছে। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের একাধিক দলে ভাগ করে বিভিন্ন লেখা বিভিন্ন দলের দায়িত্বে দিয়ে দেয়া হয়। শুধু সমন্বয়ই নয়, দায়িত্ব অন্যত্রও। সচরাচর বাংলা মাধ্যমে পড়া এই ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী লেখা থেকে উপস্থাপনযোগ্য লেখা তৈরী করতে হয়েছে। তাদের সেই কাজে সহায়তা দেয়া জরুরী। তাই বারংবার শুধু ছাত্রছাত্রীদের সাথেই নয় বরং রেহনুমা ও মানসের একত্রে বসতে হয়েছে। অনুবাদের জন্য, ছাত্রছাত্রীদের বিষয়বস্তু ধরিয়ে দেবার জন্য।

আমাদের এই যৌথতা 'জ্ঞাতিসম্পর্ক', সেই সাথে নৃবিজ্ঞান নিয়ে অনেকগুলো জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষমতাহীন ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে নৃবিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে সেই জিজ্ঞাসাগুলোর অনুশীলন অত্যন্ত জরুরী। বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু জ্ঞাতিসম্পর্কের গবেষণা কাজ হয় যেগুলো শ্রেণীকরণ, বর্ণনামলক জ্ঞাতিসম্পর্ক অনুসন্ধান করে। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনিয়ান সেই কাজগুলো জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে কতটা অর্থ বহন করে? লিঙ্গ এবং শ্রেণী সম্পর্ক কিভাবে জ্ঞাতিসম্পর্কের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? যৌনতা (sexuality) কি, যেমনটা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, অপরিবর্তনীয় কিছু, না কি একটি ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ? যদি এটা ঐতিহাসিক, তাই অনিবার্যভাবেই রূপান্তরশীল হয়, তাহলে পরিবর্তিত আধিপত্যের সম্পর্ক (পুরুষ, শ্রেণী ও পাশ্চাত্য) কিভাবে যৌনতাকে পুনর্নির্মাণ করে? কোন্ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় বিশেষ ধরনের যৌনতা, বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়ে ওঠে, একমাত্র নৈতিক হয়ে ওঠে? অপাশ্চাত্য থেকে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, এমনকি মতাদর্শের ক্ষেত্রেও শক্তিশালী। পাশ্চাত্যের এই ক্ষমতা জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় মদদ যুগিয়েছে। তাহলে আজকে অপাশ্চাত্যে, বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে বিষয়বস্তু এবং তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর দিক নির্দেশনাটা কী হবে?

নৃবিজ্ঞান কি 'অন্য সংস্কৃতির' অধ্যয়ন নাকি 'পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক হেজেমনি'র অধ্যয়ন?

'I believe, also, that it is more important today than it has ever been before in human history for people to have some understanding of cultures other than their own.'[২]

২ John Beattie, Other Cultures. Aims, Methods and Acheivements in Social Anthropology, London, ১৯৬৪, p. vii.

জন বিটি'র এই উদ্ধৃতি থেকে প্রথম পর্যায়ের নৃবিজ্ঞানের একটা চেহারা ধরা পড়ে। নৃবিজ্ঞান চর্চার তাগিদ তৈরী হয় পশ্চিমে। সংস্কৃতির অন্যতা খোঁজা এবং তার বিশ্লেষণ নিয়ে নৃবিজ্ঞানের শুরু। কিন্তু কেন এই অন্যতাকে আবিষ্কার করা পশ্চিমের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল – তা নিয়ে ধ্রুপদী নৃবিজ্ঞানের মতামত যথেষ্ট প্রশ্নাতীত বিবেচনা করা কঠিন। বিটি থেকেই তুলে ধরা যাক আবার: '...by adding a little more to that knowledge of human society and culture, and so to our knowledge of ourselves, it may help us to understand some of these problems better,'[৩] এই অনুধাবন থেকে যে প্রশ্নটা সরাসরি চলে আসে তা হল অন্যতাকে দেখার প্রশ্ন, কিংবা সঠিকভাবে বললে অন্যতাকে নির্মাণের প্রশ্ন। সেই নির্মাণের ক্ষেত্রে পশ্চিমের অর্থাৎ ক্ষমতাবানের কর্তৃক কোনভাবেই উপরের উদ্ধৃত লেখাগুলোতে উন্মোচিত হয় না। পাশ্চাত্যের ক্ষমতাকে বিটি এবং আরো অনেক নৃবিজ্ঞানীদের লেখায় নিপুনভাবে অদৃশ্য করে ফেলা হয়।[৪] কিছুতেই দেখতে দেয়া হয় না 'অন্য' বানাবার পুরো প্রক্রিয়ার নির্মাতা/কর্তা কে? 'Our'-এর 'আমরা' কারা? আমরাও, অপাশ্চাত্যরাও কি 'Our'-এর অন্তর্ভুক্ত? 'Human society'-র সদস্য কারা? কোন সমরূপতা (homogeneity) আছে কি পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নৃবিজ্ঞানীর আর অপাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নৃবিজ্ঞানীর – যেমন আমরা? একই 'অন্য' কে আমরা উভয়েই নির্মাণ করতে পারি কি?

অন্যতা যে প্রবল দ্বারা নির্মিত এবং মতাদর্শিক পরিসরে সেই অন্যতা কাজ করে – সবচেয়ে জোরালভাবে এটা উপলব্ধি করতে পারে নারীবাদীরা।[৫] লিঙ্গীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাবল্য বিদ্যমান। নারীর জন্য এবং নারীবাদীদের জন্য সেটা বস্তুগত (material) । আবার মতাদর্শিকও। এই বস্তুকতা ও মতাদর্শ পুরুষ কেন্দ্রীক। শ্রমব্যবস্থা এবং লিঙ্গীয় পরিচয়ে (gender identity) নারী হয়ে পড়ে 'অন্য'।

অপাশ্চাত্যের 'অন্য' হয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা আলাদা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নৃবিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদী কাঠামো দিয়ে অপাশ্চাত্যের ইতিহাস বানায়। সেটা আবার ঐতিহাসিকতার শর্তগুলোকে অনুপস্থিত রেখেই। পাশ্চাত্য এবং

৩ প্রাগুক্ত, একই পৃষ্ঠায়।

৪ উদাহরণ হিসেবে দেখুন S. F. Nadel, The Foundations of Social Anthropology, London, ১৯৫৩; E. E. Evans-Pritchard, Social Anthropology, London, ১৯৫১..

৫ Barbara L. Marshall, Engendering Modernity. Feminism, Social Theory and Social Change, Oxford, ১৯৯৪; Donna Landry and Gerald MacLean, Materialist Feminisms, Massachusetts, ১৯৯৩.

অপাশ্চাত্য এই প্রক্রিয়াতে যুক্ত থাকে অসম এবং খুবই ভিন্ন অবস্থান হতে। পাশ্চাত্য নিজেকে নির্মাণ করেছে অপাশ্চাত্যের সাপেক্ষে – তার 'বড়' ও 'উন্নত' চেহারাকে, নিজেকে 'প্রগতির চূড়ায়' রেখে। আবার সেই ইতিহাসে অপাশ্চাত্য থাকে যা 'আদিম', 'বর্বর', 'অসভ্য'।[৬] এই ইতিহাস বানানোর প্রকল্প বিংশ শতাব্দীর বিশ, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বদলে যায় যখন এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিত মানুষজন ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হতে চায়। অপাশ্চাত্যের মানুষজনকে উপলব্ধি করবার জন্য নতুন ক্যাটাগরি সৃষ্টি হয়। 'ট্রাইব্যাল', 'অনাধুনিক'দের 'আধুনিক', 'নাগরিক' পর্যায়ে কিভাবে 'উত্তরণ' ঘটানো যায় তা নিয়ে নৃবিজ্ঞানে তর্কবিতর্কের সূচনা হয়।[৭] তাই পশ্চিমের উপস্থিতি বাদ দিয়ে আজকের নৃবিজ্ঞান, পাশ্চাত্যে বা অপাশ্চাত্যে, চর্চা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হ'ল কোন্ ইতিহাস তাহলে নৃবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? তালাল আসাদের মতে নৃবিজ্ঞান হতে হবে ঐতিহাসিক, পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক হেজেমনির অনুসন্ধান হবে তার লক্ষ্য। আসাদের ভাষায়: 'Anthropology, then, appears to be involved in definitions of the West while Western projects are transforming the (preliterate, precapitalist, premodern) peoples that ethnographers claim to represent. Both processes need to be studied systematically. To understand better the local peoples 'entering' or ('resisting') modernity, anthropology must surely try to deepen its understanding of the West as something more than a threadbare ideology. To do that will include attempting to grasp its peculiar historicity, the mobile powers that have constructed its structures, projects and desires.'[৮]

---

৬ দেখুন James Clifford and George E. Marcus, 'Introduction', Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography, Delhi, ১৯৯০, p. ২৩; Henrika Kuklick, The Savage Within, The Social History of British Social Anthropology, ১৮৮৫-১৯৪৫, Cambridge, ১৯৯১, p. ১.

৭ উদাহরণ পাওয়া যাবে: Lucy Mair, An Introduction to Social Anthropology (second edition), Oxford, ১৯৬৫ (১৯৮৪), p. ২৭৯, ২৮১. আরও দেখুন: A. L. Epstein, Politics in an Urban African Community, ১৯৫৮.; D. Parkin, Neighbours and Nationals in an African City Ward, ১৯৬৯.; P. Mayer, Townsmen or Tribesmen, ১৯৬১.

৮ Talal Asad, 'Introduction,' Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, London, ১৯৯৩, pp. ২৩-৪.

অপাশ্চাত্যের রূপান্তর বুঝবার জন্য সেই ধরনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট কাজ প্রয়োজন যা অপাশ্চাত্যের মানুষজনের বিবিধ ইতিহাস – শ্রমবিভাজন, সম্পদের সাথে সম্পর্ক, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস-কে 'প্রাক-পুঁজিবাদী' লেবেল এঁটে 'সমরূপ' (homogeneous) করবে না।[৯] একটি জনসমষ্টির বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট বাস্তবতাকে কিভাবে পাশ্চাত্যের ক্ষমতা রূপান্তর করছে সেটাই অনুসন্ধানের বিষয়। প্রায়শই এই রূপান্তরণ অপাশ্চাত্যের জনগণের কার্যকারিতা (agency) আছে, তারা কোনও ভাবেই নিষ্ক্রিয় নয়।

ইংরেজী হ'তে বাংলায় লিঙ্গ এবং শ্রেণীর অনুবাদ ডেভিডফ ও হল, পরিবার গঠনে বিয়ের ভূমিকা

ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রী ইতিহাসবিদদের কাজের ধারা অত্যন্ত শক্তিশালী। ই. পি. টমসন, এরিক হবস্‌বম – এদের মত বলিষ্ঠ তাত্ত্বিকরা এই ধারা দাঁড় করিয়েছে।[১০] রাষ্ট্র, শ্রেণী, শ্রেণীসম্পর্ক, সাম্রাজ্যবাদ – তাদের কাজের প্রধান জায়গা। সে সমস্ত কাজে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস পুনর্নির্মাণ, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস রচনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী ইতিহাসবিদদের কাজে নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রান্তিক।[১১] লিওনোর ডেভিডফ এবং ক্যাথরিন হল নারীবাদী ইতিহাসবিদ। তাদের দুজনের যৌথ কাজের ফসল Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class, ১৭৮০-১৮৫০।[১২] দুটো চিন্তা তাদের মাথায় কাজ করেছে: লিঙ্গীয় সম্পর্কের সামাজিক সংগঠন ('the social organisation of relations between the sexes'),[১৩] এবং শ্রমিক শ্রেণী

---

৯ দেখুন Talal Asad, 'Are There Histories of Peoples Without Europe?' Comparative Studies in Society and History ২৯, no ৩, ১৯৮৭.

১০ এদের অনেক লেখালেখি হ'তে দুটো প্রধান কাজ আমরা তুলে ধরছি : E. P. Thompson, The Making of the English Working Class, Penguin, London, ১৯৬৮. Eric Hobsbawm, Industry and Empire, New York, ১৯৬৮.

১১ Catherine Hall, 'Feminism and Feminist History', White, Male and Middle Class. Explorations in Feminism and History, Oxford, ১৯৯২, p. ৫.

১২ Davidoff and Hall, ১৯৮৭, ১৯৮৭, প্রাগুক্ত।

১৩ ১৯৮৭তে প্রকাশিত Family Fortunes সম্পর্কে ক্যাথরিন হল বলছে : 'Leonore Davidoff and I used gender conceptually to mean the social organization of relations between the sexes and argued that,

নয়, অধিপতি শ্রেণীর (dominant class) অধ্যয়ন। সে কারণেই কাজটি বৃটিশ সমাজতন্ত্রী ইতিহাসবিদদের প্রচলিত ধারা হতে ভিন্ন।

আঠারো শতকের শেষভাগ হতে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতাদর্শ, প্রতিষ্ঠান এবং অনুশীলন নিয়ে তাদের বইটি।[১৪] ষাট এবং সত্তরের দশকে পাশ্চাত্যে যে নারীবাদী তাত্ত্বিকী কাজ হয়েছে লিঙ্গ এবং শ্রেণী বিষয়ে, তার ভিত্তিতে এই বইটির সূচনা।[১৫] ডেভিডফ ও হল দেখেছে লিঙ্গ এবং শ্রেণী সব সময়েই একত্রে ক্রিয়াশীল এবং শ্রেণী চৈতন্যের সবসময়ই একটা লিঙ্গীয় রূপ আছে। অবশ্যই শ্রেণী পরিচয় এবং লিঙ্গীয় পরিচয় একীভূত হয় না। সত্যিকার অর্থে, শ্রেণী প্রত্যাশা এবং নারী সত্তার ভেতর একটা বিরোধ কাজ করেছে। উনিশ শতকের মাঝভাগে নারীবাদ বিকাশে সেই বিরোধ শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে।

মধ্যবিত্ত দুনিয়ার প্রত্যক্ষ পাবলিক-প্রাইভেট (ঘর-বাহির) বিভাজনকে আলাদাভাবে মনোযোগ দিয়েছে তারা। রাজনৈতিক অঙ্গনে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিস্বার্থের যে বিভাজন – সে অর্থে নয়, পার্থক্যটা সাধারণ বুদ্ধির (common sense)। একদিকে নৈতিকতা ও আবেগের রাজ্য, অন্যদিকে যুক্তিশীল কর্মকাণ্ড যাকে বাজার ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হিসেবে দেখা হয়। এ পাবলিক-প্রাইভেট বিভাজনের বাইরে তারা দেখাতে চেয়েছে ধনসম্পত্তি এবং মানুষজন নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্যের কারণে কেউকেটা হয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত পুরুষেরা কিভাবে পারিবারিক সম্পর্ক জালে আবদ্ধ ছিল এবং নারীরা তাদের খ্যাতিতে সহায়তা যুগিয়েছে। পুঁজিবাদী বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা বইটি বিশ্লেষণ করে। পূর্বতন ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নতুন লিঙ্গীয় ভিন্নতার ধারণাগুলো চিহ্নিত করতে এবং ওই ধারণাগুলোর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব অনুসন্ধান করেছে তারা।

পুঁজিবাদী রূপান্তরের মধ্যে পরিবার ও বিয়েতে নারীর ভূমিকা পুনর্নির্ধারিত হচ্ছিল। ইহুদী-খৃস্টীয় ধারার পরিবার বৃটেনে প্রচলিত ছিল। এই পরিবারে বয়স ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষদের আধিপত্য ছিল। বৃটিশ মধ্যবিত্ত গঠনে, পুঁজিবাদী বিকাশের মধ্যে, পরিবার তৈরীতে বিয়ে নতুনভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। পিউরিটান ধারার গৃহীপনায় (domesticity) যুক্ত হয় নারীর 'সহযোগী' ভূমিকার

---

thought of in this way, gender is a constitutive element in all social relations'. 'Politics, Post-Structuralism and Feminist History.' Thematic Reviews, Gender & History, vol. ৩, no. ২, Summer ১৯৯১.

১৪ ডেভিডফ এবং হল 'বুর্জোয়া'র স্থানে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' ব্যবহার করছে অধিপতি শ্রেণী বোঝাতে।

১৫ যেমন : Michele Barrett, Women's Oppression Today, London, ১৯৮০; Juliet Mitchell, Psychoanalysis and Feminism, London, ১৯৭৫.

নতুন আদর্শ রূপ। যদিও এতে নারীর একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা তৈরী হ'ল কিন্তু নারী হয়ে ওঠে নৈতিক এবং সেই সময়কার ধর্মীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আত্মিক বা স্পিরিচ্যুয়াল। মধ্যবিত্ত গঠনের মধ্য দিয়ে রক্ষাকারী এবং কর্তা হিসেবে পুরুষের ভূমিকা বাড়তে থাকে। বিয়ে, পুরুষের বেলায় ব্যবসা অথবা পেশাগত উপার্জনের সাথে শর্তযুক্ত হয়ে পড়ল। আগের সময়টাতে যেখানে স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় স্ত্রী থাকা সম্ভব ছিল, বাস্তবও ছিল, ডেভিডফ ও হল দেখিয়েছে – পুঁজিবাদী বিকাশে তা আর সম্ভব নয়। অরুচিকর হয়ে পড়ল। সহধর্মিণী হবে বয়সে ছোট, নির্ভরশীল, শিশুরূপ; স্বামী হবে তার পথপ্রদর্শক, সব সময়কার পরিচালক।

ডেভিডফ এবং হলের এই কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। তারা কাজ করেছে পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে। যেকোনো বিচারের অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক কিংবা রাজনৈতিক ইতিহাস হতে তা ভিন্ন। লিঙ্গ এবং শ্রেণীর জটিল আবর্তে থাকা মানুষজনের জীবনচিত্র বুঝতে তাদের দৈনন্দিন আচরণ এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলো দেখা জরুরী মনে করেছে ওরা। তারা শিল্পশহর বার্মিংহাম এবং কৃষিভিত্তিক কাউন্টি এসেক্স ও সাফককে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা ডায়েরী, চিঠিপত্র, পারিবারিক নথি, ব্যবসায়িক নথি, স্থানীয় মানচিত্র, জমির খাজনা বই (rate book), কিছু বিয়ের দলিল, উইল, জরিপ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, স্থানীয় ইতিহাস, সংশ্লিষ্ট বি.এ.,এম.এ.,পি.এইচ.ডি. থিসিস, স্থানীয় সংগঠনগুলোর নথি, স্থানীয় পরিবারগুলোর বংশধরদের সাথে সাক্ষাৎকার এবং জাতীয় পর্যায়ের জীবনী সংগ্রহ ব্যবহার করেছে।

ডেভিডফ ও হলের ভাষান্তরণ: ভাষা, পরিভাষার সংকট

বোধগম্য একটা অনুবাদ কিভাবে সম্ভব? নৃবিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে 'বোধগম্যতা'র অর্থ ব্যাপক। ওয়াল্টার বেন্‌জামিন এ প্রসঙ্গে রুডল্ফ প্যানউইট্‌জ থেকে উদ্ধৃত করছেন: 'Our translations, even the best ones, proceed from a wrong premise. They want to turn Hindi, Greek, English into German instead of turning German into Hindi, Greek, English. Our translators have a far greater reverence for the usage of their own language than for the spirit of the foreign works. The basic error of the translator is that he preserves the state in which his own language happens to be instead of allowing his language to be powerfully affected by the foreign tongue. Particularly when translating from a language very remote from his own he must

go back to the primal elements of language itself and penetrate to the point where work, image and tone converge. He must expand and deepen his language by means of the foreign language.' (দেখুন আসাদ, ১৯৯৩)।[১৬]

কিন্তু প্যানউইট্জ যা বলছে, সেই অনুযায়ী বিদেশী ভাষা হ'তে নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ করা কোন্ প্রক্রিয়ায় সম্ভব যখন ভাষার অসমতা বাস্তবতা? ভাষা তৈরী এবং প্রবাহিত হওয়াতে ক্ষমতার অসমতা কাজ করে। সেটাই ভাষার অসমতা। দুর্বল সংস্কৃতির ভাষাকে প্রবল সংস্কৃতির চাহিদা এবং ধারণার উপযোগী হ'তে হয়। আসাদ এবং ডিক্সন বলছে, এই শতকে আরবী ভাষা ব্যাপক হারে ইংরেজীর মত করে, উপযোগী হয়ে, বদলে গেছে। আরবীর সাপেক্ষে ইংরেজীর একই রকম রূপান্তরের প্রশ্নই আসে না।[১৭] আরবীর ক্ষেত্রে এই যুক্তিটি বাংলা ভাষার বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। ভাষা এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে উপযোগীকরণের (accommodation) বিষয়টাই মুখ্য। দেখা দরকার, কোন্ ভাষাকে উপযোগী হ'তে হচ্ছে এবং কোন্ ভাষাকে হ'তে হচ্ছে না।

অনুবাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ও সমান গুরুত্ব রাখে। অচেনা একটা প্রেক্ষিতকে পরিচিতকরণ। অভিধান ঘেঁটে কতগুলো শব্দার্থ বাছাই করে আদৌ কোন 'অর্থ' দাঁড় করানো সম্ভব নয়। বিষয়টা নিছক ভাষা বদলের নয়। ডেভিডফ ও হল থেকে রেহনুমার জিজ্ঞাসা ছিল – 'কোর্টশিপ'-এর বাংলা কি হবে।[১৮] দেখা গেল অভিধানে কোন একটা শব্দ বের করা সম্ভব। কিন্তু বৃটেনের বাস্তবতায় কোর্টশিপের যে 'অর্থ' সেটা আমাদের পাঠকরা বুঝবে কিভাবে? অনুবাদের এই মোকাবিলার মুখোমুখি হ'তে গিয়ে আমরা গদ্যে এক ধরনের সমস্যা এবং কবিতায় আলাদা ধরনের সমস্যায় পড়ি। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আঠারো-উনিশ শতকে বৃটিশ পরিবার গঠনে লিঙ্গীয় বিভাজন এবং নানারকম মতাদর্শিক পরিসর নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডেভিডফ ও হল জেমস্ লুককের একটা কবিতাকে উদ্ধৃত করে। লুকক (১৭৬১-১৮৩৫), একজন ধনাঢ্য শিল্পপতি ছিলেন বার্মিংহামে। যখন তাঁর মনে হ'ল যে বেশিদিন বাঁচবেন না তিনি, তখন তাঁকে স্মরণ করে তাঁর স্ত্রী মিসেস লুকক (তার স্ত্রীর নাম অজানা) কি ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন সেই নিয়ে একটা কবিতা লিখলেন তিনি নিজেই। 'My Husband' কবিতার

১৬ উদ্ধৃত করছে Talal Asad, Genealogies, ১৯৬৩, প্রাগুক্ত, pp.১৮৯-১৯০.

১৭ Asad and Dixon, 'Translating Europe's Others,' in Francis Barker et al (eds), Europe and Its Others, vol ১, Colehester, ১৯৮৫, p. ১৭৩..

১৮ Davidoff and Hall, Family Fortunes, pp. ৩২২- ৩.

অংশবিশেষ ডেভিডফ ও হল ব্যবহার করেছে।

... Who first inspired my virgin breast,
With tumults not to be expressed,
And gave to life unwonted zest?
My husband.

Who told me that his gains were small,
But that whatever might befal,
To me he'd gladly yield them all?
My husband.

Who shun`d the giddy town`s turmoil,
To share with me the garden`s toil,
And joy with labour reconcile?
My husband.

Whose arduous struggles long maintain'd
Adversity's cold hand restrain'd
And competence at length attain'd?
My husband. ...?

(Davidoff and Hall, Family Fortunes, p. ৩২৮)

কবিতাটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়াতে না এড়িয়ে বাংলা করে ফেলা হ'ল।

আমার পতি

কুমারী বক্ষ মোর কে প্রথম সজাগিল হায়
ক্রুদ্ধ দলনে সে যে অনুভূতি প্রকাশ না যায়।
কে (মোর) জীবন ভরে দিল অনভ্যাসী লুব্ধ ইচ্ছায়
সে যে মোর পতি।

বলেছিল কে আমায় আছে তার কিছুমাত্র ধন
তবু সে যাহা হউক, মোর তরে সে যে সযতন

হাসিমুখে সকলই, সব কিছু করে সমর্পণ
সে যে মোর পতি।

কে পারল শহরের কোলাহল খুব পাশ কেটে
বাগানের কাজগুলো মোর সাথে ভাগ করে খেটে
যুগল কাজের সুখ একসাথে সব নিতে বেটে
সে যে মোর পতি।

কঠিন সংগ্রাম করে চলেছিল বহু দীর্ঘকাল
ভাগ্যের শীতল থাবা শেষমেশ ছেড়েছিল হাল
কার খোলে অবশেষে সাফল্যের সুবিশাল পাল
সে যে মোর পতি।

রেহনুমা: সাম্প্রতিক সময়ে নারীবাদীদের একটি প্রধান যুক্তি হচ্ছে ভাষা নারী-পুরুষের ভিন্নতা তৈরী করে।[১৯] ইংরেজীতে যেভাবে করে, বাংলাতে নিশ্চয়ই একই ভাবে করে না।

মানস: হ্যাঁ, আলাদা ভাবেই করে, কিন্তু করে। কিন্তু ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তো বলাই হয় যে এটি একটি শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা (classificatory system)।

রেহনুমা: শুধুই শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা বললেই সমস্যা, ভাষা ভীষণভাবে

১৯ সমর্থন মিলবে: Joan Wallach Scott, 'On Gender, Language and Working Class History', Gender and The Politics of History, New York, ১৯৮৮.

তার ভাষায়, 'By 'language' I mean not simply words in their literal usage but the creation of meaning through differentiation. By gender I mean not simply social roles for women and men but the articulation in specific contexts of social understandings of sexual difference. If meaning is constructed in terms of difference (by distinguishing explicitly or implicitly what something is from what it is not), then sexual difference (which is culturally and historically variable, but which always seems fixed and indisputable because of its reference to natural, physical bodies) is an important way of specifying or establishing meaning . My argument, then, is that if we attend to the ways in which 'language' constructs meaning we will also be in a position to find gender.' p. ৫৫.

ঐতিহাসিকও। সেই ঐতিহাসিকতা শ্রেণীবিন্যাসকে শুধু কতকগুলো ক্যাটাগরিতেই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং ক্যাটাগরিগুলোর মধ্যকার অসমতা বা স্তরকে তুলে ধরে। যা শুধু ক্ষমতা দিয়েই বোঝা সম্ভব।

মানস: সেই ক্ষমতা সম্পর্ক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এক রকম আর ইংরেজীতে অন্যরকম হ'তে পারে।

রেহনুমা: নারী-পুরুষের ভিন্নতা সেই সাথে অসমতাকে ভাষা এমনভাবে নির্মাণ করে যে লিঙ্গীয় ও যৌন বিষয়ের যাবতীয় ডিসকোর্সগুলোকে[২০] অনিবার্যভাবে 'প্রাকৃতিক' এবং 'স্বাভাবিক' বানিয়ে রাখে।

মানস: ভিন্নতার ক্ষেত্রে একটা মজার উদাহরণ আপনার কথাতেই আছে। বাংলায় 'লিঙ্গীয়' ও 'যৌন' দুটো শব্দই কিন্তু এসেছে একেবারেই শারীরবৃত্তীয় শব্দ থেকে। পুরুষ ও নারীর দৈহিক ভিন্নতা এবং প্রত্যঙ্গের নাম হ'তেই এসেছে এগুলো। 'লিঙ্গ' এবং 'যোনী' শ্রেণীবাচক শব্দ কিন্তু আবার পরিসরের ক্ষেত্রে বিরাট ভিন্নতা অসমতা তৈরী করছে। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে এ দুটো শব্দই কিন্তু ঐ ধারণা দুটো তৈরী করেছে। তুলনামূলকভাবে 'লিঙ্গ' শব্দটি একটু ব্যাপক; স্ত্রী লিঙ্গ কথাটিও বাংলায় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অত্যন্ত সীমিতভাবে। আর শিবপুজোর ব্যাপার তো আছেই।

রেহনুমা: খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে শব্দ দুটোই এভাবে এসেছে। কিন্তু এগুলো তো ব্যবহার্য শব্দ নয়, লোকসমাজের ভাষা তো আলাদা। যেমন 'নুনু', 'সোনা'। শিক্ষিত সমাজের এ্যাকাডেমিক আলোচনা এবং গণমাধ্যমের ভাষায় 'লিঙ্গীয়', 'যৌন' কথাগুলো ব্যবহৃত। এগুলো বিদ্যাজাগতিক বা এ্যাকাডেমিক ডিসকোর্সেই সুসঙ্গত বা coherent।

মানস: সে কারণেই ঐতিহাসিকতার কথা বলেছেন আপনি। একটা নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীতে ভাষার অনুশীলন চলে, ভাষা তাই শ্রেণীগত।

রেহনুমা: আপনার কথাতে মনে পড়ছে – আশির দশকে যখন আন্তর্জাতিক নারী দশকের কিছু লেখা-জোখা তৈরী করছি আমরা – বা ধরুন অনুবাদ, তখন 'gender' কথাটির একটা বাংলা প্রত্যয় ভীষণ দরকার হয়ে পড়ল। এর কিছু আগেই পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা 'sex' প্রত্যয়টি থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছিল। কারণ, সেটাও শারীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক অসমতা বোঝানোর জন্য ভিন্ন

---

২০ ডিসকোর্সের বাংলা করতে দেখি 'বয়ান'। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম করেছেন দৈনিক 'সংবাদ'-এ ৯ই জানুয়ারী, ১৯৯৭। 'সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা'তেও একাধিক লেখায় ডিসকোর্সকে বয়ান বলা হয়েছে। আমাদের বিচারে বয়ান হচ্ছে 'ন্যারেটিভ'। ভাষার ব্যবহারিক দিক ভেবেই ভাষান্তর হওয়া জরুরী। সে মতে, ডিসকোর্সের বাংলাকে চলতি অর্থের মধ্যে খোঁজাও দরকার।

কোন প্রত্যয় দরকার।[২১] বাংলায় 'লিঙ্গ' ধারণাটির সামাজিক পরিসর ব্যাপকভাবে নির্মিত হয় তখন থেকে। এ শব্দ থেকে এখন আর জৈবিক লিঙ্গকে বোঝার দরকার পড়ে না।

মানস: স্কট যেটাকে রিলেশনাল বলছে। তার ক্ষেত্রে 'differentiation-এর ব্যাপারটা স্পষ্ট।[২২] 'Relational -এর ব্যাপারটা আলোচনার দাবীদার। আশির দশকে যখন আপনারা কাজ করেন – বাংলা শব্দকে, বাংলা অর্থকে ইংরেজীর সমান্তরাল হ'তে হয়েছে। সেটা আন্তর্জাতিক নারীবাদের প্রেক্ষিতে।

রেহনুমা: অনুবাদের ক্ষেত্রে অচেনা প্রেক্ষিত পরিচিত করানো, যেটা প্যানউইট্জ-এর কথা থেকে আমরা পাই[২৩] – সেটাই এখানে ঘটেছে। লুককের কবিতাটির ক্ষেত্রে ভাবা যেতে পারে। ধরুন কবিতাটির নামই। 'Husband' -এর অর্থ বাংলায় 'পতি' বা 'নাথ', এমনকি 'স্বামী' শব্দতেও ধরা পড়ে না। বাংলায় এই তিনটা শব্দ দিয়েই 'প্রভুত্ব' বা 'hezimony' বোঝায়। পাশ্চাত্যের ইংরেজীভাষী নারীবাদীরা তাদের ধর্মীয় প্রচলনকে প্রশ্ন করে 'husband' শব্দটিকে গ্রহণ করছে।[২৪]

---

২১ দেখুন Ann Whitehead, 'Some Preliminary Notes on the Subordination of Women', IDS Bulletin, vol ১০, ১৯৭৯.

২২ জোন স্কট লিখছে, '...words acquired meaning by implicit or explicit contrasts established in specific contexts (or discourses). One cannot read Foucault...without understanding that meaning is multidimensional, established relationally, directed at more than one auditor, framed in an already existing (discursive) field, establishing new fields at the same time. Positive definitions depend on negatives, indeed imply their existence in order to rule them out. This kind of interdependence has ramifications well beyond literal definitions, for it involves other concepts, other relationships in any particular usage. (Thus, for example, seventeenth century political theorists made analogies between marriage contracts and social contracts that affected how people understood both; and nineteenth century socialists depicted capitalist exploitation of workers as prostitution, thereby intertwining economic and sexual spheres.) Meaning is developed relationally and differentially and so constitutes relationships'. ১৯৮৮, cÖv¸³, pp. ৫৯-৬০.

২৩ আমাদের ১৬ নম্বর টীকা দেখুন।

২৪ Casey Miller & Kate Swift, The Handbook of Non-Sexist Writing for Writers, Editors snd Speakers, London, ১৯৮১, pp. ৮১-৮২.

গির্জায় বিয়ের শুরুতে নারী-পুরুষকে ‘this Man and this Woman’ সম্বোধন করা হচ্ছে; কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বলা হচ্ছে ‘Man and Wife’। মিলার এবং সুইফ্টের মতে খৃষ্টীয় প্রতীক অনুযায়ী দুজন মিলে এক হ’ল কিন্তু পুরুষের প্রতীকী মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকল আর নারীর মর্যাদা একটি সহযোগী ভূমিকায় রূপান্তরিত হ’ল। সেখানে ‘husband’ ব্যবহার নারীবাদীদের কাছে খৃষ্টীয় ‘man’ এর তুলনায় আরো বেশী গ্রহণযোগ্য। যদিও ‘husband’ ‘wife’ দুটি শব্দ একই ওজনের নয়। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে ‘husband’ শব্দটির স্বতন্ত্র অর্থ আছে, তিনি হচ্ছেন একজন ‘বিচক্ষণ-ব্যবস্থাপক’ যা ‘Wife’ নন।

মানস: অচেনা প্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে ‘my husband’ কবিতাটির একটা জায়গা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ‘বাগানের কাজগুলো’ – বাংলাদেশের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী অথবা ছাত্র কিভাবে আঠারো-উনিশ শতকে ইংরেজ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাগানের সত্যিকার গুরুত্ব বুঝবে শুধুমাত্র অনুবাদ দিয়ে? তাহলে তো প্রেক্ষিত বা context -এর বিষয় চলে আসেই। ডেভিডফ ও হল বলছে ওই সময়টাতে বাড়ীর বাগান প্রিভেসী (privecy), নিয়ম, রুচি, প্রকৃতি প্রেম এগুলোর স্মারক হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে বার্মিংহাম শহরের চেহারায় বদল ঘটল। কল-কারখানা, দোকানপাটের মালিকরা সেই শহরে আর থাকতে চাইল না। তারা শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে বাড়ী বানাতে লাগল। সেই বাড়ীতে শহরের বাড়ীর তুলনায় অনেক বেশী জায়গা ছিল। শহর হয়ে দাঁড়াল কাজের জায়গা, শ্রম আর ঘামের জায়গা, নোংরা আর কদর্য জায়গা। বাড়ী হ’ল গৃহ, আশ্রয়; সৌন্দর্য আর শান্তির জায়গা, সুখ আর আরামের জায়গা। ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে মধ্যবিত্তের কাছে শহর এবং গ্রাম এলাকার বিভাজন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। শহর হ’ল যুক্তিশীলতা, পক্ষান্তরে গ্রাম হ’ল আবেগানুভূতি; শহর হ’ল মুনাফার ক্ষেত্র, শহর থেকে দূরে থাকা বাড়ীটি হ’ল ভালোবাসা ও মায়া–মমতার ক্ষেত্র। শহর, কল-কারখানা, দোকানপাট – মধ্যবিত্ত ইংরেজের যা কিছু আয়পাত্তি, রাজনীতির জায়গা, তা পাবলিক হয়ে পড়ছে। পৌরুষ (masculinity) সেই পাবলিকের সাথে যুক্ত। বিপরীতে গড়ে উঠছে নারীত্ব (femininity) যা প্রাইভেট। শহর থেকে দূরে থাকা বাড়ী সেই রমনীয়তার পরিচায়ক। বাড়ীতে বাগান চর্চা ঐ সময়ে মধ্যবিত্ত ইংরেজের পরিচয়ের অপরিহার্য দিক। শহরের কোলাহল আর শ্রম পরিবেশে যে শ্রেণী কাজ করতে বাধ্য, তাদের সাথে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দূরত্বের স্মারক হচ্ছে বাড়ী। বাগান তখন মধ্যবিত্ত বাড়ীরই পরিবর্ধন।

রেহনুমা: এবং আঠারো শতকের খৃষ্টীয় পুনরুজ্জীবন (যেমন মেথডিজ্‌ম, ইভানজেলিকালিজ্‌ম, কোয়েকার) এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ; কোন্ পরিবার, কোন্ ব্যক্তি কোন্ গির্জার সদস্য – এসব বিষয় এই সময়কালে কেন্দ্রীয় হয়ে দাঁড়াল।

সাম্প্রদায়িক আনুগত্য (denominational belonging) ইংরেজ সমাজে গভীর বিরোধ সৃষ্টি করল, তার ছাপ পরিবারেও পড়ল। তবে মজার ব্যাপার হ'ল যে, সমাজ গঠনে পরিবারের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং নারী-পুরুষের বিশিষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র – এ বিষয়ে কোন সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা ছিল না। সকল সম্প্রদায়ই এ ব্যাপারে একমত ছিল। এবং ডেভিডফ ও হলের মতে এ থেকেই তৈরী ইংরেজ নারীদের দ্বন্দ্ব: একদিকে, খৃষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সকল আত্মা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সমান কিন্তু অপরদিকে, বিয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কাঠামোগত অসমতা। অন্য কথায়, ধর্ম আধ্যাত্মিক সমতার কথা বলে আবার নারীদের সামাজিক এবং যৌন-নিপীড়নের পক্ষে।

মানস: অনুভূতি কাঠামো তাহলে বিশেষ একটা সমাজে, বিশেষ একটা সময়ে, বিশেষ ঐতিহাসিক বাস্তবতাতেই অর্থবহ। অনুবাদের লক্ষ্যই যদি হয় অনুভূতি-কাঠামো (structure of feelings)'র[২৫] সাথে পরিচিত করানো – তাহলে কাজটা ঐতিহাসিকও। আসাদ সে কথাই বলেন। অনুবাদ ভাষা, শব্দ, প্রতিশব্দ, পরিভাষা খোঁজার ব্যাপার নয়।

বাংলাদেশের ইতিহাস-লিখন এবং শ্রেণী আধিপত্য[২৬]

ইতিহাস এবং অনুবাদের সম্পর্ক অত্যন্ত অনিবার্য, আবার সেটাই নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জোরাল জায়গা তৈরী করছে। সে কারণেই কতকগুলো জিজ্ঞাসাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না আমরা, যে জিজ্ঞাসাগুলো শক্তিশালী পাশ্চাত্যের উপস্থিতি, সেই উপস্থিতিতে গড়ে ওঠা দুর্বল অপাশ্চাত্য, লিঙ্গীয় বিষয়াবলী, অপাশ্চাত্যে লিঙ্গীয় ও শ্রেণীর নির্মাণে পাশ্চাত্যের সংশ্রব এবং লিঙ্গ ও শ্রেণীর পারস্পরিক অনুপ্রবিষ্টতা বুঝতে জরুরী। জিজ্ঞাসাগুলো: বাংলাদেশের মত প্রান্তিক পুঁজিবাদী দেশে শ্রেণীর গঠন বুঝতে কী ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োজন? ইতিহাস লিখনের কেন্দ্রীয় বিষয় শ্রেণী-আধিপত্য অনুধাবনের বাইরে সম্ভব কি? যদি সেই দায়িত্ব ইতিহাস-লিখিয়েরা মেনেও নেয়, তাহলেই কি শ্রেণী শুধুই আর্থ-রাজনৈতিক একটা হিসেব-নিকেশের বিষয়? উৎপাদন পদ্ধতি এবং আর্থ-রাজনীতির হিসেব-নিকেশে শক্তিশালী প্রবল মতাদর্শ ধরা যাবে কিভাবে? মতাদর্শের প্রবলতা শ্রেণী গঠন ও শ্রেণী-আধিপত্যের

---

২৫ Raymond Williams, Marxism and Literature, Oxford, ১৯৭৭.

২৬ এখনো শেষ না হওয়া রেহনুমার পি.এইচ.ডি. থিসিস বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী, লিঙ্গ এবং পরিবার গঠনের উপর 'Establishing Families' : Gender, Class and Kinship in Dhaka City, সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণী, লিঙ্গ এবং পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে এই লেখাতে যে আলোচনা রয়েছে তা রেহনুমার থিসিসে বিস্তারিত এবং গভীরভাবে উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

বহির্ভূত বিষয় কি? যদি তা নাই হয় তাহলে মতাদর্শের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণী অনুধাবন কাজ করে না কেন? বিশেষ করে লিঙ্গীয় প্রশ্নে বাংলাদেশের বাম-ডান একাকার হয়ে পড়েন কোন্ প্রক্রিয়ায়? তাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কমবেশী উদারনৈতিক (liberalist) কিংবা আধুনিকায়ন (modernisation) ডিসকোর্সের মধ্যে নির্মিত হয় কেন?[২৭]

শ্রেণী অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিগুলো খুবই মৌলিক, এজন্যে এ প্রশ্ন-গুলো মোকাবিলা করা দরকার। প্রচলিত অধ্যয়নে এই বিষয়টাই স্পষ্ট হয় না যে,

---

২৭ বাম ও উদারনৈতিক বিশ্লেষণের সাদৃশ্য দেখানোর জন্য আমরা রাজা রামমোহন রায়কে বেছে নিচ্ছি। আমাদের সময়ের প্রাগ্রসর সমাজতন্ত্রী নারীবাদী লেখক মালেকা বেগম রাজা রামমোহন রায়কে সমালোচনাহীন পর্যালোচনা করছেন। তার 'নারীমুক্তি আন্দোলন' (ঢাকা, ১৯৮৫) বইটিতে পাই, '... ইংরেজ ও ইউরোপীয় নারীদের জাগরণের ঢেউ তখন এদেশের ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিলো, নিজ দেশের নারীদের ভাগ্য বিষয়ে, তুলনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নারীদের অধিকার নিয়ে। রামমোহন রায় প্রথম প্রতিবাদ জানালেন নারীর ওপর সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। তিনি নারীর হীনাবস্থার বিরুদ্ধে সে যুগের সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিলেন। সতীদাহ বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় রচনায় (১৮১৯) অত্যন্ত মর্মান্তিক বেদনায় তিনি বলেছিলেন যে, 'একজন নারী একাধারে রাঁধুনী, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী।' তাঁর ঐকান্তিক একক চেষ্টায় সতীদাহ প্রথার বির€দ্ধে জনমত গড়ে ওঠে এবং ব্যাপক আন্দোলনের ফলে ১৯২৯ সালে সতীদাহ নিষিদ্ধ হলো। পরবর্তীতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে তিনি যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছেন। বিলেতে গিয়ে (১৮৩০) নারী-জাগরণের স্বরূপ স্বচক্ষে দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন বাংলার নারীদের তেমনিভাবে জেগে ওঠা যদি সম্ভব হতো।' (পৃ. ৮৪) মালেকা বেগমের লেখায় রামমোহনের গুরুত্ব যেভাবে ধরা পড়ছে তা কিন্তু খুব ভিন্ন নয়, উদার অবস্থান হতে গোলাম মুর্শিদ যা করছেন তার সাথে।

গোলাম মুর্শিদ লিখছেন, 'During the period under review (১৮৪৯-১৯০৫), Bengali women occupied a very inferior social position. In his second pamphlet on suttee, published in ১৮১৯, Rammohan Roy observed that a woman was considered to be no more than a useful creature who could be at once a cook, a sexual partner and a faithful housekeeper... Men (Bengali) did not recognize the need to educate women. Worse still, men held an extremely poor opinion of women maintaining that women were devoid of all intellectual abilities and could never be educated. If popular male opinion in England, at that time was not so severe, some men still held that women were intellectually inferior to men...However, as English education and Western ideas permeated a segment of

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মুসলমান মধ্যবিত্ত হচ্ছে অধিপতি (dominant) শ্রেণী।[২৮] মতাদর্শ নিয়ে যখন বড়জোর আলোচনা হয় তখন রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে।[২৯] গভীর সামাজিক পরিসরে মতাদর্শ নিয়ে নয়, 'মূল্যবোধ' নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। সেই মূল্যবোধকে আবার দেখা হয় 'সনাতনী', 'চিরায়ত' হিসাবে। এভাবে, শ্রেণী 'সামগ্রিক সামাজিক গঠন' (total social formation) হিসেবে ধরা পড়ে না। কারণ, শ্রেণী সত্তার ওতপ্রোত বিষয় যেমন আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক, মতাদর্শগত। প্রচলিত অধ্যয়নে কালক্রমে অন্ততঃ

---

urbanized middle class men, that segment, though small, came to question the existing status of Bengali women. These men compared the position of their women with that of European women and found a great difference in that the latter were not secluded in their homes nor were they kept completely illiterate. On the contrary, they found that English women were given some education and were encouraged to acquire such accomplishments as singing and dancing... Rammohan Roy was the earliest to expose the deplorable condition of the womenfolk of Bengal. No one knows exactly how he became conscious of the very low position of women...Whatever, his sources of inspiration, he severely attacked the male-dominated Hindu society, saying that it was selfish and hypocritical and that it denied to them (women) those excellent merits that they are entitled to by nature. When he went to England he was most impressed by the female virtue and excellence in this country'. দেখুন Reluctant Debutante, Rajshahi, ১৯৮৩, pp. ২১-৪.

২৮ বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্তের মতই বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। শিল্প বুর্জোয়া বিকাশ হ'তে নয় বরং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রয়োজনীয় চাকরিজীবী, আমলা হ'তে গড়ে উঠেছে তারা (দেখুন Hilary Standing, 1991, প্রাগুক্ত p. 25)। উনিশ শতকের শেষভাগে ঔপনিবেশিক শাসনের 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠনকে ত্বরান্বিত করেছে। এরা এসেছে পূর্ববাংলার বহুবিধ কৃষিজ সামাজিক দল হ'তে, যেমন : ক্ষুদ্র ভূমিমালিক, ধনী ও মধ্য কৃষক, বেপারী ইত্যাদি। 'শিক্ষিত সমাজ' হিসেবে এদের আত্ম-পরিচয় তৈরী হ'ল; রাজনৈতিক, মতাদর্শিক এবং নৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারল তারা – সেই বাস্তবতাকে বোঝা সম্ভব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যেই, যার মধ্যে এরা বেড়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত মুল্যবোধের আকর হয়ে দাঁড়াল 'শিক্ষা' ও 'চাকরি'। 'শিক্ষা' মানে শুধুই প্রথাগত শিক্ষা নয়, বরং পশ্চিমা আলোকময়তা এবং প্রগতিবাদিতা। এর জোরেই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল পাতি ব্যবসায়ী বা অন্য কাউকে সুযোগ মত শ্রেণী বহির্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করা (যেমন :

দুটো স্পষ্ট গোলমাল তৈরী হয়। প্রথমত, শক্তিশালী শ্রেণী বলতে সবচেয়ে বেশী সম্পদের মালিক তথাকথিত বুর্জোয়া বোঝান হয় – শিল্পবিপ্লব না হওয়ার কারণে এবং ঔপনিবেশিক প্রভাবের কারণে ইউরোপীয় আদলের সে বুর্জোয়া আদৌ নেই এখানে। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস-লিখিয়েরা যেভাবে ঘটনা সাজায় তাতে ঘুরে ফিরে আধুনিকায়ন ধারা চলে আসে। লিঙ্গীয় বিষয়ে আলোচনায় সে ব্যাপারটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন ব্রাহ্ম সমাজ, সেই সাথে রাজা রামমোহন রায় দুই বাংলাতেই ইতিহাসবেত্তাদের বিশ্লেষণে একই রকম গুরুত্ব পান নারী প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় শ্রেণী গঠনের ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং রূপ যে ভিন্ন – সে সত্য ধুয়ে মুছে যায়। 'ভদ্রলোক' শ্রেণী গঠনের ইতিহাসকেই বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের সমরূপ ধরে নেয়া হয়। অথচ ভদ্রলোক সত্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে মুসলমান ছিল 'অন্য', 'চাষাভুষা', 'গোঁড়া', 'অনালোকিত'।

রামমোহন হতে শুরু করার মধ্য দিয়ে ইতিহাস-লিখনে প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষিত হওয়া, অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসা নারী মুক্তির উপায়। রাষ্ট্রের ভূমিকা, অনিবার্যভাবেই রামমোহনের সময় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, সেখানে পৃষ্ঠপোষকের কিংবা উদারতা (liberalism) চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মহত্তর। হাল আমলেও নারী মুক্তির প্রশ্নটি শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সাথে যুক্ত করে দেখা হয় – যে কারণে সব সময়ই মনে হতে পারে একটা সুষম সমতার যাত্রা পথে নারী রয়েছে। আধুনিকায়ন দৃষ্টিভঙ্গি এই ধারণা নির্মাণ করে। রামমোহন একটা উদাহরণ মাত্র। যে কথাটা স্পষ্ট করা দরকার তা হ'ল – তৎকালীন সময়ে রামমোহনের কাজ নিয়ে এই সময়ের ইতিহাস-লিখিয়েরা উদারনৈতিক পরিকাঠামোতেই (framework)

'অশিক্ষিত ব্যবসায়ী')। এজাজ আহমেদের চিন্তা বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অনুধাবন করবার ক্ষেত্রে সহায়তা যুগিয়েছে। তার যুক্তিগুলো হচ্ছে : প্রথমত, প্রান্তিক সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ব্যাপক মেরুকরণের অনুপস্থিতি হেজেমনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেকটা জায়গা তৈরী করে; দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক সমাজগুলোতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা হেজেমনিতে মধ্যবিত্তের প্রচেষ্টাকে মদদ যুগিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র মধ্যবিত্তের শক্তিশালী উপস্থিতির কারণে; তৃতীয়ত, মধ্যবিত্তের 'নীতিমালা' এবং 'আদর্শমালা' শুধু যে প্রলেতারিয়েত এবং কৃষক শ্রেণীর ওপর আধিপত্য বিস্তারে কাজ করে তাই নয়, বরং ধনবান শ্রেণীর ওপরও তা ক্রিয়াশীল।

দেখুন Aijaz Ahmad, 'Class, Nation and State : Intermediate Classes in Peripheral Societies', Dale L. Johnson (ed) Middle Classes in Dependent Countries, California, ১৯৮৫, p. ৪৫.

২৯ যেমন দেখুন বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা, ঢাকা, ১৯৮৭; B. K. Jahangir, Problematics of Nationalism in Bangladesh, Dhaka, ১৯৮৬.

বিশ্লেষণ করে। এই বিশ্লেষণ কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরব – শ্রেণীগঠন, মধ্যবিত্ত আধিপত্য – এবং এই নীরবতার মধ্য দিয়ে এই শতকের বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে, শিক্ষিত সমাজে, অসমতা এবং বৈষম্যের মৌলিক পুনর্গঠনকে অদৃশ্য করে ফেলে। আধুনিকীকরণ তত্ত্বের সাথে এর সংযোগ হচ্ছে যে, এই বিশ্লেষণ কাঠামো আধুনিক ক্ষমতা কিভাবে অসমতাকে পুনর্নির্মাণ করে তা 'সনাতন', 'পুরাতন' 'কুসংস্কার'– এই সকল ধারণা দিয়ে ঢেকে দেয়।

পাশ্চাত্যের অন্য এবং সাংস্কৃতিক হেজেমনি: বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত: অনুবাদযোগ্য ঐতিহাসিক কাঠামো: এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে ও পরিবর্তিত যৌন-মনস্কতা

আসাদ অনুবাদের ক্ষেত্রে একদম নতুন দিক নির্দেশনা তৈরী করেছে। যা সাহিত্যের এবং ভাষান্তর তাত্ত্বিকদের (translation theorists) থেকে একদম ভিন্ন। তার বিবেচনায় অনুবাদ ভাষা বা সাহিত্যের বিষয় নয়, ঐতিহাসিক কাঠামোর বিষয়।[৩০] তার কাজে 'অনুবাদ' এর ধারণা পাশ্চাত্য এবং অপাশ্চাত্য সমাজের মধ্যকার ক্ষমতা-সম্পর্ক বুঝবার জন্য জরুরী। এই ক্ষমতা ঐতিহাসিক। পশ্চিমা ধ্যান ধারণা এবং অনুশীলন – আইন, ব্যাঙ্ক ও বীমা, শিক্ষা, পুলিশী ব্যবস্থা এগুলো অপশ্চিমা সমাজে অনুবাদযোগ্য। এবং একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অনূদিতও । অনুবাদের এই কাজ ধারাবাহিক একটা প্রক্রিয়া।

একটা সমাজে উপনিবেশবাদ, অনিবার্যভাবেই সেটা অপাশ্চাত্য সমাজ, ভাষা, চিন্তা কাঠামো, অর্থপূর্ণতার বদল ঘটায় যা সমাজ কাঠামো, আচার-আচরণ পুনর্গঠিত করে। তার মধ্যে স্থানীয় যেমন বাঙ্গালী ঐতিহ্যও সংমিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। এই সংমিশ্রিত সত্তা আবার ভীষণ ক্ষমতাবান। এই পুনর্গঠন যান্ত্রিক নয়, ঘটে অপাশ্চাত্যের মানুষজনের কার্যকারিতা (agency) দ্বারাই; এবং সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটেও না।

উপনিবেশবাদের প্রেক্ষিতে কোন অঞ্চলের ভাষা, চিন্তাকাঠামো বদলের ক্ষেত্রে আসাদ এবং ডিক্সন[৩১] লিয়েনহার্টের কাজ থেকে ডিংকাদের উদাহরণ দেয়। ডিংকাদের ভেতরে 'লো তোয়েং' বললে বোঝাত 'অগ্রবর্তী' যা বয়স এবং অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত ছিল। তরুণ প্রজন্ম বয়স্ক প্রজন্মের পর্যায়ে আসবে – এটাই

৩০ Talal Asad, 'A Comment on Translation. Critique and Subversion', in Anuradha Dingwaney and Carol Maier (eds), Between Languages & Cultures. Translations & Cross-Cultural Texts, Delhi, 1996.

৩১ Asad and Dixon, ১৯৮৫, প্রাগুক্ত, p. ১৭১.

স্বাভাবিক ছিল। ঔপনিবেশিক সময়ে বয়স, অভিজ্ঞতার ধারণাগুলো সরিয়ে দিয়ে শব্দটাকে দখল করল 'প্রগতি'র ধারণা। তখন থেকে 'লো তোয়েং' ডিংকাদের মধ্যে প্রগতি বোঝায়, দুনিয়াতে এগিয়ে যাওয়া বোঝায়। পশ্চিমা এই ধারণার অনুপ্রবেশ, অপশ্চিমা দুর্বল একটা সমাজে সম্ভব হয়েছিল, পশ্চিমের কাছে তা কাম্যও ছিল, ঔপনিবেশিক শক্তির কারণে। ঔপনিবেশিক শক্তিকে বাদ দিয়ে, আর ক্ষমতা-সম্পর্কের ইতিহাস বাদ দিয়ে — এই রূপান্তর বোঝা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হল, পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা এবং অনুশীলন অনুবাদের ক্ষেত্রে অ-পাশ্চাত্যের মানুষজনের ভূমিকা কী? শ্রেণী গঠনের প্রসঙ্গে গ্রামসীর যে বিশ্লেষণ তাতে যৌগ (organic) বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার বিশ্লেষণে এদের ভূমিকা মতাদর্শ তৈরী করে, বিস্তৃত করে এবং সংবহিত করে। শ্রেণী গঠনের এই বিষয়টা পুঁজিবাদী বিকাশের সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে না। এমনকি সম্পদ, অর্থ — শুধুমাত্র এসবের হিসেবে শক্তিশালী অধিপতি শ্রেণীকে চিহ্নিত করাও সম্ভব নয়। সেইটাই গ্রামসীর যুক্তি। গ্রামসীর বিশ্লেষণকে ডেভিডফ ও হল ব্যবহার করেছে আঠারো ও উনিশ শতকের বৃটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন বুঝতে। লিঙ্গীয় মতাদর্শ কোনও ভাবেই শ্রেণী গঠনের বহির্ভূত বিষয় নয়। অন্যভাবে বললে শ্রেণী পরিচয়ের অনিবার্য দিক লিঙ্গীয়। তৎকালীন, বৃটিশ সমাজে মধ্যবিত্ত গঠনের বেলায় অগ্রণী বুদ্ধিজীবীরা (কবি, সাহিত্যিক ইত্যাদি) লিঙ্গীয় ভিন্নতাকে বিধিবদ্ধ করছে তাদের লেখাতে, যাদের কথা ডেভিডফ ও হল উদ্ধৃত করছে।

বড় মাপের লেখক যেমন উইলিয়াম কাউপার, হানাহ্ মোর — বিধিবদ্ধের কাজ করছে আর অজস্র মফস্বলী লেখক — পুস্তিকা (pamphlet), কবিতা, দৈনিক পত্রিকার লেখালেখি, গির্জার পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে এই বিধিবলীকে অনুবাদ করছে, এর ব্যাখ্যা দিচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিমূর্ত (abstract) ধারণা-গুলোকে — মা হিসেবে, বাবা হিসেবে, পুরোহিত হিসেবে, ডাক্তার হিসেবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে — অনুবাদ করছে এরা। এই মফস্বলী লেখকদের অধিকাংশই জাতীয় পর্যায়ে অপরিচিত থেকে গেছে, তারা বড়সরো বুদ্ধিজীবী নয়, কিন্তু মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের কারণে, তাদের ডেভিডফ ও হল যৌগ বুদ্ধিজীবী ডাকছে। বার্মিংহামের এই বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে 'পৌরুষ' এবং 'নারীত্ব'কে নির্মাণ করছে, গৃহীপনার মতাদর্শকে গৃহস্থালী পর্যায়ে, পারিবারিক পর্যায়ে বাস্তব রূপ দিচ্ছে, বিমূর্ত জ্ঞানকে সাধারণ বুদ্ধিতে পরিণত করছে। সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপারটা আবার সাধারণ নয়, ক্ষমতা-সম্পর্কের সাথে যুক্ত। গ্রামসীর চিন্তাতে সহজেই ধরা পড়ে যে, প্রবল শ্রেণীর আধিপত্য মতাদর্শিক আধিপত্য, সাধারণ বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন এবং এই সমাজের রূপান্তর বুঝবার ক্ষেত্রে

পাশ্চাত্যের প্রবল উপস্থিতি, পাশ্চাত্য-অপাশ্চাত্যের ক্ষমতা সম্পর্ক এবং সেই ক্ষমতা সম্পর্কে স্থানীয় কার্যকারিতা (agency) সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঊনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত গঠনের সূচনা; শ্রেণী গঠনের সাথে শুরু হয় পরিবার, বিয়ে ব্যবস্থা এবং নারী পুরুষের সম্পর্কে আমূল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। ঊনিশ শতকে অনুশীলিত বহুবিধ বিয়ে পুনর্গঠিত হয় এক স্বামী-স্ত্রী বিয়েতে, এবং এই শতকে তা প্রকাশিত হয়েছে নৈতিকতা, সমতা এবং প্রগতিশীলতার স্মারক হিসেবে। এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে যে একমাত্র নৈতিক বিয়ের ধরন, মধ্যবিত্তের বেলায় খুবই অল্প সময়ে, ৪০-৫০ বছরে, সেটা সাধারণ বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। এই সাধারণ বুদ্ধির অনুশীলন এই শ্রেণীতেই সম্ভব, এবং এই শ্রেণীর পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য দিক। শ্রমিক শ্রেণী এবং খুব গরীবদের বিয়ে ব্যবস্থাকে মধ্যবিত্ত তাদের উচ্চতর নৈতিক অবস্থান থেকে বিচার করে ; তাদের বিয়ের কোন ঠিক ঠিকানা নেই বলে আক্ষেপ করে। এই আক্ষেপ নীতিনৈতিকতা চর্চার অংশ, এবং আমাদের যুক্তি হ'ল, শ্রেণী আধিপত্যের সাথে যুক্ত। প্রশ্ন হ'ল, কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে এবং এর সাথে যুক্ত বিশেষ ধরনের যৌন-মনস্কতা সাধারণ বুদ্ধি হয়ে দাঁড়াল, আধিপত্য লাভ করল? কিভাবে মধ্যবিত্ত চৈতন্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে দাঁড়ায় তা? বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক রূপান্তর যা ঔপনিবেশিক আমলে ঘটল – তার বাইরে কি এই বিয়ে, পরিবার ব্যবস্থা, নারী পুরুষের আদর্শ সম্পর্ক বোঝা সম্ভব? এই রূপান্তর কি পাশ্চাত্যের হেজেমনির বাইরে বোঝা সম্ভব?

ঊনিশ শতকের শেষভাগে মধ্যবিত্ত গঠনের আগে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে একাধিক বিয়ে সব শ্রেণীতেই স্বাভাবিক ধরে নেয়া হতো। গ্রামের জমিদার শ্রেণী কিংবা প্রজা শ্রেণী অথবা গেরস্ত কোথাওই অগ্রহণযোগ্য নয় তা। সৈয়দা মনোয়ারা খাতুনের (১৯০৯-১৯৮১) লেখায়[৩২] পাই তাদের গ্রামের এক চাষী প্রজার তিন বউ ছিল। জমিদার শ্রেণীতেও একই নজির মিলছে। জমিদার পরিবারের সদস্য মনোয়ারা খাতুন। তার বড় বোনের শ্বশুর – তারাও জমিদার – পঞ্চমবারের মত বিয়ে করেছিলেন। একদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোতে ছোটখাট চাকরীর মধ্য দিয়ে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন হচ্ছে, একই সাথে একাধিক বিয়ের প্রচলন তখনও এ সকল মানুষজনের পারিবারিক জীবনে বাস্তব ছিল। আখতার ইমামের (জন্ম ১৯১৭) লেখাতেও পাই তার দাদার বান্দী-বউ ছিল।[৩৩] একাধিক বিয়ের

---

৩২ সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন, স্মৃতির পাতা, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৬-১৮।

৩৩ আখতার ইমাম, 'আমাদের সেকাল,' নুরুন্নাহার সম্পাদিত কালের সম্মুখ ভেলা, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৭।

উপস্থিতি পাই দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের (১৯০৬-১৯৯৬) আত্মজীবনীতে[৩৪], কামরুদ্দীন আহমেদ (১৯১৩-১৯৮২)[৩৫] এবং আরও অনেক নব্য-গঠমান মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত নারী পুরুষের লেখনীতে।

জমিদার নবাবদের বেলায় বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও বান্দী বউ বা তরফ্‌সানী[৩৬] ছিল। প্রজাদের বা গেরস্তদের বেলায় বান্দী-বউয়ের প্রশ্নই আসে না, যদিও একাধিক বিয়ের রেওয়াজ ছিল। একথা সত্য যে, নারীর ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভিন্ন। এক স্বামীরই ঘর করত তারা কিন্তু একাধিকবার বিয়ে সম্ভব ছিল। তাহলে পুরুষের বেলায় একগামী বিয়ে, একাধিকবার একগামী বিয়ে, বহুগামী বিয়ে, বান্দী বিয়ের চল ছিল। এতেই অবশ্য পুরুষের সমস্ত যৌন-অনুশীলন ধরা পড়ে না। জমিদার-সওদাগরদের নগরের বেশ্যালয়ে যাতায়াত ছিল কিংবা তারা দাসীদের যৌন-নির্যাতন করত[৩৭]। জমিদার ও গেরস্ত ঘরের নারীদের বেলায় একাধিকবার একগামী বিয়ে বিধিসম্মত ছিল। যদিও জমিদার ঘরের কন্যাদের একাধিকবার বিয়ের ঘটনা কম জানা যায়। সার্বিকভাবে, পুরুষদের তুলনায় একাধিকবার একগামী বিয়ে (serial monogamy) নারীর কম হতো। কিন্তু বলা যায়, সামগ্রিকভাবে বিয়ে ব্যবস্থা ছিল বহুবিধ।

দুয়েক প্রজন্মের মধ্যেই বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের স্মারক হয়ে উঠল পরিবর্তিত বিয়ে ব্যবস্থা। অন্যান্য ধরন মুছে ফেলে এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে একমাত্র গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কতকগুলো বিষয় পরপর ঘটছিল: সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের রাজনীতির মধ্যে একটা সমরূপ, অবিভাজিত 'মুসলিম' জাতি সৃষ্ট

---

৩৪ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অতীত জীবনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৭২-৭৩।

৩৫ কামরুদ্দীন আহমেদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা সন ১৩৮২, পৃ. ২৪, ৯২।

৩৬ কামরুদ্দীন আহমেদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা সন ১৩৮২, পৃ. ২৪, ৯২।

৩৭ এ ধরনের তথ্যের স্বপক্ষে কামরুদ্দীন আহমেদ তাঁর পারিবারিক জীবন হ'তে বর্ণনা দেন : 'আমার দাদী-আম্মার এক ভাই ছিলেন, নাম ছিল তাঁর ওসমান আলী ভূঁইয়া। তিনি ছিলেন ঢাকা জেলার প্রথম মুসলমান আদালতি উকিল। তিনি পি. এল. পাশ করে 'প্লিডার' বা উকিল হয়েছিলেন। তাঁর আরজি, জবাব, মুসাবিদার পারদর্শিতার কথা আমি বহুকাল পরে ওকালতি করার সময় বৃদ্ধ উকিলদের কাছে শুনেছি। তাঁর টাকার অভাব ছিল না – বিবাহ করেছিলেন একাধিক, তবু টাকার সঙ্গে যেসব উপসর্গ জুটত তা থেকে তিনি পরিত্রাণ পাননি। মদিরা পান ও বাঈজীর নাচ-গান দুটোর প্রতিই ছিল তাঁর সমান আকর্ষণ। দাদী-আম্মার কাছে শুনেছি যে, তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসতেন তখন বড় বজরা নৌকা ভাড়া করে আসতেন আর রাত কাটাতেন সে বজরায় কারণ সেখানে তাঁর সখের ও আনন্দোৎসবের সব রকম ব্যবস্থাই থাকত।' দেখুন কামরুদ্দীন আহমেদ, বাংলা সন ১৩৮২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

হয়। মুসলিম জাতির নেতৃত্বের দাবীদার হয়ে উঠল এই নব্য-গঠমান মধ্যবিত্ত; পুরাতন জমিদার ও নবাবেরা বারংবার চিহ্নিত হল 'নীতিহীন' এবং 'অধঃপতিত' গোষ্ঠী হিসেবে। সাহিত্য, নাটক, পত্র-পত্রিকায় জমিদারদের জীবনযাপন, পরিবার ব্যবস্থা, মূল্যবোধ নিয়ে কটাক্ষ তৈরী হল। মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব দাবী করবার মৌলিক ভিত্তি ছিল প্রথমত: শিক্ষা, দ্বিতীয়ত: গৃহস্থালী পরিমার্জনা বা নতুন বিয়ে এবং যৌন-আচরণবিধি।

আমাদের যুক্তি হল, এই দুটো বিষয়ই অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা এবং বিয়ে ও যৌন-আচরণবিধি পশ্চিমা প্রকল্পের অংশ। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, গোটা ব্যাপারটাই পশ্চিমা ষড়যন্ত্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমা প্রকল্পের অন্ততঃ দুটো স্পষ্ট দিক যা আবার গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটা অবশ্যই আর্থব্যবস্থার পুঁজিবাদী রূপান্তর; দ্বিতীয়টা মতাদর্শিক। তার মধ্যে শিক্ষার রূপান্তর সহজেই চিহ্নিত করা যায়। চিহ্নিত করা হয় না বিয়ে ও যৌন-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্বরূপকে। এটাও আমাদের যুক্তি যে, আর্থব্যবস্থা ও মতাদর্শের যুগপৎ রূপান্তরই ঘটেছিল, নইলে পশ্চিমা প্রকল্প ব্যহত হ'ত।

বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন, এই শতকের পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই যৌন-অনুশীলন (sexual practice), যৌন-মনস্কতা (sexual attitudes) বিয়ের সাথে শর্তযুক্ত হয়ে পড়ল। বিয়ের পরিসীমাতেই যৌনতা সম্ভব বলে মনে করা হল। মধ্যবিত্ত পরিচয় নির্মাণে ভীষণ জরুরী এটি। এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে নৈতিক উৎকর্ষের ব্যাপার হয়ে পড়তে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত চৈতন্য (consciousness) নির্মিত হয় এভাবেই। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটি নিছক আপনা-আপনি ছিল না। যৌগ (organic) বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল, যে কথা আগেই বলেছি। তেমনি রাজ-
নৈতিক নেতৃত্বেও 'নৈতিক' নেতৃত্ব দানকারীরা জায়গা করে নিচ্ছিল।

এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে যে উৎকৃষ্ট, নৈতিক, আদর্শিক সেটা প্রগতির ধারণার সাথে যুক্ত। সেটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন এই বিয়ে ব্যবস্থাকে দেখা হয় নারী-পুরুষের সমতাবিধানকারী হিসেবে। এই সমতা দিয়েই প্রগতির ধারণাটা চিনতে পারি আমরা। প্রগতির পুরো ডিসকোর্সই পাশ্চাত্য হেজেমনির বিষয়। দেখা দরকার, বুর্জোয়া সমতার যে অন্তঃবৈরীতা (dilemma) তা এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ের মধ্যেও কিভাবে কাজ করে। আধুনিক বিয়ে যে অসম, স্বামী যে বহুভাবে ক্ষমতাশালী এবং কর্তৃত্ববান (আর্থিক, মতাদর্শিক, আইনগত) – ঢাকা পড়ে পাশ্চাত্যের শক্তিমান একগামী বিয়ের মতাদর্শ এবং প্রত্যাশিত দাম্পত্যপনার মধ্য দিয়ে।

দাম্পত্যপনার মতাদর্শ নব্যগঠিত গৃহীপনার মতাদর্শের অংশ। নারী এই পরিকাঠামোতে ঘরণী, তার ভূমিকা নৈতিক, আদর্শিক। নারী চৈতন্যের বিশাল

জায়গা জুড়ে আমরা দেখতে পাই যৌন-শুচিতা (sexual purity)। পুরুষের পরিচিতি এই পরিকাঠামোতে আর্থিক। তার কাজের জায়গা বহির্জাগতিক (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক); তার শুচিতার ব্যাপার নারীর মত সংকটের নয়। ঘর-বাহির (পাবলিক-প্রাইভেট) পুনর্গঠনের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে সম্মানবোধ আর চরিত্র ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। সেই চরিত্র চর্চার কেন্দ্রীয় জায়গা, মুখ্য জায়গা নারী। নারীর শুচিতার নতুন নতুন উপাদান তৈরী হয় এই সময়ে। পূর্বতন সময়কাল হ'তে তা ভিন্ন। নারীর শুচিতা রমনীয় পরিচয় ও নারী চৈতন্যের অনিবার্য দিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়; নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল, কলেজ ইত্যাদি) বিধিনিষেধ এই শতকের গোড়া থেকে স্থাপিত হয় যার লক্ষ্যই ছিল নারী শুচিতা পাহারা দেয়া। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল বিয়ে ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠবার মধ্য দিয়ে। পুরুষের আর্থিক ভূমিকা এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ের ক্ষেত্রে এত প্রকট, যা বিশ শতকের মজুরী অর্থনীতিতে বাঙ্গালী মুসলমানের অংশগ্রহণের আগে ছিল না, যে চাকরী পাওয়ার সাথে 'বউ পালতে' পারার সামর্থ্য জড়িত হয়ে পড়ল। পৌরুষের ধারণার ভিত্তিই হচ্ছে স্বাধীন রোজগার, নির্ভরশীল বউ-বাচ্চার লালন-পালন। বটবৃক্ষ এই পুরুষ ইমেজ কিন্তু যৌতুককে বুঝতে সাহায্য করে না। অথচ যৌতুকের ইতিহাস ছাড়া বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন বোঝাই সম্ভব নয়। কনে পণপ্রথা হতে যৌতুকে রূপান্তর এই শ্রেণীর গঠনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। প্রথম প্রজন্মের পুরুষরা জায়গীর থেকে সেই বাড়ীর কন্যাকে বিয়ে করেছে। সেটা আর্থিকভাবে সুবিধেজনক ছিল। এমন নজির প্রচুর। আরো দেখা যায়, শ্বশুরের টাকায় লেখাপড়া চালিয়ে গেছে, উচ্চ শিক্ষিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্তের মধ্যে যৌতুক হচ্ছে ঘর ও মেয়ে সাজিয়ে দেয়া। মধ্যবিত্ত জীবনযাপনে যা কিছু আরাম আয়েশের উপকরণ তা বিয়ের শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়াও পরিবারে রোজগারী পুরুষদের ভেতরে আয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য দেখা দিল। যে ভাই বেশি রোজগার করছে সে 'কর্মঠ', 'উদ্যমী', অল্প রোজগারী ভাই 'অলস', 'অকর্মণ্য'। পুঁজিবাদী মতাদর্শে মজুরী ব্যক্তিগত অর্জন। যে আয় করে সে তার ইচ্ছেমাফিক তার বউ ও বাচ্চাদের লালন-পালনের জন্য খরচ করতে পারে। এটা ঘটার পাশাপাশি যৌথ পরিবারগুলোর মধ্যে দম্পতিভিত্তিক মনস্কতা তৈরী হচ্ছে যার কেন্দ্রে একজন রোজগারী পুরুষ থাকছে। হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর মধ্যে যেটা কয়েক দশক আগে আরম্ভ হয়েছিল,[৩৮] বাঙ্গালী মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটার শুরু এই শতকের বিশ তিরিশের দশকে।

গৃহীপনার মতাদর্শের দাম্পত্যপনা এবং যৌন-মনস্কতা ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। দাম্পত্যপনা ক্রমশ প্রত্যাশিত হিসেবে দেখা দিল। বিয়ের মাধ্যমে যৌন-অনুশীলনের

৩৮ Hilary Standing, ১৯৯১, ১৯৯১, প্রাগুক্ত, pp. ৯০-৯২.

যাবতীয় সীমারেখা টেনে স্পষ্ট করা হল কোন্ ধরনের অনুশীলন কাম্য নয়, কী 'বৈধ' এবং কী 'অবৈধ'। বিয়ের সীমার বাইরে সবকিছু অবৈধ হয়ে পড়ে আর বিয়েই একমাত্র 'বৈধকারী' ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিয়ে, অবশ্যই একগামী বিয়ে, একমাত্র স্বাভাবিক হয়ে পড়ল; 'বিয়ে' হীন অবস্থা তাই অস্বাভাবিক। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে জিজ্ঞাসা হচ্ছে, যদি বিয়েই একমাত্র বৈধকারী ব্যবস্থা হয় এবং তা স্পষ্টতই শ্রেণী আধিপত্যের সাথে যুক্ত, তাহলে বিয়ের মধ্যে নারীর যৌন-নির্যাতন বা sexual violence ধরা পড়বে কিভাবে? এক প্রজন্মের মধ্যে মতাদর্শের এ রকম শক্তপোক্ত পরিসীমা ধরা পড়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের আত্মজীবনীতে। একাধিক বিয়ে করার হাত থেকে তিনি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন – তাঁর ভাষায় 'জীবন আদর্শের বলিষ্ঠতার জন্যই'।[৩৯] এই আদর্শ একই সাথে প্রগতির ধারণার সাথে যুক্ত এবং মধ্যবিত্ত আধিপত্যের ক্ষেত্রে নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। গৃহীপনার মতাদর্শকে আমরা দেখতে পাই মধ্যবিত্ত সত্তার প্রধানতম দিক হিসেবে যা এই শ্রেণীর আধিপত্য নির্মাণে মতাদর্শিক ভূমিকা রেখেছে। বিয়ে, অবশ্যই এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে, যৌন-মনস্কতা এবং দাম্পত্যপনার রূপরেখা তৈরী করে আর সব কিছুকে 'অন্য' এবং 'অবৈধ' নির্মাণ করেছে। নৈতিক উৎকর্ষের জায়গা থেকে মধ্যবিত্ত অনায়াসেই নিম্ন শ্রেণীর বিয়েকে 'ভঙ্গুর', তাই 'চরিত্রহীন' এবং 'অসভ্য' বলতে পারে। পক্ষান্তরে, মধ্যবিত্ত অনুশীলনই 'প্রগতিশীল', 'রুচিসম্মত'। মধ্যবিত্তই মানদণ্ড তৈরী করে।[৪০]

প্রগতির ডিসকোর্সেই মধ্যবিত্তের এই রূপান্তরকে বোঝা সম্ভব, অন্তর্নিহিত প্রগতির তাগিদেই মধ্যবিত্ত মতাদর্শ গঠিত – এ থেকে স্পষ্ট করে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক হেজেমনিকে দেখতে পাই আমরা।

নতুন ধরনের ভাষা এবং নতুন আচরণের সম্ভাবনা

শহুরে মধ্যবিত্তদের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় 'সংসার' কথাটির উপস্থিতি ব্যাপক। সংসার বলতে গৃহস্থালী বোঝায়, কিন্তু সেই গৃহ দাম্পত্যপনার সাথে যুক্ত। মধ্যবিত্ত চৈতন্যে সংসার ঘর হতে আলাদা নয়।[৪১] বলা হয় 'ঘর-সংসার'। এই ঘর, অন্য

---

৩৯ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ১৯৮৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৪০ পুঁজিবাদী রূপান্তরের সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চৈতন্যের এই গঠন কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। যৌগ (organic) এবং অগ্রণী (vanguard) বুদ্ধিজীবীরা বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের লেখালেখি, প্রচারণা, পুস্তকাতে মতাদর্শ নির্মাণ ও সংবহনের কাজের বিস্তর নজির পাওয়া যায় – যেগুলো আমরা উদ্ধৃত করছি না।

৪১ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে গ্রামীণ/কৃষি সমাজে, লোক সমাজে 'সংসার' কথাটি ভিন্ন অর্থ বহন করে। 'বিশ্ব' বা 'জগৎ' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ভাষায় গৃহ – গৃহীপনার মতাদর্শ দিয়েই চেনা সম্ভব। বিযুক্ত করে ইট-দেয়ালের একটা কাঠামোকে ঘর হিসেবে দেখা হয় না। এবং অনিবার্যভাবেই এই ঘর, গৃহ নির্মিত হয় এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ের মধ্য দিয়েই। অন্য কোন পরিসর ভাবাই যায় না মধ্যবিত্ত চৈতন্যে। সংসারের ভিত্তিই হচ্ছে লিঙ্গীয় ভিন্নতা। 'সংসার চালানো' এবং 'সংসার করা' পুরুষ এবং নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। আগেই যেমনটা বলেছি, সংসার চালানোর ভূমিকা অর্থনৈতিক, সংসার করা আদর্শিক, নৈতিক। সংসারের ধারণা এতটাই নৈতিক, এত মূল্যবোধ আরোপিত যে গৃহশ্রম (domestic labour) এবং গৃহিণীর নানান কাজ ঢাকা পড়ে যায় এর মধ্যে। এই কাজগুলো নানাবিধ যেমন- রান্না, ঘর ঝাড়ু-মোছা, কাপড় ধোওয়া, বাচ্চাদের পালনের কাজ এবং প্রতিমুহূর্তের তদারকী, স্বামীর আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা, শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সেবাযত্ন করা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ রাখা। যদিও অধিকাংশ শহরে মধ্যবিত্তের ভারী কাজগুলো চাকররা করে কিন্তু, গৃহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব গৃহিণীরই।

'সংসার' শব্দটা যে ধারণাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত এই শ্রেণীতে এই সময়ে, সেটা রূপান্তরিত একটা অবস্থা। যদিও লিখিত তথ্যাদি কম যা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকে ব্যাহত করে, তবুও একথা বলা সম্ভব যে, উনিশ শতকেও সংসারের এ রকম ধারণা ছিল না। সংসার চালানো নয়, পুরুষ সংসার করত। কৃষ্টি গৃহস্থালীতে নারী ও পুরুষের উভয়েরই সংসারের কাজ ছিল ভিন্ন ভিন্ন ও নির্দিষ্ট। শহরে চাকুরিজীবী পরিবারে, মজুরী অর্থনীতির বিকাশে সংসার করা কেবলই নারীর

অস্তিত্বের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই রূপান্তরণের বিষয়টা ডিংকাদের 'লো তোয়েং'-এর সাথে তুলনীয়। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক হেজেমনির ধারণা ছাড়া এই রূপান্তর কিভাবে বোঝা সম্ভব?

প্রগতি এবং উদারতার ডিসকোর্সেই এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে। আমাদের মতে, আগেই বলেছি, এইগুলো পশ্চিমা প্রকল্পেরই অংশ। রূপান্তরের ফলে নতুন ভাষা কিংবা ভাষার নতুন অর্থ তৈরী হচ্ছে তাই শুধু নয় বরং নতুন আচরণ নির্মিত হচ্ছে; সেটা মতাদর্শের কারণে। 'সংসার' উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি, অন্য দু একটা উদাহরণ আলোচনা করা যেতে পারে। মধ্যবিত্তরা 'স্বামী' বা 'স্ত্রী' বা 'পরিবার' ব্যবহার করে না সচরাচর। তাদের ভাষায় এগুলো প্রায়শই 'husband', 'wife', 'family' ইত্যাদি। এটা শুধু এই কারণে নয় যে ইংরেজী চর্চা বাড়ছে। স্বামী বা স্ত্রী কিংবা husband, রিভব শব্দগুলোই পয়দা হ'ল এই শতকে। 'বাচ্চার মা', 'উনি' এগুলো মধ্যবিত্ত ব্যবহার করে না। এক স্বামী-স্ত্রী বিয়েতে যে 'দুজনে দুজনার' মডেলের কথা বলা হয় সেটার নতুন শব্দ দরকার ছিল। 'husband, wife' নতুন ভাষা হিসেবে রূপান্তরিত বিয়ে ব্যবস্থার আচরণকে ধারণ করে। প্রসঙ্গত, আগেই বলেছি, স্বামীর জায়গায় husband বললেই এই বিয়ে ও পরিবারে

পুরুষের ক্ষমতা উধাও হয়ে যায় না। অন্য একটা উদাহরণও মজার হতে পারে। সাধারণত 'আয়োজিত বিয়ে' (arranged marriage) এবং 'প্রেমের বিয়ের' ভেতরে একটা বৈরীতা দেখানো হয় – আয়োজিত বিয়ে সনাতনী, প্রেমের বিয়ে আধুনিক। আসলে প্রেম – যা মধ্যবিত্তের ভাষায় affair – নতুন আচরণ তৈরী করেছে যার অনিবার্য পরিণতি বিয়ে এবং দাম্পত্য জীবন। বিয়ের যুক্তি বা লজিক, বিয়ের ক্ষমতা (শ্রেণী, পুরুষ, পাশ্চাত্য) – এগুলো প্রশ্নাতীতই থেকে যায়।

শেষ কথা

এ ধরনের লেখা বেশ বিপজ্জনক। মধ্যবিত্ত মুসলমানের এক স্বামী-স্ত্রী বিয়ে ও পরিবারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমা সাংস্কৃতিক হেজেমনি হিসেবে যার মধ্যে বৈষম্য এবং ক্ষমতা পুনর্নির্মিত। অনেকেরই জিজ্ঞাসা থাকতে পারে : তাহলে পরিবারের মধ্যে, বিয়ের মধ্যে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন কী ধরনের সম্পর্কের কথা আমরা বলছি? আমরা কি চাই যে, যৌন-অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের নিয়ম শৃংখলাই তাহলে থাকবে না? বিয়ে ব্যবস্থার নৈতিকতা দিয়ে মধ্যবিত্ত আধিপত্য পুষ্ট হচ্ছে এই যদি আমাদের মত হয়, তাহলে নারীমুক্তি প্রশ্নে বিশ্লেষকদের কাজকে আমরা কিভাবে দেখব?

প্রশ্নগুলো অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলো শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙ্গে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক হেজেমনিকে উন্মোচন করা, পাশ্চাত্যের প্রকল্পকে চেনা এবং এই প্রকল্প ও হেজেমনির উৎপাদ হিসেবে বর্তমান বিয়ে ব্যবস্থাকে আবিষ্কার করাই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। পাশাপাশি, যৌগ বুদ্ধিজীবীদের[৪২] এই প্রকল্পে অবস্থান এবং স্থানীয় উপাদানগুলো হেজেমনিতে যে সংমিশ্রিত ভূমিকা রাখছে – সেগুলো আমাদের বিবেচনায় ছিল। প্রচলিত আলোচনায় 'ঐতিহ্য', 'সনাতন', 'মূল্যবোধ' বলে যা পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় – তার পুনরাবিষ্কার জরুরী ছিল। ইহুদী-খৃষ্টীয় একগামী বিয়ের আদলে বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিয়ে পুনর্গঠিত হয় এবং এই বিয়ে পরিবারের ও সমাজের কেন্দ্রীয় ভিত হয়; মধ্যবিত্ত মতাদর্শের শক্তিশালী মানদণ্ড হিসেবে দাঁড়ায়।

---

৪২ Organic intellectual-এর বাংলা 'অঙ্গীয়' বা 'জৈব' বুদ্ধিজীবী করা সুবিধেজনক মনে হয়নি আমাদের কাছে। গ্রামসীর বিশ্লেষণে মৌলিক যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এই বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র চিত্রণে তা হ'ল একটি বিকাশমান সামাজিক শ্রেণীর উৎপাদ হিসেবে 'একজোট' হয়ে তাদের ভূমিকা। সেই ভূমিকা হচ্ছে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেই শ্রেণীর কিছু সমরূপ আত্মচৈতন্য দাঁড় করিয়ে দেয়া। (দেখুন Terry Eagleton, Ideology. An Introduction, London, ১৯৯১, pp. 118-119)। 'যৌগ' সে অর্থেই ব্যবহৃত।

প্রগতিবাদী আলোচনায় এই বিয়ে ও পরিবার গঠনকে পূর্বতন বিয়ে ও পরিবারের সাপেক্ষে নারী-মুক্তির উপায় হিসেবে দেখা হয়। বিশ্লেষকদের সরল সমীকরণ হচ্ছে যৌথ পরিবার এবং পুরুষের বহুবিবাহ নারী অধস্তনতার অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং এই মতামত দিয়ে একক পরিবার ও এক স্বামী-স্ত্রী বিয়েকে কাম্য এবং সমতাকারী হিসেবে দেখা হয়, সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্নাতীতভাবে ছেড়ে দিতে রাজী নই আমরা। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ এবং অনুশীলন দ্বারা অর্থনৈতিক ব্যক্তিকরণের (economic individuation) মাধ্যমে পুরুষের ভূমিকা নতুন ভাবে ক্ষমতা লাভ করছে – সেই বাস্তবতা বিচার এবং সেই অনুযায়ী ক্ষমতার নুতন ধরন দেখা জরুরী। বৈষম্যের দ্বিতীয় দিকটা শ্রেণীগত। মধ্যবিত্ত মতাদর্শের আধিপত্য বিস্তারেও এই বিয়ে ভূমিকা রাখছে। লেখালেখি, সাহিত্য, গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন মধ্যবিত্ত মানদণ্ডের প্রচারণা চালাচ্ছে। এই বিয়েতে মধ্যবিত্তের ক্ষমতা অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের ক্ষমতার ইতিহাস এবং সেই ক্ষমতা অপাশ্চাত্যের সমাজে অনুবাদের কারণে, পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য সমাজের মানুষজন শ্রেণী ও লিঙ্গীয় সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতা ও অধস্তনতার এই ধরন তৈরী করছে। কিন্তু একই ধরন বলা মানে পশ্চিম - অপশ্চিমের ক্ষমতা-সম্পর্ক অদৃশ্য করে ফেলা নয়। অনুবাদ তো পাশ্চাত্যেই হয়, অপাশ্চাত্যে – উল্টোটা ঘটে না কখনো। লিঙ্গ, শ্রেণী এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে ক্ষমতার এই বিবিধ প্রক্রিয়া এবং তার আন্তঃসম্পর্ককে উন্মোচন করাটা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই লেখার কাজে বুদ্ধি এবং হাস্যরস দিয়ে আমাদের বন্ধু ও সহযোদ্ধা শহিদুল আলম সমর্থন যুগিয়েছে। ওকে ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ '৯৪-'৯৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের, জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে তাদের আগ্রহী অংশগ্রহণের জন্য।

সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৬৩, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

কাজল ইসলাম

অন্য প্রেম

‘ভালোবাসা একটা অনুভূতির নাম।’ কিসের মিথস্ক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় এই অনুভূতি? এই অনুভূতির উৎস কি জৈবিক টান থেকে জন্ম নেয়? তবে মহেষ – গফুরের প্রেমের জন্ম কোথা থেকে? এই প্রশ্নগুলো উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা মাত্র। জানি এর সব উত্তর পাওয়ার পরও একটা প্রশ্ন থেকে যাবে, ‘সখি ভালোবাসা কারে কয়?’

ভালোবাসা মানে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা। কিন্তু এটুকুতেই কি ব্যাখ্যাবদ্ধ হয়ে যায় সব? আমি জানি না! জানতে চাই বলেই এতো প্রশ্ন, এতো খুঁজে ফেরা। যখন দেখি এই প্রেমের জন্য গভীর বেদনার ত্যাগ, যখন শুনি প্রেমের জন্য অপার যন্ত্রণার গল্প কিংবা ইতিহাসের বিরল বিরহের বা নির্মমতার কাহিনী তখন উপলব্ধি করি কবি কেন প্রিয়ার একটি তিলের জন্য প্রিয় সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে পারেন। এ তো কেবল উপলব্ধিমাত্র। কিন্তু যখন মুখোমুখি হই বাস্তবে তখন আবার প্রশ্ন আঁকড়ে ধরে, শরীর আগে না প্রেম? কোনটা আসল, কোনটা আগে? প্লেটোনিক লাভ তাহলে কি? এরকম অদ্ভুত আগ্রহ থেকেই আমাদের সমাজের হিজড়া সম্প্রদায়ের উপর Third Gender নামে একটা তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলাম। সাড়ে তিন বছর ওদের সাথে মিশেছি, ঘুরেছি ওদের সাথে, বোঝার চেষ্টা করেছি ওদের। হিজড়াদের মনস্তত্ত্ব, প্রেমবোধ কিংবা ওরা আমাদের সমাজকে কি চোখে দেখে তা জানতে চেয়েছি।

আমাদের মতো স্বাভাবিক সমাজের ঘরেই জন্ম নেয় হিজড়া শিশু। কেউই দায়ি নয় এ জন্য। কিন্তু জন্মের পর সেই নাড়িছেঁড়া ধনকে চলে যেতে হয় হিজড়া সম্প্রদায়ের ভিড়ে। অনিশ্চিত জীবনের অন্ধকার বেছে নিতে হয়। কিন্তু কোন অভিমানে তারা নিজেদের পরিবার ছেড়ে চলে যায়? আমরা সুস্থ স্বাভাবিক অভিভাবকরাও তাদের ধরে রাখতে রাজি নই, শুধুমাত্র লোকলজ্জার ভয়ে! শুধু তাই নয় পরবর্তীতে পথ চলতে দেখা হলে স্বজনেরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। পাছে পরিচয় দিতে হয়!

ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি আর অবহেলার এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে প্রতিদিনের বঞ্চনার মধ্যে ওরা ভালোবাসে, প্রেমে পড়ে। শারীরিক যৌনতার প্রশ্নে অক্ষম হিজড়ারাও ভালোবেসে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। একজন হিজড়া আমাকে বলেছিলেন, 'প্রতিটা মানুষ, এমনকি প্রতিটা পশুপাখি, কীটপতঙ্গেরও জোড় আছে, ফুলেরও ভ্রমর আছে। কেবল আমাদেরই কোন জোড় নেই। আমরা তো কাগজের ফুল। আমাদের কে ভালোবাসবে?' কথা শেষের দীর্ঘশ্বাস থেকেই বুঝেছিলাম তার তৃষ্ণার গভীরতা। তবু তারা ভালোবাসে! শূন্য হাতে ফিরতে হবে জেনেও!

এরকম এক হিজড়ার প্রেমের গল্প শোনাই আপনাদের, তার নাম না হয় আড়ালেই থাক। সে ভালবেসেছিল স্বাভাবিক সুস্থ শরীরের এক ছেলেকে। তার বাসন্তী মন সুখে ভরে উঠলো। ওর তৃষ্ণা ছিল নিষ্কাম প্রেম। কিন্তু ছেলেটার দৃষ্টি ছিল হিজড়ার জমানো টাকার দিকে। ব্যবসার নামে বিভিন্ন সময়ে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে যখন জমানো টাকা শেষ হয়ে আসলো তখন ছেলেটা লাপাত্তা। হঠাৎ সেই ছেলেটার বিয়ের খবর পাওয়ার পর সেই হিজড়ার চোখভরা বুকফাটা কষ্টের জল আমি দেখেছিলাম। সে বলেছিল, 'আমি তো জানি আমি তাকে সংসার দিতে পারবো না, সন্তান দিতে

পারবো না। আমি নিজে দাড়িয়ে থেকে ওর বিয়ে দিতাম। ও কেন আমাকে গোপন করে বিয়ে করলো?' বাঁধভাঙা জল চোখে নিয়ে আমার কাছে প্রশ্ন করেছিল। আর আমার বারবার মনে হচ্ছিলো,

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম
প্রেম মিলে না।
শুধু সুখ চলে যায়।

খুলনা: ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সম্পর্কের সার্বিকতা: মার্কসীয় মনীষা

মুঈনুদ্দীন আহ্‌মদ

নারী-পুরুষ সম্পর্ক: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

Rabindranath Tagore

জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার অদম্য তাগিদ থেকে নারী ও পুরুষ পরস্পরের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ তথা যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলে তা মূলতঃ একটি জৈবিক প্রক্রিয়া ও স্বাভাবিক আর অপরিহার্য জীবনাচরণ হলেও এ বিষয়টি নির্দিষ্ট সমাজের প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাষ্ট্রীয় বিধান ও

ধর্মীয় বিধি-নিষেধের নিরিখে বিবেচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে এই রাষ্ট্রীয় বিধান ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ কার্যতঃ নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। আবার এই নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কোন চিরন্তন ব্যাপার নয়। মানবসমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় পরিবর্তন ও রূপান্তরের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে এই নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে। আর সেই সাথে পরিবর্তন ঘটেছে নারী-পুরুষের মধ্যস্থিত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও।

লিঙ্গীয় বিভাজনের বিচারে নারী-পুরুষ একে অপরের থেকে শুধু ভিন্নই নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত যৌন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই প্রাকৃতিক ভিন্নতা ও বৈপরীত্যের কারণেই একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ার অদম্য তাগিদ অনুভব করে। এই প্রাকৃতিক তাগিদ একটি জৈবিক তথা যৌন ব্যাপার এবং এর মাধ্যমেই অন্যান্য আর সব প্রাণীর মতো মানব জাতিরও জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়।

মানুষের অস্তিত্ব শুধুমাত্র জৈবিকই নয়। সে সামাজিক জীবও বটে। বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ে মানবসমাজ শ্রেণি বিভক্ত। আর যেকোনো শ্রেণি বিভক্ত সমাজে অন্যান্য আর সব সম্পর্কের মতো নারী-পুরুষ সম্পর্কও শ্রেণি সম্পর্ক বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। তাই একটি শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে বুঝতে হলে ও তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শ্রেণি সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে সেটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিঙ্গীয় বিভাজনের বিচারে নারী-পুরুষ একে অপরের বিপরীত যৌন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সে কারণে এই যৌনতাকে হিসাবের মধ্যে না নিয়ে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিবেচনা করা সম্ভব নয়। বরং নারী-পুরুষ উভয়ের বিপরীত লিঙ্গ গমনের স্বাধীনতা কিংবা অধিকারই নারী-পুরুষের মধ্যস্থিত সম্পর্ক এবং সমতা বিচারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক মানদণ্ড। তার কারণ শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নারীর সার্বিক অধস্তন অবস্থা ও সেই সাথে আরও অসংখ্য নারী নির্যাতনের পেছনে যে কারণটি কাজ করে তা নারীর এই বিপরীত লিঙ্গ গমনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। আবার নারীর ওপর আরোপিত এই বিধিনিষেদের বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র নারী বিষয়ক প্রশ্ন হিসেবে আবির্ভূত হলেও তা সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা ও শ্রেণি শোষণ থেকেই উৎসারিত। সে কারণে একটি শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা ও জটিলতা মূলতঃ শ্রেণি দ্বন্দ্বেরই একটি সম্প্রসারিত রূপ ও মূর্ত প্রকাশ।

শ্রেণি বিভক্ত ও সেই সাথে পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষের আধিপত্যপূর্ণ এই সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের বিপরীত লিঙ্গ গমনের এই অধিকার, স্বাধীনতা ও সমতা বিষয়ক আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষের আধিপত্যপূর্ণ

নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয় সামনে চলে আসে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই নৈতিক মূল্যবোধ আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেণি নিরপেক্ষ কোন চিরন্তন ব্যাপার নয়। আদিম শ্রেণিহীন সমাজের বিলুপ্তির পর শ্রেণি সমাজে প্রতিটি শাসক শ্রেণির শ্রেণি-স্বার্থ, জীবিকা উপার্জনের পথ ও জীবনযাপন পদ্ধতিকে ভিত্তি এবং অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে তার এই মূল্যবোধ তথা সংস্কৃতি। এই মূল্যবোধ বা সংস্কৃতির প্রভাব রাষ্ট্রীয় সকল নীতি থেকে শুরু করে সাধারণভাবে জনগণের জীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা ও চাপিয়ে দেওয়া শাসক শ্রেণির এই সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধকে সাধারণভাবে জনগণও তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই দেখা যায় যে, যে আচরণ কিংবা কাজ এক সমাজব্যবস্থারই সাথে সংগতিপূর্ণ, সেই একই আচরণ বা কাজ অন্য একটি সমাজব্যবস্থায় অচল। যে মূল্যবোধকে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, সেই একই মূল্যবোধকে ভিন্ন একটি প্রেক্ষাপটে নিন্দনীয় ব্যাপার হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

আমেরিকার প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী লুই হেনরী মর্গান (১৮১৮-১৮৮১) আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালীর ওপর চল্লিশ বছর কাল ব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্যাদি সংগ্রহ করে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তনের একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থিত করে তার দ্বারা সমাজ বিকাশের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দান করেছেন তাঁর বিখ্যাত এবং অতিপরিচিত Ancient Society (1877) নামক গ্রন্থটিতে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যতদিন পর্যন্ত এক একটি আদিম মানবগোষ্ঠী আধুনিক সভ্য সমাজের সংস্পর্শের বাইরে থাকে ততদিন পর্যন্ত সেসব গোষ্ঠীর জনগণের জীবনাচরণের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে আদিম মানব জাতির জীবনযাপন পদ্ধতি অবিকৃতভাবেই বহাল থাকে। তাদের খাদ্যাভ্যাস, বেশ-ভূষা, খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ইত্যাদি সব কিছুই তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকেন তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে। সে কারণে তাদের জীবনাচার অধ্যয়নের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসে আদিম মানবজাতির জীবনযাপন প্রণালী, এমনকি নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌনসম্পর্ক পর্যন্ত। শুধু মর্গানই নয়, ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক রাহুল সাংকৃত্যায়নও এই একই গবেষণায় নিয়োজিত থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্য সমাজের প্রভাবমুক্ত জনগণের জীবনাচরণ অধ্যয়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উদ্ঘাটন করেন।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের জীবনাচরণের ওপর মর্গানের, ভারতের আদিম অধিবাসীদের জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই কষ্টসাধ্য

ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা থেকে যেটা জানা যায় তা হলো মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের আদি পর্বে নর-নারীর বিপরীত লিঙ্গ গমনের স্বাধীনতা তথা পারস্পরিক যৌনসম্পর্ক কোন বিধি-নিষেধের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতো না। সেই পর্যায়ে একই নারীর বহু পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক ও একই পুরুষের বহু নারীর সাথে অনুরূপ সম্পর্ককে অনৈতিক হিসেবে দেখার মতো কোন বস্তুগত কিংবা মতাদর্শিক শর্ত তখনও তৈরি হয় নাই। এমন কি সেই পর্যায়ে মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, ভাই-বোনের মধ্যেও যৌনসম্পর্ক অর্থাৎ আজকের সভ্য সমাজে যেটাকে অজাচার (incest) নামে অভিহিত করা হয় সেই অজাচারও সেসব সমাজে অবাধে এবং স্বাভাবিকভাবে বিরাজ করতো এবং সেটা যে অনৈতিক কিংবা নিন্দনীয়— এমনটি মনে করার পেছনেও কোন বাস্তব ভিত্তি তখন উপস্থিত ছিল না। বরং সেটাই ছিল সেই পর্যায়ের নর-নারীর স্বাভাবিক জীবনাচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক। এমনকি ধর্মীয় মিথগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায় যে ভাই-বোনের মধ্যে যৌনসম্পর্কের উল্লেখ ইসলাম, খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য যেসব ধর্মে আদম-ইভের থেকে মানব জাতির উৎপত্তি বলে বলা হয় সেসব ধর্মেও পাওয়া যায়।

মর্গান, রাহুল প্রমুখের এসব গবেষণা থেকে আরও যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো বর্তমান মানবসমাজে যে এক পতিপত্নী ভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তা আদিতে ছিল না। সে সময়ে নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধ যৌনসম্পর্ক বিরাজ করার কারণে সন্তানের পিতৃপরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না। এই পরিচয় নির্ণয় করা যে শুধু সম্ভব ছিল তাই নয়, বরং সেটার কোন প্রয়োজনই মানব জাতি সমাজ বিবর্তনের সেই ঐতিহাসিক পর্যায়ে অনুভব করেনি। কিন্তু সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে এসে মানবসমাজ কর্তৃক সেই প্রয়োজন ঠিকই অনুভূত হয়েছে।

সমাজ বিকাশের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করাই মানুষের জন্য কঠিন ছিল। ফলমূল সংগ্রহ করা, পশুপাখি শিকার করা, মাছ ধরা ইত্যাদিই ছিল তাদের উৎপাদন যা তারা সংগ্রহও করত যৌথভাবে আর সেই সংগৃহীত খাদ্যের অপর্যাপ্ততার জন্য সেটা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে নিতেও তারা তখন বাধ্য ছিল। এ ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতার জীবনযাপন করতে বাধ্য ছিল এ কারণে যে সেই ঐতিহাসিক পর্যায়ে বন্য প্রাণীর আক্রমণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদির সামনে অসহায় মানুষের যৌথ জীবনযাপন করা ছাড়া অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে মানুষের অভিজ্ঞতা ও অপেক্ষাকৃত উন্নততর যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত অর্থাৎ উদ্বৃত্ত উৎপাদন শুরু হলো। এই উদ্বৃত্তই মানবসমাজে সৃষ্টি করল ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের বাস্তবতা ও চেতনা। এই পর্যায়ে এক একটি জনগোষ্ঠীর দলপতিরা নিজেরা উৎপাদন শ্রমবিমুখ হয়ে সেই

উদ্বৃত্ত আত্মসাতের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তি সম্পদের মালিক ধনিক শ্রেণিতে। নিজেরা উৎপাদন না করলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ তারা নিজেদের হাতে তুলে নিল। আর এরই পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ হয়ে পড়ল সম্পত্তিহীন ও দরিদ্র। এভাবেই শ্রমজীবী মানুষের সরাসরি দেহ শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শোষণ করে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েই চলল। ধনী আর দরিদ্র, শোষক আর শোষিত, নির্যাতনকারী আর নির্যাতিত, এই দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল সমাজ। এর সাথে যুক্ত হল পশুর চারণভূমির দখল নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুদ্ধ, আর সেই যুদ্ধে বিজিতদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও যুদ্ধবন্দীদের দাসে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। এভাবেই আদিম শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের স্তর পেরিয়ে মানবজাতি প্রবেশ করল বৈরীমূলক শ্রেণি সমাজে। আর এরকম একটি বৈরীমূলক শ্রেণি সমাজে শাসক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্যই ধাপে ধাপে গড়ে তোলা হল তার সাথে সংগতিপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইন, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও বলপ্রয়োগকারী নানান সংস্থা, কারাগার ইত্যাদি। এসবেরই সমন্বিত রূপ হিসেবে নিপীড়ন আর কর্তৃত্বের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠল রাষ্ট্রযন্ত্র যার সাহায্যে শাসক শ্রেণি জনগণের অপরাপর অংশকে নিজ স্বার্থে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সক্ষম হল।

এই রকম একটি বৈরীমূলক সমাজব্যবস্থা নারী আর পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাজনের মধ্য দিয়েই বিকশিত হতে শুরু করল। বন্য পশুকে পোষ মানাতে, কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের ব্যবহার আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে পুরুষ। তাই ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভবের সাথে সাথে সেই সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব আরোপের সুযোগও পুরুষই গ্রহণ করল। এভাবে উদ্বৃত্ত আত্মসাতের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন আর সেই সম্পদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে উৎপাদনী প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ চলে গেল পুরুষের হাতে। আর এর উল্টো দিকে পুনরুৎপাদনের অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সম্পদশালী পুরুষের নিজের সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালনের দায়িত্ব এসে পড়ল নারীর ওপর, অর্থাৎ তার স্ত্রীর ওপর। নারীর কর্মক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। আর পুরুষের কাজের ক্ষেত্র রয়ে গেল ঘরের বাইরে। মার্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণকারী ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ (১৮১০-১৮৯৫) এই ব্যবস্থাকেই বাস্তবতঃ মুক্ত, স্বাধীন নারী জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক পরাজয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর অধিকার ও পরবর্তীতে সেই সম্পদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীর পরিবর্তে পুরুষের পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয়েছে সন্তানের পিতৃ পরিচয় নির্ধারণের। এভাবেই ক্ষমতার ভারসাম্য আর ভার কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে নারীর হাত থেকে পুরুষের হাতে এসে পড়ে। অথচ এর আগ পর্যন্ত মা অর্থাৎ নারীই সকল উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করত আর সে কারণে নারীর দিক থেকেই

সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হতো। পরবর্তীকালে যখন পুরুষের হাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চিত হতে থাকল এবং তার মৃত্যুর পর তার সেই সম্পত্তি ভোগের সুনিশ্চিত উত্তারাধিকারী নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিল তখন সেই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই এবং সেটা বাস্তবায়ন করতে যেয়েই নারীর ওপর পুরুষ কর্তৃক একতরফাভাবে আরোপ করতে হয়েছে এক কঠোর বিধি-নিষেধ। এই বিধি-নিষেধেরই প্রচলিত নাম 'সতীত্ব'। যেহেতু সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে সমাজ সেই পর্যায়ে শ্রেণি বিভক্ত হয়ে পড়েছে আর পুরুষই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সম্পত্তির মালিক, তাই পুরুষ কর্তৃক নারীর ওপর আরোপিত এই বিধি-নিষেধও শ্রেণি ও পুরুষের আধিপত্য নিরপেক্ষ কোন বিষয় নয়।

এই কারণে ঐতিহাসিকভাবে যেটা দেখা যায় তা হলো মানবসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের পূর্বে নারী-পুরুষ কেউই কারও ওপর যেমন অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিল না, তেমনি কেউ কারও কর্তৃত্বের অধীনও ছিল না। লিঙ্গভিত্তিক স্বাধীনতা তখন উভয়ই ভোগ করত সমান মাত্রায়। তেমন একটি পরিবেশ এবং শর্তেই স্বাভাবিক ছিল নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধ যৌনসম্পর্ক যা বর্তমানকালের ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক এক পতি-পত্নী সমাজব্যবস্থার নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একেবারেই সংগতিপূর্ণ নয়।

কিন্তু যখন থেকে নারীর ওপর পুরুষের প্রভূত্ব জারি হলো অর্থাৎ সতীত্ব আরোপ করা হল তখন থেকে নারী-পুরুষ সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল এক অর্থে দাস-মালিক সম্পর্কের মতো। তাই পুরুষের জন্য ভোগ এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে নির্দিষ্ট নারী অর্থাৎ তার স্ত্রীকে সে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতোই বিবেচনা করতে শুরু করল। এর যৌক্তিক পরিণতি হিসেবে নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা, সম্মান, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার জায়গা দখল করে নিলো ঈর্ষা, কর্তৃত্ব এবং স্বার্থপরতা। নারী হারাল তার স্বাধীনতা। যে পুরুষ এর আগ পর্যন্ত ছিল তার জীবন সংগ্রামের সহযাত্রী ও বন্ধু সে হয়ে দাঁড়াল তার প্রভু।

স্বামীর প্রতি যে একগামীতা অর্থাৎ সতীত্ব বজায় রাখা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হলো তা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য থেকেই উৎসারিত। সে কারণে শ্রেণি বিভক্ত, পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষ শাসিত সমাজে এই একগামীতাই নারীর জন্য প্রধান নৈতিক মূল্যবোধ এবং আইনগত ও সামাজিক বিধান হিসেবে স্থির করা হল। এখানে লক্ষ্যণীয় যে পুরুষ শাসিত সমাজে প্রবর্তিত প্রতিটি ধর্মেও শাসক শ্রেণি তথা পুরুষের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের স্পষ্ট সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

যে একগামীতা নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বাস্তব প্রয়োজন ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সমাজে দেখা দিয়েছিল তা পুরুষের বেলায় সংগত কারণেই প্রযোজ্য হলো না। তার কারণ একাধিক নারী সম্ভোগকারী পুরুষের সন্তানের পিতৃ পরিচয় নির্ণয়ের

পথে কোন সমস্যা নেই। তাই নারীর ক্ষেত্রে একগামীতা বাধ্যতামূলক করা হলেও পুরুষের বেলায় সেটার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এই বিধানের সূত্র ধরে এখনও পর্যন্ত পশ্চাৎপদ অনেক দেশে একই পুরুষের একই সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ঘটনা বিরল নয়। এ ব্যাপারেও ধর্মীয় বিধানকে ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একগামীতাই নারীর স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীন যৌনসম্পর্কের পরিবর্তে বিয়েকে ক্রমান্বয়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছে। এই বিয়েও আবার মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। বহু নারীর সাথে বহু পুরুষের, বহু নারীর সাথে একজন পুরুষের, একজন নারীর সাথে বহু পুরুষের বিয়ের মধ্য দিয়েই মানবসমাজ বিকাশ লাভ করেছে। প্রাক পুঁজিবাদী সমাজ থেকে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজে এসে একজন নারীর সাথে একজন পুরুষের বিয়ে অর্থাৎ এক পতি-পত্নী প্রথা বিবাহ বন্ধনের সর্বশেষ রূপ হিসেবে মানবসমাজে এখনও পর্যন্ত টিকে আছে।

সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার কারণে যখন থেকে মানবসমাজে নারীর ওপর পুরুষের প্রভূত্ব জারি হয়েছে, তখন থেকেই সতী আর অসতী'র আবির্ভাব একই সাথে ঘটেছে। তাই কার্যতঃ এটাই দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিয়ে আর পতিতাবৃত্তির উভয়ই নারীর জন্য লিঙ্গ-দাসত্বেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যা ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক, শোষণমূলক, পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ।

বর্তমান সম্পত্তি মালিকানাভিত্তিক সমাজে, বিশেষ করে পশ্চাৎপদ সমাজে মুক্তচিন্তাকারী (free thinker) কোন নারী যদি স্বাধীন জীবনযাপন করতে চান, কিংবা প্রতারণা, দারিদ্র্য, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইলিং অথবা অন্য যেকোনো কারণে বাধ্য হয়ে পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থার বিধি-নিষেধের বেড়াজালের বাইরে নিক্ষিপ্ত হন, সে ক্ষেত্রে সেই নারী এই সমাজে 'নষ্টা' হিসেবে বিবেচিত হন।

এ রকম একটি সমাজে একজন নারী, যিনি 'দৈহিক পবিত্রতা' বা 'কুমারিত্ব' বজায় রাখতে পারেন নি, তিনি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হন এবং সে কারণে তাকে পুরুষতান্ত্রিক (male chauvinist) মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন পুরুষ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহী হন না। তিনি নিজে বহু নারী ভোগে অভ্যস্ত হলেও তার নিজের জন্য স্ত্রী হিসেবে তিনি একজন 'সতী' নারী কামনা করেন।

পুরুষের প্রভুত্ব থেকে নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি ঘটলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ঠিক কি রূপ ধারণ করবে, সামাজিক প্রথা হিসেবে বিয়ে টিকে থাকবে কি থাকবে না, তার কোন আগাম কল্পচিত্র আঁকার প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস-এর এ যাবৎ কালের এই বিষয়ক সব থেকে প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থ *পরিবার*

ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এঙ্গেলস্-এর উক্ত গ্রন্থ মর্গানের Ancient Society-তে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত হলেও তিনি মর্গানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করে সম্পত্তি সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত করে এই বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করেছেন।

আমরা এমন একটি সমাজ-বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি যখন বর্তমানের এক পতি-পত্নী প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি তেমন নিশ্চিতই লোপ পাবে, যেমন লোপ পাবে তার অনুপূরণ পতিতাবৃত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি। একই ব্যক্তির, মানে এক পুরুষের অধিকারে প্রচুর সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এবং অপর কাউকে নয়, কেবলমাত্র সে পুরুষের নিজের সন্তান-সন্ততিকেই সম্পত্তি উত্তরাধিকার দিয়ে যাবার ইচ্ছা থেকেই এই এক পতি-পত্নী প্রথা আসে। এই জন্যই নারীর পক্ষে একপতিত্ব বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়। অতএব স্ত্রীলোকদের একপতিত্বে পুরুষদের গোপন বা প্রকাশ্য বহুপত্নীত্ব বাধে না। উত্তরাধিকারের স্থানীয় সম্পদের অন্ততপক্ষে বেশিরভাগ অংশকে উৎপাদনের উপায়কে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে আসন্ন সমাজ-বিপ্লব কিন্তু উত্তারাধিকারের এই সব দুশ্চিন্তাকে সর্বনিম্নে নামিয়ে আনবে। যেহেতু এক পতি-পত্নী প্রথা অর্থনৈতিক কারণ থেকে জন্মেছে, তাই সে সব কারণ চলে গেলে কি এটিও লোপ পাবে?

এর উত্তরে যৌক্তিকতার সঙ্গে বলা চলে, এই প্রথা লোপ না পেয়ে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই। কারণ উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের সম্পত্তি হওয়ার ফলে মজুরি-শ্রম, প্রলেতারিয়েত লোপ পায় এবং সেই সঙ্গে সমাজের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের (সংখ্যাগতভাবে যা গণনাযোগ্য) পক্ষে অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতা লোপ পাবে। পতিতাবৃত্তি লোপ পাবে এবং এক পতি-পত্নী প্রথা ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাস্তব হবে — সেটা পুরুষদের পক্ষেও।

মোটের ওপর পুরুষদের অবস্থা একইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বদলে যাবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রেও, সমস্ত নারীর ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা হয়ে উঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহ বন্ধনের মারফত অথবা তার বাইরে, শিশু যেভাবেই জন্মাক না কেন, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে। এই জন্যই 'ভবিষ্যৎ ফলাফলের' দুশ্চিন্তা নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে যেটি আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ — যে জন্য একটি মেয়ে যাকে ভালোবাসে সেই পুরুষের কাছে অবাধে আত্মসমর্পণ করতে পারে না — সেই কারণ আর থাকবে না। এটা কি অধিকতর অবাধ যৌনসঙ্গমের

ক্রমিক উদ্ভব ঘটাবার মতো এবং সেই সঙ্গে কৌমার্যের মর্যাদা ও স্ত্রীলোকের লজ্জাশরম সম্বন্ধে আরও শিথিল একটা জনমত উদ্ভবের মতো কারণ ঘটাবে না? এবং সবশেষে বর্তমান জগতে এক পতি-পত্নী প্রথা ও পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিপরীত, একই সামাজিক অবস্থার দুটি মেরু, এটা কি আমরা দেখি নি? তাই এক পতিপত্নী প্রথা বিলুপ্ত না করে কি গণিকাবৃত্তি লোপ পেতে পারে?

এখানে একটি নতুন জিনিস কার্যকরী হতে থাকবে, এমন একটি জিনিস যা এক পতি-পত্নী প্রথার সূচনার সময়ে বড়জোর ভ্রূণ আকারে ছিল, যথা ব্যক্তিগত যৌন-প্রেম। ... যেহেতু যৌন-প্রেম প্রকৃতিগতভাবেই ঐক্যবদ্ধ – যদিও বর্তমানে কেবল স্ত্রীলোকের বেলাতেই এই ঐক্যবদ্ধতা পূর্ণমাত্রায় রূপায়িত হয় – সেই জন্য যৌন-প্রেমের ভিত্তিতে বিবাহ হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই এক পতি-পত্নী প্রথা। তাই যে সমস্ত অর্থনৈতিক কারণের জন্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষের নিত্যকার বিশ্বাসহানি সহ্য করতে বাধ্য হত – নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ে এবং তারচেয়ে বেশি সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ – তার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকের যে সমতা অর্জিত হবে তার ফলে অতীত সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, স্ত্রীলোক বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে সত্যই এক পত্নীব্রতই হবে।

কিন্তু এক পতি-পত্নী প্রথা থেকে যা নিশ্চিতই চলে যাবে তা হচ্ছে পুরনো মালিকানা প্রথা থেকে এ বিবাহ উদ্ভুত হওয়ায় তার ওপর যে বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলি যথা, প্রথমতঃ পুরুষের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়তঃ বিবাহ বন্ধনের অচ্ছেদ্যতা। বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য হচ্ছে তার আর্থিক আধিপত্যের প্রত্যক্ষ ফল এবং এ আর্থিক আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি তা লোপ পাবে। বিবাহ বন্ধনের অচ্ছেদ্যতা অংশত এসেছে সেই অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে যার মধ্যে এক পতি-পত্নী প্রথার উদ্ভব এবং অংশত এমন একটি যুগের রীতি থেকে যখন সেইসব অর্থনৈতিক অবস্থা ও এক পতি-পত্নী প্রথার যোগাযোগ সঠিক হৃদয়াঙ্গম করা যায়নি এবং ধর্মে তা অতিরঞ্জিত হয়ে উঠত। বর্তমানেও বিবাহ বন্ধন হাজারো গুণ লংঘিত। যদি কেবল প্রেমের ভিত্তিতেই বিবাহ নীতিসিদ্ধ হয়, তাহলে বিবাহ তখনই নীতিসিদ্ধ যতক্ষণ প্রেম থাকে। ব্যক্তিগত যৌন-প্রেমের অনুভূতির স্থায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, বিশেষতঃ পুরুষদের মধ্যে খুবই বিভিন্ন হয়; তাই যখন একটি প্রেম একেবার চলে যায় অথবা অপর একটি নতুন প্রেমাবেগ তার জায়গা নেয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষেও বিচ্ছেদ একটি আশীর্বাদ। বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার নিষ্প্রয়োজন কাদা মাড়িয়ে যাবার অভিজ্ঞতাটা শুধু আর সইতে হবে না।

এঙ্গেলস্-এর এই বিশ্লেষণের মধ্যে পুঁজিবাদের বিলোপের পরে এক পতি-পত্নী প্রথায় নর-নারীর সম্পর্ক কেমন হবার কথা সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়া

হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সাধারণভাবে ভবিষ্যৎ নর-নারীর যৌনসম্পর্ক বিষয়ে চূড়ান্ত কোন ভবিষ্যৎ বাণী করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। তিনি বিষয়টিকে ছেড়ে দিয়েছেন সেই সময়ে প্রাপ্ত বস্তুগত অবস্থায় নারী-পুরুষের সাংস্কৃতিক মান ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপের পর পুরুষের স্বেচ্ছাচারমূলক হেটায়ারিজম আর নারীর গোপন ব্যভিচারের বস্তুগত শর্ত কেন থাকবে না সেটা এঙ্গেলস্ অকাট্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন। তাই ব্যক্তিগত যৌন-প্রেমের ভিত্তিতে এক পতি-পত্নী প্রথা যথার্থ অর্থেই প্রচলিত হবে – অর্থাৎ 'স্ত্রীলোক বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে সত্যই এক পত্নীব্রতই হবে' এমন মতই তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু যথার্থ অর্থে স্বাধীন, অর্থাৎ পুরুষের আধিপত্যমুক্ত অবস্থায় এক পতি-পত্নী প্রথার মধ্যে কিংবা living together কিংবা অন্য কোন পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নারী-পুরুষ যে কখনোই অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয় বিবর্জিত শুধুমাত্র বৈচিত্র্যের জন্য বিপরীত লিঙ্গ গমনের কোন প্রয়োজন অনুভব করবে না– এমন কোন কথা নেই। তার কারণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক সকলেই স্বাধীনতা প্রিয় ও বৈচিত্র পিয়াসী। বিশেষ করে যৌন-ব্যাপারে এই স্বাধীনতার সাধ ও বৈচিত্রের সুখ লাভের বাসনা মানুষের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জন্মগত প্রবৃত্তি। গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় আইনগত বিধানের নাম করে অবদমনের প্রক্রিয়া জারি রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবদমনের ফলে সেই বাসনা তার মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও তা বিলুপ্ত হয়নি। সে কারণে সুযোগ মতো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তা সকলের মধ্যেই জাগ্রত আর সক্রিয় হয়ে উঠে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণকে প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের এক পতি-পত্নী প্রথার মধ্যে পুরুষের স্বেচ্ছাচারমূলক হেটায়ারিজম আর নারীর গোপন ব্যভিচারের সাথে কোনভাবেই তুলনা করা চলে না। কারণ পুরুষের বেলায় হেটায়ারিজম পুরুষের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি আর সেই সাথে নারীর (স্ত্রী, পতিতা কিংবা রক্ষিতা সকলের) অসহায়ত্ব ছাড়া সম্ভব নয়। আর নারীর ক্ষেত্রে ব্যভিচার পুরুষের প্রতারিত হওয়া ছাড়াও সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মুক্ত ও সমতাভিত্তিক একটি পরিবেশে অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিলোপের পর নারী-পুরুষ উভয়ই পরিপূর্ণ মাত্রায় আত্মনির্ভরশীল হবে এবং সে কারণে কেউই কারও কর্তৃত্বের অধীন থাকবে না। এমন একটি শর্তেই উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি সম্ভব। সেই প্রকৃত সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং উভয়ের পরিপূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা যৌন-প্রেমভিত্তিক এক পতি-পত্নী প্রথার মধ্যেই হোক কিংবা living together-এর মধ্যেই হোক নারী-পুরুষ

উভয়ের অপরাপর বিষয়ে স্বাধীনতার সাথে সাথে পরিপূর্ণ যৌন-স্বাধীনতার শর্ত সৃষ্টি করবে। বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সবার জন্যই পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে বিপরীত লিঙ্গ গমন কারও মধ্যেই ঈর্ষা কিংবা কোন অপরাধবোধ সৃষ্টি করবে না। তার কারণ ব্যক্তিগত মালিকানা আর তা আঁকড়ে ধরে থাকার বাসনা থেকেই ঈর্ষার জন্ম হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক সমাজে বৈষয়িক সম্পদকে ব্যক্তি যেমন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে ও আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, তেমনি প্রাক পুঁজিবাদী এবং পুঁজিবাদী সমাজে বিবাহিত নারী কিংবা পুরুষ তার স্বামী কিংবা স্ত্রীকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে ও তার ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব আরোপ করতে চায় তার দাম্পত্য সাথীর ব্যক্তি স্বাধীনতা তার কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। তাই সেখানে ঈর্ষার উপস্থিতি অনিবার্য। শুধু তাই নয়, এই ঈর্ষাকেই বর্তমানের এক পতি-পত্নী সমাজব্যবস্থায় ভালোবাসার সমার্থক কিংবা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এমনকি বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শিল্প-সাহিত্যে, নর-নারীর যে ভালোবাসার সম্পর্ক উপস্থিত করা হয় তা এই ঈর্ষারই একটি প্রচ্ছন্ন রূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ে মানব জাতি যে সমাজব্যবস্থায় বসবাস করে তা একদিকে সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণি বিভক্ত ও অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষের আধিপত্যপূর্ণ। এই শ্রেণি বিভক্তি ও আধিপত্যের প্রতিফলন ধর্মীয় বিধান, রাষ্ট্রীয় আইন, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গভীরভাবে গ্রথিত। সে কারণে কোন হিতোপদেশ, নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি কোন কিছুকেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা নিরপেক্ষ হিসেবে দেখার কোন সুযোগ নেই। সেই হিসেবে নারী-পুরুষের মধ্যস্থিত ভালোবাসা ও ঈর্ষাও কোন নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়।

যৌনতা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রবৃত্তি। সে কারণে মানব-মানবীর প্রেম বা ভালোবাসা থেকে যৌনতাকে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই। মধ্যযুগের শিল্প সাহিত্যে platonic love নামে ভালোবাসার যে ধারণা প্রচলিত ছিল যৌন-ভালোবাসার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সেই ভালোবাসা ছিল যৌনতা বিবর্জিত এক ধরনের আবেগ কিংবা অনুভূতি যা কার্যত স্নেহ-মায়া-মমতারই একটি বিশেষ রূপ। বাস্তবতা নর-নারীর পরিপূর্ণ ভালোবাসা ব্যক্ত ও অনুভূত হয় যৌনতার মাধ্যমেই। যৌনতা বিবর্জিত ভালোবাসা অসম্পূর্ণ আর ভালোবাসা বিবর্জিত যৌনতা পাশবিক। তাই প্লেটোনিক ভালোবাসার বিপরীতে পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসাকে যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন তার মর্মবস্তু যৌন-ভালোবাসা।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই যৌন-ভালোবাসাকে ভুল করে ঈর্ষা নামক অন্য একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আবেগের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। বাস্তব এবং কার্যত যৌন-

ভালোবাসা আর ঈর্ষা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দুটো ভিন্ন আবেগ হলেও এই দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। বিশেষ করে বর্তমানে যে শ্রেণি বিভক্ত সমাজে আমরা বসবাস করি সেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বেশিরভাগ সময়েই ঈর্ষাকেই ভালোবাসার সমার্থক কিংবা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কার্যত যারা ঈর্ষা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে অপারগ, তারা ভালোবাসার নামে যা করে থাকেন তা নির্ভেজাল ঈর্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি কেউ কাউকে সত্যিই ভালোবাসেন তবে তার মধ্যে কখনোই ঈর্ষা দানা বাঁধতে পারে না। উল্টোদিকে ঈর্ষা থেকে যিনি মুক্ত নন তার পক্ষে যথার্থ ভালোবাসাও সম্ভব নয়।

একজন যে প্রকৃত অর্থে কাউকে ভালোবাসেন তার কাছে তার ভালোবাসার মানুষকে সুখী রাখার বিষয়টিই সব সময় তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে আর সেটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয়। তার ভালোবাসার মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে তিনি পরিপূর্ণ মাত্রায় বুঝতে ও শ্রদ্ধা করতে জানেন। তার ব্যক্তি স্বাধীনতা চর্চার পথের সব অন্তরায় নির্মূল করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সবকিছুই করে থাকেন। কিন্তু একজন ঈর্ষাপরায়ণ স্বার্থপর ব্যক্তি তার ‘ভালোবাসার মানুষকে’ নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতোই মনে করেন আর সে কারণে তার ‘ভালোবাসার মানুষের’ ব্যক্তি স্বাধীনতা তার কাছে কোন বিবেচ্য বিষয় তো নয়ই বরং তা তার কাছে রীতি মতো অপরাধতুল্য ধৃষ্টতা। এই ধরনের একজন স্বার্থপর ব্যক্তির কাছে তার ‘ভালোবাসার মানুষ’ খাঁচায় বন্দী পোষা পাখির থেকে বেশি কিছু নয়। অসহায়, বন্দী পাখির মতো তার ‘ভালোবাসার মানুষের’ কোন উপায় থাকে না নিঃসীম শূন্যে দু’ডানা মেলে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করার।

যেহেতু যৌনতাকে নর-নারীর ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই, তাই বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সম্পর্ক উদারতা, সংস্কারমুক্ত মনোভাব আর অপরের প্রতি সর্বোচ্চ বিবেচনাবোধ ছাড়া কোনভাবেই একটি সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না আর এর উল্টোদিকে ঈর্ষা, ভালোবাসার পরিবর্তে স্বার্থপরতা, ঘৃণা, অশান্তি আর নিষ্ঠুরতাকেই জন্ম দেয়। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি নিজেও সুখী হতে পারেন না আর অন্যকেও সুখী করতে পারেন না।

পুঁজিবাদের অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের সাথে সাথে এক পতি-পত্নী প্রথার মধ্যেও নিজের দাম্পত্য সাথীর ওপর ব্যক্তিগত আধিপত্য স্থাপনের চিন্তা বা তার কোন প্রয়োজনবোধ সৃষ্টি হওয়ার কোন শর্তই আর উপস্থিত থাকবে না আর সেই সাথে পুরনো নৈতিক মূল্যবোধ আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতি-স্থাপিত হবে নতুন বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে। এই রকম একটি বাস্তবতায় পতি-পত্নী কিংবা অন্য যেকোনো ভাবধারার দম্পতির নারী-পুরুষ উভয়ই যার যার দাম্পত্য সাথীর রুচি, শখ, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির প্রতি সচেতন এবং সহানুভূতি-

শীল হবে। নিজের দাম্পত্য সাথীকে সে ঈর্ষা নয়, বরং আন্তরিকভাবে ভালোবাসার মতো বাস্তব অবস্থার মধ্যে থাকবে বলেই তার দাম্পত্য সাথী যেন নিজের জীবনটাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে পারে, তার ভেতর যেন অবদমিত কোন বাসনা তাকে মানসিক যন্ত্রণা না দেয় সে ব্যাপারে সে নিজেই দায়িত্ববোধ অনুভব করবে।

এখানে একটি বিষয়কে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই যে প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নারী এবং পুরুষ পরস্পরের প্রতি যে অদম্য যৌন-আকর্ষণ অনুভব করে এবং তার অবশ্যম্ভাবি পরিণতি হিসেবে যৌন-সম্ভোগে মিলিত হয় তা একটি সুস্থ, সুন্দর, প্রয়োজনীয় এবং উপভোগ্য প্রাকৃতিক বিধান। সে কারণে সুস্থ, সুখী এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রয়োজনে পুরুষের জন্য নারী এবং নারীর জন্য পুরুষ অপরিহার্য। এই যৌন-মিলনের মাধ্যমেই অন্যান্য আর সব প্রাণীর মতো মানব জাতিরও জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। কিন্তু শুধু জীবনের ধারাবাহিকতার জন্যই নয়, বরং নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে যৌন-সুখ উপভোগ করাই যৌন-মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে পরিপূর্ণ যৌন-তৃপ্তিই মানুষকে দেওয়া প্রকৃতির সবচেয়ে সেরা উপহার।

তাই পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি নারী-পুরুষের জৈবিক এবং মানসিক প্রয়োজন থেকেই তার কাঙ্ক্ষিত বিপরীত লিঙ্গের যে কারও সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালো-বাসা আর সম্মতির ভিত্তিতে যৌন-প্রেম করার এবং সেটার পরিপূর্ণ উৎসাহ, অপার আনন্দ আর পরম তৃপ্তির সাথে উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। এটা প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। আর এ ব্যাপারে সংস্কার, ভয়, লজ্জা, সংকোচ, ঘৃণা কিংবা অপরাধবোধ একেবারেই অর্থহীন। নিজের কাঙ্ক্ষিত বিপরীত লিঙ্গের যে কারও সাথে যৌন-মিলন যেকোনো নারী কিংবা পুরুষকে স্বাভাবিক কারণেই চরম উত্তেজনা, পরম সুখ আর অনাবিল আনন্দ দান করে। যৌন-সুখকে পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করার জন্য যৌন-সাথীর কাছে উভয়ের যৌন বিষয়ক রুচি, সখ আর আগ্রহ নিঃসংকোচে ব্যক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। যৌনতার মধ্যে যত বেশি বৈচিত্র্য আনা যায় যৌনতা তত বেশি সুখকর, আনন্দদায়ক, উপভোগ্য হয় ওঠে। এটা সবারই জানা।

কিন্তু বর্তমান ব্যক্তি সম্পত্তি ও সেই সাথে পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষের আধিপত্যপূর্ণ, এক পতি-পত্নী ভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বিবাহিতা নারী আর একজন পেশাদার পতিতার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে প্রথম জন ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিকভাবে আংশিক কিংবা পরিপূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হলেও তার স্বামীর প্রভূত্বের অধীন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল ও সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে দুঃচিন্তাগ্রস্ত কৃতদাসী তুল্য ব্যক্তিগত ভোগের সামগ্রী, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ। আর অন্যজন হচ্ছেন অসহায় আর বাধ্য হওয়ার কারণে অনিচ্ছা সত্বেও তার কাছে

গমনকারী যেকোনো পুরুষের সজ্জা সঙ্গিনী। বিবাহিতা নারীর এক অর্থে সামাজিক মর্যাদা থাকলেও তিনি যৌন ও অন্যান্য বক্তিগত স্বাধীনতা ও নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর এর উল্টোদিকে অবাধ যৌন-মিলনের সুযোগ থাকলেও যৌনতা পতিতার কাছে কার্যত কোন উপভোগ্য বিষয় নয়। এটা তার জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন, একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসম্মানজনক পেশা, একটি বিপণনযোগ্য পণ্য মাত্র। আর এই পণ্য বিপণনের মাধ্যমেই তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে অসম্মানজনক পেশা গ্রহণে বাধ্য হন ও তাার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার কাছে বেঁচে থাকার জন্য আর কোন সম্মানজনক পথ খোলা থাকে না। একজন পতিতা এবং তার কাছে গমনকারী একজন পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা একটি নিখাদ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে নর-নারীর ভালোবাসা কিংবা মানবিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু যথার্থ অর্থে স্বাধীন এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়েরই প্রয়োজন একই সাথে আত্মনির্ভরশীলতা, সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে পরিপূর্ণ যৌন-স্বাধীনতা যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ভিত্তির ওপর নির্মিত।

কোন বাণিজ্যিক বিবেচনা থেকে নয়, বরং পারস্পরিক পছন্দ, সম্মতি, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার ভিত্তিতে যেকোনো নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা এই যৌনসম্পর্ক সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক ও একটি উচ্চতর মানবিক সম্পর্ক। মানুষের এই জন্মগত অধিকারকে কোন সংস্কার দিয়ে খর্ব করা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

এঙ্গেলস্ আলোচনাটিকে শেষ করেছেন এভাবে, 'অতএব আমরা এখানে পুঁজিবাদী উৎপাদনের আসন্ন বিলোপের পরে কীভাবে যৌনসম্পর্ক পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে যে আন্দাজ করতে পারি সেটা প্রধানত নেতিমূলক চরিত্রের কেবল কী কী লোপ পাবে তাই নিয়ে তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোন কোন জিনিসের উদ্ভব হবে? সেটি দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে উঠবার পর এমন সব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোন সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে কোন স্ত্রীলোককে খরিদ করার কারণ ঘটেনি, আর এমন সব নারী যারা সত্যিকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোন কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনও বাধ্য হয়নি, অথবা যাদের কোন অর্থনৈতিক ফলাফলের ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতে হয়নি। এই ধরনের সব লোক একবার আবির্ভূত হলে আজ আমরা তাদের করণীয় বলে কী ভাবি সে নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। তখন তারা চালু করবে নিজেদের আচার এং ব্যক্তি আচরণ বিষয়ে নিজেদের সামাজিক মত, যা তার সঙ্গেই মিলবে, ব্যস।'

সমাজব্যবস্থার গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক রূপান্তরের সাথে সাথে নারী-পুরুষ সম্পর্কের অগ্রগতি কীভাবে এবং কী মাত্রায় ঘটে তার একটা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়

বিগত শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর দেশগুলোর দিকে তাকালে। সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন, গণচীন, আলবেনিয়া, পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ইত্যাদি দেশ এ ব্যাপারে এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কিন্তু এসব দেশের অধিকাংশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় এবং ধস নামার কারণে এ বিষয়ক কিছু কিছু অর্জন এখনও পর্যন্ত টিকে থাকলেও বেশিরভাগ অর্জনই লোপ পেয়েছে। সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় এখন পতিতাবৃত্তি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। একদিকে উচ্চাভিলাষী ও অনদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে জীবন ধারণের জন্য পতিতার পেছনে ব্যয় করার মতো বাড়তি অর্থ সঞ্চিত হয়েছে সম্পদশালী শ্রেণির পুরুষের হাতে। আর পুরুষও বাড়তি আয়ের জন্য নানা রকম অপরাধী সিন্ডিকেট ও মাফিয়া চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

নারীকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে বাইরের জগতে প্রবেশ করার পথ উন্মুক্ত করে দিলেও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নারীকে পুঁজির শোষণ আর পুরুষের আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়নি। নারীর পরিপূর্ণ মুক্তি ও সম্মানজনক জীবন পুঁজিবাদের যেমন কোন লক্ষ্য নয়, তেমনি পুঁজিবাদের দ্বারা সেটা অর্জন করাও সম্ভব নয়। পুঁজিবাদের লক্ষ্য শ্রমজীবী পুরুষের পাশাপাশি শ্রমজীবী নারীরও শ্রমের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করা। শুধু তাই নয়, এছাড়া নারীর প্রতি পুঁজিবাদের যা সব থেকে অমানবিক এবং অমার্জনীয় অপরাধ তা হল নারীর দেহ-রূপ-যৌবন অর্থাৎ তার যৌনতাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করা যেটা করতে পুঁজিবাদ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না বা তার নৈতিকতায় বাধে না। তার কারণ পুঁজির চালিকা শক্তি। মুনাফার সামনে প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধ পুঁজিবাদের কোন বিবেচ্য বিষয় নয়।

তাই যতদিন পর্যন্ত সম্পত্তি সম্পর্ক প্রসূত এই রকম একটি অমানবিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে মানবজাতি বাস করবে, ততদিন পর্যন্ত সাধারণভাবে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য এবং অন্যদিকে পেশাগত, পতিতাবৃত্তি, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে পতিতালয়ের ভেতরেই হোক বা অনানুষ্ঠনিকভাবে পতিতালয়ের বাইরেই হোক, প্রকাশ্যে বা গোপনে যেভাবেই হোক, তাকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, প্রাক-পুঁজিবাদী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক পতি-পত্নী প্রথার প্রচলন সত্ত্বেও পুরুষের স্বেচ্ছাচারমূলক হেটায়ারিজম আর নারীর গোপন ও প্রতারণামূলক ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার বস্তুগত কারণ থেকেই যায়। এ বিষয়ে বাধা এবং নিষেধের যেকোনো পদক্ষেপ কিংবা নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আইন, ধর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করা রোগের মূল কারণের ব্যাপারে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে রোগের লক্ষণের চিকিৎসার সমার্থক। এ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এঙ্গেলস্ বলছেন, ‘এক পতি-পত্নী প্রথার মধ্যেই কিন্তু এতে করে দ্বিতীয় আর একটি বিরোধ দেখা দেয়। যে স্বামীর জীবন হেটায়ারিজমের সুশোভিত, তার পাশেই রয়েছে অবহেলিত স্ত্রী। একটি আপেলের

আধখানা খেয়ে তার পুরোটা হাতে ধরে রাখা যেমন অসম্ভব, একটা বিরোধের একটি দিক থাকবে অন্যদিকটি থাকবে না, সেও তেমনি অসম্ভব। তবু স্ত্রীদের কাছ থেকে উচিত শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত পুরুষ অন্যকথাই ভেবেছিল মনে হয়। এক পতি-পত্নী বিবাহের সঙ্গে আগেকার দিনে অজ্ঞাত দুটি স্থায়ী সামাজিক জীব ঘটনাস্থলে এসে পরে – স্ত্রীর উপপতি ও প্রতারিত স্বামী। পুরুষ নারীর ওপর বিজয়ী, কিন্তু তার মাথায় প্রতারিতের মুকুট পরাবর ভার উদার চিত্তে গ্রহণ করেছে বিজিতরা। ব্যভিচার নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দণ্ডিত – তবু অদম্য। এই ব্যভিচার এক পতি-পত্নী প্রথা ও হেটায়ারিজমের পাশাপাশি হয়ে উঠেছে এক অপরিহার্য সামাজিক প্রথা। সন্তানের নিশ্চিত পিতৃত্ব এখনও বড়জোV নৈতিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সমাধানহীন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেপোলিয়ন কোর্ডের তিন শ' বারো ধারা নির্দেশ দিচ্ছে: 'L'enfant concu pendant le marriage a pour pere le mari'। 'বিবাহের স্থিতিকালের মধ্যে গর্ভাধারণ হলে স্বামীই হল সেই সন্তানের পিতা।' তিন হাজার বছরের একপতিপত্নী প্রথার এই হচ্ছে পরিণাম!'

আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা ভেঙে যাবার পর মানব জাতি এ পর্যন্ত যতগুলো সমাজ ব্যবস্থা পেরিয়ে এসেছে তার প্রতিটি তার পূর্ববর্তী ব্যবস্থা থেকে উন্নততর ও মানব জাতির সামগ্রিক অগ্রগতির সাথে সংগতিপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও এর কোনটিই ব্যক্তি মালিকানা ও সে কারণে শোষণ-নির্যাতন এবং অপর দিকে পুরুষের আধিপত্যমুক্ত ছিল না। তাই নারীর পরাজিত অবস্থান দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজের একটি অপরিহার্য বাস্তবতা। সে কারণে ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক সমাজের ভিতকে অক্ষুণ্ন রেখে নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে প্রকৃত মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়।

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার প্রশ্নটিকে সু-কৌশলে আড়াল করে ও পাশ কাটিয়ে এক ধরণের 'নারী-অধিকার' এবং 'নারী-মুক্তি' সংক্রান্ত নড়াচড়া দেখা যায়। Feminist Movement নামক এই ধরণের নারীবাদী আন্দোলন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর নানাবিধ অধিকারহীনতা, অধস্তন অবস্থা এবং নারী নির্যাতনের নানা অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে এবং 'নারী-অধিকার' প্রতিষ্ঠার জন্য নানা রকম আন্দোলন সংগ্রামও করে। এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাদেরই অর্থপুষ্ট ও লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত 'সাহায্য-সংস্থা' এনজিও -গুলো সব থেকে বেশী তৎপর ও সোচ্চার। কিন্তু সেটা করলেও নারীর অধস্তন অবস্থানের মূল কারণ উদঘাটন এবং সেই মতো করণীয় নির্ধারণের ব্যাপারে তারা কোন উৎসাহ তো দেখায়ই না, বরং সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে তার বিরোধীতা করে। তাদের নানা রকম লম্ফ-ঝম্ফ সত্ত্বেও পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সাফাই গাওয়া ও

সমাজ বিপ্লবের বিরোধীতা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। সে কারণে সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিবর্জিত এবং বিরোধী এই ধরণের নারীবাদী আন্দোলন ও এনজিও তৎপরতা কার্যতঃ প্রকৃত নারী অধিকার ও মুক্তির পক্ষে সহায়ক তো নয়ই, বরং ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। সাম্রাজ্যবাদী ফর্মূলা অনুযায়ী এ ধরণের নারীবাদী তৎপরতা সম্পত্তিবান পুরুষের শ্রেণী আধিপত্য ও স্বার্থকে নয়, বরং সাধারণভাবে লিঙ্গ (gender) হিসেবে পুরুষকেই নারীর প্রাকৃতিক প্রতিপক্ষ বা শত্রু হিসেবে চিত্রিত করে এবং মানব জাতির সার্বিক মুক্তি অর্জনের জন্য শোষিত-নির্যাতিত নারী-পুরুষের যে সম্মিলিত বিপ্লবী ঐক্য ও সংগ্রামের প্রয়োজন তাতে ফাটল সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাকে বিপথগামী করে।

Feminist বা নারীবাদীরা বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যেই নারীর সম অধিকার এবং নারী মুক্তির কথা বলেন। এর উল্টোদিকে মার্কসবাদীরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রম শোষণ অর্থাৎ মজুরী দাসত্ব থেকে মানব জাতির পরিপূর্ণ মুক্তি এবং তার ভিত্তিতেই নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। নারী-পুরুষের এই সম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর পরিপূর্ণ মুক্তি বুর্জোয়া সম্পত্তি সম্পর্ক অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানার পরিপূর্ণ উচ্ছেদের ভেতর দিয়েই সম্ভব। নারীবাদীরা নারী-অধিকার ও নারী-মুক্তির কথা বললেও যে পথে সেটা অর্জন করা সম্ভব তারা সে পথের ঘোর বিরোধী। এ কারণে নারীবাদীদের মতবাদ কার্যতঃ সম্পত্তিবান নারীদের জন্য আংশিক কার্যকর হলেও বিপুল অধিকাংশ সম্পত্তিহীন শ্রমজীবী নারীদের জন্য একেবারেই অকার্যকর একটি মতবাদ। শুধু তাই নয়। নারীবাদ সম্পত্তিবান নারীদের জন্যও কোন পূর্ণাঙ্গ মুক্তির দিক-নির্দেশনা নয়। প্রকৃতপক্ষে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের মূলে রয়েছে ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক, শোষণমূলক, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা। তাই ব্যক্তি মালিকানার কাঠামোর মধ্যে সম্পত্তিবান নারীর পক্ষেও পুরুষের আধিপত্য থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। নারীবাদীদের 'বাইরে' Marxist Feminist নামে যারা পরিচিত তাদের অবস্থা 'শ্যামও রাখি আবার কূলও রাখি'। শ্যাম আর কূল–এ দুটোকে একই সাথে রক্ষা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। নারীবাদীরা বুর্জোয়া সম্পত্তি সম্পর্কের সমর্থক হওয়ার কারণে ঘোর মার্কসবাদ বিরোধী। এ কারণে একই ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষে একই সাথে মার্কসবাদী আর নারীবাদী হওয়া সম্ভব নয়। তাই Marxist Feminist-দের আর যাই বলা যাক, মার্কসবাদী বলা সম্ভব নয়।

এর উল্টো দিকে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তনের কথা যারা বলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে সেটা অর্জিত হলে নিজে থেকেই নারী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এর জন্য ভিন্ন কোন উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

একথা ঠিক যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে সে রকম সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হবার পর অন্যান্য আর সব বিষয়ের মতো নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যেও আমূল পরিবর্তনের বস্তুগত শর্ত সৃষ্টি হবে এবং তার সূচনা ঘটবে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটলেও পুরুষের আধিপত্য থেকে নারীর পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য আরও উচ্চতর শ্রেণি সংগ্রাম করা ছাড়া সেটা অর্জন সম্ভব নয়। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন যত সহজ, সাংস্কৃতিক বা চিন্তাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন তত সহজ নয়। নারীর স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণ মুক্তি এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন সমাজ বিপ্লবেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কিন্তু এটি মূলতঃ একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম হলেও এর একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শিক দিক (dimension) রয়েছে।

যে শ্রেণি বিভক্ত ও পুরুষের আধিপত্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় আমরা এখন বসবাস করি একরম একটি সমাজব্যবস্থায় অন্যান্য আরও অনেক কারণ ছাড়াও যৌন তথা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপই হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ মাত্রই স্বাধীনতা প্রিয় এবং বৈচিত্র পিয়াসী – এ কথা আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের এমনই একটি জন্মগত প্রবৃত্তি যে এর অবদমনের চেষ্টা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে আর মনোমালিন্যের কারণ ঘটায়। একটি প্রবাহমান স্রোতস্বিনীর ওপর যদি একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয় তাহলে তার উজানে বন্যার সৃষ্টি হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়। তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করলে তার ক্ষতিকর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

অস্ট্রিয়ার ইতিহাস বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) এর মতে, 'সকল মানসিক রোগের মূলে আছে যৌন-কামনা বা প্রবৃত্তির অবদমন। যৌনাবেগ হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল আবেগ। কিন্তু সমাজে এই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত পূরণ সম্ভব নয়। বিভিন্নভাবে যৌন-আবেগ ও ইচ্ছাকে অবদমন করা হয়। এই অবদমিত ইচ্ছা নিয়ে মনের বৃহত্তর এবং অচেতন ভাগের সংগঠন। অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ এবং আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা এবং সচেতন মন বিবেক বা সেন্সরের প্রহরা ও প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্যক্তিv মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে। দ্বন্দ্বের তীব্রতায় ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড ১৮৮৯ সালে ঘোষণা করেন যে, যৌনানুভূতি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম লাভ করে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড বলেন, বয়ঃপ্রাপ্তিতে নয়, ব্যক্তি জন্ম থেকেই যৌনানুভূতির জন্ম' (সূত্র: সরদার ফজলুল করিম: দর্শনকোষ, পৃষ্ঠা-২১২)।

এমনকি মানব শিশুর যৌনানুভূতি সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্য হলো,

Oedipus complex, in psychoanalysis, the incestous fantasy in

which a boy about about 5 or 6 years old has sexual desire for his mother and hostility towards his father. The parallel complex in girls is the Electra complex.' আবার, 'Electra complex corresponds to the Oedipus complex in males. In psychoanalytic theory, it is a fantasy in which a daughter desires sex with her father and hates her mother. It was Freud's belief that conflicts originating at the Oedipal stage in a child (from about age 3 to 6) account for many adult neuroses.' (সূত্র: College Encyclopedia, Page 644 and 297।)

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কার্যত যার যার দাম্পত্য সাথীর সামনে নিজেকে এ ব্যাপারে নির্দোষ হিসেবে জাহির করেন। ফলে উভয়েই উভয়কে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং সন্দেহ প্রবণতায় আক্রান্ত হন। যে সব দম্পতি এসব ব্যাপার নিয়ে অশান্তি সৃষ্টির পক্ষপাতি নন তারা ব্যাপারটিকে একভাবে মেনে নেন। আর যারা সেটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সংগত কারণেই ফাটল ধরে। এর পরিণতিতে মনোমালিন্য সমাধানের অযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছালে তখন বিচ্ছেদ বা তালাকই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র যৌক্তিক সমাধান। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অধস্তন অবস্থানের কারণে তালাকের সময় নারীর জন্য একটি আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা পরিশোধ করতে পুরুষ আইনত বাধ্য। কারণ যাই হোক, তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত শুধু পুরুষই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে নারীও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ পুরুষকেই দিতে হবে। এই বিধান পুরুষের জন্য এক অর্থে বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণের অর্থের পরিমাণ এতই বড় হয় যে সেটা পরিশোধ করার ক্ষমতা অনেক পুরুষেরই থাকে না বা বাধ্য হয়ে সেটা করতে যেয়ে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। সেজন্য তালাকের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথে এই বাধার কারণে অনেক জটিলতা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত হয়। যেকোনো অবস্থায় যৌতুক যেমন মেয়েদের জন্য একটি চরম নির্যাতনমূলক প্রথা, ঠিক তেমনি তালাকের সময়ে পুরুষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবিও পুরুষের দিক থেকে চিন্তা করলে সেরকমই একটি নির্যাতনমূলক প্রথা। কোন কোন মেয়ের ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণের দাবি ছেড়ে দেওয়া তার জন্য বিশেষ রকম আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে এবং রীতি মতো এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে তাকে ফেলে দেয়। আবার কোন কোন মেয়ে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ এমনভাবে আদায় করে যা পুরুষের প্রতি একটি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। যৌতুক আর তালাকের সময়কার এই অর্থ দাবি নর-নারীর মানবিক সম্পর্ককে বাণিজ্যিক লেনদেনের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। তাই ব্রার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর কোন এক লেখায় বা বক্তৃতায় বলেছিলেন, যে বিয়ে হচ্ছে একটি আইনগত বেশ্যাবৃত্তি। তাই উন্নত

পুঁজিবাদী দেশগুলোতে আইনানুগ বিয়েকে পাশ কাটিয়ে অনেকে live together করে থাকেন যাতে প্রয়োজনবোধে কোন জটিলতার মধ্যে না গিয়ে খুব সহজেই তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে।

এর পাশাপাশি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক চিন্তা এবং প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন হলেও অনেক নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন বিষয়ে এক ধরনের অগ্রসর ও উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। প্রকাশ্যে একগামিতা, আর গোপনে বহুগামিতা – এই স্ববিরোধিতা ও ভন্ডামিকে তারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এ ধরনের দম্পতিরা প্রচলিত বৈবাহিক কাঠামোর মধ্যেই ঈর্ষাকে অতিক্রম করে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অপরের যৌন-স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেন। অর্থাৎ তারা তাদের দাম্পত্য সাথীর যৌন তথা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ তো করেনই না বরং এ ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকেন এবং সেই সাথে উভয়ের জৈবিক সুখ এবং বৈচিত্রের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করে থাকেন। এসব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক বর্তমানের এক পতি-পত্নী ভিত্তিক বিয়ের কঠোর শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতাকে অনেক শিথিল করে এনেছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গোপনে অপর নারী-পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে তা উভয়ের অবগতি, সম্মতি এবং উৎসাহ সাপেক্ষেই ঘটে থাকে। আর এর পাশাপাশি আইনী বৈবাহিক কাঠামোর বাইরে living together ছাড়াও সে সব দেশের নারী-পুরুষ পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং সাধারণভাবে কেউ প্রাপ্ত বয়স্ক কোন ছেলে-মেয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না বা নাক গলান না। কিন্তু তা হলেও একদিকে এ ধরনের শিথিলতা সাধারণভাবে এক পতি-পত্নী ভিত্তিক বিয়ে এবং পরিবারের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবার অন্যদিকে সম্পত্তি সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে এ ধরনের যৌন-স্বাধীনতা চর্চার প্রতি এক ধরনের অদম্য আকর্ষণ তারা অনুভব করলেও সম্পত্তি সম্পর্কের কারণে নারী নির্যাতনের যে শর্ত সৃষ্টি হয় এবং সেই সাথে সাধারণভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে একটি উচ্চতর মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে যে বাধা তৈরি হয়, তা অক্ষতই থেকে যায়।

সম্পত্তি সম্পর্কের কারণে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে তার স্বাধীনতাই শুধু খর্বিত হয় না, বরং সে স্বাধীনতার বস্তুগত শর্তই আর উপস্থিত থাকে না। তাই সম্পত্তি সম্পর্ক অটুট থাকা অবস্থায় এ ধরনের উদারতার মাধ্যমে ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামগ্রিক নারী-পুরুষ বিষয়ক সমস্যার একটি খণ্ডিত সমাধান সম্ভব হলেও সাধারণভাবে নারী-পুরুষ উভয়ের আর বিশেষভাবে গোটা নারীসমাজের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়। নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভর-

শীলতা ও সেই সাথে পুরুষের আধিপত্য থেকে তার পরিপূর্ণ মুক্তি, যা সম্পত্তি সম্পর্ক উচ্ছেদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এবং যা নারীকে কেবলমাত্র নারী হিসেবে নয়, বরং দ্বিতীয় শ্রেণি একজন নাগরিকের পর্যায় থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা দান করে। এই মর্যাদা লাভের জন্য সম্পত্তিবান শোষক শ্রেণির স্বার্থে রচিত সকল আইনের বিলোপ অপরিহার্য, যা তাকে একেবারে পর্দা ও গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়। নিজের পছন্দ মতো পোষাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে ঘরে-বাইরে-কর্মস্থলে সর্বত্র পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে চলাফেরার নিশ্চয়তা দেয়। শুধু তাই নয়, একই সাথে তার শিক্ষা, খেলাধুলা, শখ, বিনোদন, রাজনৈতিক -সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান, কর্মনির্বাচন, সর্ব বিষয়ে সমান গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদা দান করে। সমান সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, এবং সর্বোপরি বন্ধু ও জীবন সাথী নির্বাচন ও সেই সাথে গর্ভধারণ ও গর্ভপাত ইত্যাদি থেকে শুরু করে সর্ববিষয়ে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। নারীর এই ইচ্ছার স্বাধীনতা পুরোপুরিভাবেই একটি রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপার যা পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও পুরুষের আধিপত্য আর সম্পত্তি সম্পর্কের উচ্ছেদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই সম্পত্তি সম্পর্কের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ছাড়া নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা সৃষ্টি সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সাধারণভাবে নর-নারীর মধ্যে ঈর্ষাহীন অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ, সত্যকার প্রেমের অনুভূতি আর প্রকৃত বন্ধুত্বের ভিত্তিতে একটি উচ্চতর মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

তাই অন্যান্য আর সব বিষয়ের মতো নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সে রকম একটি উচ্চতর এবং উন্নত মানবিক সমাজ গঠন করার একমাত্র পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ মুক্তির লক্ষ্যে মতাদর্শিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ও তার সাথে সংগতিপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো ও তৎপরতা অব্যাহত রাখা। এই সাংগঠনিক তৎপরতাকেও অবশ্যই গোটা সমাজের আমূল পরিবর্তন অর্থাৎ বৈপ্লবিক রূপান্তরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। তার কারণ একই উৎস অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকেই নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য আর শ্রমজীবী মানুষের ওপর পুঁজিপতি তথা সম্পত্তিবান শ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই পুরুষের আধিপত্য থেকে নারীর পরিপূর্ণ মুক্তি আর শ্রম-দাসত্ব অর্থাৎ পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মানবজাতির পরিপূর্ণ মুক্তি একই সূত্রে গ্রথিত। নারী-পুরুষ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ এই শৃঙ্খল মুক্তির ভেতর দিয়েই নির্ধারিত হবে।

বর্তমান রচনাটি মুঈনুদ্দীন আহ্মদ বিরচিত *নারী-পুরুষ সম্পর্ক: ধর্ম ও মার্কসবাদ* (ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ঢাকা: শ্রাবণ) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টির পুনর্মুদ্রণ।

মনিরুল ইসলাম

যৌনসম্পর্কের লিঙ্গবৈষম্য: জৈব-সামাজিক অনুসন্ধান

Rabindranath Tagore

সূচনাটীকা: জীববৈজ্ঞানিক যেকোনো প্রশ্নের দুধরনের উত্তর আছে একটি হচ্ছে কাছের উত্তর অন্যটি দূরবর্তী। কাছের উত্তরটি আমাদের অব্যবহিত কারণটি জানায় আর দূরেরটি আমাদের জানায় এর উৎপত্তি ও বিকশিত হবার কারণ। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমটি শারীর-তত্ত্বীয় এবং দ্বিতীয়টি বিবর্তনীয় (Phylogenetic)। যেমন, যদি বলা হয় – 'আফ্রিকানদের গায়ের রঙ কালো কেন?' এর কাছের উত্তর – কারণ এদের চামড়ার বহিরাবরণে প্রচুর পরিমাণে মেলানিন রঞ্জক প্রস্তুতকারী কোষ রয়েছে। দূরবর্তী উত্তর হল তাদের জৈবনিক ইতিহাসের কোন একটি পর্যায়ে এই বৈশিষ্ট্যটি তাদের পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিলো বলে এটি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছে। এখানে বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এর গুরুত্ব বিচার করলে হবে না পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যটির গুরুত্ব। যেমন মেয়েরা আকারে পুরুষের চেয়ে ছোট। আমাদের সাধারণ চিন্তা অনুযায়ী আমরা মেয়েদের শরীরের এই বৈশিষ্ট্যকে তাদের এক ধরণের সীমাবদ্ধতা বা হীনতা হিসেবে দেখতে পারি। কিন্তু মানুষের জৈবনিক ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব কোন একটি পর্যায়ে কিংবা বর্তমান সময়েও এই বৈশিষ্ট্যটি

তার টিকে থাকার জন্য উপযোগী অথবা তাকে অধিক প্রজনন সার্থকতা দিচ্ছে। জীববৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চকে দেখার ও বোঝার এই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এক্ষেত্রে কোন গভীর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বা প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বর্তমান প্রবন্ধটি পড়ার সময়েও পাঠককে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

> আমরা (নর ও নারী) প্রজননের অত্যন্ত ভিন্ন দুটি উদ্দেশ্যকে কার্যকর যৌন-কৌশল দ্বারা একত্রিত করেছি। এটা করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আমাদের সমন্বয় করতে হয়েছে—চরম যৌন-সক্রিয়তা, বিচিত্র সব সাংস্কৃতিক আয়োজন, নানা আচরণগত অভ্যাস ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়কে, যার তুলনা প্রাণিজগতে নেই। সংস্কৃতি ও জৈবিক প্রবণতার শক্তিশালী সমন্বয়ই আমাদের চিন্তা, বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, এগিয়ে নেয় অমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে। সব কিছুর পেছনে রয়েছে, প্রজননের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে (যেন) ভিন্ন দুটি প্রাণী—আমাদের প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ।[১]
>
> ম্যালকম পট ও রজার শর্ট
> Ever Since Adam and Eve

> ... মানুষের যৌন-আনন্দের প্রায় সম্পূর্ণটাই (নারী পুরুষের মধ্যে) বন্ধন দৃঢ়কারী মৌলিক বিষয়গুলিকে গড়ে তোলে।
>
> প্রেম ও যৌনতা (এ ক্ষেত্রে) মূলত পাশাপাশিই এগোয়। ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের তাত্ত্বিকেরা যৌনতার জীবতাত্ত্বিক গুরুত্বের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।[২]
>
> এডোয়ার্ড ও উইলসন
> On Human Nature

গত শতকের ৬০-৭০'র দশকে মানুষের আচরণ ও সামাজিকতা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা শুরু করেন জীববিজ্ঞানীরা। জীববিজ্ঞানীদের চিন্তাভঙ্গির এই পরিবর্তনের ভিত্তি ছিল মানুষের কাছাকাছি প্রজাতিগুলোর জীবনধারার নিবিড় পর্যবেক্ষণ। প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীদের (মানুষ যে বর্গের অন্তর্গত) নিবিড় ও দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণে তরুণ জীববিজ্ঞানীরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন মহাদেশে, অনেক দুর্গম স্থানে। অভিযানের এই জোয়ারের সময় রাজস্থানের আবু পাহাড়ে হনুমান জাতের বানরের (Langurs) ওপর গবেষণা করতে আসেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যা-

---

১ Malcolm Potts and Roger Short: Ever Since Adam and Eve, Cambridge University Press, 1999 pp – 48.

২ E O Willson: *On Human Nature* Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England: 1978 pp.141

লয়ের প্রাইমেট বিশেষজ্ঞ সারা ব্লেফার হার্ডি। হনুমানের জনগোষ্ঠিতে যৌনজীবন ও মাতৃত্বের গতি প্রকৃতির প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বানরের জীবনচক্র অধ্যয়নের মধ্যদিয়ে হার্ডি উপলব্ধি করেন, স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর যৌনসম্পর্ক আসলে তাদের ভিন্নমুখী ও বিরোধময় প্রজনন কৌশলের মিথষ্ক্রিয়া। স্ত্রী ও পুরুষ হনুমানের যৌনসম্পর্কের ওপর তিনি লেখেন, ''প্রজননের দাবিতে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি জীবের বিবর্তন ঘটেছে, দুটি লিঙ্গ এক অমোচনীয় বিরোধের জালে জড়িয়ে গেছে। অল্প কিছু ক্ষেত্রেই কেবল তাদের স্বার্থের জায়গাগুলো মেলে''।[৩] এ কথাগুলো তিনি মানুষের ক্ষেত্রে বললেও ভুল হত না। প্রজননের জৈবিক তাড়না স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু যৌনতার কাছে তাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব এক নয়। তাই সকল যৌনসম্পর্কের মধ্যে যেমন রয়েছে দুটি প্রাণীর মিলন ও বন্ধনের সম্ভাবনা, তেমনি রয়েছে সহজাত বিরোধের বীজ। জৈবিক যৌনতার এই বৈশিষ্ট্য প্রাণীদের গোষ্ঠীগত জীবনে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মানুষের ক্ষেত্রে মূল ব্যাপারটি এক হলেও চিত্রটি একটু ভিন্ন।

জীবজগতে একমাত্র মানুষ ছাড়া প্রায় সকল প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে জৈবিক প্রবৃত্তিই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার যৌনতা ও যৌনসম্পর্কের মূল নির্ধারক। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রবৃত্তি ছাড়াও সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে যৌনতার ওপর। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় নির্দিষ্ট একটি ঋতুর (যৌনঋতু) বাইরে যৌনসম্পর্ক থাকে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে যৌনতা কোনো ঋতুতে সীমাবদ্ধ ব্যাপার নয়। মানুষ সার্বক্ষণিক যৌন-সক্রিয়। এই বৈশিষ্ট্যটির বিবর্তন মানুষের যূথবদ্ধ ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। মানুষের ক্ষেত্রে যৌনতা, প্রজনন ঘটানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করে তা হল মানবিক বন্ধন গড়ে তোলা। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হচ্ছে যৌনতা। তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যৌনতার ক্ষেত্রে মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। এগুলো হল: ক. সামাজিক জীবন খ. উন্নত শেখার ক্ষমতা এবং গ. মনোজগত। মানুষের যৌনতা ও যৌনসম্পর্কের ওপর এসব বিষয়ের প্রভাব এতটাই গভীর যে, যৌনসম্পর্কের মধ্যে জৈবিক প্রবৃত্তিকে খুঁজে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

উন্নত চিন্তা, মানসিক আদান-প্রদান ও ভাব প্রকাশ এবং সামাজিক সহযোগিতা মানুষের যৌনসম্পর্কের নতুন মানবিক মাত্রায় উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। কারণ জৈবিক দিক থেকে আমাদের যৌনতার মধ্যে এমন সব উপাদান রয়েছে যা দুটি

---

৩ Sara Blaffer Hrdy: *The Langurs of Abu: Female and Male Strategies of Reproduction*. Cambridge: Harvard University Press –quoted in Malcolm Potts and Roger Short ibid p-328

মানব সত্তার মধ্যে তীব্র অনুরাগ এবং দীর্ঘমেয়াদী অবিচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে তোলে। স্বতঃস্ফূর্ত যৌন-সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য আনন্দময় এবং গভীর আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হওয়া সম্ভব। কিন্তু বহুকাল ধরে প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধ, সংস্কার, যৌন-প্রতিবন্ধকতা, পুরুষাধিপত্য, পুরুষতন্ত্র ইত্যাদির কারণে অবদমিত প্রবৃত্তি জন্ম দিয়েছে নানা ধরনের মনো-সামাজিক সংকট। এতে এক দিকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত যৌনসম্পর্ক গড়ে ওঠার বিষয়টি, অন্যদিকে যৌনতার ওপর সমাজ ও ধর্মের ক্রমাগত আক্রমণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে যোগ করেছে অনেক অমানবিক উপাদান। এসব অমানবিক উপাদান একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি তিনটি বিষয় মানুষের যৌনসম্পর্কের মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে ক্রিয়া করেছে: ক. জৈবিক প্রবৃত্তি, খ. অর্থনীতি ও গ. ধর্ম।

মানুষের যৌন-আচরণ ও যৌন-সম্পর্ক আজ যে পর্যায়ে আছে এবং এর গতি-প্রকৃতি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তার পেছনে জৈবিক প্রবৃত্তি এবং সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক মানব প্রজাতি হোমোসেপিয়ান্সের উৎপত্তির অনেক আগে থেকেই মানবীয় যৌন-প্রবৃত্তির নানা প্রকাশের উৎপত্তি হয়েছে বলে জীববিজ্ঞানীদের ধারণা। দু'পায়ে চলাচল (Bipedalism), উন্নত হাতিয়ার ব্যবহার, শিকার এবং যূথবদ্ধ বসবাস হোমো হ্যাবিলিসি, হোমো ইরেক্টাস ইত্যাদি আদি মানব প্রজাতিগুলোর মধ্যেই বিকাশ লাভ করেছিল। এসব বিষয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়েই বিবর্তিত হয়েছে মানুষের যৌন-প্রবৃত্তির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা জীবন বৃক্ষে মানুষের কাছাকাছি অন্যান্য প্রজাতিগুলোর মধ্যে যারা এখনও টিকে আছে (যেমন, নরবানর) তাদের মধ্যে নেই। মানুষের সভ্য জীবন-যাপন শুরুর অনেক আগে থেকেই যৌনতার ওপর অর্থনীতি ও ধর্মের চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলে তখন থেকেই শুরু হয় যৌন-প্রবৃত্তি অবদমনের ধারা। ঠিক কবে এই ঘটনা শুরু হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখা নেই। তবে অনুমান করা যায় যে, পুরুষতান্ত্রিক পরিবার এবং ব্যক্তি-মালিকানার উদ্ভবের পর থেকেই যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থনীতির পাল্লা পুরুষের দিকে ভারী হওয়ার অর্থাৎ উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা তাদের (পুরুষের) হওয়ায়, বিধিনিষেধের বেশিরভাগ নারীর ওপরেই আরোপিত হয়েছে। এসব বিধিনিষেধের নিগড় মানুষের মনে গভীর ও স্থায়ী করার জন্য খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে ধর্ম ও লোকাচার। ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টধর্মে যৌন-আনন্দকে মানুষের জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রজনন ব্যতীত যৌনতার অন্য কোনো গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যান্য প্রায় সকল ধর্ম, প্রচলিত বিশ্বাস এবং লোকাচার যৌনতা ও যৌন-আচরণকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর ফলে

সুস্থ স্বতঃস্ফূর্ত যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে যে সাবলীল আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।[৪ ৫ ৬]

মানুষের সমাজে যৌনসম্পর্কগুলোর গতিপ্রকৃতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ধর্ম ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর ভূমিকা ছিল জৈবিক প্রবৃত্তির চেয়ে অনেক বেশি। এটি আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি যখন দেখি অন্যান্য প্রজাতির ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যৌন-জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি তা নয়। আমাদের জানা ঐতিহাসিককালের মধ্যে মানব প্রজাতির যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। যদিও এ সময়ের মধ্যে তাদের জৈবিক যৌনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। গত তিন চার হাজার বছরে মানুষের যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তনের বেশিরভাগ ঘটেছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে। এমনকি সমাজই জৈবিক যৌনতার ক্ষেত্রে এমন কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে যা যৌনসম্পর্কগুলোর মধ্যেও কিছু মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সমাজের এই অর্জনগুলো হচ্ছে—ক. প্রজনন ও মানব শারীরবিদ্যা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান এবং খ. জন্ম নিয়ন্ত্রণের কার্যকর প্রযুক্তির আবিষ্কার।

মানুষের যৌনসম্পর্কগুলো ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে গেলেও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েক ধরনের যৌনসম্পর্ক আমাদের সমাজে টিকে আছে। এর মধ্যে উল্লেযোগ্য হচ্ছে—

সম্পর্কহীন যৌনতা (casual sex)
রোমান্টিক প্রেম
বিবাহিত সম্পর্ক
অর্থের/ জীবনধারণের উপকরণের বিনিময়ে যৌনসম্পর্ক
সাম্প্রতিকালে পশ্চিমা দেশগুলো গড়ে ওঠা আধুনিক বিকল্প জীবন ধারা (alternative lifestyle)[৭]

সমকামীদের মধ্যেও ক্যাজুয়াল সেক্স, রোমান্স এবং বিয়ে রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এত বিচিত্র যৌনসম্পর্ক নেই।

৪ বার্ট্রান্ড রাসেল: *বিবাহ ও নৈতিকতা*; অনুবাদ আরশাদ আজিজ, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৮, পৃ: ১৭।

৫ *First Corinthians* vii.1 -9, New Testament, Bible.

৬ Ashley Rolph: St. Augustine: *Women, Sexuality and Sin*; LBRL 417, November 23, 2004

৭ Dr. Curtis Bergstrand and Ms. Jennifer Blevins Williams: Today's Alternative Marriage Styles: The Case of Swingers: *Electronic Journal of Human Sexuality*, voi.3 october 2000. www.ejhs.org

অতএব অনুমান করা যায় যে, জৈবিক বৈশিষ্ট্য নয় বরং সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিল পরিস্থিতিই মূলত মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যৌনসম্পর্কের জন্ম দিয়েছে।

এসব যৌনসম্পর্কের বাস্তবতা নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একরকম নয়। এখানে তাদের অংশগ্রহণও একরকম নয়। এর পেছনে জৈবিক পার্থক্য অনেকটা দায়ী। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব সামাজিক বিধিনিষেধ এবং প্রতি-বন্ধকতার কারণেই মূলত নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে যৌনসম্পর্ক ভিন্ন বাস্তবতা নিয়ে আসে। পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, বিশ্বাস এবং ধারণার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যৌনসম্পর্ক নারীর জন্য পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি প্রতুকূল। এ কথা সামাজিক-ভাবে 'বৈধ' ও 'সংরক্ষিত' সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সত্যি। নিপীড়নমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রায় সর্বাংশেই নারীরা নিপীড়নের শিকার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষই নিপীড়নকারী। অর্থের বিনিময়ে বা বাণিজ্যিক যৌনসম্পর্কেও নারী পুরুষের অংশগ্রহণের ধরণ ও মাত্রা একরকম নয়। এখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ ভোক্তা এবং নারী বিনোদন-প্রদানকারী। আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষ এমন কি বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ধারণা হল জৈবিক পার্থক্যই যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের মূল কারণ। এসব সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যে ভূমিকা প্রচলিত আছে তা 'প্রাকৃতিক' ও 'স্বাভাবিক'। কিন্তু এ ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার নিরিখে প্রশ্নের সম্মুখিন হয়েছে। নারী-পুরুষের যৌন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে তার ভিত্তিভূমির স্বরূপ সন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

এ কাজটি করতে গেলে, মানুষের যৌনসম্পর্ক বিষয়ক মূল যে প্রশ্নগুলো আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, সেগুলো হচ্ছে—

১. জৈবিক উৎসগুলো আমাদের যৌনসম্পর্কের গতি-প্রকৃতিকে কীভাবে ও কতটা নির্ধারণ করে?

২. 'স্বল্পস্থায়ী, আকস্মিক যৌনসম্পর্ক বা ক্যাজুয়াল সেক্স কেবল পুরুষের কাছেই কাম্য এবং নারীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ' একথা কতটা সত্য?

৩. নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির প্রতি যে গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী যৌন-আবেগ রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে দেখা যায় তার কতটা জৈবিক এবং কতটা সমাজ-সৃষ্ট? এতে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে ভিন্নতার কারণ কি জৈবিক না সামাজিক?

৪. বিয়ের মতো সামাজিক প্রথা (যা আমাদের জৈবিক যৌনতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে) মানব সমাজে এতো সার্বজনীন কেন? এই প্রথার মধ্যে যে পুরুষাধিপত্য রয়েছে তা কি জৈবিক অনুষঙ্গে উদ্ভূত না সমাজসৃষ্ট।

৫. যৌনতার বিপণন কিংবা গণিকাবৃত্তি কি প্রকৃতিগতভাবে শুধু নারীদের জন্যেই? শোষণ ও নিপীড়ণ থেকে মুক্ত হলে এটি কি মুক্ত মানুষের স্বাধীন কোনো পেশা হতে পারে?

৬. বিয়ের বন্ধনের মধ্যে থেকেও বৈচিত্র ও অধিক তৃপ্তির জন্য যে 'বিকল্প জীবনধারা' পশ্চিমা নারীপুরুষ গড়ে তুলছে তা কি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য একই গুরুত্ব বহন করে? বিবাহিত সম্পর্কের অপূর্ণতা এবং এই সম্পর্কের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে এর ভূমিকা কতটুকু।

জৈবিক সীমানা

> কোনো প্রাণীই যৌনতা নিয়ে রঙ্গ করতে পৃথিবীতে তাদের বরাদ্দ সময় থেকে হোমো সেপিয়েন্সদের চেয়ে বেশি ব্যয় করে না। এমন কি বিখ্যাত 'কামুক' প্রজাতি বনোবোও (পিগমি শিম্পাঞ্জী) না। হাজার হাজার না হলেও আমরা এবং বনোবো জন্ম-প্রতি গড়ে কয়েক শ যৌনসঙ্গম ভালোভাবেই করে থাকি, যা যেকোনো অন্য প্রাইমেট থেকে অনেক বেশি।...ওদের 'কর্ম' আমাদের চেয়ে অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। ... ধর্মীয় অনুশাসন সত্ত্বেও মানুষ রয়েছে কামুকতার সারির সর্বোচ্চ সীমায় যাকে বলা যায়, ব্যক্তিনির্দিষ্ট অতিযৌনতা।[৮]
>
> ক্রিস্টোফার রাইয়ান ও ক্যাকিলড জেটা
>
> Sex at Dawn: The prehistoric origins of modern sexuality

> (প্রাণীজগতে) মানুষই যৌন-আনন্দের সর্বোচ্চ উপভোগকারী। এরা তাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে তাদের সাম্ভাব্য যৌনসঙ্গীদের শুধু অবলোকন করে (কিংবা) ফ্যান্টাসি, কাব্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। প্রতিটি আনন্দময় প্রেমবিলাসের দ্যোতনা নিয়ে যায় যৌন-পূর্বরাগ এবং যৌনমিলনের দিকে। প্রজননের সঙ্গে এর সম্পর্ক খুব সামান্যই।[৯]
>
> ই ও উইলসন
>
> On Human Nature

প্রজননের ভার নারী ও পুরুষের ওপর সমান নয়। ভিন্ন রকম দায়ভার বইতে গিয়ে তাদের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে যৌনমিলনে অংশ নেওয়ার ভিন্ন কৌশল। ভিন্ন হয়েছে দেহের আকার এবং যৌনতার বাহ্যিক ও গৌণ বৈশিষ্ট্যগুলো (secondary sexual characters)। জৈবিক যৌনতার এই ভিন্নতা সামাজিক যৌনসম্পর্ক

---

৮ Christopher Ryan, PhD and Cacilda Jethá: *Sex at Dawn: The prehistoric origins of modern sexuality*; New York:Harper, ©2010.

৯ E O Willson: *On Human Nature Harvard University*, Press Cambridge, Massachusetts London, England: 1978 pp.140

নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমাদের যৌন-আচরণ ও যৌনসম্পর্কের ওপর সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। কিন্তু যৌন-আচরণ ও যৌনসম্পর্কের মূল ভিত্তি যে জৈবিক তা অস্বীকার করার কোনে উপায় নেই। প্রাণিজগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই জৈবিক প্রবণতা এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন দুটি বিষয়ই একটি প্রজাতির স্ত্রী প্রাণী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে যৌনসম্পর্ক নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। তবে কোনো প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে যৌনসম্পর্কের নির্দিষ্ট একটি ধরণ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জৈবিক মাত্রার ভূমিকাকে স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। এই স্পষ্টতা না থাকলে এসব জটিল বিষয়ে আমরা একপেশে ও নির্ধারণবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

বহুকোষী বৃহদাকার জীবের ক্ষেত্রে যৌনতা বেশ জটিল একটি প্রক্রিয়া। পুংজনন কোষ এবং স্ত্রীজনন কোষ দুটি পৃথক সত্তায় বিকশিত হয়ে ওঠে। এরা (কোষ দুটি) মিলিত হলে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়া যত সহজ, এদের মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়া তত সহজ নয়। দুটি বৃহৎ সত্তার মধ্য থেকে আণুবীক্ষণিক দুটো কোষের একত্র হওয়া স্যামন মাছের মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার মতোই একটি ব্যাপার। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর জন্য বাহক লাগে। সেই বাহককে আকৃষ্ট করার জন্য গাছের আকর্ষণীয় ফুল থাকে, যার বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গ বা অন্য কোনো বাহক ফুলের সংস্পর্শে আসে। প্রাণীর ক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী প্রাণী সরাসরি পুরুষ প্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলন প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। এর জন্য প্রয়োজন স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তৈরি এবং আনন্দময় মিলন। এই আকর্ষণ তৈরি ও মিলন আনন্দময় করার জন্য তাদের উভয়ের দেহে অনেক গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত হয়েছে। মানুষসহ অনেক বৃহদাকার প্রাণীর যৌন-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং যৌন-আচরণ আমাদের কাছে জটিল ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়। তার কারণ বিবর্তন এদের যৌন-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্মাণকল্প প্রধানত প্রজননের উপযোগী করে গড়েনি। বরং এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধরণ মুখ্যত নির্মিত হয়েছে স্ত্রী প্রাণী ও পুরুষ প্রাণীর মিলনের উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে।

তবে পুংজনন কোষ এবং স্ত্রীজনন কোষ মিলিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ সন্তান হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি বিবর্তনের মাধ্যমে যত নিখুঁতভাবে গড়ে উঠেছে, স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের আগ্রহ তৈরি এবং মিলন আনন্দময় করার প্রক্রিয়াগুলো ততটা নিখুঁতভাবে পরস্পরের জন্য সমান মাত্রার হয়ে উঠতে পারেনি। স্ত্রী প্রাণী ও পুরুষ প্রাণীর যৌন-পছন্দ ও আকাঙ্ক্ষার ধরণ ও লক্ষ্য একরকম নয়। প্রজননের সাফল্যও যৌন-আনন্দের সঙ্গে সমানুপাতিক নয়। সবচেয়ে আনন্দময় যৌনসঙ্গম এবং সবচেয়ে কম আনন্দময় যৌনসঙ্গমে সফল প্রজনন ঘটার সম্ভাবনা প্রায় সমান। যৌন-আকর্ষণের তীব্রতা এবং মিলনের আনন্দের গভীরতা বিবর্তিত হওয়ার প্রত্যক্ষ

কারণ ছিল দুটি: ১. পরিবেশের দুর্গম প্রতুকূলতার মধ্যেও স্ত্রী প্রাণী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটানো এবং ২. স্ত্রী প্রাণী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধন গড়ে তোলা। বিস্তৃত বিচরণ ক্ষেত্রের মধ্য থেকে স্ত্রী প্রাণী ও পুরুষ প্রাণীর একত্রীকরণ এবং যৌনমিলন ঘটানোর জন্য প্রথম বিষয়টির প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির প্রয়োজন হয়েছিল মূলত সন্তান পালনে পুরুষ প্রাণীর সহায়তা পাওয়ার জন্য।

পক্ষী জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে সন্তান পালনে পুরুষ প্রাণীর সহায়তার ব্যাপারটি অনেক প্রজাতির ভেতর দেখা যায়। কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে সাধারণত স্ত্রী প্রাণীই সন্তান পালন করে থাকে। মানুষ যে বর্গের অন্তর্গত সেই প্রাইমেট বর্গের প্রাণীদের অনেক প্রজাতির পুরুষেরা কম বেশি সন্তান পালনে অংশগ্রহণ করে। যেমন, নরবানরদের মধ্যে গিবন। এদের ক্ষেত্রে একজন স্ত্রী প্রাণী এবং একজন পুরুষ প্রাণী প্রায় সারাজীবনের জন্য জোড় বাঁধে। উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহা-দেশের (New World) মারমোসেট (marmosets) ও টামারিন (tamarins) প্রজাতির বানরদের মধ্যে সন্তান পালনে পুরুষ প্রাণীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে প্রথমে একজন স্ত্রী প্রাণী এবং একজন পুরুষ প্রাণী জোঁড় বাঁধে। পরে সন্তান জন্মালে (যেহেতু এদের যমজ বাচ্চা হয়) আরেকজন পুরুষ তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, যে অতিরিক্ত সন্তানটি পালনে সহায়তা দেয়। দ্বিতীয় পুরুষটির সঙ্গেও স্ত্রী প্রাণীটির যৌন-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নরবানরদের (ape) মধ্যে ওরাং ওটাং পুরুষেরা সন্তান পালনে মোটেও অংশ নেয় না । এজন্য দেখা যায় এদের মধ্যে সামাজিক বন্ধনও কম। স্ত্রী প্রাণী সন্তান নিয়ে পৃথক থাকে। পুরুষ প্রাণীর সন্তান পালনে সহায়তার ব্যাপারটি শিম্পাঞ্জির মধ্যে কিছুটা এবং মানুষের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় রয়েছে। বানর এবং নরবানরদের মধ্যে এই সহায়তা মূলত সন্তানকে ধারণ করা বা রক্ষা করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে শুধু সেটুকু নয়, পুরুষ প্রাণী স্ত্রী প্রাণীকে বেঁচে থাকার উপকরণ, যেমন খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদিও দিয়ে থাকে। পক্ষী জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের সহায়তা দেখা গেলেও অন্য কোনো নরবানর বা প্রাইমেটদের মধ্যে তা নেই। প্রাণিবিজ্ঞানী এবং প্রাইমেটলজি বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন–যে প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যৌন-সংসর্গ যত গভীর ও আনন্দময় তাদের মধ্যে বন্ধনও তত দৃঢ় হয়। এরকম দীর্ঘ-মেয়াদী, আনন্দময় ও গভীর বন্ধনে থাকার সময় পুরুষ প্রাণী স্ত্রী প্রাণীকে সন্তান পালনে সহায়তা দেয় এবং অনেক পাখি এবং মানুষের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রেও সহায়তা দিয়ে থাকে। পাখিদের বেশিরভাগ প্রজাতির ক্ষেত্রে সন্তান পালন ও তা রক্ষা করা এবং জীবন ধারণের উপকরণ যোগাতে পুরুষ প্রাণীর সহায়তা অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যৌন-আকর্ষণ ও যৌনমিলনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি হয়েছে যাতে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে

উঠতে পারে। প্রাইমেট এমনকি হোমিনিডদের (মানুষের গোত্র, যার মধ্যে রয়েছে মানুষ ও নরবানরেরা) মধ্যে মানুষের গর্ভে সন্তান ধারণের সময়কাল দীর্ঘতম। মানুষের সন্তান জন্মের পর সবচেয়ে অসহায় থাকে। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হতেও এদের সবচেয়ে বেশি সময় লাগে। হোমিনিডদের মধ্যে একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই সন্তান পালনে পুরুষ প্রাণীর কাছ থেকে এই মাত্রায় সহায়তা প্রয়োজন হয়। সে কারণেই মানুষের স্ত্রী প্রাণীদের মধ্যে এমন কিছু যৌন-বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি অছে যা অন্যান্য নরবানর প্রজাতির স্ত্রী প্রাণীদের তুলনায় অনেক গভীরভাবে পুরুষ প্রাণীকে যৌনবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। মানুষের কাছাকাছি তিনটি প্রজাতি শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং ও গরিলার মধ্যে যৌনতার কয়েকটি বিষয় তুলনা করলে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাই।

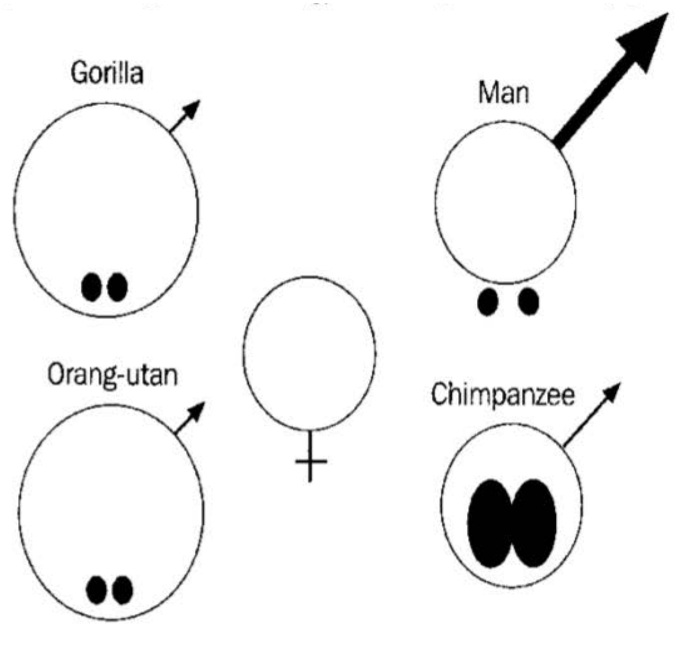

চিত্র-১: মানুষ ও নরবানরদের ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীর শরীরের তুলনায় পুরুষদের যৌন ও প্রজনন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বড় বৃত্তটি শরীরের আকার, কালো জোড়টি অণ্ডকোষ এবং তীর উত্থিত শিশ্ন নির্দেশ করছে।[১০]

১নং চিত্রে বড় বৃত্তগুলো স্ত্রী প্রাণীর তুলনায় সংশ্লিষ্ট প্রাণীর দেহের আকার, ছোট কালো এক জোড়া উপবৃত্ত অণ্ডকোষের আকার এবং তীর ওই প্রাণীর শিশ্নের

১০ Jared Diamond, *The rise and fall of the third chimpanzee*; 1991 p-60

আকার নির্দেশ করছে। দেখা যাচ্ছে, দেহের তুলনায় শিম্পাঞ্জির অণ্ডকোষের আকার সবচেয়ে বড়। অণ্ডকোষের আকার প্রাণীটির সঙ্গম করার হারের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ চারটি প্রজাতির মধ্যে শিম্পাঞ্জি সবচেয়ে ঘন ঘন যৌনসঙ্গম করে। সাধারণ শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে এ সংখ্যা গড়ে দিনে একবার এবং পিগমি শিম্পাঞ্জি বা বনবোর ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে তিন থেকে চার বার। যাদের যৌনসঙ্গমের অবাধ সুযোগ আছে সে সব অধিকাংশ মানুষের গড় যৌনসঙ্গমের হার শিম্পাঞ্জির চেয়ে অনেক কম। ওরাংওটাং এবং গরিলার সঙ্গমের হার আরও কম। যদিও বৃহদাকার দলনেতা পুরুষ গরিলার 'হারেমে' ছয় থেকে আটজন স্ত্রী গরিলা থাকে। একজন পুরুষ গরিলা বছরে বড়জোর ছয় থেকে সাত বার যৌনসঙ্গম করে। স্ত্রী ও পুরুষের দেহের আকার যৌনঙ্গমে তাদের আগ্রহের সমানুপাতিক। শিম্পাঞ্জি স্ত্রী ও পুরুষের দেহের আকার মোটামুটি সমান। এদের মধ্যে স্ত্রী প্রাণী এবং পুরুষ প্রাণীর যৌনসঙ্গমে আগ্রহ ও অংশগ্রহণের হার সমান। মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণীর আকার স্ত্রী প্রাণীর চেয়ে কিছুটা (গড়ে ১২%) বেশি। মানুষের মধ্যে পুরুষ প্রাণী স্ত্রী প্রাণীর চেয়ে কিছুটা বেশি বহুগামী। গরিলাদের মধ্যে স্ত্রী প্রাণীর তুলনায় পুরুষ প্রাণীর আকার অনেক বড়। এদের ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণীদের 'হারেম' থাকে। এবং একজন পুরষ প্রাণী, স্ত্রী প্রাণীর চেয়ে অনেক বার সঙ্গম করে

(এদের মধ্যে অনেক পুরুষ প্রাণী থাকে যারা মোটেও সঙ্গমের সুযোগ পায় না। কারণ তারা স্ত্রী প্রাণীদের সংস্পর্শে আসতেই পারে না)।

নরবানরদের তুলনায় মানুষের যৌনতার দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আমরা চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ দেখতে পাই। দেহের আকারের অনুপাতে নরের উত্থিত শিশ্ন নরবানরদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বড়। অন্যদিকে দেহের অনুপাতে স্ত্রী নরবানরদের চেয়ে নারীর স্তনের আকার অনেক বড়। সন্তান জন্মদানের পূর্বেও নারীর স্তনের যে আকার থাকে তাও স্তনদানকারী স্ত্রী নরবানরদের চেয়ে অনেক বড়। যে সব জীববিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন তাদের ধারণা, শিশ্নের এবং স্তনের এই আকার বৃদ্ধি প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন-আকর্ষণ এবং যৌনপুলকের তীব্রতা বাড়ানোর জন্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিবর্তিত হয়েছিল।

প্রায় সকল স্তন্যপায়ী এমনকি প্রাইমেট বর্গের স্ত্রী প্রাণীরা কেবল তাদের ঋতুচক্রের মধ্যবর্তী কয়েকদিন (যখন ডিম্বানু নিঃসরণ হয়) যৌনসঙ্গমের জন্য প্রস্তুত থাকে। অন্য সময় এরা যৌনসঙ্গম করে না। এই বিশেষ সময়টিকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় এস্ট্রাস (Estrus)। এস্ট্রাসের সময় অন্যান্য স্তন্যপায়ী ও প্রাইমেটদের স্ত্রী প্রাণীদের দেহে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখে পুরুষ প্রাণী বুঝতে পারে এখনই তার সঙ্গে সঙ্গম করা যাবে, অন্য সময় নয়। মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীর

এস্ট্রাসের কোনো লক্ষণ বাইরে প্রকাশিত হয় না। ২৮ দিনের ঋতুচক্রের পুরোটাই নারী সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক নারী সবসময়েই সঙ্গমের জন্য উপযুক্ত থাকে। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, নিরবিচ্ছিন্ন গভীর ও আনন্দময় যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে নারী-পুরষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বন্ধন গড়ে তোলার অনুকূলে নারীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি হয়েছিল।

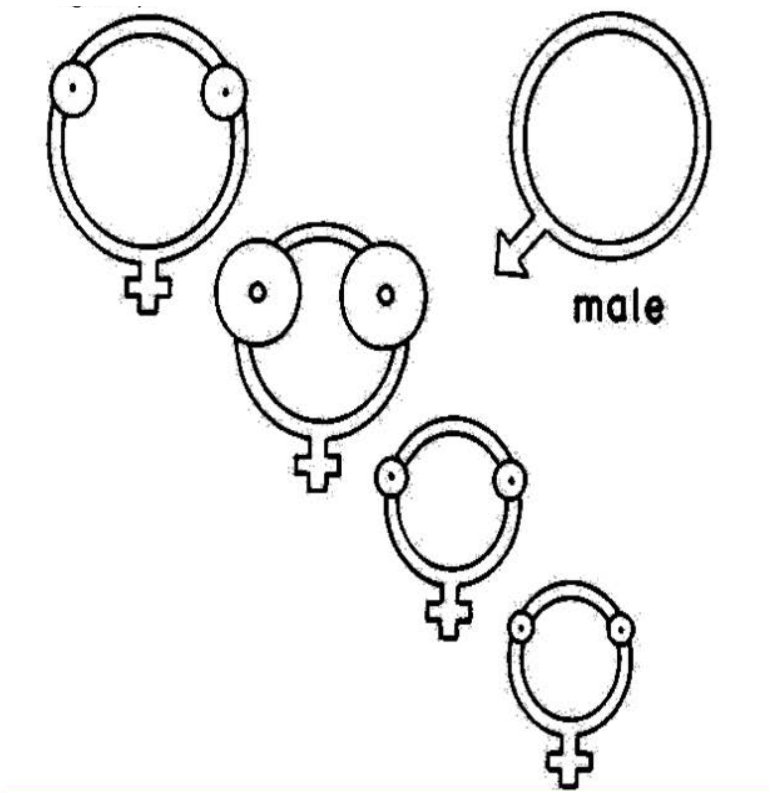

চিত্র-২: মানুষ ও নরবানরদের ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীর শরীরের তুলনায় স্ত্রী প্রাণীর স্তন। বড় বৃত্তটি শরীরের আকার, মাঝখানে ফোটাসহ ছোট একজোড়া গোল স্তনের আকার নির্দেশ করছে। উপর থেকে নিচে যথাক্রমে শিম্পাঞ্জী, মানুষ, ওরাংওটাং ও গরিলা।[১১]

পুরুষের সঙ্গে এরকম দীর্ঘমেয়াদী বন্ধন ও অন্যান্য সামজিক সহযোগিতা ছাড়া নারীর

১১ Jared Diamond, *The rise and fall of the third chimpanzee*; 1991 p-61

পক্ষে সার্থকভাবে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সন্তানধারণ, অত্যন্ত কষ্টকর সন্তান প্রসব, সন্তানকে দীর্ঘমেয়াদী দুধ খাওয়ানো এবং বহুবছরব্যাপী একাধিক সন্তানকে বড় করে তোলা অত্যন্ত দুরূহ বা হয়ত অসম্ভব হত। শুধু দীর্ঘমেয়াদী বন্ধনসৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যই নয়, নারীর মধ্যে আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটেছে যার মাধ্যমে সন্তান পালনে পুরুষ প্রাণীর সর্বোচ্চ সহায়তা পাওয়া সম্ভব। নারীর যৌন-পছন্দ এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে, সে এমন যৌনসঙ্গীকে বেছে নেবে যে সন্তান পালনে অত্যন্ত সহায়ক ও দক্ষ। অথবা সন্তানপালন বা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যার অধিকারে রয়েছে। মানুষের সমাজে উচু নীচু ধাপ (hierarchy) সার্বজনীন। আর উচ্চ ধাপে অবস্থানকারীদের কাছেই জীবন ধারণের উপকরণগুলো পুঞ্জিভূত হয়। তাই নারীরা নিজের এবং তার সন্তানের জীবনধারনের উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারটির সঙ্গে অভিযোজনের সমস্যা কিছুটা সমাধান করে যৌনসঙ্গী হিসেবে এমন পুরুষকে বেছে নিয়ে, যে (তার জনগোষ্ঠির মধ্যে) উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। মানুষের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সাম্প্রতিককালে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা এই বিবর্তনিক ধারণাকে সমর্থন করে।[১২]

এ ব্যাপারটি কেবল মানব প্রজাতির ক্ষেত্রেই রয়েছে তা নয়। অধিকাংশ প্রাইমেট এবং অনেক স্তন্যপায়ী স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে কম বেশি এ বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়। যে সব প্রাণীর (সরিসৃপ,পাখি ও স্তন্যপায়ী) ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীর দেহের ভেতরে জনন কোষগুলোর নিষেক ঘটে তাদের স্ত্রী-জনন কোষের সংখ্যা থাকে অনেক কম। অল্প সংখ্যক জনন কোষসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে সঙ্গী নির্বাচনে বাছ-বিচারের ব্যাপারটি বিবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে পুং-জননকোষ অসংখ্য এবং অধিকাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গমের পর প্রজননে পুরুষ প্রাণীর কোনো দায়িত্ব থাকে না। এজন্য দেখা যায় সরিসৃপ,পাখি ও স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অধিকাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রে সঙ্গী নির্বাচনে পুরুষ প্রাণীর বাছ-বিচার কম থাকে। যৌনসঙ্গমে পুরুষ প্রাণীর আগ্রহ স্ত্রী প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী শিম্পাঞ্জির শরীরের আকার প্রায় সমান। এজন্য শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণী ও স্ত্রী প্রাণীর যৌন-আকাঙ্ক্ষা জাগার (sexual arousal) পৌনঃপুনিকতা সমান। মানুষের মধ্যে পুরুষ প্রাণীর আকার স্ত্রী প্রাণীর চেয়ে কিছুটা বেশি। এটি ইঙ্গিত করে নারীর তুলনায় নরের যৌন-আকাঙ্ক্ষা জাগার পৌনঃপুনিকতা কিছুটা বেশি।

সম্পর্কহীন আকস্মিক যৌনতা শুধু পুরুষের জন্য?

… নারীরা বেশি চিন্তিত থাকে (শারীরিক) যৌন-নিগ্রহ নিয়ে, যে ভয়

১২ Malcolm Potts and Roger Shor t: *Ever Since Adam and Eve*, Cambridge University Press, 1999 p – 39-40.

(নারীদের জন্যে) সম্পর্কহীন আকস্মিক যৌনতাকে করেছে ঝুঁকিপূর্ণ। ... গড়ের ওপর নারীরা সম্পর্কহীন যৌনতায় কম আনন্দ পায়। কারণ যে যৌনসঙ্গী পরিচিত বা যার প্রতি আস্থা আছে তার সঙ্গে সঙ্গমে সে বেশি ইচ্ছুক থাকে। তা সত্ত্বেও চমৎকৃত হওয়ার মতো ব্যাপার হচ্ছে আমরা যদি এই বিষয়টির সমাধান করতে পারি এবং নারীদের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় সম্পর্কহীন যৌনমিলনের সুযোগ তৈরি করতে পারি, এ ধরনের সম্পর্কে তাদের পুরুষের মতোই ইচ্ছা-প্রবৃত্তি থাকবে।[১৩]

টম জ্যাকবস

Casual Sex: Men, Women Not So Different After All

আপনি বিবেচনা করে দেখুন, যৌন-যথেচ্ছাচারী আচরণের জন্য যখন পুরুষের কলঙ্ক ও সামাজিক ঝুঁকি অনেক কম, সে কেন এই সুবিধার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাবে না? নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সম্পর্কহীন যৌনতার এই ভিন্ন প্রভাবই ব্যাখ্যা করে কেন এত অল্পসংখ্যক মেয়ে এক রাতের শয্যায় যায়। ...এটা এমন নয় যে, সম্পর্কহীন মিলন পুরুষ যতটা চায় মেয়েরা ততটা চায় না, তারা অপেক্ষা করে আরও মানসম্পন্ন কিছুর জন্য।[১৪]

ম্যারি

Casual Sex: equally deserved, notable gender gap

'যৌনবিপ্লব'– গত শতাব্দিতে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর এক আলোরণ সৃষ্টিকারী ঘটনা। যৌনতার ওপর ধর্ম, সমাজ, সংস্কার ও লোকাচারের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এ শতাব্দীর ষাটের দশকে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল নতুন এক প্রজন্ম। একগামী ও সামাজিকভাবে বৈধ (বিবাহিত) যৌনসম্পর্কের মধ্যে যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত বা 'শৃঙ্খলিত' না রেখে তরুণ-তরুণিরা বেরিয়ে এলো এই গণ্ডির বাইরে। জন্মনিয়ন্ত্রণ, জনসম্মুখে নগ্নতা, সমকামীতা ও যৌনতার বিকল্প পদ্ধতিগুলো স্বাভাবিকভাবে নেওয়া, গর্ভপাতকে আইন-সম্মত করা ইত্যাদি সব কিছুই ছিল এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। যৌনতার ওপর তীব্র দমন ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন একটি সমাজে এ রকম আন্দোলন ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। এই আন্দোলনের খুঁটিনাটি ও ভালোমন্দ আমাদের বর্তমান আলোচনার গণ্ডির বাইরে। কিন্তু এই আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া মানুষের যৌনসম্পর্ক বিষয়ে যেসব সত্য মূর্ত করে তুলেছিল তা এই আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রথাবদ্ধ যৌনতার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সময়

---

১৩ Tom Jacobs, *Casual Sex: Men, Women Not So Different After All*; Miller-McCune Friday, February 25, 2011; www.psmag.com/cult

১৪ Marrie: *Casual Sex: equally deserved, notable gender gap*; written on february 23, 2012 in dirty rant; www.dirtyinpublic.com

থেকে সমাজ ও সংস্কারের অবদমন ভেদ করা পাশ্চাত্যের বহু নারী-পুরুষ শুধু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যৌনসঙ্গমে অংশ নিতে থাকে। সম্পর্কহীন যৌনতা পশ্চিমা সমাজে কিছু দিনের মধ্যেই নিয়মিত একটি ব্যাপারে পরিণত হয় বিশেষত অল্পবয়সী তরুণ-তরুণিদের মধ্যে।

মানব সভ্যতায় যৌন-বিধিনিষেধ সার্বজনীন। নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা, সভ্যতার আদিলগ্নে কিংবা তারও আগে থেকে মানব সমাজে যৌনতার ওপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এর পর থেকেই অধিকাংশ মানব সমাজে বিবাহবহির্ভূত যৌনতা অনেক সীমিত হয়ে আসে, বিশেষত নারীদের জন্য। সভ্যসমাজে নারীপুরুষের বিবাহবর্হিভূত যৌনসঙ্গম ঘটত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোমান্টিক সম্পর্ক থেকেই। মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নারীর জন্য শুধু বিনোদনমূলক যৌনতা (casual sex/recreational sex) প্রায় অকল্পনীয় একটি ব্যাপার ছিল। যৌনবিপ্লবের মাধ্যমে গত শতাব্দিতে বিষয়টি ব্যাপকভাবে আবার সভ্য সমাজে ফিরে আসে। ১৯৬২ সালে অবিবাহিত মেয়েদের বিনোদনের জন্য যৌন-আনন্দ উপভোগে উৎসাহিত করতে মার্কিন লেখিকা হেলেন গার্লি ব্রাউন লেখেন Sex and the Single Girl বইটি।[১৫] বইটি নারীদের চির কুমারিত্বের দিকে উৎসাহিত করার জন্য লেখা হয় নি বরং অবিবাহিত পুরুষের মত অবিবাহিত নারীও কিভাবে আনন্দময় বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলন উপভোগ করতে পারে, তার সহজ উপায়গুলো রয়েছে এই বইয়ে। বইটি ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল এজন্য যে এটা দাবী করেছিল মেয়েদের পক্ষে সম্পর্কহীন যৌনতা সহজ, আনন্দময় এবং প্রয়োজনীয়। পশ্চিমা দেশগুলোতেও সে সময়ে বেশিরভাগ নারীপুরুষ ব্যাপারটি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৪০ জন পুরুষ এবং শতকরা ১২ জন নারী বিবাহপূর্ব যৌনতার ব্যাপারটি অনুমোদন করত। ১৯৯৯ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭৯ জন পুরুষ এবং শতকরা ৭৩ জন নারীতে।[১৬] শুধু বিবাহপূর্ব যৌনতাই নয়, একবিংশ শতকে পশ্চিমা সমাজে সম্পর্কহীন যৌনতা অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমান সময়ে প্রাচ্য দেশগুলোতেও নারীদের সম্পর্কহীন যৌনতা বিরল নয়।

কিন্তু ষাটের দশকে এ বিষয়টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রক্ষণশীল এবং গোঁড়া ধার্মিকদের মধ্যে কেউই মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে। রক্ষণশীল সমাজে যৌনতার ওপর অবদমন ও নিয়ন্ত্রণ পুরুষের তুলনায় নারীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি। প্রচলিত যৌন-আচরণ ও যৌনসম্পর্কের বাইরে গেলে সমাজ নারীর ওপর

---

১৫ Helen Gurley Brown: *Sex and the single girl*; Publisher: Avon Books

১৬ Posted by Susan Walsh: The Gender Price Gap in Casual Sex on June 22, 2010 in *Hooking Up Realities, Politics and Feminism, Relationship Strategies*

যতটা আক্রমণাত্মক হয় পুরুষের ক্ষেত্রে ততটা নয়। এ সময় পাশ্চাত্যের কট্টর রক্ষণশীল ও গোঁড়া ধার্মিকদের অনেকেই নারীদের সম্পর্কহীন যৌনতা নিয়ে ঢালাও-ভাবে খুব নেতিবাচক কথা বলতে শুরু করেন। এর মধ্যে আমরা সেগুলোকেই গুরুত্ব দিতে চাই, যেখানে যুক্তির মাধ্যমে এর বিরোধিতা করা হয়েছে। এসব যৌক্তিক বিরোধিতার মধ্যে অনেকগুলোই গবেষণা-নির্ভর। কিন্তু তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই প্রচলিত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সম্পর্কহীন যৌনতা নারীদের জন্য নয় কেন এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে:

ক. প্রথম মত অনুযায়ী, সম্পর্কহীন যৌনতা নারীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার জন্ম দেয়। সঙ্গীর কাছ থেকে আবেগময় অবলম্বন না পেলে তাদের মনে হতে থাকে তারা 'ব্যবহৃত হচ্ছে'। মার্কিন নৃতাত্ত্বিক টাউনসেন্ড তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, নারী যত স্বাধীন এবং মুক্তচিন্তার হোক না কেন এই আবেগ তাদের জন্য সম্পর্কহীন যৌনতা উপভোগ করা অসম্ভব করে তোলে।[১৭] নর্থ ক্যারোলিনার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী গবেষক ক্যাথেরিন গ্রেলো ও তার সঙ্গীদের গবেষণায় উঠে আসে, এমন যৌনসম্পর্কের পর মেয়েদের মধ্যে যে বিষাদময়তা দেখা যায় পুরুষের চেয়ে তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।[১৮]

খ. দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি একটি বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী যৌনসম্পর্ক নারীর সন্তান পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, সে কারণে তার মধ্যে জৈবিক এমন সব বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত হয়েছে যা যৌনসঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উপযোগী। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, নারীর অন্তর্গত জৈবিক প্রবণতা সম্পর্কহীন যৌনতাকে প্রত্যাখ্যান করে।

গ. নারীদের মস্তিষ্কের স্নায়ুবিক রসায়ন সম্পর্কহীন যৌনতার উপযোগী নয়। এই মতের অন্যতম প্রবক্তা যৌনতা বিষয়ক নারী গবেষক হেলেন ফিশার। তার মতে, এমন যৌনতায় পরিতৃপ্তি পাওয়া সম্ভব কেবল যদি তা সঙ্গীর প্রতি আবেগ এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের সূচনা করে। সঙ্গী যতই অপরিচিত হোক, কামনাময় সামান্য যৌন-সংস্পর্শও (যেমন চুমু) তার প্রতি আবেগের সূচনা করে যা সম্ভাব্য দীর্ঘতর সম্পর্কের ভিত্তি। অর্থাৎ তার মতে, প্রতিটি সম্পর্কহীন যৌনতাই একটি নতুন সম্পর্কের জন্ম দেয় বা সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। তাই প্রকৃত অর্থে সম্পর্কহীন কোনো যৌনতার অস্তিত্ব মানবিক সম্পর্কের মধ্যে নেই।[১৯]

---

১৭ John Townsend: mentioned in the article The Emotional Costs of Hooking Up, *The Chronicle Review*, Chronicle of Higher Education. feb. 24, 2011, internet.

১৮ John Townsend: ibid.

সম্পর্কহীন যৌনতা অনেক নারীর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার জন্ম দেয় এটা হয়ত ঠিকই। একইসঙ্গে নারীদের মধ্যে এটা ঘটে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তাই বলে আমরা কি বলতে পারি যে মেয়েদের জৈবিক যৌনতার ধরণ এমন যে তাদের পক্ষে সম্পর্কহীন যৌনতায় আনন্দ পাওয়া বা বিনোদন নেওয়া সম্ভব নয়? উল্লিখিত গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মেয়েদের মধ্যে অনেকের কাছেই সম্পর্কহীন যৌনতা উপভোগ্য ছিল। এই গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সম্পর্কহীন যৌনতা থেকে উদ্ভূত নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার পেছনে সামাজিক কারণগুলো গুরুত্ব পায়নি। যৌন-'যথেচ্ছাচরের' ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোতেও মেয়েদের 'কলঙ্ক' ও সামাজিক ঝুঁকি পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি।[২০] সম্পর্কহীন যৌনতায় মেয়েদের কম আনন্দ পাওয়ার অন্যতম কারণ অপরিচিত যৌনসঙ্গীর কাছ থেকে শারীরিক নিগ্রহের আশঙ্কা।[২১] এ ছাড়া যৌন-হতাশা ও অবসাদের মূল কারণ সামাজিক। কারণ সভ্য সমাজের বাইরে এর অস্তিত্ব বিরল। বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন– ''যৌন-ঘটিত অবসাদ বিষয়টি সূচনা করেছে সভ্যতা। প্রাণিকুলে এটা দেখা যায় না, অসভ্য লোকের মধ্যেও এটা বিরল ঘটনা।''[২২] যৌনতার ওপর সামাজিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে এবং অন্যান্য সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এমন একজন নারীর যৌনজীবনের বাস্তব ঘটনা বিষয়টি বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক হবে। বাংলাদেশের এক নারী লেখক তার আত্মজীবনীমূলক বইয়ে লিখেছেন,

> আমার যদিও বিশ্বাস ছিল পুরুষের সঙ্গে প্রেম এ জীবনে আর করছি না অথবা কোনো পুরুষের সঙ্গে নিজের জীবন আর জড়াচ্ছি না, কিন্তু খানিকটা জড়িয়ে পড়ি আমি, অনেকটা ইচ্ছে করেই পড়ি। ভেবেছিলাম নিজের সংসার নিয়ে, ডাক্তারি নিয়ে, সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে চমৎকার বাকি জীবন কাটিয়ে দেব, পুরুষের কোনও প্রয়োজন আমার জীবনে নেই। কিন্তু ঠিকই আশ্চর্য সুন্দর এক যুবককে দেখে চোখ ফেরাতে পারি না। বার বার চোখ যায় যুবকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ডাগর দুটো চোখ খাড়া নাক, যুবকের গোলাপি ঠোঁট, মিষ্টি হাসিতে। যে তৃষাতুর চোখে পুরুষেরা দেখে কোনও রূপবতী রমণীকে, সে চোখে আমি কায়সারের রূপ দেখি। সুদর্শন যুবকের জন্য আকাঙ্ক্ষা আমার সারা জীবনের।

---

১৯ Helen fisher: *Helen Fisher Explains Why Casual Sex Doesn't Exist*; http://bigthink.com/ideas/18575

২০ Marrie: *Casual Sex: equally deserved, notable gender gap*; written on february 23, 2012 in dirty rant; www.dirtyinpublic.com

২১ Tom Jacobs, *Casual Sex: Men, Women Not So Different After All*; Miller-McCune Friday, February 25, 2011; www.psmag.com/cult

২২ বার্ট্রান্ড রাসেল: *বিবাহ ও নৈতিকতা*: প্রাগুক্ত পৃ: ১৫।

> জীবনে সাধ মেটেনি। সাধ না মেটা হৃদয়টি কায়সারকে কামনা করে। অবশ্য মনে মনে। কিন্তু মনের কথাটি খুব বেশিদিন মনের মধ্যে বসে থাকেনি ...।
>
> কায়সারের বৌ বাচ্চা নিয়ে আমার কোনো অস্বস্তি হয় না যখন সে মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকায় বা আমার একটি হাত সে ছুঁতে চায় নিঃশব্দে। আমি আমার হাত দুটিকে দূরে সরিয়ে রাখি না। যখন ঠোঁট বাড়ায় ঠোঁটের দিকে, খুব সহজেই আমার ঠোঁট কায়সারের ঠোঁটের নাগালে চলে আসে। এটি যত না কায়সারের প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি আমার নিজের প্রয়োজন।...
>
> আমার ছিল শরীরের প্রয়োজন, তার ছিল মনের। কায়সারের শরীর আমাকে দেয় আনন্দ, আমার দ্যুতি তাকে দেয় তৃপ্তি। কায়সারের সঙ্গে আমার কোনো বাঁধন গড়ে ওঠে না। মুক্ত একটি সম্পর্ক আমাদের। যে সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারও নাকগলা নেই। ... সম্পর্কটি কিছুর জন্যই নয় ... সম্পর্কটিতে কোনো ক্ষতি নেই বলে সম্পর্কটি টিকে থাকে। কায়সার এমন যে তাকে না হলেও চলে আবার তাকে না হলেও চলে না।[২৩]

পশ্চিমের নারীদের মধ্যে এ রকম সংস্কারমুক্ত অনেকেই রয়েছেন যারা জানিয়েছেন যে, সম্পর্কহীন যৌনতায় তারা নিয়মিত আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। যৌন-বিজ্ঞানীদের ধারণা, যৌনসঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনতার ক্ষেত্রেই সম্পর্কহীন যৌনতার চেয়ে অধিক শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি দিতে সক্ষম।[২৪] তবে এ কথা ঠিক পুরুষের চেয়ে নারী যৌনসঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক করতে বেশি আগ্রহী। এর পেছনে যৌনতা-সম্পর্কিত, বিবর্তনিক এবং সামাজিক তিন ধরনের কারণই রয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে যৌনতার ওপর সামাজিক বিধি-নিষেধ কমে আসার পর দেখা গেছে, কলেজে পড়ুয়া অল্প বয়সী তরুণ-তরুণীরাই মূলত সম্পর্কহীন যৌনতায় নিয়মিত যুক্ত হচ্ছে।[২৫] পরিণত বয়সে নারী-পুরুষ উভয়েই দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের দিকে বেশি ঝোঁকে।

নারীর দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের দিকে ঝোঁকার যৌনতাসম্পর্কিত কারণ হল, দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক হলেই সঙ্গমে নারীর তৃপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সিমন দ্য বুভোয়ার ভাষায়

> ... পুরুষটি যতই শ্রদ্ধাশীল ও ভদ্র হোক না কেন, প্রথম বিদ্ধকরণ সব সময়েই বলাৎকার। কারণ তরুণী চায় ঠোঁটে ও স্তনে স্পর্শাদর, কিংবা কামনা করে তার

২৩ তসলিমা নাসরিন: 'ক', ইন্টারনেট সংস্করণ, পৃ:২২৮।

২৪ Steven E. Rhoads, Laura Webber, and Diana Van Vleet: The Emotional Costs of Hooking Up, *The Chronicle Review*, Chronicle of Higher Education. Feb. 24, 2011

২৫ The Gender Price Gap in Casual Sex, ibid

জ্ঞাত বা কল্পিত কোনো কামসুখ, কিন্তু যা ঘটে তা হচ্ছে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্ন করে তরুণীকে এবং অনুপ্রবেশ করে সে অঞ্চলে, যেখানে তা কামনা করা হয়নি।[২৬]

পুরুষের ক্ষেত্রেও যারা নিয়মিত যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত নয়, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অনেকটা একই রকম। অর্থাৎ নিয়মিত যৌনসঙ্গমে অভ্যস্ত নয় এমন পুরষকেও হঠাৎ কোনো সম্পর্কহীন যৌনতা গভীর তৃপ্তি দিতে পারে না। কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের ক্ষেত্রে শুধু নিজের চরম পুলক নয়, সঙ্গিনীকে তৃপ্ত করার ব্যাপারটিও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২৭]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি দীর্ঘমেয়াদী যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের মধ্যে সেসব প্রবণতা বেশি পছন্দ করে যাতে সন্তান পালনে পুরুষের সহায়তা বেশি পেতে পারে। 'যৌনবিপ্লবের' সময় দেখা গেছে স্বল্পমেয়াদের এবং সম্পর্কহীন যৌনতার সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীরা অতটা বাছ-বিচার করছে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনের পর যৌনতার সঙ্গে সন্তান ধারণের সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে স্বল্পমেয়াদের এবং সম্পর্কহীন যৌনতার ক্ষেত্রে নারীরা যৌনতাকে হয়ত সন্তানের সঙ্গে ততটা মেলাচ্ছে না। নারীর স্বল্পমেয়াদী এবং সম্পর্কহীন যৌনতা অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হলেও বেশিরভাগ সমাজে তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত। যে সব সমাজে এগুলো গ্রহণযোগ্য সেখানেও এর সঙ্গে অনেক ঝুঁকি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করতে গিয়ে অপরাধ ও নেশার জগতের সঙ্গে জড়িয়ে যায় মেয়েরা। শুধু জৈবিক কারণ নয়, এসব সামাজিক কারণও মেয়েদের সম্পর্কহীন যৌনতার প্রতি নেতিবাচক হতে বাধ্য করে।[২৮]

গত পঞ্চাশ বছর ধরে পাশ্চাত্যে নারীরা অধিক হারে সম্পর্কহীন যৌনতায় অংশ নিচ্ছে। তাদের যৌনজীবনের এই পরিবর্তনের কারণ অবশ্যই জৈবিক নয়। এ সময়ের মধ্যে তাদের শারীরিক বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু সমাজে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে ১. জন্ম নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং ২. যৌনতার উপর সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ শিথিল হওয়া। সমাজের এই দুটি পরিবর্তন মেয়েদের যৌন-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন ও অবাধ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। যৌন-বিপ্লবের মূল চেতনা ছিল, হাজার বছর ধরে পুরুষের চেয়ে নারীর ওপর চেপে থাকা

---

২৬ সিমন দ্য বুভোয়া, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, অনুবাদ: হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ২৩৩।

২৭ Sex Files: " Phantom of Orgasm" (Introduction: Culture and History of Orgasm); www.queendom.com

২৮ Marrie: *Casual Sex: equally deserved, notable gender gap*; written on february 23, 2012 in dirty rant; www.dirtyinpublic.com

অধিক পরিমাণে যৌন-বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। পুরুষেরা যাকে ইচ্ছে তাকে নিয়ে যৌনক্ষুধা মেটাতে পারলে মেয়েরা পারবে না কেন? যৌনতার ক্ষেত্রে নারীদের নিজের ইচ্ছার উন্মেষ ঘটাতে গিয়ে স্বাধীন নারী এমনকি একনিষ্ঠভাবে ধর্ম-পালনকারী অনেক নারীও সম্পর্কহীন যৌনতার প্রতি আগ্রহী হতে থাকেন। যদিও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, নারী ও পুরুষের ওপর সম্পর্কহীন যৌনতার প্রতিক্রিয়া এক নয়।

> মার্কিন নৃতাত্ত্বিক মার্শাল টাউনসেন্ডের গবেষণায় দেখা গেছে:
> সম্পর্কহীন যৌনতা থেকে নারীরা পুরুষের চেয়ে কম আনন্দ পায় এবং বেশি অপরাধবোধের সম্মুখীন হয়।
>
> ৬৩% পুরুষ এবং ২৮% নারী সম্পর্কহীন যৌনতাকে ইতিবাচক মনে করে।
>
> ২৫% পুরুষ নিয়মিতভাবে সম্পর্কহীন যৌনতাকে উপভোগ করেন, নারীদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ২%।[২৯]

নৃতাত্ত্বিক রোয়াড এর ব্যাখ্যা হল, এই পার্থক্যের পেছনে রয়েছে নারী ও পুরুষের যৌনতার জৈবিক পার্থক্য, যার মূল উৎস তাদের বিবর্তনিক অতীত। অর্থ্যাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পর্কহীন যৌনতার প্রতি নারীর আগ্রহ কমিয়ে আবেগপূর্ণ যৌনতা এবং যৌনতাভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু ওই গবেষণার উপাত্তের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি, বেশিরভাগ পুরুষেরাও সম্পর্কহীন যৌনতাকে যথেষ্ট পরিমাণে পছন্দ করছেন না। সম্পর্কভিত্তিক যৌনতার প্রতি নারী-পুরুষ উভয়েরই আগ্রহ বেশি। 'সভ্য' সমাজে যৌনসঙ্গীর প্রতি নারী-পুরুষের মনোভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। এ কারণেও নারীরা সম্পর্কহীন যৌনতায় অংশ নিতে পুরুষের চেয়ে কম অগ্রহী হয়। সে বিষয়টিও এখানে বিবেচনায় রাখা হয়নি।

''যে নারী ইতিমধ্যেই (আমার কাছে) সমর্পিত হয়েছে তার সঙ্গে শয্যায় যাওয়ার ব্যাপারটাকে মনে হয়, এমন একটি কম্পিউটারে গেম খেলার মত, যেটি তুমি ইতোমধ্যেই জিতে গেছ।''[৩০] এটিই সম্পর্কহীন যৌনতায় নারীসঙ্গীদের প্রতি বেশিরভাগ পুরুষের মনোভঙ্গি যা শুধু জৈবিক প্রবণতা-প্রসূত নয় সামাজিক মনোভাব দ্বারাও প্রভাবিত। উল্লিখিত গবেষণার পর্যালোচনায় এমন কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, নারীরা সম্পর্কহীন যৌনতা উপভোগ করতে পারেন না। সম্পর্কহীন

---

২৯ John Townsend: ibid

৩০ Steven E. Rhoads, Laura Webber, and Diana Van Vleet: The Emotional Costs of Hooking Up, *The Chronicle Review*, Chronicle of Higher Education, Thursday, February 24, 2011, www. http://chronicle.com

যৌনতাকে পছন্দ না করা এবং উপভোগ করতে না পারা এক কথা নয়। যে দীর্ঘমেয়াদী যৌনসম্পর্ক বেশি পছন্দ করে সে সম্পর্কহীন যৌনতা উপভোগ করতে পারে না এ কথা মোটেও ঠিক নয়। আবেগপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এমন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমই নারীর জন্য বেশি কাম্য হলেও একথা মোটেও ঠিক নয় যে, তারা সম্পর্কহীন যৌনতা উপভোগ করতে পারেন না। শারীর-মানসের বিশেষ অবস্থায় সম্পর্কহীন যৌনতা নারীর কাছে বেশ উপভোগ্যও হতে পারে। যেমন, অনেক দিন যখন কেউ যৌন-আকাঙ্ক্ষা মেটানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সঙ্গী হিসেবে পছন্দ নয় এমন ব্যক্তির সঙ্গেও যৌনসঙ্গম উপভোগ্য হতে পারে। নিজের যৌন-জীবন সম্পর্কে খোলাখুলি প্রকাশ করা সেই নারী লেখক লিখেছেন—

> ধুমধাম করে নাইম একটি বিয়ে করেছে।... দেখে শুনে বুঝে সুঝে সে বিয়েটি করেছে। পতিব্রতা স্ত্রী হওয়ার গুণ যে মেয়ের মধ্যে আছে তেমন মেয়েকেই ঘরে এনেছে। ... এমন মেয়ে বিয়ে করেও নাইম আমার বাড়িতে আসে। আমার শরীরের দিকে সে ঝুঁকে থাকে। আমি বাধা দিই না শরীরের সম্পর্কে। দীর্ঘদিনের পুরুষস্পর্শহীন শরীরটি নাইমের স্পর্শে কেমন তির তির করে কেঁপে ওঠে।
>
> দীর্ঘদিন নিজের অবদমিত ইচ্ছেগুলো মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। দীর্ঘদিন অন্যের ইচ্ছের সঙ্গে আপোশ করে নিজের ভেতর একটি ইচ্ছের জন্ম হয়। ইচ্ছেটা অমারই ইচ্ছে, অন্য কারও নয়। ইচ্ছেটাকে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি। ইচ্ছেটার হাত ধরে বসে থাকি মুখোমুখি, নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলি, এ শরীর আমার, শরীর সম্পর্কিত যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বও আমার। শরীরের ক্ষুধাতৃঞ্চা মেটাবার অন্য কোনও উপায় যদি আমার জানা থাকত, তবে নাইমের সঙ্গে মাসে একবার দুবার যে সম্পর্কটি হয় তা হত না।[৩১]

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষত ৩০/৩৫ বছরের পর থেকে নারীদের যৌন-আকাঙ্ক্ষা, যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও যৌনচিন্তা ইত্যাদি বেড়ে যায়।[৩২] এই ধরনের পরিবর্তনের বিবর্তনিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ডিম্বানুর সংখ্যা তথা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা কমে আসতে থাকে। অতএব এ সময়ে যে সব নারীর যৌন-আকাঙ্ক্ষা বেশি ছিল তাদের সন্তানেরা বেশি সংখ্যায় পরবর্তী প্রজন্মসমূহে টিকে থাকতে পেরেছে। পয়ত্রিশোর্ধ্ব নারী যাদের সঙ্গী বা স্বামী নেই তাদের অনেকেই এই নতুন উচ্চতার যৌন-আকাঙ্ক্ষার মোকাবেলা করছে সম্পর্কহীন স্বতঃস্ফূর্ত যৌনতার মাধ্যমে। বাৎসায়নের

---

৩১ তসলিমা নাসরিন: প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৫।

৩২ John Cloud: *The Science of Cougar Sex: Why Older Women Lust*. *Time Magazine*, Friday July 09, 2010

কামশাস্ত্রেও তিরিশোর্ধ নারীদের বলা হয়েছে 'প্রগলভা'। পশ্চিমা দেশের অনেক নারী স্বল্প মেয়াদী এবং আবেগময় সম্পর্কছাড়া যৌনসঙ্গী খুঁজতে প্রাচ্যের দেশগুলোতে আসেন। এসব নারীদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবয়সী।[৩৩]

প্রাইমেটদের যৌনতার তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, মানুষের বাহ্যিক যৌন-অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রাইমেটদের তুলনায় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে (স্তনের আকৃতি, শিশ্নের আকৃতি, অণ্ডকোষের আকৃতি, নারী-পুরুষের তুলনামূলক দেহাকৃতি ইত্যাদি) যা পারস্পরিক যৌন-আকর্ষণ এবং যৌনপুলকের তীব্রতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। নর-নারীর দীর্ঘমেয়াদী যৌনসম্পর্ক গড়ে তোলার অনুকূলেই বিবর্তনের মাধ্যমে এসব পরিবর্তন হয়েছিল। এ কারণেই বেশির-ভাগ নারী ও পুরুষ দীর্ঘমেয়াদী যৌনসম্পর্ক পছন্দ করে। মার্গারেট মিড এবং আরও কয়েকজন নৃতাত্ত্বিক আদিবাসীদের ওপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন, যে সব সমাজে যৌন-বিধিনিষেধ কম সেখানে যৌন-জীবনের শুরুতে তরুণ-তরুণিরা ব্যাপক হারে সম্পর্কহীন যৌনতায় অংশ নেয়। ধীরে ধীরে তারা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং পূর্ণবয়স্ক জীবনে অধিকাংশ নারী-পুরুষই দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বেছে নেয়। পশ্চিমা দেশগুলোতেও যৌন-বিধিনিষেধ কমে যাবার পর থেকে একই রকম চিত্র আমরা দেখতে পাই। মিড আরও লক্ষ্য করেন, আদিবাসী যে সব সমাজে যৌন-বিধিনিষেধ কম, সেখানে বয়ঃসন্ধিতে যৌনতার এই পর্বটি নিয়ে জটিলতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়।[৩৪]

'যৌনতা নারীর জন্য নয়', যে নারীর যৌন-আকাঙ্ক্ষা বেশি সে 'বিকৃত' এ ভ্রান্ত ধারণাগুলো অনেক পুরানো– ''শেক্সপিয়ারের মতে, আদর্শ নারী তাকেই বলব যে স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা দেয় কর্তব্য হিসেবে। ... কারণ যৌনতা জিনিসটা তার কাছে খুব মজার ব্যাপার নয়, তবু যে তাকে যৌন-কর্মে লিপ্ত হতে হয় সেটা নৈতিক আদেশ মান্য করার জন্য।''[৩৫]

বর্তমান যুগেও পশ্চিমা দেশগুলোতে মেয়েদের অধিক হারে সম্পর্কহীন যৌনতায় অংশ নিতে দেখে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত রক্ষণশীল অনেক ব্যক্তিও বলতে থাকেন – 'সম্পর্কহীন যৌনতা নারীদের প্রকৃতিবিরোধী' কিংবা 'স্বাভাবিক' নারীরা এ ধরনের যৌনতা উপভোগ করে না'। উল্লিখিত গবেষণাগুলোতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এক ধরণের জৈবনির্ধারণবাদী বিচ্যুতি। নারীর

৩৩ THE OTTAWA CITIZEN: *Sex tourism: When women do it, it's called 'romance travelling*, JANUARY 27, 2007, www.canada.com

৩৪ Margaret Mead: *Coming of Age in Samoa*; William Morrow and Company, Newyork, 1928 pp-59-83.

৩৫ বার্ট্রান্ড রাসেল: *বিবাহ ও নৈতিকতা*: প্রাগুক্ত পৃ:১৪।

যৌনতা সম্পর্কে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পক্ষপাত থেকেই যার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

একক ব্যক্তিসত্তার প্রতি গভীর আকর্ষণ ও অন্তরঙ্গতার অনুভব: রোমান্টিক প্রেম

> যৌনতা হচ্ছে আমাদের প্রজাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিবর্তনের অবদান। আর প্রেম বাণিজ্য করে হোমো সেপিয়ান্সদের সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তাকে (individuality) স্বীকৃতি দেওয়া এবং সম্মান করার (ক্ষমতার) উপর ভিত্তি করে। প্রজাতি হিসেবে আমরা সাধারণত আমাদের সময় ও চিন্তার বড় অংশ বিনিয়োগ করে থাকি পারিবারিক সম্পর্কগুলোতে।[৩৬]
>
> ম্যালকম পট ও রজার শর্ট
>
> Ever Since Adam and Eve

> জৈবিক দিক থেকে নর-নারীর জন্য জোড় বাঁধা অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু প্রেম, বিয়ে, সন্তান ইত্যাদির রোমান্টিক বৃত্তান্ত ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে মোটেও একরকমভাবে চিত্তনিষ্ঠ হয় না। এটা এমন এক বৃত্তান্ত হয়ে ওঠে যা নাজুকতা, নিষ্ক্রিয়তা, প্রতিপালন ইত্যাদি (প্রচলিত অর্থে) নারীসুলভ সদগুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যদি নারীবাদকে প্রেমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মনে করা হয়, এধরনের প্রেম খোদ নারীবাদের জন্যেই হুমকি স্বরূপ।[৩৭]
>
> লিবি ব্রুক্স
>
> The Guardian November 15, 2007

মমতাজ মহল শাহজাহানের প্রথম বা একমাত্র স্ত্রী ছিলেন না। তবে তিনি যে তার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন তা প্রশ্নাতীত। সম্রাট হিসেবে শাহজাহানের ভোগের জন্য ছিল হারেম ভরা অল্প বয়সী নর্তকী, সঙ্গীতে পারদর্শী বাইজী, কামকলায় দক্ষ উপ-পত্নী, কিন্তু তিনি সব সময় ফিরে গেছেন আয়ত নয়না মমতাজের কাছে। উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে মমতাজ তাকে চৌদ্দটি সন্তান উপহার দেন। তার মৃত্যুর পর মমতাজের স্মরণে তাজমহল নির্মাণই শুধু নয়, জীবনের বাকি পয়ত্রিশ বছর সম্রাট প্রায় একাকী কাটিয়ে দেন।[৩৮] হোমো সেপিয়ান্স (মানব) প্রজাতির উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি, মানস ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার কারণেই একজন ব্যক্তিসত্তার প্রতি মানুষের এই

৩৬ Malcolm Potts and Roger Short: ibid pp – 103

৩৭ Libby Brooks: *The Guardian*, November 15, 2007 quoted in Katherine Cox: *Romantic love and feminism: an im-possible match*?; October, 14, 2009; www.examiner.com

গভীর আবেগময় ও নিবেদিতপ্রাণ অনুভব ও অনুরাগ তৈরি হতে পারে। এই গভীর অনুভব ও অনুরাগই প্রেম। যা সাধারণত মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। প্রাণিজগতে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে এ মাত্রার মনোদৈহিক সম্পর্ক বিরল। সম্রাট শাহজাহানের প্রেম একক ব্যক্তিসত্তার প্রতি মানবিক আকর্ষণ ও আবেগের চরম নিদর্শন হলেও বেশিরভাগ মানবিক প্রেমের উৎপত্তি বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে হয় না।

ভ্যালেন্টাইনস ডে বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস অর্থাৎ রোমান্টিক প্রেমের দিন নিয়ে আজকাল বেশ মাতামাতি হয়, বিশেষত শহরের তরুণ-তরুণিদের মধ্যে। সন্দেহ নেই এই মাতামাতির পেছনে বাণিজ্যিকীকরণের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, 'ভালোবাসা দিবস' জনপ্রিয় হবার পেছনে আসল যে কারণ রয়েছে তা হল সকল বয়সের মানুষের মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের ব্যাপকতা। এখনও নাটক ও চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, গান ও কবিতার মূল উপজীব্য হচ্ছে রোমান্টিক প্রেম। তরুণ-তরুণিদের স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন জুড়ে থাকে রোমান্টিক সম্পর্ক এবং তার অনুষঙ্গ। রোমান্টিক প্রেম নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ইতিবাচক ও জীবনমুখী উদ্দীপনা যোগায় যা হতে পারে তার আশাবাদী জীবন যাপনের দীর্ঘমেয়াদী অনুপ্রেরণা। সিনেমা নাটকে যে প্রেমের মহিমা দেখানো হয় তাতে সত্যিকারের বাস্তবতার প্রতিফলন খুব সামান্যই থাকে। তবে সত্যিকারের প্রেমের জন্য অনেক বড় ত্যাগ খুব বিরল কোনো ঘটনা নয়। মিথ ও কিংবদন্তীতে বহু প্রেমের কাহিনী আছে। লাইলী-মজনু, চণ্ডীদাস ও রজকিনী, রাধা-কৃষ্ণ এমন অনেক প্রচলিত কাহিনী নরনারীর প্রেমকে মহিমান্বিত করেছে।

চলচিত্র ও কাহিনীর এসব চরিত্র দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রেম সার্বজনীন এবং চিরন্তন একটি বিষয়। যাতে নারী-পুরুষ সবাই সহজাত প্রেরণা দ্বারা তাড়িত হয়ে একই উদ্দেশ্য নিয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং অনেক কিছুই ত্যাগ করে। প্রেমের পেছনে নর-নারীর জৈবিক আকর্ষণের ব্যাপারটি মুখ্য একটি বিষয়, কিন্তু প্রেম সেই অর্থে সহজাত বা চিরন্তন নয়। সর্বকালে সকল মানুষের জন্য প্রেম এক নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে সমাজবাস্তবতা এবং সামাজিক সম্পর্কের অনুষঙ্গ প্রেমের স্বরূপ নির্ধারণ করে। লিঙ্গবৈষম্যসহ সকল ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব প্রেমকে প্রভাবিত করে, দমন করে, বিকৃত করে, কলুষিত করে। যেহেতু সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কগুলো পরিবর্তনশীল, তাই নর-নারীর প্রেমের স্বরূপও স্থির থাকে না। সমাজে নারী-পুরুষের ভিন্ন অবস্থান এবং জৈবিক পার্থক্যের কারণে প্রেমের অর্থ নারী ও পুরুষের কাছে ভিন্নভাবে দেখা দেয়। এক্ষেত্রে জৈবিক পার্থক্য কতটা এবং সমাজের প্রভাব কতটা ভূমিকা রাখে সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, অনেক প্রচলিত ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারবো।

---

৩৮ Malcolm Potts and Roger Short: ibid; p-91.

প্রেম শব্দটি দিয়ে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে কয়েকটি উপাদান রয়েছে–ভালোলাগা, আকর্ষণ ও কামনা (মিলিত হবার ইচ্ছে), অন্তরঙ্গতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে এর বাইরে রয়েছে মনন, ফ্যান্টাসি, ভাব ও অনুভূতির বিনিময় ইত্যাদি। বিষমকামী কিংবা সমকামী যৌনসম্পর্কের মধ্যে প্রেম, নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির (individual) প্রতি তীব্র আবেগময় বন্ধন তৈরি করে। এ ধরনের গভীর অন্তরঙ্গ দীর্ঘমেয়াদী যৌনসম্পর্ক প্রাণিকুলে মানুষ ছাড়া কিছু পক্ষী জাতীয় প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু পাখিদের এই বন্ধনও তেমন রোমান্টিক নয়। যে সব পাখি প্রায় সারা জীবন একই সঙ্গীর সাথে কাটায় তাদের বেশির ভাগের প্রজননের ভার অনেক বেশি থাকে। [প্রজননের জন্য তাদের দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়া, এলাকা (territory) দখল, নীড় তৈরি, ডিমে তা দেওয়া, বাচ্চা বড় করা ইত্যাদি অনেক কাজ করতে হয়] এই ভার মিটিয়ে নতুন সঙ্গী জোগাড় করার মতো অতিরিক্ত সময় বা শক্তি যাদের থাকে না তারাই অনড় ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের মধ্যে যায়। প্রাইমেটদের মধ্যেও দীর্ঘমেয়াদী ও গভীর সম্পর্কগুলো প্রজননের ভারের সঙ্গে সমানুপাতিক। অতএব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে গভীর, অন্তরঙ্গ ও আনন্দময় এই যৌনসম্পর্কের উদ্ভবের পেছনে প্রজননের ভার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু মানুষের রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে মনন, কল্পনা ও ফ্যান্টাসির ভূমিকা দেখে মনে হয় অনন্য কিছু জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া এই মাত্রার সম্পর্ক দুটি সত্তার মধ্যে গড়ে উঠতে পারতো না।

প্রাইমেটদের মধ্যে মানুষের স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে গভীর যৌন-আকর্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদী যৌনসম্পর্ক গড়ে ওঠার অনুকূলে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল তার অনেকটাই আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। রোমান্টিক প্রেম গড়ে ওঠার পেছেনে আরও যে সব বৈশিষ্ট্য জরুরি ছিল সেগুলো হচ্ছে–উন্নত মস্তিষ্ক, উন্নত চিন্তা করা এবং ভাব ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার অনন্য ক্ষমতা। মানুষের মুখমণ্ডলে যে ভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় তা প্রাণীকুলে অনন্য। এটি এবং ভাষা মানুষকে দিয়েছে ভাব প্রকাশের অতি উন্নত ক্ষমতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে যৌনসঙ্গীর সঙ্গে একান্ত ও অন্তরঙ্গ মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব। এই সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদী হলে নির্দিষ্ট একজন সঙ্গীর প্রতি গভীর আবেগ তৈরি হবার বাস্তবতা থেকে রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে উঠতো। তবে যে সময় যৌনতা ও যৌনসম্পর্কের উপর সমাজের বিধিনিষেধ কম ছিল সে সময় নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির প্রতি এরকম তীব্র আবেগ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল অনেক কম।

ব্যক্তি-মালিকানা ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তি হওয়ার পর যৌনতার উপর সমাজের বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং পছন্দের মানুষকে পাওয়া কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে বলেই এ ধরনের তীব্র আবেগ সৃষ্টি হবার বাস্তবতা গড়ে ওঠে। ‘‘এই

প্রেম, ভালোবাসার পাত্রীকে দুরূহ এবং মহামূল্যবান গণ্য করে। ... যদি কোন লোক নারীকে লাভ করা দুরূহ মনে না করে তাহলে সেক্ষেত্রে রোমান্সধর্মী প্রেম জাগ্রত হয় না। মধ্য যুগে দেখা গেছে, যে রমনীর সঙ্গে প্রেমিক যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন (সম্পর্ক বৈধ হোক কি অবৈধ) তার প্রতি এধরনের প্রেম জাগতো না। সেই ধরনের রমণীর প্রতিই এ ধরনের প্রেম জাগতো ... যাকে পাওয়া সহজ ছিল না।''[৩৯] অর্থাৎ মানুষের মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের উদ্ভবকে এক অর্থে আমরা বলতে পারি যৌন-বিধিনিষেধের একটি ইতিবাচক পরিণতি। নরনারীর যত রকম সম্পর্ক আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মানবিক এবং কাব্যিক সম্পর্ক হল রোমান্টিক প্রেম। ''রোমান্টিক প্রেমই শুধু তীব্র-মধুর আনন্দের অফুরন্ত উৎস হতে পারে। নর নারীর প্রেমের মধ্যে যে প্রবল আসক্তি, কল্পনা শক্তি এবং মধুর অনুকম্পা কাজ করে তার মূল্য সহজে পরিমাপ করা যাবে না; আর এই ব্যাপারটা সম্পর্কে যিনি অবহিত নন তিনি যে একজন মন্দ ভাগ্য ব্যক্তি সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।''[৪০] বার্ট্রান্ড রাসেলের বর্ণনায় উদ্ভাসিত প্রেমের এই মহিমা সত্য ও মূর্ত হতে পারে যদি নারী ও পুরুষ তাদের স্বাধীন সত্তা নিয়ে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে। যেখানে পিতৃতন্ত্র, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও লিঙ্গবৈষম্য তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্পণকে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত বা বিকৃত করতে পারে না।

যেহেতু প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি নীতি সংস্কার লিঙ্গ বৈষম্যকে লালন করে বা প্রশ্রয় দেয়, এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এ সমাজে রোমান্টিক প্রেমের প্রভাব নারী ও পুরুষের উপর একইরকম হবে। হলিউড, বলিউড, কলকাতা কিংবা ঢাকার ছবি হোক মূল ধারার সকল চলচ্চিত্রে প্রেমের একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ আছে। রাগি রাগি একটি মেয়ে (নায়িকা) প্রথমে ছেলেটিকে পাত্তা দিতে চায় না, ছেলেটি নানাভাবে মেয়েটিকে পটাতে চেষ্টা করে অবশেষে মহত্ত্ব বা বীরত্ব দিয়ে তাকে 'ঘায়েল' করে। একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখবো এই 'ঘায়েল' হওয়া মেয়েটি ছেলেটির কাছে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করে যেভাবে পুরুষতান্ত্রিক পরিবারে একজন নারী তার স্বামীর 'পদতলে' নিজেকে নিবেদন করে। পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন নারী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বাধীন সত্তা নিয়ে প্রেমিককে ভালোবাসতে পারে না। অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক পুরুষটি চায় প্রেমিকাকে অধিকার করতে। এসম্পর্কে নিটশের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন সিমন দ্য বুভোয়া—

> প্রেম শব্দটি প্রকৃত পক্ষে পুরুষ ও নারীর কাছে বোঝায় দুটি ভিন্ন জিনিস। নারী প্রেম বলতে যা বোঝে, তা খুবই স্পষ্ট: এটা শুধু গভীর অনুরক্তি নয়, এটা দেহ

---

৩৯ বার্ট্রান্ড রাসেল: *বিবাহ ও নৈতিকতা*: প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬।

৪০ বার্ট্রান্ড রাসেল: *বিবাহ ও নৈতিকতা*: প্রাগুক্ত পৃ:২৬।

> ও আত্মার এক সামগ্রিক দান। পুরুষের কথা বলতে গেলে, সে কোনো নারীকে ভালোবাসলে সে যা চায় তা হচ্ছে নারীটির প্রেম।

প্রেমে নারী নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলেও পুরুষ তা করে না।

> তীব্রতম আবেগে আত্মহারা অবস্থায়ও তারা (পুরুষ) সম্পূর্ণরূপে অধিকার ত্যাগ করে না এমন কি দয়িতার সামনে নতজানু অবস্থায়ও তারা যা চায় তা হচ্ছে দয়িতাকে দখল করতে।[৪১]

পুরুষের এই দখল করার মানসিকতাকে কেউ কেউ পুরুষের জৈবিক বা সহজাত প্রবণতা বলে মনে করে থাকেন। কারণ প্রাইমেটদের কিছু কিছু প্রজাতির মধ্যে স্ত্রী প্রাণীরা এস্ট্রাসের সময় পুরুষ প্রাণীর দ্বারা বেশি বেশি আগ্রাসনের শিকার হয়।[৪২] কিন্তু প্রাইমেটদের আগ্রাসনের সঙ্গে এই তুলনা নিতান্তই সরলীকরণ। কারণ পুরুষ ম্যাকক বা রেসাস বানর যে আগ্রাসন বা দখলের চেষ্টা করে তা কেবল সাময়িক যৌনমিলনের জন্য। অপর দিকে মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষের দখল করার মানসিকতার উৎস পুরুষ-তান্ত্রিক। পিতৃতন্ত্র, পুরুষের জন্যে সঙ্গী নির্বাচন করে দীর্ঘমেয়াদী যৌনসঙ্গী ও সেবিকা হিসেবে। এই দখলের পেছনেও উদ্দেশ্য থাকে সেরকমই। অন্যান্য প্রাইমেটদের স্ত্রী প্রাণীরাও (আফ্রিকার সাভানার স্ত্রী-বেবুন) অন্যান্য পুরুষের 'আগ্রাসন' থেকে বাঁচার জন্যে নির্দিষ্ট একজন পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলে।[৪৩]

সামাজিক বিধিনিষেধের বাধা অতিক্রম করেই রোমান্টিক ভালোবাসার দ্বার-প্রান্তে যেতে হয়। যে সব পাত্র-পাত্রী নিজেরা পরস্পরকে পছন্দ করেছিল তাদের বিয়ে দিতে গিয়ে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। গত পঞ্চাশ/ ষাট বছর ধরে পশ্চিমা দেশগুলোতে এই বিধিনিষেধ অনেকটা কমে গেলেও আমাদের মতো পশ্চাৎপদ সমাজগুলোতে এখনও এসব অনেকাংশেই রয়ে গেছে। যেহেতু সামাজিক বিধিনিষেধের মাত্রা নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমান নয়, রোমান্টিক প্রেমের বাস্তবতাও তাদের ক্ষেত্রে এক রকম নয়। কবি বায়রন বলেছিলেন – ''পুরুষ এবং তার প্রেম

---

৪১ সিমোন দ্য বুভোয়া: প্রাগুক্ত, পৃ:৩৫৬।

৪২ BARBARA B. SMUTS: Male aggression Sexual Coercion of Females in Nonhuman Primates and Other Mammals: Evidence and Theoretical Implications; *Advances in the Study of Behavior*. Volume: 22. Contributors: Peter J. B. Slater editor, Jay S. Rosenblatt, editor, Charles T. Snowdon, Manfred Milinski. Publisher: Academic Press. Place of Publication: New York. Publication Year: 1993. Page Number: iii.

৪৩ Saayman, G. S., 1970, The menstrual cycle and sexual behaviour in a troop of free ranging chacma baboons (Papioursinus), Folia Primatol. 12:81 –110

পৃথক দুটি ব্যাপার। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে প্রেম তার সমগ্র অস্তিত্ব।''[৪৪] কবির এই অনুমান সব নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিংবা সার্বজনীন কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে রোমান্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বাস্তবতা এবং চাওয়া পাওয়া এক নয়। মানবিক রোমান্টিক সম্পর্ক শুধু জৈবনিক প্রক্রিয়াসৃষ্ট নয়। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সর্বত্র এক রকম অবস্থায় নেই। এর পাশাপাশি রোমান্টিক সম্পর্কও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে। এখানেও রয়েছে লিঙ্গ বিভেদ। মানুষের সমাজে রোমান্টিক-প্রেম, কঠোর যৌন-বিধিনিষেধ থেকে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে প্রশমিত করে। প্রতিটি সমাজেই পুরুষের তুলনায় নারীদের উপর যৌন-বিধিনিষেধ অনেক বেশি কঠোর। তাই এ সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক সংকটও তাদের মধ্যে তীব্রতর। যে সম্পর্ক (প্রেম) তাদের এই সংকট থেকে মুক্তি দেয়, তার আগমনে তারা (নারী) পুরুষের চেয়ে বেশি আপ্লুত হবেন এটাই তো স্বাভাবিক। কবি বায়রনের সময়ে সমাজে নারীদের উপর যৌন-বিধিনিষেধ ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। পছন্দমতো যৌনসঙ্গী নির্বাচনের সুযোগ ও স্বাধীনতাও ছিল অনেক কম। অতএব প্রেম সে সময়ে নারীর জীবনে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে আসতো। একশো বছরের বেশি সময় পরে এখনও আমাদের দেশের মেয়েদের ওপর এরকম অনেক বিধিনিষেধ চেপে আছে যা পুরুষের উপর নেই। অতএব, লর্ড বায়রনের পর্যবেক্ষণ যথার্থ, প্রেমে নারীই বেশি আপ্লুত হয়। এর মূল কারণ জৈবিক নয়, সামাজিক। এ ধারণা আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত যে নারীরা জৈবিকভাবেই বেশি আবেগপ্রবণ, অতএব প্রেমের ক্ষেত্রে তাদের বেশি আপ্লুত হবার কারণ জৈবিক। প্রকৃত পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষতন্ত্রের প্রভাব 'প্রেমের মধ্যকার প্রবল আসক্তি, কল্পনাশক্তি এবং মধুর অনুকম্পা'কে নিঃশেষ করে এবং পুরুষের রোমান্সকে বিকৃত করে সঙ্গিনীর প্রতি আধিপত্য ও দখলদারিত্বের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। সিমোন দ্য বুভেয়ার ভাষায়—''সত্য হচ্ছে এখানে প্রকৃতির বিধানের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই। প্রেম সম্পর্কে পুরুষ ও নারীর ধারণার মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায় তাতে প্রতিফলিত হয় তাদের পরিস্থিতির ভিন্নতা।''[৪৫]

আধুনিক মানুষের জীবনে রোমান্টিক প্রেমের মতো গভীর ও মধুর সম্পর্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ ধরনের সম্পর্ক মূলত দুটি চমৎকার ও জীবনীশক্তি-উদ্দীপক উপহার আমাদের দিয়ে থাকে—ক) গভীর তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দময় যৌনসঙ্গম খ) একজন মানুষের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতার বন্ধন। আধুনিক জীবনের জটিলতা, অনিশ্চয়তা

৪৪ সিমোন দ্য বুভোয়া: প্রাগুক্ত,পৃ-৩৫৬

৪৫ সিমোন দ্য বুভোয়া: প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৪

ইত্যাদির অপরিহার্য পরিণতি হল অবসাদ ও হতাশা। রোমান্টিক প্রেমের এই উপহার আমাদেরকে অবসাদ ও হতাশা কাটাতে সহায়তা করে। এই মাত্রার রোমান্টিক প্রেম প্রাণী জগতে তুলনাহীন। রোমান্টিক প্রেম গড়ে ওঠার মতো জৈবিক বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে বিবর্তিত (প্রাকৃতিক নির্বাচন) হয়েছিল কারণ এটি (রোমান্টিক প্রেম) বেঁচে থাকার সংগ্রামে সমাজবদ্ধ মানুষের টিকে থাকার অন্যতম একটি কৌশল (survival technique)। কিন্তু সমাজের একপেশে যৌন-বিধিনিষেধ, ধর্ম এবং পুরুষতন্ত্রের নিগড় নর-নারীর স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ককে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিশেষ করে নারীদের যৌন-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে যৌনসঙ্গী বেছে নেওয়ার উপর আরোপ করা হয় অনেকরকম বিধিনিষেধ। সভ্যতার এই আরোপ মানব প্রজাতির জন্য এক অমানবিক অধ্যায়ের সূচনা করে। নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অনেক প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অবদমন। যার সবচেয়ে নির্মম শিকার হয়েছে নারীরা।

এখনও পৃথিবীতে কোটি কোটি নর-নারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যৌন-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ করতে এবং নিজের পছন্দমতো যৌন-সঙ্গী বেছে নিতে পারে না। পশ্চাৎপদ সমাজগুলোতে অধিকাংশ নারীদের পছন্দমতো যৌন-সঙ্গী বেছে নেবার অধিকার নেই। নারীর উপর যে সব অমানবিকতা ও নিপীড়ন ঘটে তার অন্যতম কারণও এই ব্যাপারটি। নিজের পছন্দমতো সঙ্গীকে বেছে নেওয়া এবং যৌনসঙ্গীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে নারীরা বঞ্চিত হলে পুরো সমাজই মানবিক সম্পর্কের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। নিপীড়ন ও বৈষম্যমুক্ত মানবিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সমাজে এমন অবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে নারী ও পুরুষ তাদের স্বাধীন সত্তা নিয়ে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে।

ভিনজাতের দুটি প্রাণীর অন্তরঙ্গ একত্রবাস (বিয়ে)

> একই ব্যক্তি, মানে এক পুরুষের অধিকারে প্রচুর সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এবং অপর কাউকে নয়, কেবল মাত্র সে পুরুষের নিজের সন্তান-সন্ততিকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে যাবার ইচ্ছে থেকেই এই একপতত্নী প্রথা আসে। এইজন্য নারীর পক্ষেই এক পতিত্ব বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়।[৪৬]
>
> ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস
>
> The Origin of the Family, 1884

৪৬ ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস: *পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি*: কার্লমার্ক্স ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রচনা সংকলন (দুই খন্ডে সম্পূর্ণ); প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পৃ: ২৩০-২৩১।

> বিয়ের ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তি মানুষকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়... দোষী সংস্থাটি নিজেই, যা শুরু থেকেই বিকৃত। একজন পুরুষ ও একজন নারী, যারা হয়তো পরস্পরকে পছন্দ করে বেছে নেয় নি, যারা পরস্পরকে জীবনভর সব রকমে তৃপ্ত করার জন্য দায়িত্ববদ্ধ, এ ধারণা পোষণ ও ঘোষণা একটা পৈচাশিকতা, যা অবধারিতভাবে জন্ম দেয় ভাড়ামো, মিথ্যাচার, শত্রুতা ও সুখহীনতার।[৪৭]
>
> সিমন দ্য বুভোয়া
>
> The Second Sex

> বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি তৈরী করে কিছু পরজীবী নারী, যারা (হয়ে ওঠে) চরমভাবে পরনির্ভরশীল। এটা নারীকে করে তোলে জীবন সংগ্রামে অযোগ্য, ধ্বংস করে তার সমাজ সচেতনতাকে, পঙ্গু করে দেয় তার কল্পনাশক্তিকে। অতঃপর তার উপর চাপিয়ে দেয় সদয় সুরক্ষা। প্রকৃত পক্ষে এটা এক ধরণের ফাঁদ যা মানব-চরিত্রকে উপস্থাপন করে বিকৃতরূপে।[৪৮]
>
> এমা গোল্ডম্যান
>
> Marriage and Love

জৈববিবর্তন মানুষের যৌনতাকে অনেকটা পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে যাতে এটা তার দীর্ঘমেয়াদী পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মানুষের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি জৈবিকভাবে নয় বরং সমাজ ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। বিয়ে নামের প্রতিষ্ঠানটি মানুষের সংস্কৃতির একটি অনন্য আবিষ্কার যা মানব সমাজে সার্বজনীন ও জনপ্রিয়। যদিও পরিবার ও বিয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির উপলব্ধি ও মূল্যায়ন বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী। এগুলোর কোনোটিই পুরোপুরি নিখুঁত বা গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ প্রজনন ও যৌনতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের চাওয়া পাওয়ার হিসেব-নিকেশ এক নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই সংঘর্ষময়। যৌনতাই বিয়ের মতো শক্ত সামাজিক বন্ধনের মধ্যে 'দুটি ভিন্ন জাতের জীবকে' (নারী ও পুরুষ) একত্র করে এবং একত্র রাখে। কিন্তু এই সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সংঘাতের কারণে সব সময়েই এর মধ্যে টানাপোড়ন অব্যাহত থাকে। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এই টানপোড়ন ভালোবাসার সম্পর্কে পরিণত হয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এর পরিণতি হতে পারে আতঙ্ক, বৈষম্য, তিক্ততা এমনকি চরম নিষ্ঠুরতা।[৪৯] এই সংঘাত সত্ত্বেও বিয়ের বন্ধনের মধ্যে নর-নারীর যে আপষরফা হয় সেটাই পূর্ণবয়স্ক

---

৪৭ সিমোন দ্য বুভোয়া: প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৪

৪৮ Emma Goldman: Marriage and Love, *Anarchism and Other Essays*, Filiquarian Publishing, LLC., Dec 30, 2005

৪৯ Malcolm Potts and Roger Short ibid p- 102.

মানুষের জীবনে প্রাচুর্য, পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শুধু তাই নয়, বিবর্তন মানুষের বিষমকামী সম্পর্কের মধ্যে যে ধরণের সহযোগিতার উদ্ভব ঘটিয়েছে তার ফলে পুরুষের সঙ্গে তেমন কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই নারীরা যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য পেয়েছে। অপর দিকে যৌনসঙ্গী জোগাড়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘাত অনেকটা কমে গেছে। নর-নারীর মধ্যে এই মাত্রার সহযোগিতা ছাড়া ক্রমোন্নতির দীর্ঘ পথে এগিয়ে যেতে পারত না মানুষের সভ্যতা।

মানুষের বিয়ের আসল অর্থ এই নয় যে, এটা যৌনমিলন অনুমোদন করে। বরং এটি যৌনমিলনকে সীমিত করে। বিয়ে মূলত, সমাজের অন্য সকল পূর্ণবয়স্ক যৌন-সক্রিয় মানুষের থেকে এক জোড়া নর-নারীর যৌনজীবনকে পৃথক ও নির্ধারিত করে দেয়।[৫০] নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের মতো সমাজবদ্ধ প্রাণীর ক্ষেত্রে বিয়ের কয়েকটি উপযোগিতা রয়েছে। যেমন ক. বিয়ে যৌন-প্রতিযোগিতা এবং যৌনসঙ্গী অর্জন-জনিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কমায়। খ. বিয়ে, পরিবারের ভিত্তি তৈরি করে যা সমাজের অর্থনৈতিক একক। গ. বিয়ে সন্তানকে লালন পালন করা এবং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলার কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান। বিবাহপ্রথার মাধ্যমে হয়ত এ বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা অনেকটা পাওয়া গেছে। কিন্তু অন্যদিকে এই প্রথার ভেতরে থাকতে হলে মানুষকে চরম কিছু মূল্যও দিতে হয়। ধর্ম, লোকাচার, রাষ্ট্রীয় আইন এবং প্রচলিত বিশ্বাসের কঠোর অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত এই প্রথা মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় জীবনব্যাপী অবদমন, শৃঙ্খল ও শাসনের বোঝা। মানুষের জীবনের বহু দুঃখ-দুর্দশা এবং অনাচারের কারণ এই অবদমন থেকেই জন্ম নেয়। এই বোঝার ভার ও ধার সকলের জন্য এক রকমও নয়, বিশেষত পুরুষের তুলনায় এই ভারের প্রতুকূলতা নারীর উপর বহুগুণ বেশি।

বিয়ের মতো দীর্ঘমেয়াদী বন্ধন অনেক প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান। প্রজনন ঋতুতে সন্তানের লালন পালনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর জোড় বাধাকে আমরা প্রাণীদের বিয়ে বলতে পারি। এই জোড় বাধার সময় ওই প্রাণীরা একগামী সম্পর্ক বজায় রাখে।[৫১] মানুষের ক্ষেত্রেও আদিমকালে এ ধরনের বিয়ের প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিবাহ প্রথাকে একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। উৎপত্তিগত দিক থেকে আমরা বলতে পারি, বিয়ের মূল উদ্দেশ্য যৌন-সঙ্গম নয়, সন্তান উৎপাদন। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বিয়ের গুরুত্ব মূলত সন্তান পালনের জন্য। সে দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে বিবাহপ্রথা জৈবিকভাবে

---

৫০ Malcolm Potts and Roger Short ibid p – 81

৫১ Eleven species that mate for life: *Mother Nature Network*; http://www.mnn.com/earth-matters/animals/photos/11-animals-that-mate-for-life/old-faithful

পুরুষের চেয়ে নারীর জন্যই বেশি উপযোগী বলে মনে হয়। ব্যক্তিমালিকানা ও পুরুষতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত হওয়ার আগে সন্তান পালনের জন্যে নর-নারীর স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত জোড়বাধা সম্পর্ক (বিবাহ) ছিল যাতে ধর্ম, সমাজ, পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারা ইত্যাদির প্রভাব ছিল না। নর-নারীর সেই সম্পর্কের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা, পারস্পরিকতা এবং প্রতিসাম্য অন্যান্য প্রাণীর জোড়বাধা সম্পর্কের থেকে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক ও ধর্মভিত্তিক বিবাহ প্রথার মধ্যে নর-নারীর সম্পর্কের এসব বৈশিষ্ট্য টিকে থাকতে পারেনি।

ধর্ম, লোকাচার ও সামাজিক বিধান বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে নারীর অধস্তনতা নিশ্চিত করেছে। এঙ্গেলস এই সম্পর্ককে বলেছিলেন, শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী। এটাই অধিকাংশ মানবসমাজে একমাত্র বৈধ যৌনসম্পর্ক। যৌনসম্পর্কের জন্য বিয়ের মতো এ রকম কৃত্রিম, প্রচণ্ড অনুশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রথা প্রাণিকুলে নেই। সকল ভৌগোলিক এলাকার সব ধরনের মানবসমাজেই কোনো না কোনোভাবে যৌন-সম্পর্কের সমাজ-স্বীকৃত এই রূপটির অস্তিত্ব রয়েছে। এই প্রথাটির সার্বজনীন অস্তিত্ব দেখে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষের জৈবিক বা সমাজবদ্ধ অস্তিত্বের জন্যে এরকম একটি প্রথা অপরিহার্য ছিল কি না। সকল সমাজে বিয়ের প্রথা এবং তার রীতিনীতি এক রকম নয়। সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথার ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিয়ের এই বিভিন্নরূপ এবং পরিবর্তনের ধারা দেখে মনে হয়, বৈষম্যময় সমাজের নানারকম জটিলতার সঙ্গে মানুষের যৌনতা ও যৌনসম্পর্কের খাপ খাওয়ানোর জন্যেই হয়ত এ প্রথার উদ্ভব ঘটেছে।

সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি এমন অনেক সমাজে পিতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা নেই। যেমন, মেলানেশিয়া দ্বীপের জনগোষ্ঠির মধ্যে। ডিঙ্গো জতীয় কুকুরকে গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে নেওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাবোরিজিনিদেরও জানা ছিল না পিতৃত্ব বলে কিছু আছে। তারা ভাবত নারীর শরীর থেকেই সন্তানের উৎপত্তি হয়। মানুষের সমাজে পিতৃত্ব সম্পর্কে সচেতনতা এসেছে অনেক পরে। পিতৃত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সমাজে এক নতুন মাত্রা নিয়ে আসে। পিতৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান এবং ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব হওয়ার পর যৌনসম্পর্কের ওপর বিধিনিষেধ ব্যাপক হারে আরোপিত হতে থাকে। প্রথমে আসে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যৌনসম্পর্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা (টাবু)। এর পর আসে বিবাহিত সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার যৌনসম্পর্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা। এসব নিষেধাজ্ঞার ফলে বিয়ে হয়ে যায় দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত (টাবু লঙ্ঘন করে নয়) একমাত্র আইনসম্মত যৌনসম্পর্ক। সমাজে সম্পদশালী পুরুষের কর্তৃত্বে থাকায় বিবাহপ্রথার রীতি-নীতিগুলোর বেশিরভাগ পুরুষের কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও যৌন-সুবিধার অনুকূলে করা হয়েছে। বিবাহপ্রথাভিত্তিক পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে

ধর্মগুলো খুব সংগঠিতভাবে তাদের ভূমিকা রেখেছে।

বাইবেলে লেখা হয়েছে –

> স্ত্রীগণ, ঈশ্বরের মতো স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ কর। কারণ, স্বামী স্ত্রীর অধিপতি যেমন যিশু উপাসনালয়ের অধিপতি (head) এবং নিজেই এর পরিত্রাতা। এখন চার্চ যেমন (সব কিছু) খ্রিস্টকে উৎসর্গ করে, অতএব, স্ত্রীদেরও উচিৎ স্বামীর কাছে তাদের সর্বস্ব সমর্পণ করা।[৫২] (Ephesians 5: 22-6:9)

কোরানে লেখা হয়েছে –

> পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরের ওপর বিশিষ্টতা দিয়েছেন। ... স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয় তাদের ভালো করে উপদেশ দাও, তারপর তাদের বিছানায় যেও না এবং তাদের প্রহার কর।[৫৩] (সুরা নিসা: ৩৪-৩৫)

এই প্রথার মধ্যে নারীর জন্য অনুকুল কিছু কিছু বিষয় হয়ত আছে কিন্তু প্রতুকূলতা রয়েছে অনেক বেশি। এই বিষয়গুলো সামাজিক আচার আচরণ, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় আইন এবং মানুষের চিন্তা ও ধারণা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই প্রথার মধ্যে নারীর জন্য প্রতুকূল যে ধারণাগুলো রয়েছে তা হচ্ছে:

> ক. বিবাহিত নারী স্বামীর অধিনস্ত ও মালিকানাধীন (স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অঙ্গীকারের কথা বলা হলেও স্বামী কখনোই স্ত্রীর মালিকানাধীন নয়)।
>
> খ. স্বামীর অন্য নারী গমন (একাধিক বিয়ে/রক্ষিতা/দাসী/গণিকা) স্বাভাবিক বা চলতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর পর পুরুষ গমন অত্যন্ত গর্হিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।
>
> গ. বিয়ের জন্য সঙ্গী পছন্দের ক্ষেত্রে নারীর মতামতের প্রয়োজন নেই। এখনও পশ্চাৎপদ সমাজগুলোতে নিজের পছন্দে বিয়ে করাকে পুরুষের চেয়ে নারীর জন্য বেশি গর্হিত বলে গণ্য করা হয়।
>
> ঘ. স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করা, তার সেবা করা এবং যৌন-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে বাধ্য। এগুলোর অন্যথা তার জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
>
> ঙ. স্বামী, যে কোনো সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে বা ত্যাগ করতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে বা ত্যাগ করতে পারবে না

৫২ *Bible*: Ephesians 5:22-6:9 mm Final 3 rd Proof

৫৩ *আল কোরান*: সুরা নিসা: ৩৪-৩৫।

চ. সন্তানের ওপর স্বামীর অধিকার বেশি। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হলে সন্তান স্বামীর হেফাজতে যাবে। সন্তান বাবার পরিচয়ে বড় হয়।

ছ. বিবাহিত নারীকে তার নিজের পারিবারিক বাড়ি এবং অতীতের অনেক কিছু ছেড়ে স্বামী ও তার পরিবারের কাছে চলে যেতে হয়। পুরুষ বিয়ের পরেও নিজ পরিবারে থাকে।

এরকম বৈষম্যমূলক ও নিপীড়নমূলক একটি প্রথার মধ্যে যে সম্পর্ক তা নারীদের করে তোলে আত্মশক্তিহীন। বিবাহিত সম্পর্কের নিগড় নারীকে কতটা অসহায় ও আত্মশক্তিহীন করতে পারে তার চিত্র আমরা দেখতে পাই 'আমাদের মাকে' কবিতায়।

কবি হুমায়ুন আজাদ দাম্পত্য জীবনের যে চিত্র একেছেন তা এত বাস্তব ও সত্য যে এর নজির খুঁজতে আমাদের খুব বেশি দূর যেতে হয় না। আমাদের আশেপাশের অনেক বিবাহিত নারীর দিকে তাকালেই এ দৃশ্যের অসংখ্য প্রতিরূপ আমরা দেখতে পাই। কবি লিখেছেন –

আমাদের মাকে আমরা বলতাম তুমি, বাবাকে আপনি
আমাদের মা গরিব প্রজার মত দাঁড়াতো বাবার সামনে,
কথা বলতে গিয়ে কখনোই কথা শেষ করে উঠতে পারতো না।
আমাদের মাকে বাবার সামনে এমন তুচ্ছ দেখাতো যে
মাকে আপনি বলার কথা আমাদের কোনোদিন মনেই হয়নি।
আমাদের মা আমাদের থেকে বড় ছিলো, কিন্তু ছিলো আমাদের সমান।
আমাদের মা ছিলো আমাদের শ্রেণীর, আমাদের বর্ণের, আমাদের গোত্রের।
...বাবা ছিলেন অনেকটা সিংহের মতো, তার গর্জনে আমরা কাপতে থাকতাম
বাবা ছিলেন অনেকটা আড়িয়াল বিলের প্রচণ্ড চিলের মতো...
আমাদের মার কোনো ব্যক্তিগত জীবন ছিলো কি না আমরা জানি না।
আমাদের মাকে আমি কখনো বাবার বাহুতে দেখিনি।
আমি জানি না মাকে জড়িয়ে ধরে বাবা কখনো চুমু খেয়েছেন কি না
চুমু খেলে মার ঠোঁট ওরকম শুকনো থাকতো না।[৫৪]

আবহমান কাল ধরে বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে আমাদের সমাজে অধিকাংশ নারীর অবস্থা এমনই ছিল। এখনও বহু নারীর সঙ্গে তাদের স্বামীর সম্পর্ক এমনই। স্বামী, পতি, ভাতার ইত্যাদি শব্দগুলো যেমন প্রভুত্বমূলক, বিবাহিত জীবনের বাস্তবতা তার চেয়েও কঠিন। যেসব ধারণা ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বিবাহ প্রথা

৫৪ হুমায়ুন আজাদ রচিত কবিতা: আমাদের মা

টিকে আছে সেগুলো এবং তার রীতিনীতিগুলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের জন্য খুবই 'প্রয়োজনীয়' ও 'স্বাভাবিক' বলে পুরুষতন্ত্র ও ধর্মের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এগুলো মানব প্রকৃতির অনুকুল এবং মানুষের জৈবিক যৌনতার সঙ্গে সংঘর্ষমূলক নয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, বিয়ে হল, সন্তান পালনের কর্তব্যের অনন্য-সাধারণ দাবির সঙ্গে নর-নারীর এক ধরনের আপস। যদিও যা তাদের এই বন্ধনে আবদ্ধ রাখে তা হচ্ছে নিয়মিত প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কহীন যৌনসঙ্গম। এটি এমন এক চক্কর যেখান বহুগামী একজোড়া প্রাণী সংগ্রাম করছে একগামী জীবন যাপনের জন্য।[৫৫] আমাদের সমাজে খুব প্রচলিত একটি ধারণা হল—নারী জৈবিকভাবে 'একগামী' এবং পুরুষের প্রকৃতি বহুগামী। কিন্তু নারীরা প্রকৃতিগতভাবে একগামী একথা আধুনিক জীববিজ্ঞানের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জৈবিকভাবে নারীও মূলত বহুগামী, তবে পুরুষের চেয়ে ভিন্নমাত্রায়।

একাধিক যৌনসঙ্গীর সঙ্গে যৌনমিলনের প্রবণতা পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভিন্ন কারণে বিবর্তিত হয়েছে। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেশির-ভাগ প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রজননে পুরুষের বিনিয়োগ যৌনসঙ্গম পর্যন্ত। কিন্তু নারীর বিনিয়োগ সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে সন্তান পালন পর্যন্ত। বহুসংখ্যক সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গম পুরুষকে বেশি সংখ্যক সন্তান উৎপাদনে সাফল্য দেয়। নারীর ক্ষেত্রে একাধিক পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম তার সন্তানকে অন্য পুরুষের আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে বাঁচায় এবং বেঁচে থাকার উপকরণ পেতে সহায়তা করে। অর্থাৎ টিকে থাকার সংগ্রামে উপযোগিতা ছিল বলেই নারীর মধ্যে একাধিক যৌনসঙ্গীর সঙ্গে যৌনমিলনের প্রবণতা বিবর্তিত হয়েছিল। 'বহুগামীতা নারীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, পুরুষের নয়' এ ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপকভাবে আধিপত্য করে। সিনেমা, নাটক, সাহিত্য, পাঠ্য-পুস্তক সর্বত্র এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এর বড় রক্ষক।

নারী-পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছের ওপর ভিত্তি করে স্বতঃস্ফূর্ত জোড় বাঁধাই প্রাকৃতিক ও কাঙ্ক্ষিত। পুরুষতান্ত্রিক বিয়েতে এক সময় নারীর ইচ্ছে বা পছন্দের ব্যাপারটিই উঠে গেল। বিয়ে হয়ে গেল 'কন্যা সম্প্রদান'। যেখানে পিতা তার জামাতাকে নিজ কন্যা দান করছেন, সেখানে কন্যার ইচ্ছের ব্যাপারটি হয়ে পড়ে অবান্তর। শুধু তাই নয়, এখানে নারী ও পুরুষের ভূমিকা এমনভাবে নির্ধারিত যে, বিয়েটা নারীর জন্য হয়ে যায় বশ্যতা, শৃংখল এবং ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির বিষয়। অন্যদিকে পুরুষের কাছে তা চিরস্থায়ী শয্যাসঙ্গী সেবিকা ও দাসী পাওয়ার বা একটি নারীকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করার মতো ব্যাপার হয়ে যায়। ধর্ম ও সমাজ সেবিকা ও দাসী হিসেবে নারীর সেই ভূমিকাকে অনুমোদন করে। গত শতাব্দীর ৫০ এর দশকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

৫৫ Malcolm Potts and Roger Short ibid p 81.

গার্হস্থ্য অর্থনীতির পাঠ্য পুস্তকের বড় অংশ বরাদ্দ ছিল নারীদের স্বামী-সেবার কৌশল শেখানোর জন্যে।[৫৬] শুধু তাই নয়, গৃহস্থালী বৃত্তি নেওয়ার ফলে উৎপাদন ও জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন নারীকে নিজের এবং সন্তানের ভরণ পোষণের জন্যও বিয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। পরিবারও তাই মেয়েদের 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বার্থে ' বিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। আর যথার্থ কারণেই বিয়ের পাত্র নির্বাচনের মূল বিবেচ্য বিষয় হয় অর্থনীতি। নারীবাদী লেখিকা এমা গোল্ডম্যানের মতে বিয়ের মত একটি প্রতিষ্ঠান সমাজে আছে বলেই অধিকাংশ নারী নিজের ভরণ পোষনের জন্য সাবলম্বী হবার ব্যাপারটিকে ততটা গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না যতটা একজন পুরুষ নিয়ে থাকে। একারণে এবং বিবাহিত জীবনের পুনরাবৃত্তির চক্রে পড়ে মেয়েটি চরমভাবে পরনির্ভর -শীল এবং 'পরজীবী' একটি প্রাণীতে পরিণত হয়।[৫৭]

পিতৃতান্ত্রিক বিবাহ প্রথা কঠোর ও গভীর যে বিষয়টি নারীর ওপর চাপিয়েছে তা হল সতীত্ব। সতীত্ব কোনো দিকে থেকেই জৈবিক নয়। প্রাণিকুলে কিছু কিছু প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ যে একগামী যৌন-আচরণ দেখা যায় তা একটি নির্দিষ্ট প্রজনন ঋতুতে সীমাবদ্ধ থাকে। সারাজীবনের কঠোর একগামিতা প্রাণিকুলে স্ত্রী বা পুরুষ কারো মধ্যে নেই। এটি নারীদের ওপর কঠোরতরভাবে চাপানো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কীর্তি। গত শতাব্দী থেকে নারীদের বিকশিত হওয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলো যত কমছে এবং তাদের স্বাধীনতা যত বাড়ছে; ততই কমে যাচ্ছে বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে নারী-পুরুষের জৈবিক স্বতঃস্ফূর্ততার অবদমন। এখন বিয়ের পাত্র পছন্দের ক্ষেত্রে নারীদের পছন্দ গুরুত্ব পাচ্ছে শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনাই নয়, পাত্রের দৈহিক সৌন্দর্য, বয়স এগুলোও বিবেচিত হচ্ছে নারীদের দ্বারা। শুধু তাই নয়, বিবাহ প্রথাকে ফেলে দিয়ে অনেক নর-নারী কোনো সামাজিকতা ছাড়াই জোড় বাধছে যাকে ইংরেজি ভাষায় বলা হচ্ছে 'লিভিং টুগেদার'।

পুঁজিবাদী সমাজ যে সার্বজনীন শিক্ষা ও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে এসেছিল তারই ধারাবাহিকতায় নারীরা গত একশো বছরের অধিক কাল থেকে পারিবারিক (বিবাহিত) ও সামাজিক জীবনে তাদের ওপর চেপে থাকা বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরোধিতা করে আসছিলো। কিন্তু নারীদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির বড় বাধা ছিল জৈবিক, অর্থাৎ সন্তান ধারণ ও পালনের দায়। আধুনিক সমাজে নারীর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে বিবাহিত জীবনে তার ভূমিকা পাল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল

---

৫৬ from a 1950's Home Economics Textbook intended for High School girls of USA, for teaching them how to prepare for married life.

৫৭ Emma Goldman: Marriage and Love, *Anarchism and Other Essays*, Filiquarian Publishing, LLC., Dec 30, 2005

জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন। এর ফলে সন্তান উৎপাদনের গুরুভার অনেক কমে গেছে। সন্তান পালনের ভারও অনেকাংশে সামাজিকভাবে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ যুগে বিবাহিত নারীরাও পরিবারের বাইরেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ভূমিকা রাখছে। পুরুষতন্ত্র এক সময় এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল যে, পরিবারের গণ্ডির বাইরে খুব বেশি কিছু করা নারীদের সাধ্যের বাইরে। নারীদের বর্তমান ভূমিকার ফলে সে ধারণা ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পরিবারের বাইরে ভূমিকা রাখার পরও ভেতরে তাদের দাসি বা সেবিকা হিসেবে যে কাজ করতে হত তার দায় পুরোপুরিই তাদের ওপর চাপানো হচ্ছে। এই বোঝা চাপানোকে যথার্থতা দেওয়ার জন্য আগের মতোই ব্যবহার করা হচ্ছে 'জৈবিক যুক্তি'। বলা হচ্ছে নারীরা জৈবিকভাবে গৃহস্থালী কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত পুরুষেরা নয়। এই ধারণা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। আধুনিক নারী-পুরুষের বিবাহিত জীবনে তাই গৃহস্থালী কাজ এবং সন্তানপালনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দায়িত্ব ভাগাভাগি অনেক বেড়েছে। বেড়েছে নারীর পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ। এভাবেই উন্মোচিত হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক বিয়ের চক্কর থেকে তার মুক্ত হওয়ার পথ।

প্রাচীন কাল থেকে বিবাহপ্রথা যেভাবে চলে আসছিল তা এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু আধুনিক মানুষ এবং মুক্তিকামী নারীদের পক্ষে বিবাহিত জীবন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব যদি দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে নারী-পুরুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা সমান হয় এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ না থাকে। এরকম একটি ভবিষ্যতের দিকে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বিবাহিত জীবনের মধ্যেও সভ্য নর-নারীর পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, ''বিবাহ সম্ভাবনাপূর্ণ এবং সার্থক হতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে উপলব্ধি করতে হবে যে, আইনের কেতাবগুলোতে যাই লেখা থাক না কেন পারিবারিক জীবনে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করা খুবই জরুরি।''[৫৮] তবে এত কাল পরেও বিয়ে বা জোড় বাধার মূল উদ্দেশ্য সন্তান পালন। মানুষের সভ্য সমাজে সন্তানপালন তো একটি ঋতুর ব্যাপার নয়। সন্তান পালনের জন্য চাই স্থায়ী বাবা-মা। পুরুষতান্ত্রিক পরিবারে নারীর জন্য কঠোর একগামীতা থাকলেও পুরুষের ক্ষেত্রে অলিখিত বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের অনুমোদন বা প্রশ্রয় ছিল। নারী স্বাধীনতার যুগে দু'টো ব্যাপার স্থায়ী সম্পর্কের জন্য হুমকি স্বরূপ। প্রথমত স্ত্রীরা আর স্বামীদের বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ককে মেনে নিতে পারছেন না এবং দ্বিতীয়ত দীর্ঘদিন একজন যৌন-সঙ্গীর প্রতি নিবদ্ধ না থাকার যে বাসনা তাদের মধ্যে আছে সেটাকেও তারা আর আগের মতো অবদমিত রাখতে চান না। একই সাথে সন্তানের স্বার্থে ভাঙতে চান না তাঁর

---

৫৮ বার্ট্রান্ড রাসেল: *বিবাহ ও নৈতিকতা*: প্রাগুক্ত পৃ: ৫৮

দীর্ঘমেয়াদী বিবাহিত সম্পর্ককেও (যেখানে রয়েছে স্নেহ ও মমতার গভীর বন্ধন)। আধুনিক মানুষ কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করে তার উপর নির্ভর করবে বিবাহ প্রথার ভবিষ্যত।

গণিকাবৃত্তি: মানুষের সমাজের মনুষ্যত্বের নয়

> গণিকাবৃত্তির মধ্যে নারীদেহের অপব্যবহার রয়েছে। এই বৃত্তি নিজেই নারীদেহের অমর্যাদাকর ব্যবহারগুলোর অন্যতম । ... কোনো নারীই গণিকাবৃত্তিতে তার পূর্ণাঙ্গ সত্তা নিয়ে থাকতে পারে না। গণিকাবৃত্তিতে নারীর শরীরকে যেভাবে ব্যবহার করা হয় সেভাবে কোনো মানবদেহকে ব্যবহারের শেষে, অথবা এর মাঝামাঝি পর্যায়ে কিংবা শুরুতে পূর্ণাঙ্গ একটি মানবসত্তাকে পাওয়া অসম্ভব। এবং কোনো নারীই এর পরবর্তি সময়ে আর পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।[৫৯]
>
> অ্যান্ড্রিয়া ডকিন
>
> Prostitution and Male Supremacy

> নারীকে কোথাও তার কাজের উৎকর্ষতা দিয়ে বিচার করা হয় না। বরং দেখা হয় একটি যৌনবস্তু হিসেবে। তাই এটা প্রায় অপরিহার্য যে টিকে থাকার অধিকারের জন্য, যে কোনো ক্ষেত্রেই নিজের অবস্থানকে ধরে রাখতে, তাকে মূল্য দিতে হবে যৌন-আনুকূল্যের মাধ্যমে। অতএব, সে নিজেকে বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে বিক্রি করছে না বাইরে বহু সংখ্যক পুরুষের কাছে করছে এটা কেবল মাত্রার ব্যাপার। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধস্তনতাই গণিকাবৃত্তির জন্য দায়ী।[৬০]
>
> এমা গোল্ডম্যান
>
> The Traffic in Women

যৌনকর্ম প্রবৃত্তিজাত একটি প্রাকৃতিক কর্ম। কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃতিক কর্ম যেমন খাওয়া, ঘুমানো, মল-মূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদির সঙ্গে এর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। কারণ যৌনকর্ম একা একা করা যায় না, অন্য একজন সত্তার (individual) সঙ্গে করতে হয়। যৌনসঙ্গী সাধারণত বিপরীত লিঙ্গের হয়ে থাকে। যৌনসঙ্গম পারস্পরিক একটা ব্যাপার হলেও প্রকৃতি দুই লিঙ্গের যৌনতা ও যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে ভিন্ন মাত্রায়

---

৫৯ Andrea Dworkin (1992-10-31). "Prostitution and Male Supremacy (1 of 2)". Nostatusquo.com. http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/MichLawJourI.html. Retrieved 2010-05-09

৬০ Emma Goldman: Marriage and Love, *Anarchism and Other Essays*, Filiquarian Publishing, LLC., Dec 30, 2005

বেঁধেছে। প্রাণিজগতে আমরা ব্যাপকভাবে দেখতে পাই, যৌনক্রিয়ার ব্যাপারে পুরুষ প্রাণীর আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও উদ্যম স্ত্রী-প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি (এর জৈবিক কারণ সম্পর্কে আমরা আগেও অনেকবার উল্লেখ করেছি)। এই অসম আগ্রহের কারণে যৌনসঙ্গী জোগাড় করা পুরুষ প্রাণীর জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রজননে তার সফল হওয়ার ক্ষেত্রে এটিই পুরুষ প্রাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। এ কারণে প্রাণীজগতে আমরা দেখতে পাই, পুরুষ প্রাণী যৌনসঙ্গী জোগাড় করার জন্য অনেক 'কাঠ-খড় পোড়াচ্ছে'। এই কাঠ খড়ের অন্যতম হচ্ছে– যৌনতার বিনিময়ে স্ত্রী-প্রাণীকে জীবন ধারণের উপাদান সরবরাহ করা, সন্তান পালনে সহায়তা করা, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। যৌনতার বিনিময়ে পুরুষ প্রাণীর কাছ থেকে খাদ্য, বাসস্থান (সন্তানের জন্য সুরক্ষিত বাসা) এবং অন্যান্য সহায়তা গ্রহণের দৃষ্টান্ত সকল প্রজাতির মধ্যে না থাকলেও পাখিদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপকভাবে। সরিসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের অনেক প্রজাতির মধ্যেও এ ধরনের সহায়তার অস্তিত্ব দেখা যায়। জীববিজ্ঞানীদের কেউ কেউ এ বিষয়টির নামকরণ করেছেন 'যৌনতার বিনিময়ে খাদ্য' (Sex for food)।

পেঙ্গুইনদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এক পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে এমন অবস্থায়ও স্ত্রী-প্রাণীকে বাসা তৈরির জন্য পাথর দিয়ে অন্য পুরুষ তার যৌনসঙ্গ অর্জন করছে।[৬১] ক্যারিবীয় অঞ্চলের কোনো কোনো প্রজাতির হামিং বার্ডের খাদ্যের জন্য গাছের সুনির্দিষ্ট অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ হামিং বার্ড গাছের ওইসব অংশ দখল করে রাখে। খাদ্যের জন্য স্ত্রী হামিং বার্ডেরও ওই এলাকায় ঢুকতে হয় অথবা নতুন কোনো অবস্থান খুঁজতে হয়। প্রথমোক্ত বিকল্পটাই স্ত্রী হামিং বার্ডের জন্য বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু আকারে বড় পুরুষ হামিং বার্ডের দখল করা এলাকায় শারীরিক বল খাটিয়ে ঢুকে পড়া স্ত্রীটির জন্য সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ত্রী হামিং বার্ড দখলদার পুরুষ পাখিটির সঙ্গে স্বল্প মেয়াদী যৌনসম্পর্ক করে খাদ্য জোগাড় করছে।[৬২] শুধু পাখিদের মধ্যেই নয়, প্রাইমেটদের মধ্যেও এমন প্রবণতা বিরল নয়। শিম্পাঞ্জিরা যখন শিকার করে, তখন শিকারী পুরুষ প্রাণীর কাছ থেকে মাংসের ভাগ নেওয়ার জন্য স্ত্রী প্রাণীরা তাদের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়।[৬৩] এ ধরনের ঘটনাগুলোকে 'প্রাণিজগতের গণিকাবৃত্তি' বলছেন জীববিজ্ঞানী-দের অনেকে। প্রাণীদের এই প্রবণতা মানুষের সমাজের গণিকাবৃত্তির সমান্তরাল একটি ব্যাপার। কিন্তু মানুষের সমাজের গণিকাবৃত্তি যে মাত্রায় রয়েছে তা অন্য

৬১ Luc Loranhe (2006): Sex for food; *Sexual Politics*: www. sexualfront.com

৬২ Luc Loranhe (2006): ibid.

৬৩ Rob Quinn, Newser Staff): Chimp 'Prostitutes' Trade Sex for Meat; *NEWSER*; Posted Apr 8, 2009, http://www.newser.com

প্রাণীদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্কের মতো অতটা সরল নয়। বরং সামাজিক প্রথা ও স্বার্থের অনুষঙ্গে তা পরিণত হয়েছে জটিল ও নিপীড়ণমূলক এক প্রপঞ্চে ।

প্রাণিজগতের এই ঘটনাগুলো থেকে যে বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল, যৌনতার বিনিময়ে বেঁচে থাকার উপকরণ উপার্জনের ক্ষমতা প্রকৃতি স্ত্রী-প্রাণীদেরই দিয়েছে। জৈবিক বিচারে এটি স্ত্রী-প্রাণীদের এক ধরনের সুবিধা, যা পুরুষ প্রাণীদের নেই। মানুষের ক্ষেত্রেও কথাটা সমান সত্য। যদিও মানুষের ক্ষেত্রে চিত্রটি অন্য রকম হয়ে গেছে। মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীদের এই জৈবিক সুবিধার দিকটিকে যাতে তারা ব্যবহার করতে না পারে তার অনেক পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছে ধর্ম ও সমাজের পুরুষতান্ত্রিক বিধি বিধান ও বিশ্বাস। ধর্ম ও পুরুষতন্ত্র বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে যৌনতাকে নারীর জন্য যতটা গর্হিত ও কলঙ্কময় করেছে, পুরুষের জন্য ততটা করেনি। এরকম একটি পরিস্থিতিতে বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে তাদের জৈবিক সুবিধাকে কাজে লাগানো একজন নারীর জন্য কষ্টকর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার যৌনতার প্রকাশ ও চলা ফেরাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, যেন বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে সে ‘এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে’ না পারে। তাই বেশিরভাগ নারী বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যেই এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ নিজের যৌন-আবেদনকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে যোগ্য স্বামী যোগাড় করা, স্বামীর কাছ থেকে যৌনতার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ আদায় করা ইত্যাদি।

কিন্তু এরপরও মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষের যৌন-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য বিবাহিত সম্পর্ক যথেষ্ট ছিল না, এখনও নয়। পুরুষতন্ত্রের নির্ধারিত যৌন-নৈতিকতা অনুযায়ী বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক নারীদের জন্য নিষিদ্ধ থাকায় অনেক পুরুষের অতিরিক্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য বিবাহিত অন্য নারী কিংবা অন্য অনুঢ়া নারীদের সঙ্গ লাভ করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। এই সংকট দূর করার জন্য প্রাচীন কালেই মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তির উদ্ভব হয়। সমাজে ক্ষমতাধর পুরুষেরা বহু নারীগমনের মাধ্যমে তাদের অতিরিক্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য নানান ধরনের সংগঠিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। চীন ও তুরস্কের সম্রাটদের ‘হারেমে’ হাজার হাজার নারী থাকতো। আজকের দিনেও অনেক পুরুষই আছেন, যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুব সফল তারা সাধারণের চেয়ে বেশিসংখ্যক নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করে থাকেন।

গণিকাবৃত্তিকে বলা হয় ‘আদিম পেশা’। এটা কতটা আদিম তা ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লেখা নেই। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যৌনতার ওপর কঠোর সামাজিক বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়া এবং পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তির পরই এই পেশার একটি বৃত্তি হিসেবে জন্ম নেওয়ার বাস্তবতা তৈরি হয়। সভ্যতার উৎপত্তির পর এই বৃত্তি আরও সংগঠিত ও বিকশিত হয়। প্রাচীন সকল সভ্যতায় এই

বৃত্তির অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথমে কিছু কিছু স্থানে ধর্মের ছত্র ছায়ায় (যেমন দেবদাসী) এই বৃত্তি শুরু হলেও কালক্রমে তা বেশিরভাগ 'সমাজ-ধর্মে' কলঙ্কিত ও নীতি-বহির্ভূত বলে চিহ্নিত হয়। যে সব নারী এই বৃত্তি গ্রহণ করত তারা সমাজ থেকে 'পতিত' বলে গণ্য হত। প্রাচীনকাল থেকেই এই উপমহাদেশে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীদের বলা হয় 'পতিতা'। তবে যে পুরুষ তাদের সঙ্গে তারা যৌনসম্পর্ক করল তারা পতিত বা সমাজচ্যুত হয় না। এই অসম ব্যবস্থা পুরুষের যৌন-সংকটকে অনেকটা প্রশমিত করলেও নারীর সমস্যাকে করেছে আরও ঘনীভূত।

প্রাণিজগতে যৌনতার বিনিময়ে খাদ্যের (Sex for food) সঙ্গে মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তির সাদৃশ্য থাকলেও এখানে বিষয়টির বাস্তবতা এতটা সরল নয়। প্রাণিজগতে অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে স্ত্রী প্রাণীর তুলনায় পুরুষ প্রাণীর অতিরিক্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন ধারণের উপকরণের অভাব যৌনতার বিনিময়ে খাদ্যের মূল কারণ। মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তি যৌনতার বিনিময়ে খাদ্যের তুলনায় অনেক সংগঠিত ও জটিল একটি ব্যাপার। গণিকাবৃত্তির উদ্ভব ও টিকে থাকার পেছনে উপরে উল্লেখিত কারণগুলোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মানুষের সমাজে বিদ্যমান কঠোর যৌন-নিষেধাজ্ঞা। সমাজের কঠোর যৌন-নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যৌনসঙ্গী সংগ্রহ করার সহজ উপায় হিসেবেই এই বৃত্তি 'সার্বজনীন ও চিরকালীন' একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। মানুষের সমাজের কঠোর যৌন-নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পুরুষের জন্য যৌনসঙ্গী সংগ্রহ করার উপায় কয়েকটি—প্রেম, বিয়ে, বলাৎকার এবং গণিকার সঙ্গ। সমাজের বাস্তবতায় অনেক পুরুষের জন্যেই প্রথম তিনটি থেকে চতুর্থটি অপেক্ষাকৃত সহজ। ২০০৯ সালে গণিকা-গমণকারী পুরুষদের ওপর স্যান ফ্রান্সিসকোর গণিকা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Prostitution Research & Education এবং লন্ডন-ভিত্তিক নারী সহায়তা সংস্থা Eaves যৌথভাবে একটি সমীক্ষা চালায়।[৬৪] এই সমীক্ষার উপর প্রকাশিত প্রতিবেদনটির নাম Men who buy sex। প্রতিবেদনে গণিকাবৃত্তির উপর পুরুষ গ্রাহকদের মন্তব্যগুলো লক্ষ্য করলে আমরা বিষয়টির সত্যতা অনুধাবন করতে পারব—

> এটা কোনো শর্তাবদ্ধ যৌনতা নয়, কোনো উপহার কেনা কিংবা অর্থনৈতিক অঙ্গীকারের বালাই নেই।[৬৫]

---

৬৪ Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding: Men who buy sex: *Eaves, London Prostitution Research & Education*, San Francisco; December 2009

৬৫ Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding: ibid

গণিকাগমন হচ্ছে অপূর্ণ যৌনবাসনার শেষ আশ্রয়স্থল। ধর্ষণ করা নিরাপদ নয়...[৬৬]

পুরুষেরা মেয়ে মানুষের (গণিকা) জন্য টাকা খরচ করে কারণ সে যাকে ইচ্ছে তাকে বেছে নিতে পারে। অনেক লোক গণিকাদের কাছে যায় কারণ সে (তাদের সঙ্গে) যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। যা বাস্তব জগতের নারীদের সঙ্গে করা যায় না।[৬৭]

আমরা ইনস্ট্যান্ট কফি ইনস্ট্যান্ট খাবারের যুগে বাস করছি। এটা (গণিকাগমন) হল ইনস্ট্যান্ট যৌনতা।[৬৮]

প্রেম বা বিয়ের মাধ্যমে যৌনসঙ্গম করার জন্যে যে পরিমাণ মূল্য দেওয়া প্রয়োজন হয় গণিকাগমন তার চেয়ে অনেক কম কষ্টে, কম মূল্যে এবং কম সময়ের মধ্যেই যৌনসঙ্গমের সুযোগ করে দিতে পারে। বিয়ে ও প্রেমে নিত্য নতুন সঙ্গী বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই। এই সম্পর্কগুলোতে যৌন-সঙ্গিনীকে নিছক যৌনবস্তু নয়, মানুষ বলেই গণ্য করতে হয়। অতএব বিবাহিত বা রোমান্টিক যৌনসঙ্গীর পছন্দ, রুচি ও নৈতিকতাবোধের পরিপন্থী কোনো যৌনাচার তার সঙ্গে করা যায় না। দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংসারিক অনেক বিষয় ও সমস্যার কারণে যে কোনো সময়ে কিংবা চাহিবা মাত্র যৌনসঙ্গমের সুযোগ পাওয়া যায় না। তথাকথিত 'ইনস্ট্যান্ট যৌনসঙ্গম' কিংবা তার ফ্যান্টাসি অনুযায়ী নানা রকম অবাধ যৌনাচার যারা চায়, তাদের বাসনা চরিতার্থ করার সহজ উপায় গণিকাগমন। পুরুষ ক্রেতার কাছে গণিকাদের ব্যাপক চাহিদার কারণ এগুলোই।

'যৌনতা খারাপ জিনিস' – প্রচলিত এই ধারণা এবং বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞাই যে মানব সমাজে গণিকাবৃত্তি ও যৌন-বাণিজ্যের রমরমা অবস্থা তৈরির 'মূল চালিকশক্তি' তা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যখন আমরা নারীদের দেখি পুরুষ যৌনকর্মীর সেবা গ্রহণ করতে। এর কোনো প্রতিরূপ প্রাণিজগতে নেই। প্রাণিজগতের যৌনতার বিনিময়ে খাদ্যের (Sex for food) সুবিধা শুধু স্ত্রী-প্রাণীরাই গ্রহণ করে থাকে। এর উল্টোটা সাধারণত ঘটে না। কিন্তু মানুষের জীবনের কাহিনী একটু ভিন্ন। সমাজের কঠোর যৌন-অনুশাসন ও কঠোর একগামী সম্পর্কের মধ্যে বহু সংখ্যক নারীও যৌনজীবনে তৃপ্ত হতে পারে না। তাদেরই যৌনজীবনে বৈচিত্র্য ও অধিকতর তৃপ্তির জন্য বিবাহ বহির্ভূত যৌনসঙ্গী প্রয়োজন হয়। নারীদের ওপর যৌন-অনুশাসন যেসব সমাজে ততটা কঠিন নয়,

৬৬ Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding: ibid

৬৭ Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding: ibid

৬৮ Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding: ibid

সেখানে যৌনজীবনে অতৃপ্ত বিত্তবান ও সচ্ছল নারীদের মধ্যে অনেকেই বেছে নেন পুরুষ গণিকা বা গিগোলোদের। নারীদের জন্য বিবাহ বহির্ভূত যৌনসঙ্গী জোগাড় করা পুরুষের চেয়ে সহজতর হলেও যৌনতৃপ্তির জন্য কিছু কিছু নারী বাণিজ্যিক যৌনসঙ্গীই বেশি পছন্দ করছেন।[৬৯] তবে বাণিজ্যিক যৌনসঙ্গীর কাছে নারীর ও পুরুষের চাহিদা এক নয়। নারী-পুরুষের যৌনতার পার্থক্যের কারণেই যৌনসঙ্গীর কাছে তাদের চাহিদার মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যৌনসঙ্গীর কাছে নারীরা 'ইনস্ট্যান্ট যৌনসঙ্গম' চায় না, চায় অন্য কিছু। দেখা গেছে অনেকের ক্ষেত্রে ক্যাজুয়াল যৌনসঙ্গীর চেয়ে যৌনকর্মী তাদের সে চাহিদা মেটাতে বেশি দক্ষ হয়ে থাকে। আইরিশ এক পুরুষ যৌনকর্মী নারী খদ্দেরদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন –

> জৈবিকভাবে নারীরা এমন চিন্তা করবে না যে, 'এখন মধ্যরাত আমার খুব উত্তেজনা লাগছে আমি এখনই যৌনসঙ্গম করতে চাই'... তাদের ক্ষেত্রে এটা (বাসনার) দীর্ঘতর এক দহন। ... নারীরা খুব কমই তাদের সঙ্গে নৈশভোজ করতে বলে, কিন্তু তাদের সঙ্গ দেওয়ার ব্যাপারটা কেবল যৌনসঙ্গম নয়। মোটের উপর ... একজন নারী চায় অন্তরঙ্গতা এবং অনুভব করতে চায় পুরুষটির মনযোগ তার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে।[৭০]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ সম্পদ রয়েছে পুরুষের হাতে। নারীর যৌনতা তাই অত্যন্ত লোভনীয় পণ্য যার চাহিদা সর্বত্র। এ রকম একটি পণ্য নিয়ে সমাজে যে জোরদার একটি বাণিজ্য হবে তা সহজেই অনুমেয়। এই বাণিজ্যের মূল পণ্য নারী। তাই ছলে বলে কৌশলে নারীদের এই ব্যবসার পণ্য করে তোলার চক্র অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। মেয়েদের অসহায়ত্বের সুযোগে এই চক্র নানাভাবে তাদের এই পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। ইতিহাসের কতগুলো পর্যায়ে কিছু কিছু দেশে গণিকাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা কুলবধুর চেয়ে বেশি ছিল, যেমন, প্রাচীন গ্রীসে। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্ম ও লোকাচারের হাত ধরে প্রায় সকল সমাজে গণিকাদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, একবার গণিকাবৃত্তি করলে কোনো নারী চিরতরে সামাজিক মর্যাদা হারায় এবং সমাজের চোখে সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি জীব বলে গণ্য হতে থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে কোনো নারী স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি বেছে নেবে না সেটাই স্বাভাবিক।

১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর রাশিয়াতে (সোভিয়েত ইউনিয়ন) গণিকাবৃত্তি অবসানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ উদ্যেগের প্রয়োজনেই সে

---

৬৯ Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding: ibid

৭০ Catherine Murphy: Confessions of a male escort; http://www.independent.ie/lifestyle/independent-woman/; Saturday Nov 5 2011

সময় গণিকাবৃত্তি কেন গড়ে ওঠে? নারীরা কেন এই বৃত্তির সঙ্গে জড়িত হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বেশ কিছু গবেষণা হয়। দারিদ্র গণিকাবৃত্তির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হলেও 'সব দরিদ্র নারীরা এই বৃত্তি গ্রহণ করে না, কেউ কেউ করে কেন?' এই প্রশ্ন থেকেই যায়। কেউ কেউ বলতে চাইলেন কিছু কিছু নারী 'পতিতাপ্রবণ'। এই ধারণাটি ছিল পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতদুষ্ট। পরবর্তী-কালে গবেষণায় বেরিয়ে এল এর মূল কারণ বাণিজ্য ও শোষণ। এ সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> ... সমাজের বুকে এক জঘন্য ব্যবসার জাল ছড়িয়ে রয়েছে, সে ব্যবসা ছলে বলে কৌশলে দরিদ্র আর অসহায় মেয়েদের গণিকাবৃত্তির পথে টেনে আনবার ব্যবসা। অত্যন্ত সংঘবদ্ধ এই ব্যবসা ... গুণ্ডা আর দালাল থেকে শুরু করে বাড়িওয়ালা-বাড়িওয়ালি পর্যন্ত নানা রকম ফন্দিবাজ মানুষ মিলে এই জাল বিস্তার করেছে। আর গণিকা ব্যবসায়ে যেটা আসল লাভ সেটা মোটেও গণিকারা পায় না, তাদের এই দেহ বিক্রির টাকায় বড়োলোক হয় এইসব দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী...[৭১]

যেখানে প্রচুর মুনাফা করার সম্ভাবনা থাকে সেখানেই পুঁজি ও বাণিজ্য-প্রচেষ্টা ধাবিত হয়। মুনাফার হার যদি অত্যন্ত বেশি হয় তা অর্জনের জন্য পুঁজি করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। যৌনবাণিজ্য এমনই এক বাণিজ্য। এ বাণিজ্যে পণ্যের চাহিদা অত্যধিক। তাই বিনিয়োগের তুলনায় লাভ অনেক বেশি। এ বাণিজ্যের ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা থাকায় গোপনে এক বিশাল অপরাধচক্র নিয়োজিত হয় অসহায় নারীদের শোষণ করে মুনাফা লাভের নেশায়। দাসপ্রথা বহুকাল আগে বিলুপ্ত হলেও এই শোষণের চক্র পৃথিবীব্যাপী এক নব্য দাসপ্রথা চালু রেখেছে, যেখানে নারী ও শিশু কেনা বেচা হয়, তাদের দেশান্তরে পাচার করা হয়। এখনও এই বৃত্তিতে নিযুক্ত বেশির -ভাগ নারী শোষণের এই চক্রের শিকার। এই বৃত্তির ওপর সাম্প্রতিক যে সব গবেষণা হয়েছে সেগুলো থেকে আমরা দেখতে পাই, বেশিরভাগ নারী না বুঝে, ফাঁদে পড়ে, অন্যায্য উপায়ে বিক্রি হয়ে এই পেশায় এসেছে। শতকরা ৭৫ জন নারী গণিকা-বৃত্তিতে যুক্ত হয় তাদের শৈশবে। শতকরা ৭৪ জন নারী দারিদ্রের কারণে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে থাকে। এখনও এই বৃত্তিতে নিয়োজিত অধিকাংশ নারী সমাজে সবচেয়ে অসহায় ও নাজুক পরিস্থিতিতে থাকে। গণিকাবৃত্তিতে যুক্ত অধিকাংশ নারী শারীরিক ও যৌননিপীড়নের শিকার হয়। এদের মধ্যে বেশিরভাগ মাদকাসক্ত এবং বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত। ব্রিটেনে গণিকা

---

৭১ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: *নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ*, নিউ এজ পাবলিশার্স,চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৯, পৃ: ৮৬।

নারীদের মৃত্যু হার জাতীয় গড়ের ১২ গুণ। এই বৃত্তিতে নিয়োজিত গড়ে দশ জন নারীর মধ্যে নয়জন (বেঁচে থাকার অন্য উপায় থাকলে) এই পেশায় থাকতে চান না।[৭২]

গণিকাবৃত্তি থেকে যদি বাণিজ্য, মধ্যস্বত্ব এবং শোষণকে দূরে রাখা যেত তাহলে কি এটা স্বাধীন নারীর কাঙ্ক্ষিত পেশা হতে পারে? এ বিষয়টি বিতর্কিত। নারীবাদীদের মধ্যে কেবল লিবারাল ফেমিনিস্ট বা উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করেন এরকম হলে নারী স্বাধীনভাবে এই পেশা গ্রহণ করতে পারে এটি তার অধিকার। অন্যদিকে র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট এবং মার্ক্সীয় ফেমিনিস্টরা কোনোভাবেই এই পেশাকে মুক্ত মানুষের কোনো বৃত্তি হিসেবে মেনে নিতে রাজি নন। র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা মনে করেন, এই বৃত্তি মুক্ত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এটি মানুষকে বাণিজ্য ও ভোগের বস্তুতে পরিণত করে। মার্ক্সীয়দের দৃষ্টিতে এটি একটি শোষণমূলক সম্পর্ক যা একদল মানুষকে শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করে অন্য একদল মানুষকে পরিণত করে শোষক ও দুর্বৃত্তে।[৭৩] উদারনৈতিক নারীবাদীদের মত অনুযায়ী আমরা নিশ্চয় বলতে পারি যে, একজন নারী বা পুরুষের স্বাধীনভাবে এই পেশা গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। লিবারালদের এই দাবি কতটা গ্রহণযোগ্য তা বোঝার জন্য বাস্তবে এ ঘটনার প্রভাব কেমন তা জানা দরকার। এ বিষয়টি দেখার জন্য বর্তমান সময়ে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে সমাজতন্ত্র-উত্তর রাশিয়ার সমাজ; যেখানে পুঁজিবাদের নতুন পর্যায়ে গণিকাবৃত্তি নতুন মাত্রায় ও ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে।

১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ১৯৩০ এর মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়েছিল।[৭৪] এই কাজটি করার জন্য তৎকালীন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ শুধু গণিকাবৃত্তি ও যৌনবাণিজ্য নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হননি বরং গণিকাবৃত্তির আরও মৌলিক কারণগুলোর মূলোৎপাটন করেছিল। প্রতিটি নারীর কর্মসংস্থান এবং তার সন্তানের খাওয়া, পরা, থাকা, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত ছিল সোভিয়েত সমাজে। সমাজতন্ত্র অবসানের পর অসংখ্য নারী কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয় এবং যাদের কাজ রয়েছে তাদের বেশির ভাগের মজুরিও এত কম যে দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করেও সন্তানের খাওয়া, পরা, থাকা, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা নেই। সমাজতন্ত্র-উত্তর রাশিয়ার গণিকাবৃত্তির ওপর সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাভিত্তিক এক

---

৭২ Melissa Farley PhD: *Prostitution: Factsheet on Human Rights Violations*; Prostitution Research & Education Box 16254, San Francisco CA 94116 USA

৭৩ Sarah Bromberg: Feminist Issues In Prostitution; http://www.hutch.demon.co.uk/prom/prostitu.htm and http://www.feministissues.com/

৭৪ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৪-৯০।

প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, রাশিয়ায় সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পুনঃনির্মাণের সময় বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নারীদের ব্যাপক হারে ছাটাই, (নারীদের) বেকারত্ব, উচ্চ-বেতনের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য, এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বাণিজ্যিকরণের ফলে দারিদ্রের নারীকরণ (feminisation of poverty) হয়েছে।[৭৫]

প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য নারী স্বেচ্ছায় এবং 'স্বাধীন-ভাবে' এই বৃত্তিতে নিয়োজিত হয়েছে। দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজে থাকার ফলে নারীদের মধ্যে এই বৃত্তি নিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার অনেকটা কমে গিয়েছিল। এখন রাশিয়ায় দেখা যাচ্ছে তিন ধরনের নারীরা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই বৃত্তিতে নিয়োজিত হচ্ছে। ১. নিম্ন আয়ের নারী যেমন নার্স, শিক্ষিকা, বিক্রয়-কেরানি, গ্রন্থগারিক ইত্যাদি। পেশার পাশাপাশি বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে তারা এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে। ২. কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাদের শিক্ষা ও বিনোদনের খরচ যোগানোর জন্য এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে। ৩. কর্মহীন দরিদ্র নারী ও তাদের সন্তান, মাদকাসক্ত নারী এবং অনুঢ়া নারীদের আয়ের একমাত্র উৎস এই বৃত্তি।[৭৬]

রাশিয়াতে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে এই পেশা চালাচ্ছে, এখানে দালাল ও মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম 'নেই বললেই চলে'। কিন্তু তাই বলে এই পেশা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট তা একেবারেই বলা যাবে না। প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়েছে–''আমরা এমনটা দেখিনি যে, (রাশিয়াতে) গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরা নিজেদের জন্য বিশেষ কোনো আনন্দের ব্যবস্থা করতে পারছে। কাজটির পদ্ধতির মধ্যেই এমন কিছু আছে যা (ওই পেশায় নিয়োজিত) নারীদের মধ্যে ঘৃণার বোধ জাগায়, যদি তখনও তাদের মধ্যে কোনো অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে। ... প্রকৃতপক্ষে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরা তাদের জীবনে সত্যিকারের যৌন-আনন্দ থেকে বঞ্চিত।''[৭৭] গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীদের মধ্যে যারা এই গবেষণায় অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক (০.২৫%) বলেছে তারা পেশাগত যৌনসংসর্গে আনন্দ পান। অতএব প্রশ্ন থেকে যায়, এটা কী নারী-পুরুষের কার্যকর ও প্রয়োজনীয় কোনো যৌনসম্পর্ক? বিষয়টিকে কয়েকটি দিক থেকে দেখা যায়।

যৌনতা নর-নারীর পারস্পরিক ও আনন্দময় একটি সম্পর্ক হয়ে ওঠে যখন উভয়েই তার সঙ্গীর কাছ থেকে পরিতৃপ্তি পায় এবং একই সময়ে সঙ্গীকেও পরিতৃপ্ত

---

৭৫ Natalia Khodyreva: How Women in Prostitution see Themselves and Explain their Motivations; Nordik Gender Institute, http://www.nikk.no

৭৬ Natalia Khodyreva: ibid

৭৭ Natalia Khodyreva: ibid

করে। এই বিচারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণিকা ও তার খদ্দেরের মধ্যে যৌনতা কোনো সম্পর্ক হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন– ''কুসংস্কারমুক্ত হলে যৌনসম্পর্কে নৈতিকতা বলতে এক অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বোঝায়। ব্যক্তিগত আনন্দ চরিতার্থ করার জন্য অপরকে ব্যবহার না করাও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নিজের সুখ যেমন তেমনি সঙ্গীর সুখও দেখতে হবে। বেশ্যাবৃত্তি এই নীতির বিরুদ্ধে অন্যায় করে বলেই ওই প্রথা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। বেশ্যাদের যদি যথাযথ মর্যাদাও দেওয়া হয় ... তথাপি এই প্রথা কাম্য হতে পারে না।[৭৮]

তবে খুব বিরল হলেও এই সম্পর্কের মধ্যে নর-নারীর পরস্পরকে তৃপ্ত করার ব্যাপার ঘটে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সম্পর্ক থেকে দুজনের মধ্যে গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী প্রেম গড়ে ওঠে যা অনেক সময় বিয়েতেও গড়ায়। অন্যদিকে কঠোর একগামীতার মধ্যে থেকে নর-নারী উভয়েই যৌন-একঘেয়েমী ও হতাশায় ভুগতে পারে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অবাণিজ্যিক যৌনসম্পর্ক করা সম্ভব না হলে বাণিজ্যিক সম্পর্কও অনেক সময় একটি পর্যায় পর্যন্ত পরিতৃপ্তি দিতে পারে।[৭৯]

আধুনিক মানুষের নৈতিকতার দিক থেকে গণিকাবৃত্তি সম্পর্কে যে আপত্তির কথা বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি এখানে আসতে পারে নারীমুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে। জৈবিক ও সামাজিক উভয় কারণে গণিকাবৃত্তি এখনও মূলত নারীদেরই ব্যাপার। এই বৃত্তির মাধ্যমে সমাজে 'যৌনবস্তু' হিসেবে নারী ও নারী-শরীরের ভাবমূর্তি পাকাপোক্ত হয়। এ ধারণাও পাকাপোক্ত হয় যে, নারীর 'আসল সম্পদ' হল তার শরীর বা যৌনতা। যা মানবিক সত্তা হিসেবে তার জন্যে সম্মানজনক নয়। নারী যখন কোনো পেশায় যায় অনেক ক্ষেত্রেই তার যৌন-আবেদন পেশাগত দক্ষতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। পেশায় টিকে থাকা এবং উন্নতির জন্য পুরুষের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহ বিকোতে হয় নারীকে। এমনকি প্রেম ও বিয়ের ক্ষেত্রেও নারী একরকম গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয় যখন সে যৌন বা মানসিক আকর্ষণ থেকে সঙ্গী নির্বাচন না করে সঙ্গীর অর্থ বিত্ত ও প্রতিপত্তির কাছে বিক্রি হয়। যেসব সমাজে এখনও নারীর যৌনসঙ্গী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা নেই সেখানে পরিবারের পক্ষ থেকেই এই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈরী পরিবেশে এবং কঠিন জীবন সংগ্রামের প্রতুকূলতায় টিকে থাকার জন্য যৌনতার বিপণন অনেক ক্ষেত্রেই নারীর জন্য সহজতর অবলম্বন হয়ে যায়। জৈবিক সুবিধার কারণেই এটি তার জন্য সহজ। কিন্তু স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার পথে এই বৃত্তি তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়।

---

৭৮ বার্ট্রান্ড রাসেল: *বিবাহ ও নৈতিকতা*; অনু: আরশাদ আজিজ; বাংলা একাডেমি ঢাকা; মে ১৯৯৮; পৃ: ৬২।

৭৯ Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline M. Golding: ibid

‘বিকল্প জীবনধারা’

> (বিবাহিত জীবনে) দৈহিক পরিচয় এক সময় আসক্তির ধার ভোতা করে দেয়। তখন অন্য কাউকে খোঁজা বাস্তব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়, নতুবা তার মধ্যে পূর্বের আবেগ ও আসক্তি কাজ করে না। অবশ্য নৈতিকতার স্বার্থে এই তাড়না নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কিন্তু তাড়না দূর করা দুরূহ ব্যাপার।[৮০]
>
> বার্ট্রান্ড রাসেল
> বিবাহ ও নৈতিকতা

> আমাদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে, পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তি দিয়ে আমরা বুঝেছি...আসলে পরীক্ষামূলক যৌনতা বিয়েকে ধ্বংস করে না, বরং এর সঙ্গে নিত্য যে মিথ্যে এবং লুকোচাপা থাকে সেটাই আসল দোষী। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ইচ্ছে হলে অন্য যৌনসঙ্গীর সঙ্গে শোবার জন্য পরস্পরকে অনুমতি দেবার।[৮১]
>
> গুয়েসিস ডেভিস এবং রুবি ডিই
> On Open Marriage

১৯২৯ সালে দার্শনিক ও গণিতবিদ বার্ট্রান্ড রাসেলের বিখ্যাত বই Marriage and Morals প্রকাশিত হয়। সে সময়ের তুলনায় বইটি ছিল অত্যন্ত সাহসী একটি রচনা। ওই সময় নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকা বইটিকে ‘‘একটি ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং উস্কানিমূলক বই’’ (An audacious and provocative book) বলে বর্ণনা করেছিল। নর-নারীর যৌনতা সম্পর্কে গভীর চিন্তা-প্রসূত এ বইয়ে রাসেল ভবিষ্যৎবাণী করেন—‘‘মানুষ যত বেশি সভ্য হবে ততই তার পক্ষে একই সঙ্গী বা সঙ্গীনী নিয়ে গোটা জীবন কাটানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।’’[৮২] তিনি লক্ষ্য করেছিলেন দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে নর-নারীর মধ্যে দৈহিক আসক্তি প্রাবল্য ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। তখন অনেকেরই যৌনজীবনে বৈচিত্র্য এবং পরিপূর্ণ যৌন-পরিতৃপ্তির জন্য অন্য সঙ্গীর প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। পুরনো সঙ্গীর প্রতি সত্যিকারের আবেগ ও আসক্তি কাজ করে না। এটি কেবল পুরুষ নয়, নারীর ক্ষেত্রেও সত্যি। সামাজিকতা ও নৈতিকতার স্বার্থে বেশিরভাগ নারী-পুরুষ এই তাড়না নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিশেষত নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের তাড়নাকে সম্পূর্ণ অবদমন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অবদমিত যৌনতাড়না বিপুল শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। সুযোগ

---

৮০ বার্ট্রান্ড রাসেল: প্রাগুক্ত, ৫৬

৮১ Sheri & Bob Stritof: Ossie Davis and Ruby Dee On Open Marriage; About.com Guides, http://marriage.about.com

৮২ বার্ট্রান্ড রাসেল: প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫।

পেলেই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। রাসেল পর্যবেক্ষণ ও প্রজ্ঞা দিয়ে অনুমান করেছিলেন, যৌনতার ওপর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের নিগড় যত শিথিল হতে থাকবে কঠোর একগামীতা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ ততই বাড়তে থাকবে। তত বেশি হারে নারী-পুরুষ একগামীতার সীমা অতিক্রমের দিকে এগিয়ে যাবে। তাঁর এই অনুমান সত্য হতে বেশি দিন লাগেনি।

১৯৬০ এর দশকে 'যৌন-বিপ্লবের' পর থেকেই পশ্চিমা দেশগুলোতে যৌনতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর সমাজ ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ অনেক কমে যাওয়ায় পাল্টে যায় নর-নারীর যৌনজীবন। দাম্পত্য জীবনের যৌন-অসন্তোষ ও অপূর্ণতাকে আর আগের মতো মেনে নিতে পারছিলেন না অনেক বিবাহিত নর-নারী। গত শতাব্দির শেষ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালানো এক সামাজিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্বামীদের মধ্যে শতকরা ৩৭ ভাগ এবং স্ত্রীদের মধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ স্বীকার করেছেন যে তাঁদের বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক রয়েছে।[৮৩] প্রথম বিয়ের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের হার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ।[৮৪] পরিবারিক অস্থিতিশীলতা এবং সন্তানদের প্রতি অবহেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।[৮৫] বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক এবং বিচ্ছেদ এই দুটি ব্যাপারেই প্রধান কারণ স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি 'দৈহিক আকর্ষণ ভোতা হয়ে' আসা এবং একগামী সম্পর্কের বাইরে যৌনতাকে প্রসারিত করার তীব্র আকর্ষণ। আমরা ধরে নিতে পারি, বিবাহিত নর-নারীর মধ্যে যারা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্কের মধ্যে যায়নি তাদেরও একটি বড় অংশের মধ্যে একগামীতার গণ্ডি অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

বিয়ের মূল উদ্দেশ্য সন্তান পালন। এ সম্পর্কের মধ্যে নর-নারীর বন্ধন সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে যৌনতা। বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক শুধু বিবাহিত সম্পর্কে ফাটল ধরায় তা নয়, পরিবারের শান্তি ও সন্তানের উপযুক্ত যত্ন ও লালন-পালনেও প্রভাব ফেলে। এ রকম পরিস্থিতিতে পশ্চিমা দেশগুলোর বিবাহিত নর-নারীর একটি অংশের দাবি, স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে 'ভালোবাসা' বা আবেগময় সম্পর্ক বজায় রেখেও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক সম্ভব হলে তা এক দিকে দাম্পত্য সম্পর্কের সংকট এবং অন্য দিকে পারিবারিক অস্থিতিশীলতা এবং সন্তানদের প্রতি অবহেলা ইত্যাদি সমস্যাও দূর

---

৮৩ Dr. Curtis Bergstrand, Ms. Jennifer Blevins Williams, Department of Sociology, Bellarmine University: Today's Alternative Marriage Styles: The Case of Swingers; *Electronic Journal of Human Sexuality*, Volume 3, Oct. 10, 2000; www.ejhs.org

৮৪ Dr. Curtis Bergstrand, Ms. Jennifer Blevins Williams: ibid

৮৫ Edward M. Fernandes: The Swinging Paradigm: An Evaluation of the Marital and Sexual Satisfaction of Swingers; *Electronic Journal of Human Sexuality*, Volume 12, January 23, 2009; www.ejhs.org

করতে পারে।[৮৬] গত দুই দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব অঙ্গরাজ্য, কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশে জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে ব্যাপকভাবে এক বিকল্প বিবাহ পদ্ধতি (Alternative Marriage Styles) বা ''বিকল্প জীবন ধারা'' (Alternative life style) দেখা যাচ্ছে। কথ্য ভাষায় একে বলা হচ্ছে দোলাচল (Swinging)। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌনসম্পর্ক এবং আবেগময় সম্পর্ক (ভালোবাসা, স্নেহ ইত্যাদি) বজায় রেখে উভয়ের সম্মতিতে ভিন্ন পুরুষ বা নারীর সাথে যৌনসম্পর্ক করার মাধ্যমে বিবাহিত জীবনের সুখ ও বন্ধনকে দৃঢ় করার পদ্ধতি হলো এই নতুন 'জীবন ধারা'। ১৯৫০-৬০ এর দশকের 'বউ বদল' (wife-swapping) কিংবা ১৯৭০ দশকের 'খোলামেলা বিয়ে' (open marriages) ইত্যাদির সঙ্গে মিল থাকলেও একে পরিবার ও সন্তানের প্রতি আরও দায়িত্বশীল একটি পদ্ধতি বলে দাবি করেন একটি গোষ্ঠী।[৮৭]

> দোলাচল সাধারণত ঘটে স্বামী বা স্ত্রীর উপস্থিতিতে, অভিজ্ঞতাটির ব্যাপারে উভয়ের সম্মতিতে। দোলাচলে অংশগ্রহণকারী নারী-পুরুষ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়, কিন্তু এখানে এমন বিধিনিষেধ আছে যে, স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া কারও সঙ্গে আবেগময় সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে না। যদিও দোলাচলে নারী-পুরুষ স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গম করে থাকে, এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা দাবি করেন এটি তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আবেগময় ও যৌন উভয় সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে। যৌনতার বৈচিত্রের প্রতি তাদের অন্তর্গত কামনাকে বিবাহিত নর-নারী সাধারণত তাদের স্বামী বা স্ত্রীর কাছে গোপন রাখে (সঙ্গীর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে এই কামনা চরিতার্থ করে)। কিন্তু দোলাচলে এই গোপনীয়তা ও অবিশ্বস্ততাকে দূর করার মাধ্যমে যুগলটি কোনো গ্লানি বা অপরাধবোধ ছাড়াই তাদের (বহুকাঙ্ক্ষিত ও অনাস্বাদিত) যৌনবাসনাকে উন্মোচিত করতে পারে।[৮৮]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে এই বিকল্প জীবন ধারার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক। এদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, এই জীবন ধারার মানুষেরা তাদের বিবাহিত জীবনে এবং জীবন সম্পর্কে সন্তুষ্টির দিক থেকে মূল জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি তৃপ্ত।[৮৯] এরা মার্কিন জনগোষ্ঠীর ব্যতিক্রমী কেউ

৮৬ Edward M. Fernandes: The Swinging Paradigm: An Evaluation of the Marital and Sexual Satisfaction of Swingers; Electronic Journal of Human Sexuality, Volume 12, January 23, 2009; www.ejhs.org

৮৭ Edward M. Fernandes: ibid

৮৮ Edward M. Fernandes: ibid

৮৯ Edward M. Fernandes: ibid

নয়। বেশিরভাগ সাদা চামড়ার, মধ্যবয়সী, চার্চে যাওয়া উচ্চ-শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। যৌনতা ও বিয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় এরা কম বর্ণবাদী, কম পুরুষতান্ত্রিক এবং কম সমকামীতা-বিরোধী।[৯০] অর্থাৎ যৌনতার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উদার ও সংস্কার-মুক্ত মানুষেরাই এই বিকল্প জীবনধারা গ্রহণ করছে। অংশগ্রহণকারী যুগলদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষেরাই প্রথম তাদের সঙ্গীনীর কাছে এরকম একটি সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েছে। এখানে পুরুষদের প্রায় সবাই বিষমকামী। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, নারীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি উভকামী এবং খুব অল্প সংখ্যক বিষমকামী।[৯১] এই উপাত্ত থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, পুরুষের ক্ষেত্রে দোলাচলে অংশ নেওয়ার মূল আগ্রহ অধিক-সংখ্যক যৌনসঙ্গীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করা। অন্য দিকে নারীর মূল আগ্রহ যৌন-বৈচিত্র ও যৌন-ফ্যান্টাসির চরিতার্থতা। দোলাচলে উভকামী নারীরা অনেকাংশে তাদের সমকামী বাসনা এবং সমকামী ফ্যান্টাসির চরিতার্থতার সুযোগ পায়।

বিধিনিষেধ এবং নেতিবাচক ধারণা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজ মানুষের মধ্যে যে মাত্রায় যৌন-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তা মানুষের যৌনবাসনার স্বতঃস্ফূর্ততাকে বাধাগ্রস্ত করে। বিবাহিত জীবনের কঠোর একগামীতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে যৌন-অপূর্ণতা থাকলে তাকে প্রশমিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এটি নারীর জন্য যতটা দুরূহ, পুরুষের জন্য ততটা নয়। স্ত্রীর দিক থেকে যৌনমিলনে কোনো অক্ষমতা থাকলে বেশিরভাগ পুরুষ এবং নারীও (অনেক ক্ষেত্রে তার স্ত্রীও) মনে করে এক্ষেত্রে পুরুষের বিবাহবহির্ভূত যৌনতা 'দোষের কিছু নয়'। কিন্তু স্বামীর অক্ষমতা থাকলে সাধারণত কোনো স্বামী এবং সমাজের বেশিরভাগ মানুষ নারীর বিবাহবহির্ভূত যৌনতাকে মেনে নিতে পারে না। কেবল বৈচিত্রের জন্য কোনো মেয়ে স্বামী ছাড়া অন্য কারও যৌনসংসর্গে যাবে এটা এখনও পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের মানুষ মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে এখনও বেশিরভাগ মানুষ এই বিকল্প জীবনধারার কথা শুনে আৎকে ওঠেন। এও ঠিক যে, এই জীবনধারায় পুরুষের চেয়ে নারীর অংশগ্রহণেই বেশি আৎকে ওঠার ঘটনা ঘটে। কারণ সেটা পুরুষতন্ত্রকে বেশি আঘাত করে।

যৌন-ঈর্ষা মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। কিন্তু মানুষের সমাজে যৌন-বিধি-বিধান এবং যৌন-নিয়ন্ত্রণ যৌন-ঈর্ষাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, পুরুষ ও নারীর যৌন-ঈর্ষা একরকম নয়। নারীর বড় আপত্তি, তার সঙ্গীর অন্য কারও সঙ্গে আবেগময় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায়। অন্যদিকে

---

৯০ Dr. Curtis Bergstrand, Ms. Jennifer Blevins Williams: ibid

৯১ Dr. Curtis Bergstrand, Ms. Jennifer Blevins Williams: ibid

পুরুষের কাছে সঙ্গীর আবেগময় সম্পর্কের চেয়ে অন্য কারও সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক বেশি আপত্তিজনক। তাই মনে হয়, বিকল্প জীবনধারায় পুরুষের পক্ষেই ঈর্ষা অতিক্রম করা বেশি কঠিন। অবশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর প্রযুক্তি আছে বলে এই ঈর্ষাও আগের মতো থাকার কথা নয়। আর নারীর জন্য বেশি কঠিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধি নিষেধ এবং ধারণাগত শৃঙ্খল ডিঙ্গানো, যা তার ওপর পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় রয়েছে।

প্রচলিত বিবাহিত সম্পর্কের চেয়ে এই জীবন ধারায় লিঙ্গবিভেদ এবং সামাজিক অবদমনের মাত্রা অনেক কম। পুরুষতান্ত্রিক বিধিনিষেধ যত কেটে যাচ্ছে এবং মানুষ যত পশ্চাৎপদ ধারণা ও কু-সংস্কার থেকে মুক্ত হচ্ছে ততই সরে যাচ্ছে বিবাহ প্রথার দমনমূলক ও নেতিবাচক দিকগুলো। বিকল্প জীবনধারা এখনও মানব প্রজাতির খুব নগন্য একটি অংশের আচরিত জীবনধারা। আমাদের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে বিভিন্ন ধরণের যৌথ বিয়ের নিদর্শন আছে। এই নতুন জীবনধারাও অতীতের মতো অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গৃহীত হবে কি না তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে ভবিষ্যতের মানুষ কীভাবে সন্তান পালনের স্বার্থে একগামী সম্পর্ক বজায় রেখেও অধিক যৌন-সন্তুষ্টির জন্য বর্ধিত বিভিন্ন সম্পর্ক গড়ে তুলবে তার ইঙ্গিত দেয় এই বিকল্প জীবনধারা। পুরুষের তুলনায় নারীর যৌনতার ওপর চেপে থাকা বিধিনিষেধ ও অবদমন কাটিয়ে নারীও ভবিষ্যতে যৌন-উপভোগের মুক্ত প্রান্তরে উপনীত হতে পারবে সে ইঙ্গিতও আমরা এখানে পাই। এই নতুন জীবন ধারা আমাদের বলে দেয়, সন্তান পালনের স্বার্থেই দীর্ঘমেয়াদী যৌনসম্পর্ক হিসেবে বিবাহ প্রথা সুদূর ভবিষ্যতেও মানুষের সমাজে টিকে থাকবে, হয়ত ভিন্নরূপে।

শেষ কথা

> যৌনতা হল এমন এক সংসক্তি যা বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে দুটি ভিন্ন জাতের মানুষকে একত্রে রাখে। দুই লিঙ্গের মধ্যে সব সময় একটি টানাপোড়ন থাকে, যার উৎস প্রজননে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের বিনিয়োগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই টানাপোড়েন ভালোবাসাময় সম্পর্কে রূপ নেয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এর পরিণতি হয় ভীতি, অসাম্য, তিক্ততা এমনকি নিষ্ঠুরতা।[৯২]
>
> ম্যালকম পট ও রজার শর্
> Ever Since Adam and Eve

আমাদের যৌনতা কেমন করে বিবর্তিত হয়েছে তা বুঝতে পারা অত্যন্ত

৯২ Malcolm Potts and Roger Short: ibid p-102

> চিত্তাকর্ষক ব্যাপার শুধু ওই বিষয়টির জন্য নয়। (জীবজগতে) আমাদের অন্যান্য স্বাতন্ত্র্যসূচক মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার জন্যেও। এই বৈশিষ্ট্য-গুলোর মধ্যে রয়েছে আমাদের সংস্কৃতি, বাকশক্তি, মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক এবং জটিল হাতিয়ার ব্যবহারের মুনশিয়ানা। যদিও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এসব বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের কারণ হিসেবে আমাদের বৃহদাকার মস্তিষ্ক ও সোঁজা হয়ে দাঁড়ানোকে উপস্থাপন করে থাকেন, এ ব্যাপারে আমার ভিন্নমত হল আমাদের উদ্ভট প্রকৃতির যৌনতা এসব বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনের জন্য অপরিহার্য ছিল।[৯৩]
>
> জ্যারেড ডায়মন্ড
>
> Why Is Sex Fun? The Evolution Human Sexuality

মানুষ এমন এক প্রজাতি যার টিকে থাকতে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতম এবং দীর্ঘতম সম্পর্কের প্রয়োজন। কারণ সন্তান পালনের জন্য নর-নারীকে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি সময় দিতে হয়। যে বিষয়টি মানুষের সন্তানের মা-বাবার মধ্যে দীর্ঘ সময়ের বন্ধনকে ধরে রাখে তা হচ্ছে যৌনতা। প্রাকৃতিক নির্বাচন নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনতার মধ্যে এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যাতে তাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী এবং গভীর যৌনসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন এক 'অন্ধ ঘড়ি-নির্মাতা' (Blind Watchmaker) যার নির্মাণ কখনোই নিখুঁত নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন এক দিকে নারী-পুরুষের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যগুলোর উদ্ভব ঘটিয়েছে। অন্যদিকে প্রজননে তাদের বিনিয়োগের মাত্রা করেছে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতাই তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিরোধের বীজ। নর-নারীর যৌনসম্পর্কের এই জৈবিক ভিত্তিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত করেছে সামাজ ও সংস্কৃতি। জৈবিক সত্তা হিসেবে যৌনজীবনে নর-নারীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে বিভিন্ন সময়ে মানুষের সমাজ বিভিন্নভাবে সেই সংঘাতকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে চেয়েছে। আমাদের জানা ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়েই এই নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ও সমাজের। অতএব, সমাজ ও সংস্কৃতির এই নিয়ন্ত্রণ ও দমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে। এর পাশাপাশি যৌনতাকে 'নেতিবাচক', 'খারাপ' ও 'ক্ষতিকর' বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে নারী-পুরুষ উভয়ের জৈবিক যৌনতাকে বিশেষ সংকটের মধ্যে ফেলেছে এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও দমন পুরুষকে কিছু কিছু সুবিধা দিলেও নারীর উপর আরোপিত হয়েছে বৈষম্য, একপেশে অবদমন এবং নিপীড়ন।

---

৯৩ Jared Diamond: *Why Is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality*; published by basic books, A member of perus book group, 1997 - from preface.

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখি, যৌনতার ওপর কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নারী-পুরুষ উভয়ের মানবিক স্বাধীনতাকে আক্রান্ত করেছে এবং তাদের যৌন-সম্পর্কের স্বতঃস্ফূর্ততা ও পারস্পরিকতাকে অনেকাংশে ধ্বংস করে ফেলেছে।

মানুষের সমাজের যৌন-বিধিনিষেধ প্রজাতির টিকে থাকার স্বার্থে উদ্ভূত কোনো বিষয় নয়। বরং শ্রেণী-সম্পর্ক, লিঙ্গবৈষম্যমূলক সংস্কৃতি, ধর্ম এবং পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। এসব বিধি-নিষেধের সঙ্গে মানুষের জৈবিক যৌন-প্রবণতার দ্বন্দ্বময় মিথষ্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের যৌনসম্পর্ক। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে প্রশ্নের সম্মুখিন হচ্ছে প্রচলিত যৌনসম্পর্ক ও এ সংক্রান্ত ধারণাগুলো। পুরনো সমাজ সম্পর্কগুলো যত বেশি প্রশ্ন ও বিরোধিতার সম্মুখিন হচ্ছে, ততই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে প্রচলিত যৌনসম্পর্কের ভিত। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভবের পর মানব সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার যে ধারণার উন্মেষ ঘটে তারই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য মানবিক বৈষম্যেও মত লিঙ্গ-বৈষম্যেরও অবসান করার মানবিক দাবী উঠতে থাকে। অধিকতর মুক্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের স্বার্থে যৌনসম্পর্ক সংক্রান্ত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানকে নানাভাবে অতিক্রম করতে থাকে আধুনিক মানুষ। গোঁড়া ধার্মিক ও রক্ষণশীলদের জন্য ব্যাপারটি স্বস্তিকর নয়। পুরানো সম্পর্ক এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসগুলোকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে বিভিন্ন 'যৌক্তিক' চেষ্টায় সক্রিয় আছে বিভিন্ন রক্ষণশীল মহল। যৌনসম্পর্কগুলোর বিদ্যমান রূপকে প্রাকৃতিক এবং জৈবিক বলে প্রচার করলে এগুলোর 'যৌক্তিকতা' প্রমাণ করা এবং এগুলোকে ওই অবস্থায় টিকিয়ে রাখা সহজ হয়।

মানুষের সামাজিক জীবনে যৌন-বিধিনিষেধের প্রয়োজন কতটা তা নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। অনেকের ধারণা যৌন-স্বাধীনতা মানুষের সমাজ জীবনে অরাজকতা এবং 'নারীর সম্মানের অবমাননা' ঘটাবে। এখানে নারীর সম্মানের যে ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'সম্মান'। পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজ নারীর সম্মান বলতে তার 'সতীত্বকে' বুঝিয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে কঠোর একগামীতাকে যৌন-নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করলেও পুরুষের জন্য বহুগামীতার দরজা খোলা রাখে। একাধিক বিয়ে, বিবাহ বহির্ভূত অন্যান্য যৌনসম্পর্ক, গণিকালয়ে গমন ইত্যাদি নানা উপায়ে অধিকাংশ পুরুষই বহুগামী সম্পর্কের দিকে যায়। নারী এত সহজে বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্কে যেতে পারে না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চক্করে পড়ে অসংখ্য নারী শেষ বিচারে তার একগামীতাকেও রক্ষা করতে পারে না। নারীর নিয়তি হয়ে ওঠে হয়

বলাৎকার বা নিপীড়নমূলক যৌনতার শিকার হওয়া অথবা গণিকাবৃত্তি বা অন্য কোনোভাবে নিজের শরীর 'বিক্রি'। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং কর্মদক্ষতা দিয়ে সমাজে আসন করে নেয়। এ বিষয়টি নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে এক রকম নয়। এখনও অধিকাংশ নারীর সামাজিক অবস্থানের জন্য যৌন-আবেদন একটি মুখ্য ব্যাপার। যৌন-আবেদন প্রয়োজন হয় এমন পেশায় নারীর চাহিদা প্রায় একচ্ছত্র, যেমন– মডেলিং, রিসিপশনিস্ট, টেলিভিশনের উপস্থাপিকা ইত্যাদি। প্রেম ও বিয়ের মতো দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে যেখানে উভয়ের সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে সেখানেও নারীর ক্ষেত্রে যৌন-আবেদন এবং পুরুষের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাধান্য পায়।

প্রকৃতিতে পুরুষ প্রাণীর জন্য যৌনসঙ্গী জোগাড় করা অনেক কঠিন। মানুষের সমাজে নারীর যৌনতার উপর যে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আছে তাতে পুরুষের জন্য যৌনসঙ্গী জোগাড় করা সহজ হয়ে গেছে। আমাদের দেশসহ প্রাচ্যের অনেক সমাজেই নারী ঋতুমতি হওয়ার পরই তাকে তাড়াতাড়ি 'বিয়ে দেওয়ার' ব্যাপারে তার পরিবারের উপর সামাজিক চাপ থাকে। এদেশের গ্রামাঞ্চলে এবং নিম্নবর্গের মানুষের ক্ষেত্রে এখনও ঋতুমতি হওয়ার পরই মেয়েকে 'পাত্রস্থ' করতে পরিবার খুব সচেষ্ট থাকে। ফলে বিষয়টি প্রকৃতিতে অন্যান্য প্রাণীর জীবন থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতিতে স্ত্রী-প্রাণীর চাহিদা বেশি হলেও এখানে দেখা যায় পুরুষের চাহিদা বেড়ে গেছে। পুরুষের চেয়ে নারীর জন্য স্থায়ী যৌনসঙ্গী জোগাড় করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে গেছে। স্থায়ী যৌনসঙ্গী জোগাড় করার জন্য নারীর পরিবারের পক্ষ থেকে পুরুষকে দিতে হচ্ছে নানা উপঢৌকন (যৌতুক)।

''আধুনিক বিশ্বে আমরা কীভাবে আচরণ করব বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান (Evolutionary Biology) আমাদের তা শেখায় না। কিন্তু আমরা কেন একটি নির্দিষ্ট রূপে আচরণ করি সে ব্যাপারে অর্ন্তদৃষ্টি গড়ে দেয়।''[৯৪] আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীদের ধারণা আমাদের যৌনতা বিবর্তনের মাধ্যমে এতটা বিশেষায়িত হয়েছে যে, এটা শুধু প্রজনন নয়, মানুষের ভাষা সংস্কৃতিসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর উদ্ভব ঘটিয়েছে। একটি জনগোষ্ঠীতে যৌনতার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অর্ন্তদৃষ্টি দেয় বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান। জীবিত প্রাণীদের মধ্যে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি দুটি প্রজাতি হচ্ছে সাধারণ শিম্পাঞ্জি ও বনোবো। বিবর্তন বৃক্ষে এরা পরস্পরও একে অন্যের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রজাতি। কিন্তু আফ্রিকার কঙ্গোতে জায়ারে নদীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে বসবাসরত এই দুই প্রাজাতির নরবানর যৌন-আচরণ এবং সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন। শিম্পাঞ্জি সমাজে রয়েছে পুরুষাধিপত্য। বিরোধ প্রায়ই রূপ নেয় হুমকি

৯৪ Malcolm Potts and Roger Short: ibid p-310

ও সংঘর্ষে। স্ত্রী শিম্পাঞ্জি স্ত্রী বনোবোর তুলনায় অনেক বেশি একাকী জীবন কাটায়। স্ত্রী-সঙ্গীকে অধিকারে আনার জন্য পুরুষ শিম্পাঞ্জিদের বিরোধ প্রায়ই রূপ নেয় হুমকি ও সংঘর্ষে। যৌনতা অনেকাংশেই প্রজননের সফলতার জন্য। পুরুষেরা প্রায়ই স্ত্রী প্রাণীকে নিজের অধিকারে রাখে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের শিশু হত্যা করে।

অন্যদিকে বনবো বা পিগমি শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে রয়েছে গভীর সামাজিক বন্ধন। সংঘর্ষ নেই বললেই চলে। এর পেছনে রয়েছে তাদের সমাজের বাধাহীন যৌনতা। যৌনতাকে এরা ব্যবহার করে তাদের দলীয় বন্ধন দৃঢ় করা এবং সংঘর্ষ কমানোর জন্য। যথেচ্ছ যৌনমিলনের কারণে সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। তাই এদের সমাজে শিশুহত্যা নেই। সাধারণ শিম্পাঞ্জি এবং বনোবো শিম্পাঞ্জির যৌনতার পার্থক্যের কারণ তাদের বিবর্তনিক অতীতের মধ্যেই আছে। আমরা সে দিকে যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের নিকটতম আত্মীয় এ দুটি প্রজাতির সমাজ কাঠামো দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে, যৌন-সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি যূথবদ্ধ একটি প্রজাতির সমাজ কাঠামো গঠনের মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। হার্ডির পর্যবেক্ষণ হলো, হনুমান স্ত্রী প্রাণীরা বহুসংখ্যক পুরুষ প্রাণীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করে তাদের সন্তানের ওপর পুরুষ-প্রাণীর আগ্রাসন কমানোর জন্য।[৯৫] কারণ যে পুরুষ তার সঙ্গে সঙ্গম করে সে সাধারণত তার সন্তানের ওপর হিংসাত্মক হয় না।

অর্থাৎ আমরা দেখছি যূথবদ্ধ জীবন জীবের ক্ষেত্রে যৌন-প্রতিবন্ধকতা বা যৌন-বিধিনিষেধ নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত অবাধ যৌনতাই শান্তিময় এবং ইতিবাচক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা আদিবাসী মানুষের জীবনে এ বিষয়টির নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যৌন-প্রতিবন্ধকতাগুলো যেহেতু পুরুষের চেয়ে নারীর ওপর বেশি মাত্রায় চাপানো হয়েছে, এগুলো দূর করা নারীর মুক্তি ও মানবিক বিকাশের জন্য বেশি সহায়ক হবে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সমাজ মানুষের ওপর যে কঠোর যৌন-প্রতিবন্ধকতা চাপিয়েছে তা নানাভাবে প্রভাবিত ও বিকৃত করেছে নর-নারীর স্বতঃস্ফূর্ত যৌনসম্পর্ককে।

মানব ইতিহাসে যৌনতার ওপর আরোপিত নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা থেকে গত দেড়শো বছর ধরে মানুষ সচেতনভাবে ও ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়েছে। মানুষের সচেতন উদ্যোগ যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তা কেবল সামাজিক ক্ষেত্রে নয়। জৈবনিক বিষয়গুলোও পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন দ্বারা। যৌনতার ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকর কৌশল, লিঙ্গ পরিবর্তন ও যৌন-আকর্ষণ বৃদ্ধির শল্য চিকিৎসা ইত্যাদি অনেক ধরনের বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল

---

৯৫ P.M.R. Clarke, S.P. Henzi, L. Barrett: Sexual conflict in chacma baboons, Papio hamadryas ursinus: absent males select for proactive females; *Animal Behaviour* 25

মানুষের যৌনসম্পর্কের নিয়তিকে নতুন করে নির্মাণ করছে। টেলিযোগাযোগের ব্যাপক উন্নতি ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগের যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করেছে তা ভবিষ্যতে নর-নারীর যৌনসম্পর্ককে ব্যাপকভাবে পাল্টে দিতে সহায়তা করবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ পৃথিবীতে আমাদের এমন অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিবর্তন যার জন্যে আমাদের প্রস্তুত করেনি। আশার কথা, বেশিরভাগ পরিবর্তনই মুক্ত এবং আরও মানবিক সম্পর্কের পক্ষে। উদারনৈতিক সমাজগুলোতে যৌন-প্রতিবন্ধকতা কেটে যাওয়াতে গড়ে উঠছে অতীতের চেয়ে অধিক মানবিক যৌনসম্পর্ক এবং তারই প্রভাবে নারীর জন্য অধিক মানবিক এক সমাজ। মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যে যে পরিবর্তন অত্যন্ত ইতিবাচক ও প্রয়োজনীয়।

এই রচনাটির আদি পাঠ ২০১২ সালে *বিজ্ঞান চেতনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে লেখক কর্তৃক অতি সম্প্রতি পরিমার্জিত পাঠ ছাপা হলো।

সম্পর্ক-সন্ধিৎসা: স্বাধীনতাশীল পাঠ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ

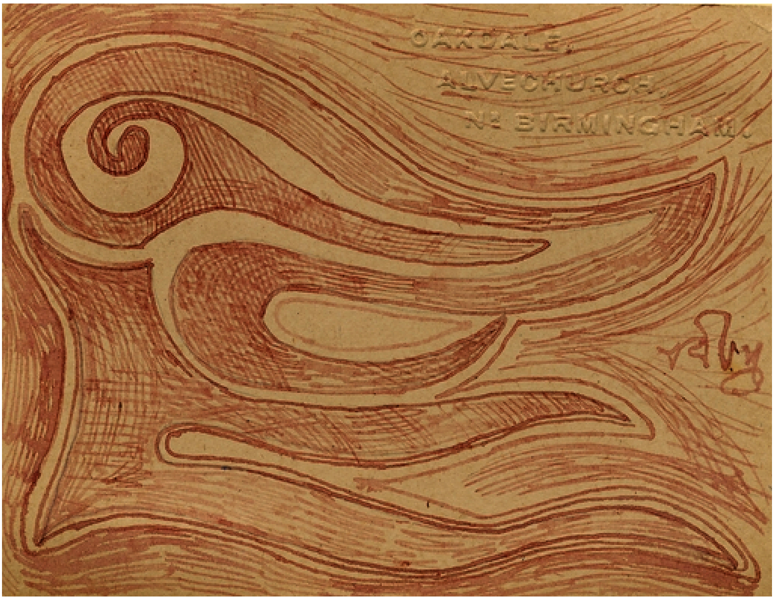

Rabindranath Tagore

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে প্রকৃত প্রণয় মস্তকে দিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলে লোকে সহসা মনে করিতে পারে লেখক চর্বিতচর্বন করিবেন, কতকগুলি গিলিত পদার্থের উদ্‌গার করিবেন। বাস্তবিক এরূপ আশঙ্কা অমূলক বা অসংগত নহে। ইউরোপে এ পর্যন্ত কত লোকে যে প্রণয়-শীর্ষক রচনা লিখিয়াছেন বলা যায় না। গ্রীসে বিদ্যাচর্চার প্রাতরুণোদয় আরম্ভ করিয়া গত শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় যে-কেহ লেখনী ধারণ করিয়া যশোলাভ করিতে গিয়াছেন, যে-কেহ মানব সমাজের মনোরঞ্জন করিতে গিয়াছেন, তিনিই প্রণয়ের উপর কিছু-না-কিছু লিখিয়াছেন। এবং এক্ষণে বাংলায়ও অনেকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের দেশের প্রধানতম নবেল লেখক মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ অমানুষ প্রতিভাবলে মানব হৃদয়ের অভ্যন্তর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রণয়ের একটি আশ্চর্য সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আমরা লেখনী ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ মাত্র, আমরা লিখিতে গেলে যে লোকে চর্বিতচর্বণ মনে করিবেন তাহাতে লোকের

কোন দোষই নাই। কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, আমরা প্রস্তাবটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠ্য করিতে চেষ্টা করিব বলিয়াই এ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রকৃত প্রণয় বিষয়ে লিখিতে গেলে অনেকে আমাদের নিকট চাহিয়া বসিবেন প্রণয়ের লক্ষণ কি? আমরা বলিতেছি এরূপ লক্ষণ দিতে আমরা অসমর্থ। শুদ্ধ আমরাই অসমর্থ এরূপ বলি না, ইহার লক্ষণ হয় না। মনের প্রত্যেক বৃত্তির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লক্ষণ দিবার চেষ্টা বিফল। শাস্ত্রাভিজ্ঞ ভট্টাচার্য মহাশয়, ইউরোপীয় ফিলজফর মহাশয় রাগ করিবেন না– আমরা বলি এরূপ সূক্ষ্ম লক্ষণের দিন গিয়াছে। প্রণয়ের লক্ষণ হয় না কিন্তু প্রণয় এমনি জিনিস যে উহার লক্ষণের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের এল.এল.ডি. হইতে সামান্য কুলি পর্যন্ত প্রণয় কি তাহাও জানে, প্রণয়ের কি বেগ তাহাও অনুভব করে। কোন্ পণ্ডিত কবে লক্ষণ দিয়া প্রণয় বুঝাইতে গিয়াছেন? আর লক্ষণ দিয়াই বা তিনি কি বুঝাইয়াছেন? আর যাহা সকলেই বুঝিতে পারে তাহারই বা লক্ষণের প্রয়োজন কি?

প্রণয়ের লক্ষণ হয় না কিন্তু উহার বিবরণ দেওয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী লোকে প্রণয় হইতে অন্য মানস প্রবৃত্তির ভেদ নির্ণয় করিতে পারেন। এই ভেদ নির্ণয় আবশ্যক এবং আমরাও এ স্থলে এই ভেদ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রণয় একটি মানসিক কোন বিকার। একটি সুন্দর বস্তু দেখিলে আমরা যে তাহাকে ভালোবাসিতে চাই, শৈবলিনীর ন্যায় কোন একটি সুন্দর মুখ দেখিলে মির কাসিম পর্যন্ত গলিয়া যান, তাহা প্রণয় নহে। ভবভূতি তাহার নাম তারামৈত্রক বা চক্ষুবাসা দিয়াছেন। সে তারামৈত্রিক চক্ষুরাগ– প্রণয় নহে।

অনেক দিন একজনের সঙ্গে একত্র থাকিলে তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না, ছাড়িতে কষ্ট বোধ হয়, মনে মনে একটু কষ্ট হয় সে মানসিক বিকার প্রণয় নহে। অনেক স্থানে স্ত্রী ও স্বামী মনের মিল না থাকিলেও সাংসারিক অসুবিধার জন্য বা আবার কোথায় যাইব দূর হোক ছাই এই লইয়াই নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হইয়া থাকি এই ভাবে বাস করেন, সেটি প্রণয় নহে। অনেক অর্বাচীন লোক, আমাদের প্রাচীন কালের অনেক কবিই প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়পরতার এমনি অভেদ্য মিলন করিয়া দিয়াছেন যে উহাকে প্রণয় বলিতে আমাদের লজ্জা হয়। অনেকে রূপ তৃষ্ণার নাম প্রণয় বলিয়াছেন তাহাও প্রণয় নহে। বঙ্কিমবাবু তাহাকে মদন-বাণ বা পঞ্চশর বলিয়াছেন, বাস্তবিকও সে মদন-বাণ বা পঞ্চশর। সে প্রণয় নহে। প্রণয় নামে যে প্রবৃত্তি আছে তাহার কার্য এই, তাহার কারণ এই– একজন লোকের সঙ্গে আর-একজন অনেক দিন থাকিলে উহার আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গি, দোষ-গুণ, শ্বেত অংশ কৃষ্ণ অংশ দেখিয়া আপনার মনের সহিত অনেক বিষয়ে তাহার সহিত ঐক্য হয় ক্রমে তাহার সহিত একত্র বাস করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে না দেখিলে কষ্ট হয়, তাহার অদর্শনে

জগৎ শূন্যময় বোধ হয়, তাহার কথা কর্কশ হইলেও প্রণয়ীকর্ণে উহা সুধাধারা বর্ষণ করে। উহার দোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় না গুণও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল সে যেমন আছে সেই ভাবে তাহার সহিত এক হইয়া– চিরকাল এক হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। স্বর্গে যদি বিচ্ছেদ সম্ভাবনা থাকে তবে সে স্বর্গও অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। উহার কষ্ট হইলে আপনার দ্বিগুণ কষ্ট হয়, আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও উহার কষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হয়, শেষ উহার সামান্য সুখের জন্য আত্মবিসর্জনে ইচ্ছা হয়। এই স্থায়ী প্রবৃত্তি, এই স্থায়ী ঘনতর মনের বিকার, এই আত্মবিসর্জন– প্রণয়। তারামৈত্র, চক্ষুরাগ, রূপতৃষ্ণা, সৌন্দর্যস্পৃহা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নানা কারণে সহবাসের ইচ্ছা হয়, সেই সহবাস শেষ প্রণয়রূপে পরিণত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। আজি কোন কারণে সহবাস ইচ্ছা হইল কালি তাহারই বিপরীত কারণে তাহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতএব সহবাস প্রণয়ের কারণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। এবং কোথায় কারণ হইবে কোথায় না হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। প্রণয় এইরূপ পদার্থ, কেন হয়, কেন না হয় কেহই বলিতে পারে না। হইলে তৃপ্তি হয়, মোহ হয়, আনন্দসমুদ্র সুখসন্তান বোধ হয়, আত্মজ্ঞানরহিত হয়, স্বার্থপরতা একেবারে থাকে না, পরকে আপনার অপেক্ষা বড়ো দেখিতে হয়, প্রণয়ীর সহিত একাকার হইয়া আপনার স্বতন্ত্রতা লোপ হইয়া যায়, পরের জন্য আপনার জীবন সর্বস্ব বিসর্জন করাও অসীম সুখকর বোধ হয়।

প্রণয় প্রবৃত্তির বিবরণ দিতে গেলে আরো কত প্রবৃত্তির সহিত যে উহার ভেদ নির্ণয় করিতে হয় তাহার ঠিকানা নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, অনেক সময়ে অনেকের মনে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঙ্গে অন্য অন্য সু ও কু প্রবৃত্তি এমনি মিশ্রিত থাকে এমনি ঘনীভূত থাকে যে আপাতত উহাকে শুদ্ধ নির্লক্ষ [নির্লক্ষণ?] প্রণয় বলিয়া বোধ হয়; সেই স্থানে উহায় অবিমিশ্রণ অতি আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি অনেক কবিরা প্রণয় ও ইন্দ্রিয়পরতা এক নিশ্বাসে বর্ণনা করিয়াছেন। যে কবিতায় মনে গভীর ভাব, অনির্বচনীয় আন্তরিক চাঞ্চল্য, তাহাতেই দুর্দাম রুধির প্রবাহ, পঞ্চেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাসনা অনেক স্থানে দেখা যায়। এরূপ স্থলে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি অত্যন্ত আবশ্যক। প্রণয় আত্মার গুন, চিরস্থায়ী, ক্ষণিক নহে; মনের গুণ নহে, ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে, শরীরের নহে, বাহ্য জগতের নহে, একবিধ আত্মগুণাবলীপ্রণোদিত মানসের বিকার; আন্তরিক চাঞ্চল্য উহার অনুভাব মাত্র, কার্যমাত্র, অন্য কিছুতে অন্য কোন কার্যতেই উহার নির্ণয় হয় না, ঠিক নির্ণয় হয় না। বাহিরের যে সকল কার্য দেখিয়া আপাতত আমরা প্রণয় আছে বলিয়া মনে করি সে সকল কার্য প্রবাহের মূল অনুসন্ধান করিলে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহা আত্মার অপর গুণাবলী হইতে নিঃসৃত, সুতরাং তাহা প্রণয়কার্য কি না নির্ণয় হওয়া দুঃসাধ্য। এইজন্য কবিরা প্রণয় বর্ণনাস্থলে সর্ব প্রথম লোকের অন্তর-মধ্যে যান, সেখানকার গোপন ভাবগুলি খুলিয়া খুলিয়া

পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখান; ক্ষুদ্র কবিরা গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লন, বড়ো কবিরা একটি অপূর্ব বিস্তৃত বীচি-বিক্ষুব্ধ মানস-সমুদ্রের চিত্র প্রদর্শন করেন। নাটকে প্রকৃত ভাব জানাইবার স্থানশরীরের নহে, স্বগতবাণী বা সখী সংবাদ।

এই পর্যন্ত প্রণয় লইয়া গেল; শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, মানসমাত্র-গামী প্রণয়ের স্বভাবের উপর দুই-এক কথা বলা হইল। এখন সেই প্রণয়ের স্ফুর্তি হয় কখন? কোন্ সময়ে তাহার তেজের আধিক্য হয়? কোন্ সময়ে তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ থাকে? কোন্ সময়ে তাহার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে? কোন্ সময়ে? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে জানা চাহি কি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যের কোন্ ব্যাঘাত হয়, কোন সময়ে মানসিক প্রবৃত্তি সকল বর্ষাঘ্রাত পালি শস্যের ন্যায় সবল, সতেজ ও মনোবিমোহন মাধুর্য প্রাপ্ত হয়, কোন সময়ে তাহাদের কোনরূপ বৃদ্ধি ব্যাহত না থাকে, কোন্ সময়ে তাহারা স্বাধীন ভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে। বীজবপন করিয়া চাপা দিয়া রাখো, অঙ্কুর হইলেও হইতে কিন্তু সে অঙ্কুর কেবল শুকাইবার জন্য। নদীর স্রোত যেদিকে যাইতেছে তাহার অন্য দিকে লইয়া গেলে তাহার গতির লাঘব হইবে মাত্র। সেই-রূপ কোন স্ফূরণোন্মুখ মানসিক বৃত্তির মুখে যদি বাধা চাপানো যায় সে বৃত্তিটি হাপসিয়া যাইবে মাত্র। প্রণয়ের মুখে যদি অধীনতা পাথর চাপাও সে প্রণয়াঙ্কুরকে পিষিয়া ফেলিবে। বাড়িতে দিবে না, দিবে না।

প্রণয়ী যুগল যদি উভয়েই স্বাধীন হয়, কেহ কাহারো কোন অধীনতা স্বীকার না করে, উভয়ে আপন ইচ্ছায় উভয়কে ভালবাসে, কেবল ভালোবাসা ভিন্ন আর ভালোবাসায় কোন পার্থিব কারণ না থাকে, ক্রমে যখন সেই ভালোবাসা ঘনতর হইয়া আসে– সেই বিশুদ্ধ প্রণয়, সেইখানেই প্রণয়ের সর্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধি। এরূপ একটি চিত্র জগতে যদি মিলে তবে জগতে আর স্বর্গে কিছুই প্রভেদ থাকে না। এইরূপ একটি চিত্র যদি কল্পনায় অঙ্কিত করা যায় তাহাতেও বিমলানন্দ। যিনি এরূপ চিত্র আঁকিয়া জগতের লোককে দেখাইতে পারিবেন তিনিই প্রকৃত কবি। কিন্তু জগতে এরূপ চিত্র নাই কেন? জগতের লোকের অত্যাচারে, যে সমাজ বলিয়া জগতে এক বিধাতার অনির্মিত সৃষ্টি আছে, তাহার অত্যাচারে। যে সকল লোক সমাজ বলিয়া দৈত্য সৃজন করেন তাঁহারা জানিতেন উহাতে কুলোক শাসিত হইবে, কুপ্রবৃত্তির দমন হইবে, কুকার্য জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। কিন্তু সমাজ আমার পঞ্চানন্দ ঠাকুর, বড়ো ছেলেটির কিছু করিতে পারেন না, ছোটো ছেলেটির ঘাড় ভাঙেন। যাহারা কু তাহারা সমাজকে কদলী দর্শন করাইয়া কুকর্ম করে। তাহারা গোপনে করে, গোপন করে বলিয়া আরো অধিক দুষ্কর্ম করিতে পারে। সমাজ দেখিতে পান না বা দেখিতে পাইয়াও কিছু করিতে পারেন না। মাতা খান সুলোকের, সুপ্রবৃত্তিগুলিকে যুবড়া করিয়া রাখেন, তাহাদের জন্মাইতে দেন না, জন্মাইলে বাড়িতে দেন না, বাড়িলে প্রকাশ হইতে দেন না, প্রকাশ হইলে অঙ্গহীন করিয়া দেন। এরূপ অত্যাচারে দেবদুর্লভ

পবিত্র প্রণয় কোথায় মিলিবে? গোময় রাশি মধ্যে উজ্জ্বল হীরক কখনো কি মিলিয়া থাকে? পবিত্র বিশুদ্ধ নির্মল উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় প্রণয়ের উপর সমাজের প্রধান অত্যাচার বিবাহ প্রথা প্রচালন। ইহাতে যে একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা হয়, চারি দিক হইতে প্রণয়-স্রোত বন্ধ করা হয়, উহাকে অপরাপর প্রবৃত্তির সহিত মিশ্রিত করিয়া কলুষিত করা হয়, তাহার আর কোন সংশয় নাই। বিবাহে প্রণয়ের কত অনিষ্ট করা হয় একবার কল্পনা বলে দেখা যাউক। কুলোকে নানাবিধ উপায়ে সুনিয়ম কু করিয়া তুলে, ভালোতে মন্দ করে, মিষ্ট পদার্থ কটু করে, তাহাদের কথা আমাদের প্রয়োজন নাই, তাহাদের কথা আমরা কহিতে চাহি না কহিতেওছি না। আমরা মনে করিয়া লইয়াছি জগতে কুলোক নাই সবই সু, সবই ভদ্রলোক বিশুদ্ধ চরিত্র সাধু সজ্জন। বিবাহ আসিয়া বলিলেন কি?— অমুক ঘোষের কন্যা তোমার গৃহিনী, তুমি তাহাকে ভালোবাসিবে, সে তোমাকে ভালোবাসিবে, অন্য লোককে তোমার ভালোবাসিতে নাই। যদি বাসো, তোমায় আমি শাস্তি দিব, হয়তো শ্রীঘরেও দিব। এই নাও ইহার হাত তুমি ধরো, তোমাদের শুভ-দৃষ্টি হউক—'। নাও কথা, তুমি আমায় ভালোবাসিতে বাধ্য করার কে? তুমি সমাজ আছ আমি দুষ্কর্ম করিলে শাস্তি দিও, আমার অন্তর-স্রোত আমার ইচ্ছাধীন, আমি তাহাকে যেদিকে চালাইব সে সেই দিকে চলিবে। তুমি তাহার উপর কর্তৃত্ব করিবার কে? প্রথম ঘোর অত্যাচার। আমাদের দেশের দশা ঠিক এইরূপ। সে ঘোষের মেয়ে আমার মনে ধরিল না, আমার প্রণয় বলিয়া যে প্রবৃত্তিটি ছিল তাহার বিজয়া হইল। মনে করো ধরিল, তাহাকে আমি খুব ভালোবাসিতে লাগিলাম, একদিন অতি বিশ্রদ্ধ কথোপকথন সময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি আমায় বড়ো ভালোবাস— না? সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল— খুব। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হইত তুমি কি করিতে? কাহাকে ভালোবাসিতে? যাহাকে বিবাহ করিতাম। ও হরি তবে ভালোবাসার কল আছে। যার দিকে কল নড়িবে সেই চরিতার্থ হইবে। আমাদের দেশের বিবাহে স্ত্রীলোকের একেবারে স্বাধীনতা নাই। তাহারা যে ভালোবাসে তাহা একপ্রকার কল মাত্র। তাহাদের পছন্দ করিবার ক্ষমতা নাই ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। খাও দাও চিনির বলদের মতো স্বামী ও গুরুজনের সেবা শুশ্রুষা করো। শেষ ঐ এক ভাবে থাকিয়া, এক রকম কি গোলমালযুক্ত একটি মানসিক ভাবের উৎপত্তি হয়। এটি প্রণয় নহে। প্রণয় একটি প্রবৃত্তি, উহার কার্য-প্রবণতা অত্যন্ত বলবতী, প্রণয় গাঢ় হইলে কার্য-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, পূর্বেই বলিয়াছি উহাতে আত্মবিসর্জন পর্যন্ত জন্মায়। পূর্বোক্ত যে ভাবটি জন্মায় সেটি নিবৃত্তি-মূলক, তাহার তলা অন্বেষণ করিয়া দেখো এই কয়টি অক্ষর পাথরে খোদা দেখিতে পাইবে। ''আর তো উপায় নাই এখন এই ভাবেই মানিয়ে জুনিয়ে থাকিতে হইবে।'' সেইভাবে বাস্তবিকই মানিয়ে জুনিয়ে থাকে, এইভাবে মানিয়ে জুনিয়ে অধিকাংশ বাঙালির দিন কাটে, প্রণয় মুষড়িয়া যায়,

প্রণয়— মনুষ্য ও পশু প্রভেদ করিবার একমাত্র উপায়, জগদীশ্বরের প্রদত্ত অত্যৎকৃষ্ট মানস প্রবৃত্তি— বৃথা হইয়া যায়। বলিয়াছি এই প্রথম জঘন্য সর্বথা পরিহারযোগ্য অত্যাচার। দ্বিতীয়— ইউরোপীয় বলিবেন, নিজে পছন্দ করিয়া বাছিয়া দুজনে মিল হইলে অন্তরে অন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত জন্মিলে বিবাহ করো। এও বরং। কিন্তু বলি ইউরোপীয় মহাশয় আমাদের যদি মনের মিল হইল, আমরা যদি উভয়ে উভয়কে বুঝিলাম, পরস্পর যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এমন-কি যদি একাত্মভাবে দাঁড়াইল— বিবাহে প্রয়োজন? চর্চে যাওয়া, দশ জনের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করা; এত হাঙ্গাম কেন? উহাতে আমাদের কি কিছু বাড়িবে? কিছু বেশী ঘনিষ্ঠ প্রীতি উৎপন্ন হইবে? কখনোই না, বরং এই হইবে যে আমাদের নিজের কথার উপরে হাত দেয় কেন? এই ভাবিয়া একটু বিরক্তি হইবে। আমরা আপন ইচ্ছায় যা করিব পরে বলিলে তা কখনোই তেমন করিয়া করিব না। ছেলেরা আপন মনে যেমন খেলা করে কি যেমন পড়ে বাপ মা কি গুরু মহাশয় যদি তাহাদিগকে হুকুম করেন সে তেমন করিয়া পড়া তো করিবেই না, অনেক জায়গায় দেখিয়াছি তেমন প্রফুল্ল মনে খেলাও করে না। হয়তো সমাজের এরূপ অনধিকার চর্চায় আমাদের প্রণয়ে বিঘ্ন হইবে মাত্র। এতদূর তো হয়তোর উপর দিয়া গেল। তাহার পর তুমি পাদরি সাহেব বলিলে আমাদের চিরদিন এই দম্পতি ভাবে থাকিতে হইবে। কেন? চিরদিন যখন কিছুই থাকে না, সকল পদার্থেরই যখন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হইতেছে, তখন আমরা কেমন করিয়া বলি যে আমরণ আমরা এইভাবে থাকিব। হয়তো থাকিতাম, যদি আমাদের নিজ ইচ্ছামতো হইত আমরা ঘরে ঘরে বন্দোবস্ত করিয়া থাকিতাম। তোমার হুকুমে থাকিব কেন? এইরূপ অন্যায় হুকুম করা কি তোমার ঘোরতর অত্যাচার নহে? তাহার পর বলিবে ডাইভোর্স প্রথা আছে। তোমরা অত্যাচার করিয়া একটি বন্ধন দিলে আবার আমার সেইটি কাটাইতে হইবে। এ দোকর পরিশ্রম কেন? আর তোমাদের যেরূপ ডাইভোর্স প্রথা তাহাও তো বিশুদ্ধ প্রণয়ের পোষক নহে। পরস্পর অন্যায় ইন্দ্রিয়পরতা আদালতে প্রমাণ না করিয়া দিলে তো ডাইভোর্স হইবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও তো অনেক কারণে পরস্পর একত্র বাস কষ্টকর হইতে পারে, যখন সাত বৎসরে সমস্ত শরীরের পরিবর্তন হইয়া যায় তখন যে মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন হইবে না তাহার ঠিক কি? যদি এই রূপ শরীর-পরিবর্তনে মনেরও পরিবর্তন হয়? তবেই গোলমাল।

এইরূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে প্রকৃত প্রণয় স্থলে বিবাহ প্রথা—সমাজের হস্তক্ষেপ, প্রণয়ীর অত্যন্ত ক্ষতিকর, উহা যত শীঘ্র অপনীত হয় ততই জগতে মঙ্গল।

শ্রীশরৎ।

'আর্যদর্শন', শ্রাবণ, ১২৮৪ (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে)

প্রাসঙ্গিক তথ্য

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ— সম্পাদিত ‘আর্যদর্শন’ পত্রিকার শ্রাবণ ১২৮৪ সংখ্যায় ‘প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ’ প্রবন্ধ ‘শ্রীশরৎ’ স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমে হর-প্রসাদের নামকরণ করা হয় শরৎনাথ, ‘হরের প্রসাদে’ কঠিন রোগ থেকে ভালো হয়ে ওঠায় পরে নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তাঁর আদি নাম ব্যবহার করেছেন।

‘আর্যদশর্ন’— এ প্রবন্ধের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে: ‘‘আমরা এ প্রস্তাবের শেষ সিদ্ধান্তের অনুমোদন করি না। প্রচলিত বিবাহ প্রথা অপনীত হইবার যোগ্য বলিয়া যে একেবারে বিবাহেই প্রয়োজন নাই ইহা আমরা স্বীকার করি না। আজীবন হউক বা সাময়িক হউক বিবাহ প্রথা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমাদের মত সকল একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবাকারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।’’

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ হরপ্রসাদের প্রথম রচনা ‘ভারত-মহিলা’ ‘আর্যদর্শন’— এ প্রকাশ করতে রাজি হন নি। হরপ্রসাদ লিখেছেন, ‘‘তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীর ভাবে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, ‘তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরষ্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপানো উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে-সকল ভিউ দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।’ আমি বলিলাম, ‘আমার তো মহাশয় নিজের কোন ভিউ নাই। পুরাণ পুথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।’ যাহা হোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজি হইলেন না। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, আপাতত গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।’’ — দ্র. ‘‘বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ায়’’, ৭ অনুচ্ছেদ।

পরে বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারিবারিক দাসত্ব

Rabindranath Tagore

সম্প্রতি স্বাধীনতা-নামক একটি শব্দ আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি। অল্প দিন হইল সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত কৃষকদের য়ুরোপ হইতে আনীত কতকগুলি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সেগুলি ব্যবহার না করিয়া অলৌকিক দেবতা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-কৃষীগণ 'স্বাধীনতা' নামক ওইরূপ একটি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র সহসা পাইয়াছে, কিন্তু না জানে তাহা ব্যবহার করিতে, না তাহা ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। কেবল দিবানিশি ওই শব্দটার পূজাই চলিতেছে। কাগজে পত্রে পুঁথিতে সভাস্থলে মহা আড়ম্বরপূর্বক স্বাধীনতা শব্দের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে এবং

কবিবর, মহাকবি ও সুপ্রসিদ্ধ কবি-নামক যত বড়ো বড়ো সাহিত্য-ঢাকীগণ ওই বোলে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি নাকি বড়ো মিঠা বাজিতেছে এবং সেই তালে তালে নাকি অধুনাতন বঙ্গ-যুবক-কলের-পুতুলগণ (ঈষৎ কল টিপিয়া দিলেই যাঁহারা নাচিয়া উঠেন এবং নাচা ব্যতীত যাঁহারা আর কিছু জানেন না) অতিশয় সুদৃশ্য নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা শব্দ 'তাধিন্‌তা' শব্দের অপভ্রংশ নহে, ওই শব্দটি লইয়া যে কেবলমাত্র নৃত্যের ও ঢাকের বোল প্রস্তুত হয় তাহা নহে; ওই হল-যন্ত্র চালনা না করিয়া কেবলমাত্র পূজা করিলে কোনো প্রকার ফসলই জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা ও অধীনতা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমরা সকলে ঠিকটি হৃদয়ংগম করিতে পারি নাই। যে ভাব আমরা ভালোরূপে অনুভব করিতেই পারি না, সে ভাব হৃদয়ংগম করাও বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণত আমরা সকলে মনে করি যে, আমরা অধীন, কেননা ইংরাজেরা আমাদের রাজা, তাহারা আমাদের রাজা না থাকিলেই আমরা স্বাধীন। এরূপ কথা নিতান্তই লঘু। এই কথাটি সর্ব-সাধারণ্যে চলিত থাকাতে ফল হইয়াছে এই যে, যাঁহারা দেশ-হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা দেশ-হিতৈষী হইবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটি আর কিছু নয়, ইংরাজ জাতিকে যথেচ্ছা গালাগালি দেওয়া। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজ জাতিই তাহার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী! কাঁঠাল বৃক্ষ যদি তাহার শাখাজাত ফলগুলির উপর মহা রাগ করিয়া বলিয়া উঠে যে, 'আঃ, এই ফলগুলা যদি না থাকিত তবে আমি আম্রবৃক্ষ হইতে পারিতাম,' তবে তাহাকে এই বলিয়া বুঝানো যায় যে, তুমি কাঁঠাল বৃক্ষ বলিয়াই তোমাতে কাঁঠাল ফলিয়াছে, তোমার শিকড় হইতে পাতা পর্যন্ত কাঁঠাল ফলিবার কারণে পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজের শিরায় শিরায় অধীনতার কারণ সঞ্চারিত হইতেছে। ইংরাজেরা আছে, কারণ আমরা অধীন জাতি। ইংরাজ-রাজত্ব কাঁঠাল ফল মাত্র। আমাদের পক্ষে ইহা বড়ো কম সান্ত্বনার বিষয় নহে যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজেরাই তাহার কারণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা সত্য নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক দুইটা শব্দ হাতে পাইয়াছি, এবং হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথা প্রয়োগ করিতেছি। যদি স্বাধীনতা কথাটা যথার্থ আমাদের হৃদয়ের কথা হয়, তবে যে, আমরা কতকগুলি অসংগত ব্যবহার করি তাহার অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে?

আমরা সংবাদপত্রে মহা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে যথেচ্ছা-তন্ত্রে শাসন করিতেছেন। ভারতবর্ষের আইন ভারতবর্ষীয়দের মতামত অপেক্ষা করে না। দুই-চারিটি ব্যক্তি মিলিয়া যাহা-কিছু নির্ধারিত করিয়া দেয়, আমরা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহা চুপচাপ করিয়া পালন করি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহা

হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে আমরা অধীন জাতি। এবং কেতাবে পড়িয়াছি অধীনতা বড়ো ভালো দ্রব্য নহে, তাহা যদি হয় তবে দেখিতেছি আমাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়! তাহা যদি হয় তবে আমাদের বিলাপ করা নিতান্তই কর্তব্য। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া আমরা আজকাল যে-সকল শূন্যগর্ভ বিলাপ আরম্ভ করিয়াছি, তাহা আমরা কর্তব্য কাজ সমাধাস্বরূপে করিতেছি মাত্র! কিন্তু এ কথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিতস্বরূপে হৃদয়ে বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক-একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের—আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশবকাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড়ো হইলে তাহারা যাহাতে এক-একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড়ো হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালিগুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক-শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড়ো হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ-কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ওই শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড়ো আমোদেই আছি!

বঙ্গদেশের অনেক সৌভাগ্যফলে আজকাল দেশে যে-সকল মহা মহা জাতীয়-ভাব-গদ্‌গদ আর্যশোণিতবান তেজিয়ান দেশহিতৈষীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁহারা চিৎকার করিয়া জপ করেন, নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তা হয়তো অতি অল্পই পাইবে। ইহাই এক প্রধান প্রমাণ যে, স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব নহে।

যাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা আজ্ঞা করিবার জন্য সততই উন্মুখ, অবসর পাইলেই হয়। অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোনো কর্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা 'হাঁরে' করিয়া উঠিলেই ছেলেপিলেগুলার মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়ে। এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের কনিষ্ঠ সকলের ভীতির পাত্র, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আমোদ।

মনুষ্য জাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষেই আমাদের সমবেদনা, আর অসহায়ের আমরা কেহ নই। এইজন্যই একজনের হাতে

যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাকে আর বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক, সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়। এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। যত আইন, যত বাঁধাবাঁধি, যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরেই না? কেহ যদি নিতান্ত অসহ্য আঘাত পাইয়া গুরুজনের মুখের উপরে একটা কথা বলে, অমনি কি বড়ো বড়ো পক্ক-কেশ মস্তকে আকাশ ভাঙিয়া পড়ে না? আর, যদি কোনো গুরুজন বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বা অন্যায় কারণে তাহার কনিষ্ঠের উপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করে তবে তাহাতে কাহার মাথাব্যথা হয় বলো দেখি? গুরুজন মারুন, ধরুন, গালাগালি দিন, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখুন, তাহাতে কাহারো মনোযোগ মাত্র আকর্ষণ করে না, আর কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তাহার গুরুজনের আদিষ্ট পথের একচুল বামে কি দক্ষিণে হেলিয়াছে, গুরুজনের পান হইতে একতিল চুন খসাইয়াছে, অমনি দশ দিক হইতে দশটা যমদূত আসিয়া কেহ তাহার হাত ধরে, কেহ তাহার চুল ধরে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ বক্তৃতা দেয়, কেহ মারে ও তাহার দেহ ও মনকে সর্বতোভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তবে নিষ্কৃতি দেয়। সমাজের এ কীরূপ বিচার বলো দেখি? যে দুর্বল, যাহার দোষ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকেই কথায় কথায় মেয়াদ ফাঁসি ও দ্বীপান্তরে চালান করিয়া দেওয়া হয়, আর যে বলিষ্ঠ, যাহার অন্যায় ব্যবহার করিবার সমূহ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার কাজ একবার কেহ বিচার করিয়াও দেখে না। যেন ওই দন্তহীন কোমল শিশুগুলি এক-একটি দুর্জয় দৈত্য, উহাদের বশে রাখিতে সমাজের সমস্ত শক্তির আবশ্যক, আর ওই যমদূতাকার বেত্রহস্ত পাষাণহৃদয়রা নবনীতে গঠিত কুসুম-সুকুমার, উহাদের জন্য আর সমাজের পরিশ্রম করিতে হইবে না। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ, কোনো শাস্ত্রেই লিখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ। কেহই হয়তো স্বীকার করিবেন না (যদি বা মুখে করেন তথাপি কাজে করিবেন না) যে গুরুজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যতখানি পাপ, কনিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাও ঠিক ততখানি পাপ। একজন গুরু ব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠকে অন্যায়রূপে মারিলে যতটুকু পাপে লিপ্ত হন, একজন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গুরুজনকে অন্যায়রূপে মারিলে ঠিক ততটুকু পাপেই লিপ্ত হন, তাহার কিছুমাত্র অধিক নয়। ঈশ্বরের চক্ষে উভয়ই ঠিক সমান। কোন্ ব্যক্তি সাহসপূর্বক বলিতে পারে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বর তাহার প্রতি কনিষ্ঠের অপেক্ষা অধিক অন্যায়াচরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন! কিন্তু সকলেই যেন মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই একই কারণ হইতে আমরা অবলাদিগের সামান্য দোষটুকু পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারি না, অথচ পুরুষদের

প্রতিপদেই মার্জনা করিয়া থাকি! যেন সবলেরাই কেবলমাত্র মার্জনার যোগ্য। যেন হীনবল স্ত্রীলোকদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য পুরুষের বাহুবলই যথেষ্ট নহে তাহার উপরে ধর্মের বিভীষিকা ও সমস্ত সমাজের নিদারুণতর বিভীষিকার আবশ্যক, আর পুরুষদের জন্য যেন সে-সকল কিছুই আবশ্যক নাই। যাহা হউক, ছেলেবেলা হইতেই আমরা কি এইরূপ বলের উপাসনা করিতে শিখি না? এবং যে শিক্ষা বাল্যকাল হইতে আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করে বড়ো হইলে কি তাহা আমরা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি? সুতরাং যেখানে বাঙালি সেইখানেই পদাঘাত, সেইখানেই গালাগালি, সেইখানেই অপমান, এবং সেই অপমান পদাঘাতবৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষীণশরীর সুন্দর বনবাসীদের শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় অবিকৃত মুখশ্রী! ছেলেবেলা হইতে তাহারা পদে পদে শিখিয়াছে যে, গুরুজনেরা মারে, ধরে, যাহা করে তাহার উপরে আর চারা নাই, ইচ্ছা করিলেই সকল করিতে পারেন, এবং সেরূপ ইচ্ছা প্রায়ই করিয়া থাকেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই গুরুজনদের নিকট তাহাদের প্রথম শিক্ষা এই যে, 'যাহা বলি তাহার উপরে আর কথা নাই!' ভালো করিয়া বলিতে ও বুঝাইয়া বলিতে অনেক বাক্য ব্যয় হয়, অতএব যত অল্প পরিশ্রমে ও যত অল্প কথায় একটা আজ্ঞা দেওয়া যাইবে তাহা দেওয়া হইবে ও আজ্ঞা লইয়া যত কম আন্দোলন করিয়া যত শীঘ্র পালন করা হইবে ততই ভালো! দাদা আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'কী করছিস, শুতে যা।' যে ছেলে বলে, 'কেন দাদা, এখনও তো সন্ধ্যা হয় নি।' তাহার কিছু হইবে না, যে ছেলে বলে, 'যে আজ্ঞে দাদা মহাশয়' তাহার তুল্য ছেলে হয় না!

ছেলেবেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কী? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত। কারণ, ভক্তির ভাব বালকদের নহে। তাহাদের নিকট সকলই সমান। তাহাদের হৃদয়ে কেবল অনুরাগ ও বিরাগের ভাব জন্মে মাত্র তাহারা কাহারও অনুরক্ত হয়, কাহারও হয় না, আবার কাহারও প্রতি তাহাদের স্বতই বিরাগ জন্মে। তাহাদের যখন ভর্ৎসনা করিয়া বলা হয় 'গুরুজন বলছেন শুনছিস নে!' তখন তাহারা এই বুঝে যে, না শুনিলে ভয়ের কারণ আছে। না শুনিলে তাঁহাদের এমন ক্ষমতা আছে, যে শুনিতে বাধ্য করাইতে পারেন। অতএব গুরুজনদের ভক্তি করিবে, অর্থাৎ ভয় করিবে; কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোনো মতে পারিয়া উঠি না। এইজন্যই, যখনি ছেলেরা দশজনে সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কী তোরা গোলমাল করছিস।' তখনি তাহারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। বেশ বুঝিতে পারে যে, গুরুজন যে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া ওই আজ্ঞাটি করিলেন তাহা নহে, তবে কেন তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল? না যিনি আজ্ঞা দিলেন তিনি তাহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি! আমার বল আছে অতএব তুই আজ্ঞা পালন কর্ এই ভাব ছেলেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া

দেওয়া, তাহাদের চোখের সামনে দিনরাত্রি একটা অদৃশ্য বেত্র নাচানো, এইরূপ একটা ভয়ের ভাবে, একটা অবনতির ভাবে কোমল হৃদয় দীক্ষিত করা কি স্বাধীনতাপ্রিয় সহৃদয় গুরুজনের কাজ?

ভক্তির ভাব ভালো, কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা অনুরাগের ভাব আরও ভালো; কারণ, ভক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে আর অনুরাগে আকর্ষণ করিয়া আনে। যাহার হৃদয় যত প্রশস্ত, তাহার অনুরাগ ততই অধিক। পিতা তো পিতা, সমস্ত জগতের পিতাকে যাঁহারা সখা বলিয়া দেখেন তাঁহারা কে? না, তাঁহারা ভক্তদের অপেক্ষা অধিক ভক্ত! তাঁহারা ঈশ্বরের এত কাছে থাকেন যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সখ্যতা জন্মিয়া যায়। কত শত কালীভক্ত আছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মতো কয় জন ভক্ত দেখা যায়! অন্য ভক্তেরা শত হস্ত দূরে থাকিয়া তটস্থ হইয়া কালীকে প্রণাম করে; কিন্তু রামপ্রসাদ যে কালীর কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়াছেন, রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়াছেন! হাফেজের ন্যায় ঈশ্বর-ভক্ত কয় জন পাওয়া যায়, কিন্তু দেখো দেখি, হাফেজ কীভাবে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন! হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা অনুরাগ শিক্ষা, ভক্তি শিক্ষা তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা। যে হৃদয় যত উদার সে হৃদয় ততই অন্য হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে সমর্থ হয়, এবং যতই নিকটবর্তী হয়, ততই ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ করিতে শিখে। পিতার প্রতি পুত্রের কী ভাব থাকা ভালো? না, অভক্তির অপেক্ষা ভক্তি থাকা ভালো, আবার ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ থাকা আরও ভালো। সেই পুত্রই যে পিতাকে সখা বলিয়া জানে। কর্তব্যের সহিত প্রিয়কার্যের যতখানি প্রভেদ, ভক্তির সহিত অনুরাগের ঠিক ততখানি প্রভেদ। কর্তব্যজ্ঞান যেমন আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়, ভক্তিভাবও তেমনি আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়। ভক্তিভাজন ব্যক্তি আমাদের দূরের লোক অথচ নিজের লোক। আমি যদি জানি যে, একজন আত্মীয় নিয়তই আমার শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, বাল্যকালের বিঘ্ন-সংকুল পথে আমার হাতে ধরিয়া যৌবনকালে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আমার সুখ-দুঃখের সহিত যাঁহার সুখ-দুঃখ অনেকটা জড়িত, তাঁহাকে আমার নিতান্ত নিকটের ব্যক্তি মনে না যদি করি তবে সে একটা কৃত্রিম প্রথার গুণে হইয়াছে বলিতে হইবে। মায়ের সহিত পিতার সম্পর্কগত প্রভেদ কিছু অধিক নহে, সমানই বলিতে হইবে। পিতা যদি ভক্তিভাজন হন তবে মাতাও ভক্তিভাজন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণত কী দেখা যায়? পিতার প্রতি পুত্রের যে ভাব মাতার প্রতি কি সেই ভাব? আমি তো বলি মাকে যে ছেলে শুদ্ধ কেবল ভক্তি করে সে মায়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। মায়ের সহিত আমাদের অনুরাগের সম্পর্ক। মায়ের এমন একটি গুণ আছে, যাহাতে তাঁহাকে আমরা অনুরাগ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে গুণটি কী? না, তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, আমাদের সহিত

তাঁহার সম্পূর্ণ সমবেদনা আছে, তিনি কখনো জানিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত দিতে পারেন না, তিনি কখনো আমাদের আজ্ঞা দিতে চাহেন না, তিনি অনুরোধ করেন, বুঝাইয়া বলেন, আমরা একটা ভালো কাজে বিরত হইলে তিনি সাধ্যসাধনা করেন। এইজন্য মায়ের প্রতি আমাদের যে একটি আমরণ-স্থায়ী মর্মগত ভালোবাসা জন্মে, তাহা আমাদের হৃদয়ের একটি শিক্ষা। যে ব্যক্তি শৈশবকাল হইতে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে সে একটি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাওয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান উপায়। মনে করো, একজন বালক তাহার সঙ্গীদের লইয়া খেলা করিতেছে, গোল করিতেছে, সেই সময়ে আসিয়া একটি গুরুজন তাহাকে খুব একটা চড় কসাইয়া দিল, ইহাতে তাহাকে স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয় না। পরের সুখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া শিক্ষা ওই এক চড়েই হয় না। আমি নিজের সুখের জন্যে আর-একজনের সুখের হানি করিলাম, এবং তাহার উপরে একটা চড় কসাইলাম, ইহাতে তাহাকে কী শিক্ষা দেওয়া হইল? একটা কাজ আপাতত বন্ধ করিয়া দেওয়া এক, আর তাহার কারণ উঠাইয়া দেওয়া এক স্বতন্ত্র। প্রতি কাজে একটা কান ধরিবার জন্য একটা হাত নিযুক্ত রাখা, সে কানের পক্ষে ও সে হাতের পক্ষেই খারাপ। যে শাসন করে তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে আর যে শাসিত হয় তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে। শাসনপ্রিয়তার ভাব বর্বর ভাব, সে ভাব যত দমন করা যায় ততই ভালো। আর যে ব্যক্তি শাসনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহার পক্ষেও বড়ো শুভ নহে।

আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোনো সম্পর্ক নাই। সম্মান ও প্রসাদ ইহাই আমাদের পরিবারের প্রাণ। এমন-কি, স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিণী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতই ভালোবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে? স্বামী ভক্তিভাজন অতএব ইঁহার কথা পালন করিব, ইহা কি স্ত্রীর মুখে শোভা পায়? ভক্তির স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা কর্তব্য কার্য, অনুরাগের স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা প্রিয় কার্য। অনুরাগে স্বার্থ বিসর্জন দিতেছি বলিয়া মনেই হয় না। অনুরাগের নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া। লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে! এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় তো আর দুটি নাই! কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি আর নাই। ভক্তি ভাব পরিবার হইতে নির্বাসন করিয়া দেওয়া আমার মত নহে ও তাহা দেওয়াও বড়ো সহজ নহে, আমার মত এই যে, ভক্তি ব্যতীত অন্য নানা প্রকার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, সেগুলিকে কৃত্রিম শিক্ষা দ্বারা দমন করিবার আবশ্যক নাই। ভাইয়ে

ভাইয়ে সমান ভাব, সখ্যতার ভাব, স্ত্রী পুরুষে সমান ভাব, প্রেমের ভাব, পিতা পুত্রে অনুরাগের ভাব, এবং তাহার সহিত শ্রদ্ধার ভাব মিশ্রিত (ভক্তির ভাব সর্বত্র নহে), এই তো স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার ভাব, অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, চরণধূলি লইয়া পূজা করিবার ভাব নহে, সসম্ভ্রমে দশ হাত তফাতে দাঁড়াইবার ভাব নহে, কোনো কথা কহিলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার উপরে তোমার মত ব্যক্ত করিতে নিতান্ত সংকোচের ভাব নহে। এ ভাব শোভা পায় রাজার সম্মুখে, যাঁহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্ক নাই, যাঁহার প্রতি তোমার নাড়ীর টান নাই, যিনি তোমার কোনো প্রকার ত্রুটি মার্জনা করিবেন কি না তোমার সন্দেহ আছে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কীরূপ? না, তোমার পিতার প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, জান যে, তিনি কখনো কুপরামর্শ দিবেন না, জান যে, তোমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বিপদে-আপদে পড়িলে সকলকে ফেলিয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে মন যায় এমন একটা আস্থা আছে, তাঁহার সহিত মতামত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে, এই পর্যন্ত; একেবারে চক্ষু-কর্ণ-নাসাবরোধক অন্ধ নির্ভর নহে। আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াও একজনকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাহাকে ভক্তি বলি, তাহার কাছে আমাদের আর স্বাধীনতা থাকে না। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উপদেশ দেন, পরামর্শ দেন, বুঝাইয়া বলেন, মীমাংসা করিয়া দেন। আদেশ দেন না; শাস্তি দেন না। আদেশ ও শাস্তি বিচারালয়ের ভাব, পরিবারের ভাব নহে। উপদেশ, অনুরোধ ও অভিমান আত্মীয়-সমাজের ভাব। এ ভাব যদি চলিয়া যায় ও পূর্বোক্ত ভাব পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান পড়িয়া যায়, তবে আত্মীয়েরা পর হইয়া, দূরবর্তী হইয়া একত্রে বাস করে মাত্র। সেরূপ পরিবারে ভয়ের ও শাসনের রাজত্ব। দৈবাৎ যদি ভয়টার রাজ্যচ্যুতি হয় (কর্তা ব্যক্তির মৃত্যুতে যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে) তবে আত্মীয়দের মধ্যে কাক-চিলের সম্পর্ক বাধিয়া যায়। আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের বঙ্গসমাজের মধ্যে এই ভয়ের এমন একাধিপত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যেখানে ভয় সেইখানে কাজ, যেখানে ভয় নাই সেখানে কাজ নাই। একজন নবাগত ইংরাজ তাঁহার বাঙালি বন্ধুর সহিত রেলোয়েতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি গাড়িতে আলো পাইলেন না, অতি নম্রভাবে তিনি স্টেশনের একজন ভদ্র (!) বাঙালি কর্মচারীকে কহিলেন, 'অনুগ্রহপূর্বক একটা আলো আনাইয়া দিন, নহিলে বড়ো অসুবিধা হইতেছে'; কর্মচারীটি চলিয়া গেল। অমনি ইংরাজটির বাঙালি বন্ধু কহিলেন, 'আপনি বড়ো ভালো কাজ করিলেন না, এমন করিয়া বলিলে বাঙালিদের দেশে কখনো আলো পাওয়া যায় না; যদি আপনি তেরিয়া হইয়া বলিতেন, এখনো আলো পাইলাম না, ইহার অর্থ কী—তাহা হইলে আলো পাইবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।' আমি সেই বাঙালিটির কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জা বোধ

করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কী, কথাটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সে ইংরাজটি যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আলো আনাইলেন। এরূপ আরও সহস্র ঘটনা হয়তো আমাদের পাঠকেরা অবগত আছেন। অনেক বাঙালি রেলোয়েতে যাইতে হইলে কোট্ হ্যাট্ পরেন ও গলা বাঁকাইয়া কথা কহেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, বাঙালি স্টেশন-কর্ম্মচারীদের জন্য দায়ে পড়িয়া তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করেন। ঈঙ্গবঙ্গেরা বাঙালি বলিয়া পরিচয় দিতে যে কুণ্ঠিত হন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন যে, বাঙালিদের বাঙালিরা মানে না। তাহারা বলের দাস। একজন ভৃত্য তাহার কর্তব্যকাজে শৈথিল্য করিতেছে তাহাকে দুই চড় কসাইলে সে সিধা হয়। ভয় না থাকিলে সে হয়তো কাজ করিবেই না। অতএব দেখা যাইতেছে ভয়ের শাসনে কত কাজের ক্ষতি হয়। তাহাতে আপাতত একটু সুবিধা আছে। একটা চাবুক কসাইলে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ সমাধা হয়, কিন্তু সেই চাবুকের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে ভয়ের শাসনে থাকিয়া ভয়টাকেই আমরা প্রভু, রাজা বলিয়া বরণ করিয়াছি, সে ব্যতীত আর কাহারও কথা আমরা বড়ো একটা খেয়াল করি না। স্বাধীনতা শিক্ষার প্রণালী এইরূপ নাকি!

যদি স্বজাতিকে স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাও, তবে সভা ডাকিয়া, গলা ভাঙিয়া, করতালি দিয়া একটা হট্টগোল করিবার তো আমি তেমন আবশ্যক দেখি না। তাহার প্রধান উপায়, প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বাধীনতা চর্চা করা। জাতির মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও পরিবারের মধ্যে অধীনতার শৃঙ্খল ইহা বোধ করি কোনো সমাজে দেখা যায় না। প্রতি পরিবারেই যদি কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের ভ্রাতাদের, পুত্রদের, ভৃত্যদের স্বাধীনতা অপহরণ না করেন, পরিবারের মধ্যে যদি কতকগুলি কৃত্রিম-প্রথার অষ্ট-পৃষ্ঠ বন্ধন না থাকে, তবেই আমাদের কিছু আশা থাকে। যাঁহারা স্ত্রীকে শাসন করেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ও সন্তানদের প্রহার করেন, ভৃত্যদিগকে নিতান্ত নীচজনোচিত গালাগালি দেন, তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার কথা যত কম ক'ন ততই ভালো। বোধ করি তাঁহারা চাকর-বাকর ছেলেপিলেগুলাকে মারিয়া ধরিয়া গালাগালি দিয়া বীর রসের চর্চা করিয়া থাকেন। এই মহাবীরবৃন্দ, এই পারিবারিক তৈমুরলঙ, জঙ্গিস খাঁ-গণ যথেচ্ছাচারের বিষয় যতই বলেন, আর স্বাধীনতার কথায় যত কম লিপ্ত থাকেন ততই তাঁহারা শোভা পান। তাঁহাদের আস্ফালনের প্রবৃত্তিটা কমিয়া গেলেই দেশের হাড় জুড়ায়।

আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা স্বাধীন স্ফূর্তি নাই বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বড়ো আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমোদের জন্য বিরামের জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। পরিবারের সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবার শত সহস্র বাধা বর্তমান। ইনি শ্বশুর, উনি ভাসুর, ইনি দাদা, উনি ছোটো ভাই, ইনি বড়ো, উনি

ছোটো ইত্যাদি কত যে সাত-পাঁচ ভাবিবার আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। লাভের হইতে হয় এই যে, আত্ম-বিনোদনের জন্য পরের সহায়তা আবশ্যক করে। আমাদের পরিবার আমাদের আমোদের স্থান নহে। (আমোদ বলিতে যাঁহারা দূষণীয় কিছু বুঝেন, তাঁহাদের কল্পনা নিতান্তই বিকৃত।) ইহাকে ছুঁইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উহার সহিত কথা কহিলে, এমন-কি, উহার নিকট মুখ দেখাইলে বেহায়া বলিয়া বিষম অখ্যাতি হয়; যেদিন কোনো গুরুজন বাড়ির বধূর হাসির সুর শুনিতে পান, সেদিন সে বালিকা বেচারীর কপালে অনেক দুঃখ থাকে, দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীতে দেখাশুনা কথাবার্তা হইলে পাড়ায় লোকের কাছে তাহাদের মুখ দেখাইবার জো থাকে না। নিজের ঘরেই যত বাঁধাবাঁধি, যত শাসন, যত আইন-কানুন, আর বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ব্যবহার কি পরের সঙ্গেই! পরিবারের মধ্যেই কি যত ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, ত্রস্তভাব! ইহার অপেক্ষা অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করা যায় না। আধুনিক যে-সকল উন্নত পরিবারে এই-সকল কৃত্রিম বন্ধনসমূহ দূরীভূত হইয়াছে, আমোদের নিমিত্ত সে পরিবারভুক্ত কাহাকেও পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় না। এই-সকল বন্ধনমুক্ত পরিবারে যে-কেহ প্রবেশ করেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া যান। বুঝিতে পারেন যে, আপনার লোক আপনার হইলে পরের আবশ্যক অনেক কমিয়া যায়।

যাহারা আপনার কনিষ্ঠদের নিজের সম্পত্তি মনে করে, তাহারা যে নিজের ভৃত্যদেরও তাহাই মনে করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। লেখক ইংলন্ড হইতে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, 'এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা আর-একজন বাহিরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মতো চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোনো কাজ করে দিলে 'Thank you' ও তাকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় 'Please' বলা আবশ্যক।' ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন, 'চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা আষ্টেপৃষ্ঠে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না। এ-সকল কৃত্রিম সভ্যতার আমদানি যত কম হয় ততই ভালো; মনে করো ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল, অমনি ছেলে বলে উঠলেন, 'Thank you বাবা!' এরূপ কাষ্ঠ-সভ্যতা কাষ্ঠ-হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে!' জাতীয় ভাব এমন একটি যুক্তিবিহীন অন্ধ বধির ভাব যে, সে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও অযৌক্তিক করিয়া তোলে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, ইংরাজদের সমস্ত আচার-ব্যবহার কাষ্ঠ-সভ্যতাপ্রসূত, এরূপ সংস্কার সাধারণ লোকদের মধ্যে বদ্ধ থাকা স্বাভাবিক, যাহারা কিছু বিবেচনা করে না, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিতেই জানে তাহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়, কিন্তু

চিন্তাশীল ব্যক্তি অত শীঘ্র একটা সংস্কারে উপনীত হন না। Please কথা বলিবার ভাবটার মূল যে রসনায় নহে হৃদয়ে, ইহা মনে করিতে আপত্তিটা কী? আমার যে ভাবটি নাই, আর-এক ব্যক্তির সেই ভাব থাকিলেই তাহাকে মৌখিক বলিয়া মনে করা নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে যত প্রকার অনুষ্ঠান আছে সমস্ত মৌখিক; জাতীয় হৃদয়ের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা যে পিতাকে প্রণাম করি, তাহা কৃত্রিম কাষ্ঠ-সভ্যতার প্রথা, তাহা আন্তরিক নহে। আমি তো বলি, এইরূপ মনে করা উচিত যে, ইংরাজ জাতির হৃদয়গত এমন একটি ভাব আছে, যাহাতে করিয়া তাহাকে স্বতই Please বলায়। সে ভাবটি কী? না তাহাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ভাব। তাহারা সকলেই নিজে নিজে নিজের কার্য করিতে চায় ও তাহাই করে, এই নিমিত্ত অপরে যতটুকুই কাজ করিয়া দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক-না কেন, Thank you আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এবং অপরকে সামান্য কাজটুকু করিতে বাধ্য করিতে হইলেও তাহারা Please না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যেমন অনেক সামান্য কাজে পরের উপর নির্ভর করি, এবং পরের নিকটে অনেকটা আশা করি, আমাদের অত সহজে Please ও Thank you বাহির হয় না। এমন হইতে পারে যে, প্রতিবারেই যখন তাহারা Please ও Thank you বলে তখন তাহাদের হৃদয়ে ওইরূপ ভাব উদয় হয় না, কিন্তু ওই ভাব হইতে যে এই প্রথার উৎপত্তি তাহা কি কেহই অস্বীকার করিবেন? আমরা যখন প্রতি অবসরেই প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করি তখন যে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতে করি, তাহা নহে, অনেক সময়ে প্রথার বশবর্তী হইয়া করি, কিন্তু ইহা অসংকোচে বলা যায় যে, গুরুভক্তি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত।

জাতীয় ভাব আমাদের কী অন্ধ করিয়াই তুলে! মনে করো আমাদের দেশে যদি কবরের প্রথা প্রচলিত থাকিত ও ইংলন্ডে শবদাহ প্রচলিত থাকিত তবে আমরা (অর্থাৎ জাতীয় ভাবোন্মত্ত পুরুষেরা) কী বলিতাম? আর আজকালই বা কী বলি, একবার কল্পনা করিয়া দেখা যাউক। আজকাল আমরা বলি, 'দেখো দেখি শবদাহে কত সুবিধা! স্থান সংক্ষেপ, ব্যয় সংক্ষেপ, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। এমন-কি, আমাদের দেখাদেখি দেখো আজকাল য়ুরোপেও এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে!' আর আমাদের দেশে যদি কবর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে আমরাই বলিতাম, 'যে দেশে কাষ্ঠ-সভ্যতা প্রচলিত সেই দেশেই শবদাহ শোভা পায়! সুবিধাই কি সর্বস্ব হইল, আর হৃদয় কি কিছুই নহে? যে দেহে সামান্য আঘাত মাত্র দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি, যে দেহের স্পর্শে প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কিনা অকাতরে দগ্ধ করিলাম? কী জন্য? না, স্থান সংক্ষেপের জন্য, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য, সুবিধার জন্য? সহজ-সভ্য দেশের কি এই প্রথা? আবার নিজ হস্তে প্রিয়জনের মুখাগ্নি করা কি সহৃদয় জাতির কাজ!' জাতীয় ভাব এইরূপ একটা অদূর-দৃষ্টি, যুক্তিহীন অথচ গোঁ-বিশিষ্ট ভাব।

উহা দ্বারা অতিমাত্র বিচলিত হওয়া সাধারণ লোকদের কাজ, চিন্তাশীল লোকদের নহে!

লেখাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ভাষা-প্রযুক্তি-গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ (http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/15282) থেকে নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্ত্রীর পত্র

Rabindranath Tagore

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি— মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহমনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই

সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, 'মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?' চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ স্যাক্‌রা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পালকি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না— সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃত অম্লশূল এবং ক'নের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না– তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন-কি সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল— তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁতগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপরে আমি সুন্দরী বটে। সে কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তা হলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই

তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই । যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু, কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সে দিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সে দিকে আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেওয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্টো অনাদর-জিনিসটাই ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তা হলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখে ব্যাথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তা হলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালের সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো — দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে

পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কত বড়ো অপমান। দায়ে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না– রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, 'মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।' আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটি কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে; তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ায় এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না । কিন্তু, সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল । আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক্, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি, বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলে । বললে, নিশ্চয় বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু ।

অনাদরে মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না— মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল; কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তেমনি বিষম ।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কোনো

কারণ বহুকাল ঘটে নি—এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, 'দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।' যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম, সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না । কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্‌ টকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে— সে কোন্‌ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না ।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক-একবার তার উপর রাগ হত, সেকথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এ দিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁতখুঁত-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল এ কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়ে-চর। তার আর-কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্যে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ

সেই দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এ দিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমের বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতিদেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, 'বাঁচলুম। মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।'

বর কেমন তা জানি নে; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল; বললে, 'দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।'

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'বিন্দু, তুই ভয় করিস নে— শুনেছি তোর বর ভালো।'

বিন্দু বললে, 'বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।'

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু, ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে; তাতে কালো মেয়ে–কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, 'দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।'

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম; কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তা হলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে, 'দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।'

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, ‘জানিস তো বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।’

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্য যদি তোমাদের খরচ করতে হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তা হলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন— আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধকরি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্য তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ‘দিদি, আমাকে তোমরা তা হলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?’

আমি বললুম ‘না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক্‌-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না ।’

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

‘সত্যি বলছিস, বিন্দি?’

‘এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না— কিন্তু, তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।’

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপরে বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ‘ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো

পুরুষ বটে।’

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিল। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল।

স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, ‘এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।’

তোমরা বললে, ‘বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।’

আমি বললুম, ‘ও কখনো মিথ্যা বলে নি।’

তোমরা বললে, ‘কেমন করে জানলে।’

আমি বললুম, ‘আমি নিশ্চয় জানি।’

তোমরা ভয় দেখালে, ‘বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।’

আমি বললুম, ‘ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ কথা কি আদালত শুনবে না।’

তোমরা বললে, ‘তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি । কেন, আমাদের দায় কিসের।’

আমি বললুম, ‘আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব ।’

তোমরা বললে, ‘উকিল বাড়ি ছুটবে নাকি ।’

এ কথার জবাব নেই । কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ও দিকে বিন্দুর শ্বশুড়বাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে ।

আমার যে কি জোর আছে জানি নে— কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গরু

প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, 'তা, দিক্ থানায় খবর।'

এই ব'লে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবদ্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, 'ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।'

কুষ্টরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না। কিন্তু আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো যতরকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ.এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, 'বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।'

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিংবা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, 'আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।'

আমি বললুম, 'সেই যা সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম — কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।'

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, 'বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?'

আমি বললুম, 'বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।'

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে— কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই ।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, 'বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।'

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, আমিও যাব।

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমার যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, 'যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।'

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, 'ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব— ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।'

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বললুম, 'কী শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?'

'সে বললে, না।'

আমি বললুম, 'রাজি করাতে পারলি নে?'

সে বললে, 'আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে

আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।'

যাক, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, 'মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।'

তোমরা বললে, 'এ-সমস্ত নাটক করা।' তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি— মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু, সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু, আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্-না কেন সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান—সেখানে বিন্দু কেবল

বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন করেই ডাক দিক-না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা; কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশ বন্ধনেরই হবে জিত—আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল— কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে!

ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু— তাতে তার যা হবার তা হোক।'

এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন—
মৃণাল।

'স্ত্রীর পত্র', মাসিক *সবুজপত্র*, শ্রাবণ ১৩২১, *গল্পগুচ্ছ*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২), দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩৩৮, কলকাতা: বিশ্বভারতী।

নিয়ামুন নাহার

নতুন চোখে 'স্ত্রীর পত্র' পাঠ: সম্পর্কে বিবাহে পরিবারে

Rabindranath Tagore

> I am not playing a role. I am being myself, whatever the hell that is.
>
> — Bea Arthur, American actress, comedian, and singer

যে গল্পটাকে পড়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে নানান অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হয়েছি, সেই স্বাভাবিক চোখ থেকে আমাদের দেখার চোখটা আলাদা হয় বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন কিনা 'স্ত্রীর পত্র' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১) লেখার একশো বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছে। এতদিন ধরে ১৯১৪ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্পটি আজ, এই সময়, এখনকার সমাজ-বাস্তবতায় পাঠ করলেও একে দেখার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। 'স্ত্রীর পত্র' অনেক বিশাল আকার ধারণ করে। মানবীয় সম্পর্ককে বুঝতে এবং সমাজের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ধরণকে বুঝতে

আমাদের নতুন করে ভাবায়। ভাবতে শেখায়। গল্প দিয়ে সমাজকে, সমাজের মানুষের সম্পর্ককে কেন দেখব বা বোঝার চেষ্টা করব এই প্রশ্নের সরল উত্তর হলো, যেকোনো সাহিত্যই সমাজকে বুঝতে সাহায্য করে। সাধারণভাবে বললে এ সময়ের লেখক, প্রাবন্ধিক, কবি, সাহিত্যিকের লেখায় যেভাবে এ সময় ফুটে ওঠে, সেভাবেই যুগে যুগে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন জনের লেখনিতে সেই সেই সময়ের সমাজ-বাস্তবতা ফুটে ওঠে।

স্ত্রীর পত্র নয়, ব্যক্তির চিঠি

রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্ত্রীর পত্র' লিখলেন, কেমন ছিল সেই সময়ের সমাজটা, কেমন ছিল সে সময়ের মানুষে মানুষে সম্পর্ক, কেমন ছিল সেই সম্পর্কের ছাঁচ, ব্যক্তিসত্তাটাই বা কেমন ছিল পরিবারে, বিবাহে? এইসব ছোট ছোট অথচ গুরুতর প্রশ্নের উত্তর পাই আমরা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে। একে নারীর চোখ দিয়েও যেমন দেখা যায়, তেমনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সর্বজনীন মানুষের চোখ দিয়েও দেখা যায়। কারণ এর মুখ্য নারী-চরিত্রটি সম্পর্কের এবং পরিবারের ক্ষেত্রে কেবল একজন 'মেজোবউ' না, কারো স্ত্রী না, কারো দিদি না। এসব কিছুকে ছাপিয়ে তাঁকে আমরা এই একশো বছর পরেও অতিশয় আধুনিক, প্রখর বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ, যুক্তিগ্রাহী, ও আত্মমর্যাদা-বোধ-সম্পন্ন একজন ব্যক্তি হিসেবে পাই। আবার যখন এ গল্পটিকে আধুনিক সমাজ -বাস্তবতার অংশ ভাবি তখন বুঝতে পারি, একে সময়-কালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। অর্থাৎ গল্পটি এর সময়-কাল অতিক্রম করে গিয়েছে। পুরনো সমাজ-বাস্তবতা ভেবে একে খারিজ করে দেয়া যায় না। এটি এখনকার সময়ের সমাজ-বাস্তবতা এবং সম্পর্কজনিত সংকটের বিবরণ ও মুক্তির উপায়। আবার এই গল্পটাকে সর্বজনীন মানবীয় সম্পর্ক উপলব্ধির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। সেখানে শুধু নারীর চোখে 'স্ত্রীর পত্র'কে পর্যালোচনা করলে বিষয়টিকে বরং ছোট করেই দেখা হয়। কারণ এটি একজন ব্যক্তির চিঠি। একজন মানুষের চিঠি। চিঠির গল্প। সম্পর্ক, বিবাহ এবং পরিবারের গল্প।

যেহেতু 'স্ত্রীর পত্র' ১৩২১ সালে লেখা হল, সেহেতু আমরা ধরেই নিতে পারি স্ত্রীর পত্রে ১৩২১ এবং এর আগে পরের সময়ের সমাজচিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু যদি নারী-পুরুষ ধারণা এবং এদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান আমরা দেখতে চাই তাহলে স্ত্রীর পত্র লেখার আরো কিছু কাল আগের নারীপুরুষের সামাজিক অবস্থাও দেখার প্রয়োজন পড়ে।

এটা সে সময়ের কথা যখন ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও সেই মৃত স্বামীর সাথে চিতায় উঠতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। এরকম একটা সমাজ গেলো দীর্ঘ কাল ধরে। এই প্রথা বিলোপ করার জন্য রাজা

রামমোহন রায় এগিয়ে এলেন এবং সফল হলেন। তারপরেই যার কথা আসে তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বিধবা বিবাহ নিয়ে আওয়াজ তুললেন। এঁরাই প্রথম ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে বৃহত্তর ও প্রকাশ্য সামাজিক পরিসরে ভাবলেন এবং কাজ করলেন। একজন বাঁচালেন নারীর প্রাণ। আরেকজন নারীকে দিতে চাইলেন একটা স্বাভাবিক জীবন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা ছিল প্রাণের, বেঁচে থাকার। সেসময় নারী কেবল আলাদা একটা প্রাণ, ব্যক্তি হয়ে ওঠেনি। (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪: ২৭০-২৮১)

তারপরে অনেকটা সময় পেরিয়েছে। নারী-পুরুষের তথা ব্যক্তির আচরণ এবং ভূমিকাও বদলেছে সমাজে। পরিবারে সমাজে সম্পর্কগুলো নতুন করে নির্মিত হয়েছে। এরকম প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল একটা সময়ে 'স্ত্রীর পত্র' লেখা হয়েছিল। কিন্তু আজ একশো বছর পরে এসেও আমরা যখন 'স্ত্রীর পত্র' পড়ছি এবং এই গল্পটিকে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত জায়গা থেকে যদি আমরা একে ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমাদের জানা প্রয়োজন 'জেন্ডার' ধারণাটা কী। জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের সামাজিক পরিচয় যা একই সাথে সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও ভূমিকাকে নির্দেশ করে। এতে নারী পুরুষের সাথে সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধটি প্রাধান্য পায় বেশি।

জেন্ডার একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবে নির্ধারিত বিশিষ্টতা নির্দেশ করে। একজন নারী ও পুরুষের কার কীরকম পোশাক পরিচ্ছদ হবে; কে কীরকম আচার আচরণ করবে; আশা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা কার কী রকম হবে; সমাজে নানা ধরনের কাজে একজন নারী বা পুরুষের ভূমিকা কিরকম হবে; মানসিক গঠনের দিক দিয়ে একজন নারী বা পুরুষ কীরকম হবে; সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ধারিত এই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যাদাতা হল জেন্ডার-অধ্যয়ন।

বলা হয়ে থাকে জেন্ডার-অধ্যয়ন নারী পুরুষের সামাজিক পরিচয়, সম্পর্ক ইত্যাদি নির্ধারন করে। কিন্তু জেন্ডার ধারণার একটি ক্ষুদ্র ও স্থূল ধারণা আছে। যা কেবল একতরফা ভাবে সমাজে শুধুই নারীর অবস্থান এবং নারী-পুরুষের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে। অর্থাৎ নারীর বিপরীতে পুরুষ বা পুরুষের বিপরীতে নারীকে তুলে ধরার সাধারণ একটা প্রবণতা এতে লক্ষ করা যায়। সমাজে নারীর দুঃখকষ্ট-বঞ্চনা-বৈষম্য ইত্যাদির প্রতি মনোনিবেশ করা এই সংকীর্ণ ধারার মূল লক্ষ্য।কিন্তু অপর দিকে, বৃহৎ পরিসরে, জেন্ডার-ধারণা নারী-পুরুষকে মানুষ হয়ে ওঠার কথা বলে। ব্যক্তি-মানুষ হয়ে ওঠার কথা বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ছোট গল্পটির বিভিন্ন চরিত্রকে যখন আমার বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে ফেলি, তখন দেখা যায় শুধুমাত্র নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থান, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দিয়ে মানবীয় সম্পর্ক বিচার করলে খোদ 'সম্পর্ক'

জিনিসটাকেই আমাদের ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণগুলো আবার এই গল্পটিতেই নিহিত। যেমন পরিবারে এবং সমাজে সম্পর্ককে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। নারী-পুরুষের প্রথাগত ধারণা তো রয়েছেই, কিন্তু মানবীয় সম্পর্ক বুঝতে হলে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র অর্থে জেন্ডার ধারণাই মূখ্য নয়। জেন্ডার এর সংকীর্ণ প্রথাগত ধারণার বাইরে এবং এর উর্ধ্বে ব্যক্তি-মানুষ হয়ে সম্পর্ককে বোঝার আলাদা একটা প্যাটার্ন বা মনোভঙ্গি আমাদের চিন্তার জগৎকে আরো প্রসারিত করে। তা যেকোনো গল্প বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে খাটে কিনা, সেটা আপাতত আলোচ্যবিষয় না হলেও ‘ স্ত্রীর পত্র’ বিবেচনা করে ব্যাখ্যা করলে এর সমগ্রতার বিশালতা বুঝতে অসুবিধা হয়। এর বিষয়বস্তু তখন সীমাবদ্ধ স্থূলতার গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

গল্পটা ছোট্ট করে বললে এর অনেকটা এরকম, স্বামীকে চিঠি লিখছেন মৃণাল। দীর্ঘ পনেরো বছরের সংসারে যে চিঠি লেখার অবকাশ ঘটে নি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মৃণালের সংগে তার স্বামীর বিয়ের দিনটি থেকে শুরু করে তার সংসার জীবনের ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে একটি চিঠিতে উঠে আসে। যা কোনোদিনই হয়ত লেখার প্রয়োজনই পড়ত না, কিন্তু মৃণালের ব্যক্তিসত্তা, মৃণালের আত্মমর্যাদাবোধ, তার প্রতিবাদের ভাষা এবং তার ব্যক্তি পরিচয়ের যখন সঙ্কট সৃষ্টি হয় – চিঠিটা লেখার তাগিদ বোধ করি সেখান থেকেই আসে। মৃণালের একটি কন্যাসন্তান জন্মের পরেই মারা যাওয়া, বড় জায়ের বোন বিন্দুর আত্মহত্যা বা তাকে মেরে ফেলার সাবলীল বিবরণের মধ্য দিয়ে চিঠির ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্পটিতে উঠে আসে মানবীয় সম্পর্কের সংকট, ব্যক্তির মুক্তি তথা স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং ব্যক্তির পরিচয়ের সংকট। একজন বারো বছরের বালিকার পনেরো বছরের সংসারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পোড় খেতে খেতে ব্যক্তি হয়ে ওঠার সংকট। মাত্র সাতাশ বছর বয়সের জীবনে সে জেনে গেছে জীবনের প্রকৃত, বৃহৎ অর্থ। তার এই বাড়ি থেকে – মাখন বড়ালের গলি থেকে – বের হয়ে পড়ার সিদ্ধান্তটি স্রেফ তীর্থ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নয়। নিতান্তই ধর্মকর্ম করতে যাওয়া এ নয়। এ আসলে জীবনের চরম সত্য জেনে জীবন-তীর্থের পথে বের হয়ে যাওয়া। যে তার পনেরো বছরের মর্যাদাহীন-পরাধীন-আত্মপরিচয়হীন সংসার-জীবন দিয়ে ‘অভ্যাসের অন্ধকার’কে চিনেছে, জেনেছে– তার এই সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অতিক্রম করে উন্নততর জীবনের অজানা অভিসারের দিকে যাওয়া। অবারিত আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবনের দিকে মৃণালের এই যাত্রায় গন্তব্য, গতিপথ ও পরিণতির সুনির্দিষ্ট কোনো উল্লেখ গল্পে নাই বটে, কিন্তু দুর্দান্ত সুস্পষ্টতার সাথে যা আছে তা হলো এই উপলব্ধি যে: ‘তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৮) এভাবে, প্রথাগত বিবাহ ও পরিবার নামক

প্রতিষ্ঠানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা দেয় এই ছোট গল্পটি।

এই চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি খেয়াল করেছেন ভারতী রায়ও তাঁর ‘ফ্রেশ এয়ার এন্ড ফ্রিডম’ প্রবন্ধে (ভারতী রায়, ২০১১)। তাঁর প্রবন্ধে তিনি আসলে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক রচনাবলী নিয়ে কাজ করেছেন। সার্বিকভাবে রবীন্দ্র রচনায় নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধ্যানধারণা ফুটে ওঠে তা সনাক্ত করতে চেয়েছেন ভারতী রায়। তাঁর অনুসন্ধানে তিনি ‘নতুন নারী’র জন্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার ওপর আলোকপাত করেছেন। নতুন নারী হল ‘সেই নারী যিনি প্রচলিত রীতিকে চ্যালেঞ্জ করেন, এবং নতুন ধরণের সমাজবিন্যাসের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চান’।

এ প্রবন্ধে ভারতী রায় স্ত্রীর পত্রকে ‘পুরুষের প্রতি নারীর একটি চিঠি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সমাজে নারীর প্রতিপুরুষের বৈষম্যমূলক আচরনের কথা তুলে ধরেছেন এবং মৃণাল চরিত্রটিকে তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, সমাজে নারীর আলাদা স্থান রয়েছে এবং নারীর জীবনের অর্থ শুধু এই সংসারেই সীমাবদ্ধ নয়। এর অন্য অনেক অর্থ রয়েছে। এ প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে মৃণালের পুনর্জন্ম হয়েছে। তিনি চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘মৃণালের মধ্যকার মেজোবউয়ের মৃত্যু হল, কিন্তু নারী হিসেবে পুনর্জন্ম হল মৃণালের’। ভারতী দেখিয়েছেন, ‘সে (মৃণাল) দেখতে চেয়েছিল পৃথিবীতে নারীর জন্য উন্নততর কোনো জায়গা আছে কিনা এবং সে নিজে জীবনের উচ্চতর কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে কিনা’। (ভারতী রায়, ২০১১: ২০)

এই উচ্চতর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অন্যেরা ঘর থেকে বের হতে পারে নি, মৃণাল ‘গার্হস্থের কারাগার’ (সোমনাথ মৈত্র, ১৯৫৭: ২০) ছেড়ে বেরিয়েছে। এই সেই কারণ যে কারণে মেরি ল্যাগো(১৯৭৭: ১০৬) মৃণালকে রবীন্দ্রনাথের নারীর মুক্তি বিষয়ক প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পগুলোর প্রধাণ চরিত্রগুলোর মধ্যে ‘সবচেয়ে সংহত’ চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইন্দ্রানী চ্যাটার্জি (২০০১: ৫৯২-৫৯৩) ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ যখন স্ত্রীর পত্র লিখেন তখন তিনি জ্ঞাতি-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার দায়িত্ব বা ‘এজেন্সি’ একটি উচ্চবর্ণের ভদ্র হিন্দু ঘরের গৃহবধূর ওপর অর্পণ করেছিলেন। স্ত্রীর পত্র মৃণালের সেই মেজোবউয়ের পদ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে মুক্ত নারী হিসেবে বেরিয়ে আসার গল্প। সমাজে এই গল্পের অভিঘাত পড়বে সেটাই স্বভাবিক। সুতরাং,‘স্ত্রীর পত্র’ প্রকাশিত হইলে উহা বঙ্গসাহিত্যসমাজে বিশেষ আন্দোলনের কারণ হইয়াছিল’ (গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৭১২) – এই তথ্য আমাদের কাছে স্বাভাবিকই ঠেকে।

‘স্ত্রীর পত্র’কে নতুনভাবে দেখতে গেলে, বুঝতে গেলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে, আমাদের নতুন করে ভাবায়, যে নতুন প্রশ্নগুলো সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পরিবারে,

বিবাহে নতুন মাত্রা যুক্ত করে সেগুলো পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সম্পর্কের খেলাঘর: সেই সুরে কাছে-দূরে

'সম্পর্ক' শব্দটির সাধারণ অর্থ মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ। এর ধরণ, রকম, ইত্যাদি। আবার ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির যোগাযোগের নৈকট্য, আন্তরিকতা দিয়ে এই শব্দটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। সাধারণত ভালো সম্পর্ক মানেই নৈকট্য বা কাছাকাছি থাকাকেই বোঝায়। 'কিন্তু চিরদিন কাছেই পড়ে আছি' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩২৯)। এই কাছাকাছি থাকা নিকট সম্পর্কটিকেও কিন্তু সুসম্পর্ক বলা যাচ্ছে না। যেখানে চিঠি লেখার ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি, সেই সম্পর্কে এই ফাঁকটুকুকে গুরুত্ব দিতে হয় বৈকি। অর্থাৎ সম্পর্ক মানে শুধু নৈকট্যই নয় দূরত্বও বটে। সম্পর্কে যদি স্পেস না থাকে, তাহলে সেই সম্পর্ক হয় আবদ্ধ এবং বাধ্য। যে সম্পর্কে নৈকট্যের বাধ্যতা থাকে, সেখানে মুক্তি থাকে না, হাওয়া চলাচল করতে পারে না। সম্পর্কটা পরাধীন হয়ে পড়ে। প্রাণহীন হয়ে পড়ে। মূল কথা হল 'স্পেস'। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক ভার্জিনিয়া উলফ তাঁর বিখ্যাত রচনা 'এ রুম অফ ওয়ান্স্ ওন' (১৯২৯) বা 'নিজের একটি কামরা'; মূলত এ রচনায় তিনি বলেছেন অনেকটা এভাবে যে, সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাইলে একজন নারীর অর্থ আর নিজের একটা কামরা দরকার। ভার্জিনিয়া উলফ যে সময়ে নারীদের জন্য আলাদা একটা কামরার কথা বলছেন সেই সময়টা আমরা পার করে এসেছি। কিন্তু এই যে তিনি কামরার কথা বললেন, সেটাকে আজকের দিনে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আলাদা একটা 'স্পেস' হিসেবেই দেখা যেতে পারে। তা কেবল নারীর নয়, পুরুষের জন্যই নয়, ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য বটে। কারণ, সম্পর্ক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই রচিত হয়। একা একা নয়। এই সম্পর্ক রচনার জায়গায় সুস্থতার জন্য 'কামরা' বা 'স্পেস' এগুলোর কোনো বিকল্প নেই। আমরা আমাদের কল্পনায়, মনের ভিতরে যেভাবে খেলাঘর সাজাই, সেই খেলাঘরই আমাদের সম্পর্কের 'কামরা' বা 'স্পেস'। যা সম্পর্কের সুস্থতার নির্দেশক। সম্পর্কের মানুষজনের কমন প্লাটফর্ম। যা এতোটাই অপরিহার্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেনো আমরা, মানুষগুলো ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারি এই খেলাঘরে। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে সম্পর্ক মানে কাছে থাকার নৈকট্যই নয়, দূরে থাকাও বটে।

মেজোবউ একটি আমলাতান্ত্রিক পদ

পরিবার নামক যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে, তাকে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যদি বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটিতেও রয়েছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত কিছু পদ। যেমন কোনো প্রতিষ্ঠানের থাকে মালিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী তেমন

ভাবেই পরিবারের মধ্যে মেজবউও একটা পদের নাম। পরিবারেও থাকে সেরকমটাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তা, সিদ্ধান্ত পালনকারী সদস্য। পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, বড়বউ, ছোটবউ ইত্যাদি নানান পদের মত স্ত্রীর পত্রের মেজোবউও একটি আমলাতান্ত্রিক পদ। এই মেজোবউ যখন বলছে যে তার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে তার অন্য সম্বন্ধও আছে, তার অর্থ দাঁড়ায় যে সে একজন স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় মানুষ। প্রত্যেকটা মানুষ যেভাবে ভিন্ন, সেভাবেই তার জগৎটাও ভিন্ন। সে আবার যখন বলছে, এ তোমাদের মেজবউয়ের চিঠি নয়, তার অর্থ হল পরিবারের মধ্যে যে তার মেজোবউ এর পদটা, সেটাকে সে অস্বীকার করছে।

প্রথাগত পরিবারের যে ধারণা, তাতে মেজোবউ এর এই যে স্বকীয়তা, স্বতন্ত্রতা—এটা অন্যদের স্বস্তির কারণ হয় না। উল্টা পরিবার ব্যক্তির স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি তো দেয়ই না বরং এই বৈশিষ্টের জন্য পরিবার সেই ব্যক্তিকে নানানভাবে ভোগাতে থাকে।

ব্যক্তি হয়ে ওঠার সঙ্কট

আজকের দিনে যেখানে নারী-পুরুষের অবস্থান অনেকখানি কাছাকাছি, শিক্ষায়, পেশায় যখন নারী-পুরুষটি সমান মর্যাদা সম্পন্ন সেখানে কি পুরুষরাও স্বকীয়তা বা নিজস্বতার সংকটে ভুগছে না? যে পুরুষটি ব্যক্তি হয়ে উঠতে চায়, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যে সমাজের বা পরিবারের অন্য সদস্যদের মত গৎবাঁধা চিন্তা করে না, তাকেও কিন্তু পরিবার বা সমাজের প্রথাগত সংকটগুলিও মোকাবেলা করতে হয়। তার স্বকীয়তাও কিন্তু পরিবারের জন্য স্বস্তির হয় না। তাকেও ভুগতে হয়।

পরিবারে, বিবাহে আজ যখন নারী-পুরুষ অর্থনৈতিক ভাবে সম-অবস্থানে আছে তখন এই নারী-পুরুষের ব্যক্তি হয়ে ওঠার সঙ্কটই কিন্তু মূল সমস্যার জায়গা। এখানে মৃণাল বলেছিল, ‘আমার মরণ নেই’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩২৯)। অর্থাৎ একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নারীর যন্ত্রণার সীমা নেই, অন্ত নেই, আমৃত্যু। সেই সময়ের পারিবারিক ব্যবস্থায় বিষয়টা এরকমই ছিলো। কিন্তু আজকের দিনে পুরুষেরই কি মৃত্যু আছে? যে সম্পর্কে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তি, আবার সেই সম্পর্কেই মুক্ত বাতাস চলাচলের মত জায়গা নেই, যে সম্পর্ক কাঠামোটাই বন্দী এবং পরাধীন, সেই সম্পর্কে শুধু নারীটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, পুরুষও হয়। অর্থাৎ নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করে দেয় না। নারী-পুরুষের আর্থসামাজিক বৈষম্যটুকু দূর করলেই সম্পর্কের ধরণটা বদলে যায় না। দুজন ব্যক্তি সমান ক্ষমতার অধিকারী হলেও সম্পর্কের মুক্তি ঘটার নিশ্চয়তা থাকে না।

এখন তো আর্থিক সংকট ঘুচছে, কিন্তু সম্পর্ক কি টিকছে? তাই এখানে মৃণাল

যখন বলছে তার মরণ নেই, সেখানে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে মৃণালকে নারী না ভেবে ব্যক্তি ভাবাই ন্যায্য। এই সময়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পূর্বের মতো আর্থিক-সামাজিক বৈষম্যের মতো সাধারণ টানাপোড়েনগুলো যখন নেই সেখানে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যার জায়গা ভিন্ন। তাই সেটাকেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

রূপ দেখার চোখ

যে মেয়েটা নিজের রূপ জিনিসটার সংসারে কোনো প্রয়োজন দেখে নি, কোনো দাম বা মূল্য খুঁজে পায় নি, সে মেয়ে সংসারে নিজেকে মানুষ হিসেবে দেখেছে, ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে চিনেছে। সে সংসারে তার ভূমিকাকে নিতান্তই টিপিক্যাল নারীর চোখ দিয়ে দেখে নি। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সংসারে পুরুষের রূপের প্রয়োজনীয়তার কথা তো কেউ বিবেচনায়ই আনে না, কিন্তু মৃণাল দেখিয়ে দিতে চাইল যে আসলে সংসারে নারীর রূপ জিনিসটাও নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। যা কিনা প্রচলিত সমাজবাস্তবতায় পুরুষের ক্ষেত্রেও ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ এভাবে দেখতে গেলে রূপ জিনিসটা সংসারে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই একইভাবে অর্থহীন। আর যদি তা অর্থপূর্ণও হয়, তা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই অর্থপূর্ণ হবে। রূপের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সংসারে আছে। সেকারণেই মৃণাল রূপকে একেবারেই খারিজ করে দিচ্ছে। বাস্তবতাও তাই। কারণ তথাকথিত অরূপবান বা অরূপবতী মানুষজন সংসারে যদি সারাক্ষণ রূপ নিয়েই পড়ে থাকত, তাহলে পুরো পৃথিবীই হয়ত থেমে থাকত। মানুষের অন্য যাবতীয় গুণাবলী, কার্যাবলী কোনোকিছুই আর দুনিয়াদারির মধ্যে পড়ত না। মানুষের চেহারার অসুন্দরের বিপরীতে যে সুন্দরের ধারণা তা নিতান্তই বাহ্যিক। এই বাহ্যিক জিনিসটার জন্য মানুষ নিজে দায়ী না। বরং মানুষের ভেতরের সৌন্দর্যই তার নতুন পরিচয় নির্মাণ করে। মানুষের সাথে মেলামেশায়, সম্পর্কে রূপ যদি অনেক বড় বিষয় হতো, তাহলে আর মানুষে মানুষের ভেতরের বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে তাদের পৃথক করা যেত না। তাহলে পৃথিবীতে যা কিছু ভালো বা সুন্দর কাজ, সবই সুন্দর চেহারার মানুষজনই করত। তথাকথিত অসুন্দরদের কোনো কাজই থাকত না। তাই এর কদর কতখানি সেটাও প্রশ্নবিদ্ধ। রূপ সম্পর্কে মুখস্থ ধারণায় নারী-পুরুষ কিংবা ব্যক্তি কিন্তু সমানভাবেই বিবেচ্য। এ গল্পে নারীর প্রতি টিপিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি এবং রূপ সম্পর্কে মুখস্থ ধারণাই আমরা পাই। রূপ সম্পর্কেই মৃণাল বলেছে, 'তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩২৯)। 'কিন্তু সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩০)। অর্থাৎ রূপ জিনিসটা দেখার চোখের উপর নির্ভর করে। যাকে দেখা

হবে সেই বস্তুর উপর নির্ভর করে না। যে দেখবে তার কাছে যদি সেটা দেখার জিনিস বলে মনে হয় তবেই সেটার দাম আছে। চিঠির ভাষায় আরো উঠে আসে। ‘রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩০)। রূপের মূল্য যদি সংসারে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ হতো, তাহলে অরূপের বাণী আমাদের চিত্তে মুক্তি এনে দিতে পারত না।

বাধা-বুদ্ধির সম্পর্ক

‘রূপ’ এবং ‘বুদ্ধিমত্তা’ দুটা আলাদা শব্দ। যদিও দুটাকেই আপাত দৃষ্টিতে মানুষের যোগ্যতা হিসেবেই দেখা হয়। কিন্তু দুটা দুই মেরুর শব্দ। শব্দ দুটোর আলাদা অর্থ ও প্রয়োগ আছে। রূপ এবং বুদ্ধিমত্তা মিলিয়ে একটা মানুষের আলাদা একটা পরিচয় নির্মিত হতেই পারে। যেমনভাবে একজন মানুষ তথাকথিত রূপহীন এবং বুদ্ধিহীন হয় একইসাথে, অথবা রূপ আছে কিন্তু বুদ্ধিমত্তা নেই আবার বুদ্ধিমত্তা আছে কিন্তু রূপ নেই। এগুলোতে মানুষের হাত নেই, অন্তত রূপের ক্ষেত্রে তো বটেই। মানুষ তো নিজ হাতে নিজেকে তৈরী করে না। কিন্তু বুদ্ধিটা চর্চার বিষয়। এই ‘বুদ্ধিমত্তা’ বস্তুটিকে ওজন করে মাপা যায় না। এমনকি সমাজে যাকে আমরা ‘বোকা’ বলে পরিচয় করিয়ে দেই বা যে ব্যক্তিটা নিজেকে বোকা বলে দাবি করে সেই বোকামিটা বুদ্ধিমত্তার বিপরীত শব্দ নয়। বুদ্ধি স্বাভাবিক। সবারই থাকে। সমাজে বোকা বলে পরিচিত মানুষগুলো কি সকালে ঘুম থেকে উঠে তাদের প্রাত্যহিক কর্ম করে না? যে বোকা সে কি খাওয়ার সময় খাদ্যের স্বাদ-বিস্বাদ বোঝে না? যে গৃহিনীকে বোকা বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, সে কি রান্না করার সময় লবনের পরিমাপ বোঝে না? কেউ সরল বা জটিল প্রকৃতির মানুষ হতে পারে, সেটা মানুষের অন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই সাধারণ কথাগুলোকে রবীন্দ্রনাথ মৃণালকে দিয়ে বলালেন অসাধারণভাবে এবং কোনটার সাথে কোনটার তফাতের জায়গা কোথায় তাও দেখা গেল এ গল্পে। এখানে মৃণাল লিখছে, ‘আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্য বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩০)। অর্থাৎ রূপ জিনিসটাকে বুদ্ধিমত্তা একেবারেই নাকচ করে দেয়। ব্যক্তির জন্য এবং সম্পর্কের জন্য বুদ্ধিমত্তা যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তা মৃণাল বলেই

দিচ্ছে। আবার সে এটাও বলছে যে বাধা মেনে চলা বুদ্ধি মেনে চলার বিপরীত। তার মানে বাধার বিপরীতে বুদ্ধির অবস্থান। আর যেখানে সম্পর্কের প্রশ্ন, সেখানে বাধা ও বুদ্ধি আলাদা আলাদা সম্পর্কই নির্দেশ করে। যে সম্পর্কে বুদ্ধির চর্চা হয়, সেখানে বোকামি হয় না বা থাকে না। আর যেখানে বাধা সম্পর্ক মেনে নিতে হয় সেটা বোকামি বা নির্বুদ্ধিতার সম্পর্ক। যে নির্বুদ্ধিতা বা বাধা মেনে চলবে, তাকে নিয়ে পরিবারে, সংসারে কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু বুদ্ধিমত্তাটা তো মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী। সেটা স্বাভাবিকভাবেই আসে এবং চর্চিত হয়। যখনই মানুষ বুদ্ধির চর্চা করে, তখন সে বাধাকে অতিক্রম করে। আর বাধাকে অতিক্রম করা মানেই হলো মুক্ত হতে পারা। বুদ্ধির চর্চা করা মানে মুক্ততার চর্চা করা, স্বাধীনতার চর্চা করা, আমিত্বের চর্চা করা। কিন্তু প্রচলিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বুদ্ধির চর্চা করা মুক্ত মানুষকে আপদ হিসেবেই ভাবা হয়। এই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিতে বুদ্ধির চর্চার চেয়ে অন্ধ বিশ্বাসের চর্চার দাম বেশি। কারণ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে গেলে আবার বুদ্ধিহীনতার চর্চাই করতে হয়। তবেই সেই সম্পর্ক টেকে, বিয়ে টেকে, পরিবার টেকে। বুদ্ধিহীন ভাবে সবকিছু মেনে নেওয়া এখানে পূর্বশর্ত। কিন্তু এগুলো তো গৎবাঁধা, গতানুগতিক, প্রাণহীন, পরাধীন, বুদ্ধিহীন সম্পর্ক। বুদ্ধির চর্চা করলে যদি মুক্তি ঘটে তাহলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বুদ্ধির চর্চা করলে সম্পর্কের পরিস্থিতিরও মুক্তি ঘটে। এতে সম্পর্ক স্বাধীন হয়, মুক্ত হয়, সুস্থ হয়। তাই যেকোনো প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তনের চাহিদা একমাত্র বুদ্ধির চর্চা, স্বাধীনতার চর্চা দিয়েই সম্ভব।

আমিত্ব এবং আমলাতন্ত্র

মৃণাল লিখেছে, ‘আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল গড়ে ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩০)।

সাধারণভাবে নারীর অবস্থানগত এই চিত্র তো মেজোবউ বলেই দিচ্ছে। কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ‘আমি’ হয়ে ওঠাকে সকলেই বিপদের মনে করে। কারণ এই ‘আমি’র সাথে জড়িত আছে ব্যক্তির মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা। এই যে ব্যক্তির আমিত্ব সেটা দাম্পত্যে অথবা পরিবারের ক্ষেত্রেও ভয়ের বিষয়। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে বিয়ে করল, দম্পতি হয়ে গেলো। এই দাম্পত্যেও ‘আমি’ কে দেখানো যাবে না, সে স্বামী বা স্ত্রী যার আমিই হোক। পরিবারের সন্তানটির মধ্যে যদি এই আমিত্ব ভর করে, তাহলে বাবা-মা’র টেনশন শুরু হয়ে যায়। শ্রেণীকক্ষে যদি

একটা ছাত্র তার আমিত্ব দেখাতে চায় তাহলে শিক্ষকের টেনশন শুরু হয়ে যায়। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তিটা মুক্তচিন্তা করে, স্বাধীনভাবে সেই ব্যক্তিটা সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য ভীতির কারণ হয়ে পড়ে। পরিবারের মধ্যেও যেহেতু আমলা-তন্ত্র রয়েছে, সে কারণেই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিও চায় যে এখানে কর্তার ইচ্ছায়ই কর্ম হবে। এর ব্যতিক্রম হওয়া যাবে না। কারণ মেজোবউ বলছে যে তাদের পারিবারিক পদটার বাইরেও তার যে আমিত্বটা ছিল সেটা কেউ পছন্দও করে নি এবং চিনতেও পারে নি। আর তার এই 'কবি' সত্তা কিংবা 'আমি' সত্তা যদি কেউ চিনতও, সেটাও তার সম্পর্কের জন্য ভীতির কারণ হতো। ব্যক্তির এই আমিত্বে গৎবাঁধা পরিবারের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। এতে প্রথাগত পরিবারের মধ্যকার ঊর্ধ্বতনতা এবং অধস্তনতার চর্চা বজায় থাকে। তার মধ্যে প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই। আছে ঊর্ধ্বতন-অধস্তন-সম্পর্কচর্চা। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো পরিবর্তন সম্ভব হয় না সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অথচ মুক্তচিন্তা দ্বারা প্রচলিত ধারার এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুক্তপ্রতিষ্ঠান বানানো সম্ভব। কারণ প্রতিষ্ঠান যেমন আমাদের প্রয়োজন তেমনি এর মধ্যে পরিবর্তনও আমাদের প্রয়োজন। সেই পরিবর্তনটা ছোটখাট পরিবর্তন না। সেই পরিবর্তনে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। বরং এতে সম্পর্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়। রাতারাতি এই পরিবর্তন সম্ভব না। কিন্তু আস্তে ধীরে এই পরিবর্তনের দিকে যাওয়া অসম্ভব কিছু না।

মুক্ততা ও মমতা

সম্পর্ককে মুক্তভাবে দেখলেই কেবল ভালোবাসার জায়গা এবং পরিসর বড় হয়ে উঠতে পারে। মুক্ততা মানে স্বাধীনতার চর্চা করা, নিজের মতো করে ভাবা। প্রকৃতির সাথে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে নিজের একাত্মতা এবং ভালোবাসা থাকা বা অনুভব করা। মৃণাল লিখছে, 'আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে– তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩০)।

এখান থেকে একটা গড় ধারণা পাওয়া যায় এরকম যে, বিয়ে হয়ে আসার পরেই নতুন এই বাড়ির পরিবেশের আর কোন মানুষের সাথে তার একাত্মতা ঘটেনি। সাধারণ ভাবে একে নারীর অধস্তনতা হিসেবে চোখে পড়লেও এর বাইরে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একে দেখা যায়। মৃণাল বলছে যে সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। এই পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা প্রকৃতির সাথে, গোরু-বাছুরের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক অনুভব করে। সেখানে কিন্তু তারা অধস্তনতা দেখে না। উঁচুনিচু দেখে না। তারা জীবের সাথে, প্রকৃতির সাথে মমতা বোধ করে। কারণ সে লিখেছে যে

গরুগুলো যখন ক্ষুধার্ত থাকতো, তার প্রাণ কাঁদত। যে মেয়েটা আমি হয়ে উঠতে চায়, স্বাধীন-মুক্ত হয়ে উঠতে চায়, কবি হয়ে উঠতে চায় সেই মেয়েটি এখানে অন্য প্রাণীর সাথে মমতার সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক খুঁজে পায়। এটা তার বিশালতা। যে মেয়েটা ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছে বনের পথে যেতে, সেই কেবল প্রকৃতির সাথে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে একাত্মতা বোধ করতে পারে। বরং ঠাট্টার সম্পর্কের শহরের আত্মীয়দের তখন ক্ষুদ্রতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যে এই প্রেম এবং মমত্ব ধারণ করে সে এখানে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি প্রাণী বা কি মানুষ তাতে তার কিছু যায় আসে না। এখানে সে ভালোবাসাটাকেই বড় করে দেখে।

এই যে মেজোবউ, যে কিনা 'আমি' হয়ে উঠতে পারছে না, যে নিজের পারিবারিক অবস্থানে প্রতিনিয়ত আমিত্বের সংকটে, আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে, যে নিজের জীবনে অসহায়ত্বের সঙ্গে ভালোবাসাবিহীন ভাবে যুদ্ধ করছে তার মধ্য-কার হাহাকার হল 'মা' হওয়া। এই মা হওয়াটাকে সে তার সংসারের মেজোবউয়ের পদটির পদোন্নতি হিসেবে মোটেই ভাবেনি। তার কাছে মা হওয়ার অর্থ হল তার জীবনে বড় হয়ে ওঠার অর্থ। যা কিছু সে পারে নি, যা কিছু তার অপূর্ণতা, সে ভেবেছিল তার মেয়েটি হলে সেই অপূর্ণতার কিছুটা হয়তো সে এনে দিতে পারত। তা যে 'আমি' না হয়ে ওঠার কষ্ট, তা তার মেয়েটি ঘুচিয়ে দিতে পারত। 'আমি' হওয়াতে যে মুক্তির, বড় হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে ছিলো তা মূলত সত্য হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। আর সত্য সম্পূর্ণ, বড় হয়ে ওঠা মানেই তার কাছে তা মুক্তি এবং স্বাধীনতা। আবার একই সাথে মা হওয়া মানে যে বিশালতা ধারণ করা তাও সে ধারণ করতে চেয়েছিল। তার মানে বিশালতা মানেই মুক্তি, সত্য, আমিত্ব। তাই সে বলেছিলো, 'মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩০-৩৩১)।

সংসারের সিদ্ধান্ত: সম্পর্ক-সম্মান-ভালোবাসা

সম্পর্কে ভালোবাসা পারস্পারিক আত্মসম্মানবোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কেই আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখি না যে অন্যের সাথে সম্পর্কটা কীসের ভিত্তিতে টিকিয়ে রাখব। আবার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা মানে কোনো রকমে অফিসিয়াল সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সম্পর্কের ব্যবস্থা-অবস্থাও হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগুলো ভয়ঙ্কর নাজুক অবস্থা। এগুলোতে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক আত্মসম্মানবোধ ও ভালোবাসা নেই বললেই চলে। এগুলো মৃত সম্পর্ক। সম্পর্ক স্বাভাবিক নিয়মেই ভালোবাসার সম্পর্ক হয়, ঘৃণার সম্পর্ক হয়। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। কিন্তু শুধু অন্যকেই সম্মান দিলাম বা শুধু নিজেকে সম্মান

দিলাম, আবার অন্যের কাছে থেকে কোনো সম্মান পেলামই না, তাতে সম্পর্ক দুর্বল ভাবে টেকে বটে, কিন্তু তা ভালোবাসাবিহীন সম্পর্কে পর্যবসিত হয়। এগুলোকে অনেক কিছুর স্বার্থে আমরা টিকিয়ে রাখি, রাখতে বাধ্য হই। সম্পর্ক কখনো একতরফা কারণে ভালোবাসাহীন হয় না। এখানে 'পরস্পর' শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পর্কের প্রশ্ন যখন আসে তখন স্বাভাবিক ভাবেই যে মূল জায়গাটিতে ব্যক্তিকে সংকটে পড়তে হয় তা হল আত্মসম্মানবোধের জায়গা। যে নিজেকে সম্মান দিতে জানে সেই তো অন্যকে সম্মান দিতে পারে। আর সম্পর্কে যদি সম্মান না থাকে তাহলে তা সুস্থ সম্পর্ক নয়। এর সাথে আবার ভালোবাসা এবং আদরযত্নও সম্পৃক্ত। আত্মসম্মান থাকলে ভালোবাসার এবং আদরযত্নের উপস্থিতি থাকা সম্ভব। কিন্তু সম্পর্কে যখন পারস্পারিক সম্মানবোধই থাকেনা তখন তা অনাদরে, অবহেলায় পর্যবসিত হয়। আর এভাবে অনাদরে থাকতে থাকতে যে অভ্যস্ততা গড়ে ওঠে, তাতে দুঃখ-ব্যথাবোধ নাই হয়ে যায়। তখন এই দুঃখ ব্যথা এতোটাই স্বাভাবিক মনে হয় যে এই বোধগুলোও আর কাজ করে না সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মৃণাল এখানে লিখছে,

'আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩১)।

সাধারণভাবে মেয়েদের যুগ যুগ ধরে দুঃখ যন্ত্রণার বিষয়টাতো এখানে পরিষ্কার। কিন্তু মৃণাল এখানে সরাসরি প্রচলিত ব্যবস্থাকেই একটা বড় রকমের প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। এই প্রশ্ন নারীর অবস্থান থেকেও স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু একেই যদি আমরা একটু বড় পরিসরে দেখি, তাহলে দেখতে পাই এর মধ্যে লুকিয়ে আছে অবহেলা, অনাদর ও ভালোবাসাবিহীন একটা সম্পর্ক কাঠামো। তার মানে সম্পর্কে আদরযত্ন ও ভালোবাসা অপরিহার্য। এগুলো ছাড়া সম্পর্ক কষ্টেরই কারণ বৈ আর কিছু নয়। এই বিষয়টাকে যদি দাম্পত্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেখি, অথবা পরিবারে সন্তানের ক্ষেত্রে দেখি, পরিবারে পুরুষটির ক্ষেত্রে দেখি, অর্থাৎ ব্যবস্থা বা সিস্টেম যদি একতরফাভাবে এমনই হয়, তাহলে দাম্পত্যে আর প্রেম ভালোবাসার কথা না তোলাই ভালো। সন্তানকে আদর যত্নে বড় না করাই ভালো। সমাজ থেকে, সম্পর্ক থেকে ভালোবাসা উঠে যাওয়াই ভালো। কারণ প্রেম, ভালোবাসা, আদরকে যদি সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে না দাঁড় করানোই চিরন্তন ব্যবস্থা হয় তবে এসবের চর্চা করলে সম্পর্কে দুঃখ কেবল বাড়তেই থাকে। বারবার ভ্রান্তি জন্মে যে এটা বুঝি প্রেমের সম্পর্ক, এটা বুঝি ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু বারবার আঘাত পেয়েই ফিরে আসতে হয়। প্রচলিত প্রথাই এখানে তাই রীতি।

আবার এ গল্পেই আরেকটা পরিবারের অস্তিত্ব পাই যেখানে তৎকালীন

পরিবারেরও একটা ভিন্ন ছাঁচ দেখা যায়। বিন্দুর ভাষায়, তাঁর শ্বশুর বিন্দুর 'শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৪) – এই বাক্যটি দিয়ে কিন্তু এও বোঝা যায় যে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পর্কের জায়গায় তাহলে শুধু পুরুষটির সকল সিদ্ধান্ত সংসারে খাটে না। এই পরিবারটিতে কিন্তু নারী চরিত্রটিরই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো। সম্পর্কের সুস্থতার ক্ষেত্রে কেউ কাউকে যমের মতো ভয় করছে সেটা কোনো স্বাভাবিক বিষয় না। বরং তা অসুস্থ সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। ভয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনোই ভালো জিনিস না। কিন্তু সে সময়ের পারিবারিক কাঠামোতেও কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীকে আমরা পাচ্ছি। এখানে এই নারীর উপস্থিতিটা নেগেটিভ। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে পজিটিভ হতে পারত যদি এখানে ভয়ের চর্চা না হয়ে ভালোবাসার চর্চা হত। এবং তা সম্ভব হতো পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ থেকে।

মানুষ স্বভাবজাত ভাবেই এমন একটা প্রাণী যার খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা হলো ভালোবাসা পাওয়ার চাহিদা। এই ভালোবাসা দিয়ে সে নিজেকে চিনতে পারে, আবিষ্কার করে। এটা নিজে নিজে ঘটে না। কেউ কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসলেই যাকে ভালোবাসা হয় সে নিজেকে আবিস্কার করতে পারে। এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। আর এটা সম্ভব হয় তখনি যখন এই উপলব্ধিটা অন্য কেউ এনে দেয়। মনে করিয়ে দেয়। দেখিয়ে দেয়। এতে মানুষ স্বীকৃতি পায়। তার নিজস্ব বোধগুলো, বুদ্ধিগুলো চর্চিত হয় আত্মবিশ্বাসের সাথে। তাই মৃণাল মুক্তির স্বরূপটাও তার মধ্যে দেখতে পেয়েছে বিন্দুর ভালোবাসা দিয়ে।

মৃণাল যখন সেই সময় পার করে এসেছে, যে সময় সে রূপ বা সৌন্দর্যকে সংসারের জন্য অপ্রয়োজনীয় বলে আখ্যা দিয়েছে, সে সময় বিন্দু নামের এই মেয়েটি তাকে মনে করিয়ে দিলো যে তার রূপ আছে। বিন্দু বলেছে, 'দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৩)। এই যে বিন্দুর চোখ দিয়ে মৃণালকে দেখা, এটা ভালোবাসার চোখ। বাহ্যিক রূপের চোখ নয়। রূপে ভোলানো নয়, ভালোবাসায় ভোলানো। অর্থাৎ সম্পর্কে ভালবাসাই মূল জিনিস। যা হারিয়ে গেলে সম্পর্ক টেকে না। এখানে সম্পর্কের নতুন গড়ন আমাদের সামনে হাজির হয়। তা হলো, যে সম্পর্কে ভালোবাসা থাকে, সেই সম্পর্কে থাকে রূপের প্রকৃত কদর। কি ছেলে বা কি মেয়ে সেটা এখানে মুখ্য না। মুখ্য বিষয় হল ভালোবাসা। কাউকে যখন আমরা ভালোবাসি, তখন সেই মানুষটার চেহারা দেখে বিমোহিত হয়ে তাকে ভালোবাসা শুরু করে দেই, এরকম নৈমিত্তিক ভালোবাসার প্রসঙ্গ এটা নয়। প্রসঙ্গটা হলো ভালোবাসার গভীরতার। সেখানে কারো বাহ্যিক সৌন্দর্যটা আসল কথা নয়। ভেতরের সৌন্দর্যটাও গুরুত্বপূর্ণ।

তার মানে মানুষকে ভালোবাসতে পারাও মানুষের দানশীলতা, মমতা, স্নেহ-

পরায়ণতা, সততা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলীরই একটা অংশ। মানুষে মানুষে ভেদাভেদে এগুলো কম বেশি হয় অথবা হয় না। যেমন; মৃণাল লিখছে বিন্দুর শাশুড়ি সম্পর্কে, 'মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৪)। কিন্তু মৃণাল মেয়ে হয়েও আরেকটা মেয়েকে সাহায্য করছে, ভালোবাসছে। এইটা মেয়ে সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কথা। কিন্তু অন্যত্র কিন্তু একটা ছেলেও একটা ছেলেকে দয়া করে না। সুতরাং, এটা নিছক মেয়েলী ব্যাপার নয়। এটা মানুষের সাথে মানুষের চারিত্রিক পার্থক্য। মানবীয় গুণাবলী মেয়ে কিংবা ছেলে নির্বিশেষেই থাকে।

সংসারের সিস্টেম: মানা ও না মানা

যে ব্যক্তিটার মুক্ত হয়ে ওঠা হয় নি, যার মায়ের মতো সত্য হয়ে ওঠা হয় নি, যার জীবনে আদর নেই, ভালোবাসা নেই, ঠিক এরকম একটা সময়ে এ গল্পে আমরা বিন্দু নামের আরেকটি চরিত্রের সাথে পরিচিত হই। সেই সময়ের সমাজবাস্তবতায় এখানে আমরা বিন্দুকে পাই আরেকটি অনাদরে, অভাবে, অবহেলায় এবং রূপে, গুণে, বংশমর্যাদায় অতি অধস্তন রূপে। এখানে আরেকটি নারী চরিত্রকে পাই, যে-ও সমানভাবে তৎকালীন সমাজের নারীর আরেকটি প্রতিচ্ছবি। এই চরিত্রটিরও অসহায়ত্ব আমরা প্রতি পদে পদে খেয়াল করি। এখানে সার্বিকভাবে যে বিষয়গুলো উঠে আসে তার মূল কথা হল প্রথাগত পারিবারিক সিস্টেমের মধ্যকার অনাদরকে অস্বীকার করা, ন্যায়-অন্যায় বোধের সঙ্গে মৃণালের আমি স্বত্বার বোঝাপড়া এবং এগুলোকে অতিক্রম করা।

এখানে 'বড়জা'ও স্ত্রীর পত্রের একান্নবর্তী পরিবারটির একটি নারী চরিত্র। কিন্তু এই চরিত্রটি সেই সময়ের সিস্টেমকে মেনে নেওয়া, পারিবারিক প্রথাকে মেনে নেওয়া, প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ না তোলা, বরং প্রথাকেই ধর্ম জ্ঞান করে চলাটাকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়া একজন টিপিক্যাল নারী চরিত্র। কিন্তু এরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি শুধু নারীর মধ্যেই আমরা পাই? বরং পরিবারে এরকম পুরুষ চরিত্রেরও আমরা কিন্তু দেখা পাই যারা এসমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রথা মেনেই আসছে। এধরণের মানুষগুলো ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে নি। অর্থাৎ সিস্টেমকে বা সিস্টেমের ভুল ত্রুটিকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বিষয় না। বিষয়টা আত্মমর্যাদাবোধের, বিষয়টা স্বকীয়তার, স্বতন্ত্রতার এবং সৎসাহসের। গল্পকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনে এই চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ করা। কিন্তু প্রত্যেক পারিবারিক সিস্টেমে এইসব চরিত্র বাস্তবিকই বিদ্যমান। কেউ মেনে নেয়, কেউ প্রতিবাদ করে। সেকারণেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তন আসে। কেউ না কেউ এই পরিবর্তনের জন্য সাহস করে পা বাড়ায়। কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হয়। যেমন ভাবে সে বলেছিল, 'আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে

ভালো বলে বুঝি আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয় ...।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩২)

মৃণাল যেখান থেকে শুরু করেছিল পারিবারিক সিস্টেম, পারস্পরিক সম্পর্কের সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করা। বিন্দুর পাশে দাঁড়ানো মানে হল প্রতি পদে পদে সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যেটা আর কেউ করতে পারছে না, করে দেখানোর সাহসও করছে না, সেটা করার অর্থ হল মৃণালের আমিত্বটাকে বজায় রাখা। বুদ্ধির চর্চাকে বাঁচিয়ে রাখা। নিজের ভালোমন্দ বোধের সাথে কম্প্রোমাইজ না করা। সেটা নিজের দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি বুদ্ধিকে স্বাভাবিক মনে করে, সে বাধা মেনে চলতে পারে না, সে তো বিন্দুর পাশে দাঁড়ানোকে তার নিজের স্বাধীনতার প্রশ্ন হিসেবেই দেখবে। তার নিজের মুক্ত হয়ে ওঠার প্রশ্ন হিসেবেই দেখবে। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত যে আলো, সেই আলোতেই সে ভালো খুঁজবে। ভালোর দেখা পাবে। প্রতি পদে পদে মৃণাল নিজের আত্মসম্মানবোধ এবং ভালোমন্দ বিচারের বোধের সাথে বোঝাপড়া করেছে। এটাই তার স্বতন্ত্রতা। যার কারণে সে আবার জানিয়ে দিল যে তার ভালোমন্দ বোঝার ধরণটাও তার মতো স্বতন্ত্র। তার স্বাভাবিক বুদ্ধির মতই নিজস্ব।

অভ্যাসের অন্ধকার থেকে পরিবর্তনের পথে

প্রচলিত চোখে 'অভ্যাস' শব্দটির দুই রকম অর্থ করা যায়। এক অভ্যাস মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজে যদি কেউ অদক্ষ হয়– অভ্যস্ততা বাড়ালে তার কাজের দক্ষতা বাড়বে। এটা চর্চার কাজ। চর্চা করে করে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই অভ্যাসের অর্থ হল 'একবার না পারিলে দেখো শতবার'। এই অভ্যাসের বিপরীতে অনভ্যাস হল চর্চা না করা বা কোনো কিছু দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে না পারা। কিন্তু আরেক রকমের অভ্যাস আছে, যা কোনো কিছুর অবস্থা নির্দেশ করে। সেটিও দীর্ঘ দিনের চর্চারই ফল। কিন্তু এই চর্চা দীর্ঘদিন থেকে অভ্যস্তভাবে চলে আসছে বলেই আমরা চোখ-কান বুঁজে এই অভ্যাসেই পথ চলি। যেমন পরিবারে কোনো একজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত দেবে আর পরিবারের বাকিরা সবাই তা মেনে নেবে, এটাও এক ধরনের অভ্যাস। সংসারে বড়রা যা বলবে, ছোটরা তা-ই শুনবে – এধরনের রীতিগুলোও একরকমের অভ্যাস। কিন্তু এধরনের অভ্যাস আমাদের জগতকে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে ফেলে। এতে আমাদের মুক্তি ঘটে না। এই 'অভ্যাস' আমাদের সমাজে ও আত্মার গহীনে তৈরী করে 'অন্ধকার'। অন্ধকারে মানুষ বাঁচে না। নিঃশ্বাস নিতে পারে না। 'অভ্যাসের অন্ধকারে' হাওয়া চলাচল করতে পারে না। সম্পর্ক আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটার মূল প্রতিপাদ্য হল প্রচলিত পরিবার কাঠামোতে নারী তথা

ব্যক্তির মুক্তি নেই। মুক্তির জন্য দরকার মুক্ত আলো বাতাসের, মুক্ত বুদ্ধির চর্চার, ভালোবাসার এবং আত্মমর্যাদার। সম্পর্কে এগুলো অপরিহার্য। না হলে সম্পর্ক বাঁচেনা, পরিবার বাঁচেনা, ব্যক্তি বাঁচে না।

তৎকালীন সমাজের নারী-পুরুষ বৈষম্যও ভয়াবহ ভাবে উঠে আসে এতে। যেমন, 'ছেলে হোক না পাগল, সে তো পুরুষ বটে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৫)। মৃনালের এই বাক্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পুরুষের দাম সমাজে অমূল্য। মৃণালের বড়ো জা-ও বলেছিল 'পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৫)। অর্থাৎ পাগল, ছাগল, পুরুষ, স্বামী সকলেরই সমান মূল্য। সকলেই সমান মূল্যবান এবং এতোটাই তাঁর মূল্য যে সে একটা সুস্থ নারীর চেয়েও দামী। নারীকে মানুষ না ভাবার প্রবণতা এ সমাজে প্রকট। সেকারণেই একটা 'পাগল' পুরুষের সাথে একটা সুস্থ নারীর তুলনা চলে। এবং সেটাকে অস্বাভাবিক যেন না ভাবা হয়, তাও জায়েজ করার প্রক্রিয়া চলে। বিন্দুর কাপড়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার কাহিনীর বর্ণনা থাকে মৃণালের চিঠিতে। এবং সেই আত্মহত্যার পদ্ধতিকেও সমাজে কীরকমভাবে কেবলমাত্র 'নাটক করা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৭) বলে আখ্যায়িত করা হতো, এবং নারীর প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কেমন ছিল তা মৃণালের চিঠির সাবলীল বিবরণীতে উঠে আসে। কিন্তু বিন্দুর এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃনালের মধ্যকার ব্যক্তিটা আরো পরিষ্কার করে নিজেকে আবিষ্কার করে।

সংসারের মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলোকে ফেস করা এতটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে সেটা মৃণালের মতো মুক্তিপরায়ণ, স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য মেনে নেয়া অনেক কঠিন। সে দেখছে সামান্য মাখন বরালের গলির সামান্য ইট কাঠের তোলা প্রাচীর – এগুলোকে অতিক্রম করতে এতো ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয় কেন? এই তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছ বেঁচে থাকা, তাতেও ব্যক্তি এতো পরাধীন কেন? মৃণাল সংসারের, সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে শুধু বাধা-ই দেখেছে। মুক্তি দেখে নি। সংসারের বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলিকে সে প্রতি পদে পদে প্রশ্ন করেছে। 'অভ্যাসের অন্ধকারে'র (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১: ৩৩৮) দিকে প্রশ্ন ছুড়েই ক্ষান্ত হয় নি সে, বরং চ্যালেঞ্জ করেছে। এই যে বাঁধা নিয়ম, অভ্যাস, বুলি সবটাই যে পরাধীনতার শিকল ছাড়া আর কিছুই না এবং এগুলো যে নিতান্তই তুচ্ছ – এটা মৃণাল তার পনেরো বছরের সংসার জীবন থেকে উপলব্ধি করেছে। এই উপলব্ধি দিয়েই সে তার স্বরূপ আবিষ্কার করলো। বুঝল যে সে এই পদ্ধতিকে মেনে চলার মানুষ না। এই কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় করে বেঁচে থাকা তার জন্য অসম্ভব।

মেজোবউ হয়ে যেটা পারা যায় নি, সেখানে মেজোবউ থেকে মৃণাল হওয়াই শ্রেয়। যে মৃণাল মুক্তির প্রতীক, আমিত্বের প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক তার জন্য

সংসারে মেজোবউয়ের পদটির কোনো গুরুত্ব বা অর্থ নেই। অর্থাৎ সে বলছে, আজ থেকে আমি আর তোমাদের পরিবারের মেজবউয়ের পদে চাকরি করছি না। খোলস ছিন্ন করতে যে ভয়কে অতিক্রম করতে হয় সেটাও তার নেই। ভয়কে অতিক্রম করতে পারাও স্বাধীনতার, পরিবর্তনের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। আরো স্পষ্ট করে সে বলল, মেজোবউ থেকে আমি আজ মৃণাল হলাম। মুক্ত হলাম, স্বাধীন হলাম। না মরে। বেঁচে থেকেই। অর্থাৎ, মৃণাল বলছে বেঁচে থেকেই মুক্ত ও স্বাধীন হওয়া সম্ভব। বাঁচবার জন্য মরার দরকার নেই। জীবনের সাথে লেগে থাকাই বেঁচে থাকা। আর জীবনের অর্থ মুক্তিতেই। তা সংসারে বা পরিবারে, সমাজে – সব ক্ষেত্রেই। মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন করাই মৃণালের প্রচলিত সম্পর্কের প্যাটার্ন থেকে বের হয়ে আসার প্রতিবাদের ভাষা। পরিবর্তনের দিকে যাওয়ার ভাষা।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এমা গোল্ডম্যান তাঁর ‘বিবাহ এবং প্রেম’ (১৯১০) রচনায় শুরুতেই বলেছিলেন,

> প্রতিটি বিবাহের পেছনেই রয়েছে দুটি লিঙ্গের সারা জীবনের পরিবেশ; সে পরিবেশ এতই পৃথক যে নারী ও পুরুষ অপরিচিত আগন্তুকই রয়ে যায়। সংস্কার রীতিনীতি অভ্যাসের এক অনতিক্রম্য দেয়ালে পৃথক থাকায় পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাবোধ – যা ছাড়া প্রতিটি মিলনই ব্যর্থ হতে বাধ্য – গড়ে তোলার কোনো সম্ভাবনা বিবাহের মাঝে নেই।

সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা তাঁর চরম সত্য উপলব্ধি। তা আবার ‘স্ত্রীর পত্র’তেও দেখা গেল। আবার এতেই কিন্তু আমাদের মুক্তির কথা বলা হয়েছে, আমাদের সম্পর্কের স্বাধীনতার কথা এই আকাশেই রচিত আছে, সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনাও চিহ্নিত করা আছে সর্বজনের মনের মাঝে। আশ্চর্যের বিষয় হল, আজকের দিনেও এই গল্পটিকে সমাজের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিতকরণে এবং সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশনা পেতেও আমাদের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা নতুন চোখ খুলে দেয়। সকল বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজেও স্বয়ং ‘মৃণাল’ চরিত্রটি এখানে ‘চেঞ্জ এজেন্ট’ হিসেবে কাজ করে বা ইতিবাচক পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা দেয় (ভারতী রায়, ২০১১)। বিবাহ ও পরিবারে সম্পর্কের বাঁধা অভ্যাসের জায়গায় আঘাত করার মতো জরুরি প্রশ্ন তোলে। ‘অভ্যাসের অন্ধকারে’র বিপরীতে অনভ্যাসের আলোর দিশা পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে ব্যক্তির জন্য। এত বছর পরেও গল্পটি আমাদেরকে সম্পর্ক-বিবাহ-পরিবারকে নতুন চোখে, পৃথক দৃষ্টিতে দেখার জায়গা করে দেয়। শুধু নারী বা পুরুষের জন্য না। ব্যক্তির জন্য। মানুষের জন্য।

বকুলতলা, রংপুর: ২০শে ডিসেম্বর ২০১৪

তথ্যসূত্র

ইন্দ্রানী চ্যাটার্জি, ১৯২৮। Virginia Woolfe, *A Room of One's Own*, A Project Gutenberg of Australia eBook, This eBook was produced by: Col Choat, eBook No.: 0200791.txt, Date first posted: October 2002, Date most recently updated: October 2002, http://gutenberg.net.au.

ইন্দ্রানী চ্যাটার্জি, ২০০১। Indrani Chatterjee, ''En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives by Sangeeta Ray'', *The Journal of Asian Studies*, Vol. 660, No. 2 (May, 2001), pp. 591-593.

এমা গোল্ডম্যান (১৯১০)। 'বিবাহ এবং প্রেম'। বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত *নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে* গ্রন্থে হাসিবুর রহমান কর্তৃক অনুদিত প্রবন্ধ। পৃ. ৪৬-৫১। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৯।

ভারতী রায়, ২০১১। Bharati Ray, ''Fresh Air And Freedom: Rabindranath Tagore's Portrayal of Women as Agents of Change in Society and Culture'', *Aletria*, N. 2 - V. 21. pp. 11-25.

মেরি ল্যাগো, ১৯৭৭। ''Mary M. Lago, Tagore's Liberated Women '', *Jour-nal of South Asian Literature*, Vol. 12, No. 3/4, Feminine Sen-sibility and Characterization in South Asian Literature (Spring-Summer 1977), pp. 103-107.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩২১। 'স্ত্রীর পত্র' (রবীন্দ্র-রচনাসমগ্র > গল্প> গল্পগুচ্ছ> স্ত্রীর পত্র), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা-প্রযুক্তি-গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ডট এনএলটিআর ডট অর্গ। http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/279। এবং 'স্ত্রীর পত্র', মাসিক *সবুজপত্র*, শ্রাবণ ১৩২১, *গল্পগুচ্ছ*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২), দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩৩৮, কলকাতা: বিশ্বভারতী।

সোমনাথ মৈত্র, ১৯৫৭। Somnath Maitra, ''Short Stories of Tagore'', *Indian Literature*, Vol. 1, No. 1 (October 1957), pp. 15-26.

হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪। 'রামমোহন ও বিদ্যাসাগর: প্রাণদাতা ও জীবনদাতা', *নারী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

সেলিম রেজা নিউটন

সম্পর্ক স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ*

Rabindranath Tagore

মুখস্থ সম্পর্কে ছিলাম না কোনো দিন। মুখস্তের মুখ চোখে পড়া মাত্র মুখ ফিরিয়েছি। শিরোনামের 'সম্পর্ক'টাও আমার অজানা সম্পর্ক বটে। সম্পর্ক মাত্রই আমার কাছে প্রেম। প্রেমে পড়েছি তাঁর। এ রচনা লিখতে বসে তাঁর সাথে আমার প্রেমের দাগ-গুলোকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছি মাত্র। খেয়াল করছি, বিশ্বপ্রকৃতিতে অবস্থিত ব্যক্তি-মানুষের 'স্বাধীনতার নিয়ম'গুলোকে ক্রম-আত্মস্থ করার সূত্র ধরেই সম্পর্ক আমার তাঁর সাথে। রবীন্দ্রনাথের সাথে। যুক্তি আর মুক্তিকে কেন্দ্র করেই আমার রবীন্দ্রনাথ। যুক্ত তিনি সকলের সাথে। সর্বময় যুক্ততার সর্বজনীন উপলব্ধিই তাঁর

* পত্রিকায় প্রকাশের সময় এই রচনাটা আমি উৎসর্গ করেছি আমার বন্ধু 'চিহ্ন-সম্পাদক প্রফেসর শহীদ ইকবালের প্রীতিকমলে'। ইকবালদের পত্রিকা চিহ্ন-র রবীন্দ্র-বিষয়ক সংখ্যার জন্য তিনি আমাকে 'আমার রবীন্দ্রনাথ' জাতীয় একটা লেখার জন্য বলেছিলেন। এটাই সেই রচনা। কিন্তু একটুর জন্য এটা আমি তাঁর হাতে সময়মতো পৌঁছাতে পারি নি বলে চিহ্ন-তে এটা ছাপা হয় নি। এখানেও রইল এটা প্রফেসর ইকবালের প্রীতিকমলে।

মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার সারসত্তা। যাবতীয় বদ্ধতাকে মুক্ত করার সাধনাই তাঁর সাধনা। 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ' তাঁর মূলমন্ত্র।[১] আবিশ্ব যুক্ততার 'বিশ্বধর্ম' তাঁর একান্ত উপলব্ধি। যুক্ততার যুক্তি তাই বন্ধন হয়ে ওঠে না তাঁর জন্য। বিশ্বধর্ম হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন মুক্তিধর্ম। 'বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই।'[২]

আমার যুক্তিবোধ কোনো গুরুজনের কাছ থেকে আয়ত্ত-বস্তু নয়। বই পড়েও শেখা নয়। আগুনের সাথে কয়লার সংযুক্তির শিখায়ই কেবল শিক্ষা করা যায় এ যুক্তিবোধ। নিছক মনুষ্যস্বভাবে। নিতান্তই জন্মসূত্রে। কোনোকিছু সহকারে যা জন্মায়, তা-ই সহজ। আমার যুক্তিবোধ আমার সাথেই জন্মেছে। তাই আমার যুক্তিবোধ সহজ। সহজাত। সহজ যুক্তি এই যে: যুক্তি কোনো তর্কযুক্তি নয়। মতবিরোধের যুক্তিও নয়। ওসব নিছক গালাগালির যুক্তি। (স্মর্তব্য: 'মতবিরোধ নিয়ে তোমরা যাকে যুক্তি বলো আমরা তাকে বলি গাল'।[৩])। গালাগালির যুক্তির কথা এখানে হচ্ছে না। লজিকবিদ্যার যুক্তির কথাও নয়। আমার যুক্তিবোধ সম্পর্কের। ভালোবাসার। প্রেমের। এবং অবশ্য-অবশ্যই মুক্তির আর স্বাধীনতার।

যুক্তি বলতে যুক্ততা বোঝায়। আমার যুক্তিবোধ হলো যুক্ততার বোধ। একটা কিছু অন্য কিছুর সাথে যেভাবে সম্পর্কিত, যেভাবে যুক্ত, যেভাবে পার্থক্যযুক্ত, সেটাই তাদের মধ্যকার যুক্তি। ঐ যুক্তিতেই তারা পরস্পর-সম্পর্কিত। এই অর্থে যুক্তিবোধ লজিকবিদ্যা-বিবর্জিত কিছুও নয়। সম্পর্কই যুক্তি – যুক্ততা। আর প্রেমও এক প্রকার সম্পর্ক। যুক্তিই তাহলে প্রেম। যুক্তিবোধই প্রেমবোধ। যুক্তির অনুভূতি তথা যুক্ততার অনুভূতিই তাহলে প্রেমের অনুভূতি। উপরন্তু প্রেম স্রেফ এক প্রকার সম্পর্কই নয় – সর্ব প্রকার সম্পর্কই প্রেম। যাবতীয় সম্পর্কই একেক ধরনের প্রেম। প্রেম তাহলে নিছকই সম্পর্ক। টান। কীভাবে একে অন্যকে টানে, টানাটানি হয়, সেটাই তাদের মধ্যকার যুক্ততা, সম্পর্ক, প্রেম। প্রেম তাই টানাপোড়েনমুক্ত হয় না। হতে পারে না। টানাটানিতে অন্তর পোড়ে। না পুড়লে প্রেম হয় না। আলো হয় না। সম্পর্ক হয় না। যে সম্পর্ক এমনকি নষ্ট হয়ে যায় বলে মনে হয়, সেও এক প্রকার সম্পর্কই। তাতে

---

১ রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পূজাপর্ব, ১১১ সংখ্যক গান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা-প্রযুক্তি-গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ডট এনএলটিআর ডট অর্গ। এর পর থেকে শুধু 'রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২ রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের ১ম পর্বের 'ত্যাগ' নামাঙ্কিত অংশ, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

৩ রবীন্দ্রনাথ, 'সংগীতচিন্তা' বইয়ের 'সংযোজন' অংশে 'কল্যাণীয় ধূর্জটি'প্রসাদকে লেখা চিঠি, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

দূরত্ব বেশি। টান কম। তাই টানাটানি কম। দহনও কম। তবু সেটা সম্পর্ক। দুর্বল সম্পর্ক। দুর্বল সম্পর্ক মানেই খারাপ সম্পর্ক না। প্রবল সম্পর্কও খারাপ হতে পারে। টানাপোড়েন তাহলে সমস্যা না। টানাপোড়েনই সম্পর্ক বরং। কোনো না কোনো প্রকার টানাপোড়েন। টান ছাড়া সচলতা নাই। আর এই মহাবিশ্বে কিছুই স্থির নয়। অনড় নয়। সচল। সম্পর্ক তাই অনড় নয়। সদাপরিবর্তমান। 'পাল্টায় মন, পাল্টায় চারপাশ, রাস্তায় আসে নতুন রুটের বাস; পাল্টায় চেনা মুখের দেখন-হাসি, পাল্টাও তুমি তোমায় দেখতে আসি' (কবীর সুমনের গান)।

অনেকেই এই অপরিহার্য পরিবর্তন মানতে চান না। নিজেরা বদলান। কিন্তু বদলটাকে খেয়াল করতে চান না। স্বীকার করেন না। যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁদেরকে উল্টো বলেন পাল্টি-খাওয়া লোক। পাল্টে যাওয়া প্রেমিকের মুখ দেখতে চান না কেউ। মান্না দের মতো তাঁদের অন্যতম 'সিগনেচার সং' হয়: 'তুমি কি সেই আগের মতোই আছো? নাকি অনেকখানি বদলে গেছ? খুব জানতে ইচ্ছে করে।' জানতে আসলে ইচ্ছা করে 'তুমি' বদলাও নি। কেউ বদলাবে না। সব আগের মতো থাকবে।

কৃষি-কেন্দ্রিক, ভূমি-মালিকানাভিত্তিক এই সামন্ত মনন ভারতবর্ষকে ভাষায় গাছের মতো অনড় করে রেখেছিল সহস্র বছর (কার্ল মার্ক্স, 'ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল')। আমাদের মন এখনও সেই অচলায়তনে স্থির হয়ে থাকতে চায়। একেবারে কালোপাহাড়ি আইকনোক্লাস্টের মতো করে সেই 'অচলায়তন'কে আক্রমণ করেন রবীন্দ্রনাথ। বাঁধ ভেঙে 'মুক্তধারা' বওয়ানোর সাধনায় অনির্লিপ্ত থাকেন জীবনভর।

জীবন তো আর থেমে থাকে না। 'রাস্তার নাম পাল্টায় একদিন, ধারা পাল্টায় মাও সে তুং-এর চীন; প্রেম পাল্টায়, শরীরও পাল্টে যায়, ডাকছে জীবন: আয় পাল্টাবি আয়' — এ ডাক কবীর সুমনের নয় আসলে। এ ডাক শুষ্ক-সজল জীবনের। এ ডাকে সাড়া দেয়া সহজ নয়। তার জন্য নিজেকে সহজ করে তুলতে হয়। স্বরচিত মুখোশের আড়ালে, আর কল্পখোলসের ভেতরে নিজেকে বন্দি করে রাখলে চলে না। নিজের দায়িত্বটুকু অন্তত নিতে হয়। নিজের অধীন হতে হয়। স্বাধীন হতে হয়। তবেই জীবনপ্রবাহের গতিধর্ম-স্থিতিধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। পরিবর্তনকে ভয় লাগে না। অনেকে সেটা মানতে পারেন না। অনড় স্থিরতা চান তাঁরা। ধ্রুব প্রেম চান। তাঁদের প্রেমও পাল্টায় না। শরীরও পাল্টায় না। ওগুলো পাল্টালেও মনটা পাল্টায় না। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন হৃদয়' পর্যন্ত 'পুলকে দুলিয়া' ওঠে অথচ আমাদের নতুন হৃদর ভদ্রলোকেরা সুস্থির, গৃহপালিত, গেরস্থালি প্রেম চান। সম্পর্কের স্থিরতা চাওয়া কেন? ভয়ে। পরিবর্তনের ভয়। নতুনের ভয়। তাছাড়া, সম্পর্ক সুস্থির হলে, তাকে নিজের দরকার মতো ব্যবহার করতে সুবিধা হয়। সুস্থির সম্পর্ক হলো কেজো সম্পর্ক। প্রয়োজন পূরণের সম্পর্ক। দরকারের সম্পর্ক। উদ্দেশ্য

হাসিলের সম্পর্ক। উদ্দেশ্য: নিজের স্থূল কামনা বাসনা প্রলোভনকে চরিতার্থ করা। এ হলো স্থূল সম্পর্ক। স্থূল সম্পর্ক কামপরায়ণ। স্থূল প্রেমিক আসলে প্রেমিকই নন। সম্পর্ক-সন্ধানী তিনি – সুযোগসন্ধানী। ধান্দাবাজ। কামুক তিনি। তিনি শুধু নিজের ইন্দ্রিয়বাসনা চরিতার্থ করতে চান। ষড়রিপুর কাছে নিজেকে সঁপে দেন তিনি। রিপু আর ইন্দ্রিয়ই তার সুখ। নিজেকে সুখী করতে চান তিনি। কিন্তু তাঁর আনন্দ হয় না। কেননা কামনা কোনোদিন পরিতৃপ্ত হয় না। এই অপরিতৃপ্তি তাঁকে ব্যর্থতার অনুভব দেয়। ব্যর্থতা তাঁর কাছে অসহনীয়। তিনি চান সফলতা। সফলতার তাড়না থামতে দেয় না। 'আরো চাই, আরো চাই' স্পৃহা কেড়ে নেয় স্বাধ-আহ্লাদ-সাধনার স্বাদ। প্রয়োজনের সম্পর্ক তাই আনন্দহীন। কেননা তা উদ্দেশ্যপরায়ণ।

প্রেম অবসরের ঘটনা। প্রেম কোনো ব্যস্ত কাহিনী নয়। ব্যস্ততা অফিসের প্রসঙ্গ। বাণিজ্যের প্রসঙ্গ। অবকাশ নিজেই প্রেম। উদ্দেশ্যহীন অবকাশ। এর সম্পর্ক রিক্ততার সাথে। রবীন্দ্রনাথের দেখা সেই রিক্ত একটা ঘরের মধ্যে এর বাস:

> ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই। একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুলছে। ওই ছবি আমার সমস্ত চোখ একা অধিকার করে; চারি পাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ করবার মতো কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তার সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিস ভিড় করত তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাকত একটি আসবাবমাত্র হয়ে, তার ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হত, সে আপনার সব কথা বলতে পারত না।
>
> কাব্য সংগীত প্রভৃতি অন্য-সমস্ত রসসৃষ্টিও এইরকম বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারিদিকে যদি অবকাশ না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ মূর্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায়; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমকলাগা। (রবীন্দ্রনাথ, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।)

চিত্তের এ জাগরণই প্রেম। আত্মজাগরণ। হেনরি ম্যাকে'র 'নৈরাজ্য' কবিতার মতো 'যখন প্রত্যেকে জেগে উঠবে নিদেনপক্ষে নিজের নিকটে' তখন আমরা প্রেমময় সমাজ পাব। আত্মজাগরণই আত্মবিকাশ। আত্ম-পরিচয়। আত্ম-অধীনতা। স্ব-অধীনতা। স্বরাজ। এ বস্তুর নামই প্রেম। প্রেম ছাড়া স্বাধীনতা নাই। আত্ম-পরিচয়ের বিকাশ যার মধ্যে ঘটে নি, যার আত্মা এখনও সুপ্তিকাতর, প্রেম তার কাছে অনুষ্ঠান। নায়কনায়িকার হাত-ধরাধরি করে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অনুষ্ঠান। মিডিয়া-ম্যানুয়ালে সূচিবদ্ধ অনুষ্ঠান। প্রেম কোনো ভিড়ের গল্প নয়–

ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মন যদি কাব্যকে গানকে পেতে হয় তা হলে তার খুব আড়ম্বরের ঘটা করা দরকার। কিন্তু সে-আড়ম্বরে শ্রোতার কানটাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরো বেশি করে ঢাকাই পড়ে। কারণ, সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরত দেখাবার প্রলোভনে মজে, আপনাকে দেখাতে ভুলে যায়। আড়ম্বর জিনিসটা একটা চিৎকার; যেখানে গোলমালের অন্ত নেই সেখানে তাকে গোচর হয়ে ওঠবার জন্যে চীৎকার করতে হয়; সেই চীৎকারটাকেই ভিড়ের লোক শক্তির লক্ষণ জেনে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আর্ট তো চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয়ে হচ্ছে তার আত্মসংবরণে। আর্ট বরঞ্চ ঠেলা খেয়ে চুপ করে যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঠেলা মেরে পালোয়ানি করার মতো লজ্জা তার আর নেই। হায় রে লোকের মন, তোমাকে খুশি করবার জন্যে রামচন্দ্র একদিন সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন...। (রবীন্দ্রনাথ, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।)

দেশ-দশ-সমাজের বাইরে নয় প্রেম। যে নিজেকে চেনে, পরিবেষ্টনী-প্রকৃতি-পুঞ্জকে সহকারেই নিজেকে চেনে সে। যে নিজেকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসে সবাইকে। কিন্তু তাই বলে প্রেম চীৎকার নয়। আড়ম্বর নয়। কোলাহল নয়। গোলমাল নয়। ক্রমাগত ভিড় ঠেলাঠেলি করে সিনেমা হলের টিকেট কাউন্টার থেকে টিকেট জোটানোর সফলতা নয়। প্রেম অপ্রয়োজনের। অকারণের। অকারণই তো কাব্য, কলা, সাহিত্য, গান, আর্ট। অকারণেই আনন্দ। তাসের দেশের 'বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে', সেই হাঁসের দলের অকারণ আনন্দের মতো। রবীন্দ্রনাথ জানেন: 'ওড়বার আনন্দ, অকারণের আনন্দ'।

বৃথা ওড়ার আনন্দের নাম প্রেম। বৃথা-সম্পর্কের নাম প্রেম। উদ্দেশ্যহীন, কামনা -হীন, প্রত্যাশাহীন সম্পর্কের নাম প্রেম। প্রেম শুধু প্রেমকেই চায়। প্রেমের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য নাই। পূরণ করার মতো বিশেষ কোনো ধান্দা নাই। সম্পর্কিত সত্তাকে সুখী করার সাধনার নাম প্রেম। সম্পর্কিত সত্তা সুখী হলেই প্রেমিকের সুখ। এ হলো কামনা মোচনের সাধনা। রিপু, ইন্দ্রিয়, আর কামনাকে অতিক্রম করে প্রেম। নিষ্কাম কর্মযোগের নাম প্রেম। প্রেমে তাই সবই পাওয়া যায়। কোনো অভাবই থাকে না প্রেমে। মন মলিন হয় না। ভাব থাকে শুধু। আনন্দ থাকে। মিলনের আনন্দ। রক্ত-ক্ষরণের আনন্দ। পোড়ার আনন্দ। আলোর আনন্দ। অকারণ আনন্দ।

প্রেম এতই অকারণ যে এমনকি দায়িত্বহীনও বটে। 'সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর! প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজা ও রাণী,* প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য) কর্তব্যবোধতাড়িত সম্পর্কের নাম প্রেম নয়। চুক্তি। বিবাহ। তার

সম্পর্ক দায়-দায়িত্ব-অধিকারের সাথে। প্রেমের সাথে নয়। আনন্দের সাথে নয়। আনন্দ তো বন্ধুকে সুখী করাতেই। কিন্তু তা কর্তব্য নয়। কর্তব্য সংবিধানের অংশ। প্রেম বেআইনী। আইন-অতিক্রমী। সংবিধান-বহির্ভূত। তার আইন তার নিজের রচিত। তা সে বদলায়ও নিজে। প্রেম এক্ষেত্রে আর্টের মতোই। 'তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।' রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখি উপনিষদের গল্প:

> উপনিষদে লিখছে, এক ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর এক পাখি দেখে। যে পাখি দেখছে তারই আনন্দ বড়ো আনন্দ। কেননা তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে। এক পাখির প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখির প্রয়োজন নেই। এক পাখি ভোগ করে, আর-এক পাখি দেখে। যে পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা – নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে সৃজন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এইজন্য ভোগী পাখি যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির উপকরণ হচ্ছে আমি-পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না। (রবীন্দ্রনাথ, 'জাপানযাত্রী', দ্বিতীয় অংশ, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।)

এই আমির প্রকাশই সত্তার প্রকাশ। সর্বসত্তার। এই আমির প্রকাশই ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতার সম্ভাব্য চূড়ান্ত বাস্তব রূপ। কেননা স্বাধীনতা সীমাহীন নয়। আমার প্রকাশের সীমাই আমার স্বাধীনতার সীমা। তাই বলে কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য-আইন-কানুন-আদালত আমার প্রকাশের সীমা নির্ধারণ করতে পারে না। এই সীমা নির্ধারণ করতে পারি শুধু আমি। তা আমি নির্ধারণ করি আমার প্রকাশের সীমা অনুভব করার মধ্য দিয়ে। এ সীমাবদ্ধতা আরোপিত নয়, অন্তর্জাত নয়, অন্তঃ-নিবিষ্ট। আমার ভেতরের এ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমও করতে পারি আমি। নবরূপ নবপ্রকাশের কর্তব্য-ঊর্ধ্ব আনন্দে। আবার, রূপ সৃষ্টির এ স্বাধীনতা যেহেতু আমার, এ তাই বন্ধুরও (সবার)। তাঁর স্বাধীনতাই তো আমার স্বাধীনতার মানদণ্ড। বব মার্লের গানের মতো: 'বন্ধু তো সে যে তোমাকে পেতে দেয় পূর্ণ স্বাধীনতা যেন তুমি হয়ে ওঠো তুমিই নিজে।' প্রেম তাই স্বাধীন। সেজন্যই সীমাহীন।

ধ্রুব প্রেম বলে কিছু নাই। প্রেমকে যাঁরা নিটোল, গতিহীন সত্তা বলে চাউর করে চলেছেন হাজার বছর ধরে, তাঁরা প্রেমের নিজস্ব যুক্তির দিকে তাকান না। তাঁরা

যুক্তিবোধহীন। আর সেকারণেই তাঁরা আবেগবোধবর্জিত। প্রেমের চাইতে প্রবল আবেগ কী আছে? অন্যের সাথে যুক্ত হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা আর কী আছে? এ জন্যই যুক্তিবোধহীন যিনি, তিনি আবেগবোধহীনও বটে। (দেখার বিষয়: যুক্তিহীন বলি নি, আবেগহীন বলি নি।) যুক্তি তাহলে আবেগই বটে। যুক্তি আর আবেগ পরস্পর-বিপরীত কিছু নয়। এরা একই জিনিসের দুই নাম। একই জিনিসকে দুইভাবে দেখার জন্য দুইটা নাম মাত্র।

জ্ঞান-ইন্ডাস্ট্রি যে বস্তুকে যুক্তি বলে চালায় তা আসলে অস্ত্র। হাতিয়ার। অন্যকে ঘায়েল করার হাতিয়ার। এই যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। করা হয়ে থাকে। এই যুক্তি হলো ব্যক্তির অন্ধ বাসনার শার্টের হাতায় লুকানো ছুরি। চক্ষুহীন কামনার আঁচলে লুকানো বল্লমের ফালা। আমার বাসনা পূরণে যা-কিছু প্রবল বাধা, এ দিয়ে সেসবকে বধ করা যায়। বিচারবুদ্ধিহীন কামনা-বাসনা পূরণের পথ পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার্য কাস্তে এই প্রচলিত যুক্তি। এর সাথে প্রেম নেই। সম্পর্ক নেই। আছে জোরাজুরি। আছে জবরদস্তি। অর্থাৎ বলপ্রয়োগ।

যুক্তির এই অর্থে বলপ্রয়োগ আর যুক্তিপ্রয়োগ একই কথা। এ যুক্তি তাই প্রেমের নয়। প্রভুত্বের। এ যুক্তি মালিকের যুক্তি। মালিকানার যুক্তি। অন্যকে নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা অনুসারে পরিচালিত করার যুক্তি। 'যদি দেখি যে মনের মতো ফল হচ্ছে না তাহলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নয়, অন্যেরই বুদ্ধি ও স্বভাবকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে।'[৪] জবরদস্তির যুক্তিবোধ রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁর যুক্তি 'স্বাভাবিক' যুক্তি। ছন্দের লয় যেমন স্বাভাবিক, সেরকম স্বাভাবিক এ যুক্তিবোধ। এ যুক্তিতে জবরদস্তি নিতান্তই অচল। 'আমাদের প্রাণের, আমাদের হৃদয়ের ছন্দের একটা স্বাভাবিক লয় আছে; তার উপরে দ্রুত প্রয়োজনের জবরদস্তি খাটে না'।[৫]

জবরদস্তির প্রবৃত্তি-যুক্তির সাথে প্রেম-ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই। এ হলো ভালোবাসার নামে, প্রেমের নামে, পিতৃত্বের নামে, মাতৃত্বের নামে, ধর্মের নামে, অন্যকে দিয়ে নিজের দাসত্ব করানোর যুক্তি। এ যুক্তি রবীন্দ্রনাথের না। রবীন্দ্রনাথ জানেন, মানুষ নিজেই নিজের প্রভু হতে চায়। 'সমস্ত প্রলোভন সত্ত্বেও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়'; কেননা 'সে জানে তাহার (নিজেরই) মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে'; 'স্বভাবতই সে প্রভু; সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে—বাহিরের স্তুতি বা লাভ, বা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু যেখানে সে

---

৪ রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের 'সঞ্চয়তৃষ্ণা' অংশ, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

৫ রবীন্দ্রনাথ, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।

আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায়; সেজন্য সে দুঃখ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে। সেজন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়—পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মতো সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।' আর 'এই জন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে, আমি মুক্তি চাই।' (রবীন্দ্রনাথ, 'ধর্মের অর্থ', প্রবন্ধ-সংকলন: 'সঞ্চয়', রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতীন সংস্করণ।) মুক্তি ছাড়া তাই যুক্তি নাই। মুক্তি-যুক্তির সম্পর্ককে আবিষ্কার করাই আমার রবীন্দ্রনাথকে দেখার আনন্দ।

সম্পর্ক ঘরে থাকে। সম্পর্ক থাকে বাইরেও। ঘর আর পথ শেষ পর্যন্ত আলাদা কিছু নয়। মুসাফির-রাস্তাই তো ঢোকে ঘরে। আবার, ঘর থেকেই পথে বেরোয় মানুষ। ঘর যাঁর নাই কিংবা ছিল না, পথ নামক বস্তুটার কোনো ধারণাও তাঁর নাই। ঘরে ছিলেন বলেই তিনি পথে নেমেছেন। ঘর মানে যেকোনো আশ্রয়। সকল আশ্রয়ই অস্থায়ী আশ্রয়। সম্পর্ক তাই সরাইখানা বটে। সরে সরে যায় সে সারাক্ষণ। তার ওপরকার সামিয়ানা কখনও দূরের আকাশ। কখনও তা কাছের ছাউনি, গাছতলা, ছাদ, চাতাল। সম্পর্ক তাহলে যেমন আশ্রয়ের— বিশ্রামের, সম্পর্ক তেমনই আবার অবিশ্রাম পথচলারও। কেননা পথই ঘর অনেকের। উপরন্তু, অনেকের জন্য এমনও হতে পারে: ঘরই পথ তাঁদের। ঘটনা তাহলে পথ কিংবা ঘর নয়। ঘটনা হচ্ছে হাঁটা।

সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার আশ্রয়। আশ্রয় দরকার তার। কেননা তা হাঁটে। পথ চলে। হাঁটে, অনুসন্ধান করে, আস্বাদন করে। আস্বাদন করে একাধারে অমৃত এবং গরল। যখন সে অবিরাম হাঁটে, তখনও কিন্তু শান্ত নিষ্ঠার সাথে অস্তিত্বে একাগ্র থাকে তার আত্মা। আবার, আশ্রয় তাঁর ঘরও। কেননা সে থামেও। থামে, অনুসন্ধান করে, আস্বাদন করে। আস্বাদন করে একাধারে অমৃত এবং গরলের মধ্যবর্তী আনকা নহর। যখন সে থেমে থাকে, তখনও কিন্তু অশান্ত পরিভ্রমণে বহু-অগ্রে (এক-অগ্রে নয়) রত থাকে আত্মা তাহার। গৃহক্লান্ত-গৃহত্যক্ত মানুষের কাছে পথই অবিকল্প আশ্রয়। পথ হচ্ছে ঘরের সাথে তার সম্পর্ক অনুধাবনের অবসর। আবার, মরুপথে দিশাহারা মুসাফিরের আশ্রয় হচ্ছে মরুদ্যান – এক চিলতে ঘর। মরুদ্যানই মরুভূমির সাথে তার সম্পর্ক উপলব্ধি করার অবকাশ।

রবীন্দ্রনাথ আমার অবসর। আলো আনন্দ আর গানের এই অবসরটুকু আছে বলেই হাঁটতে পারি আমি। হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাই: 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে; আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।' আমার নশ্বর দেহ তখন আর জৈবযান্ত্রিক সায়েন্স-সম্মত জড়দেহমাত্র নয়, সদামুক্ত অবিনশ্বর আত্মার সশরীর সামাজিক অস্তিত্ব। 'শরীরকে হত্যা করিলেও ইনি নিহত হন না' (শ্রীমদ্ভগ-বদ্‌গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২০)। আমি তখন উপলব্ধি করতে পারি সমুদয় প্রপঞ্চের সাথে আমার সমুচয় সম্পর্কের মুক্ততার সারসত্তা। অনুধাবন করতে পারি

অন্তহীন সম্পর্করাশির পারস্পরিক মুক্ততার নিত্যস্বভাবটাকে। টের পাই: অনতিক্রম্য যুক্ততার স্বরূপ উপলব্ধি করার মধ্যেই আছে মুক্তির অভিজ্ঞান। টের পাই অস্তিত্বজোড়া অবিনাশী মুক্ত সম্পর্কের স্বাদ। পারস্পরিক দাসত্বের অচলায়তনে জবুথবু আমাদের প্রেম-পরিবার-রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ আইনী সম্পর্কের সীমা তখন অনন্ত স্বাধীন সম্পর্কের অভিসারী হয়ে ওঠে।

আরো অনেক কিছুর মতো, রবীন্দ্রনাথ আমার অবকাশ। নিরাকার আঁধার আর বিশেষণ-অযোগ্য বিষণ্নতার এই অবকাশটুকু আছে বলেই আমি অনুধাবন করতে পারি এ মহাবিশ্বের সাথে আমার বন্ধনহীন যুক্ততার স্বরূপ। টের পাই বাঁচার যুক্তি। এই যুক্তিবোধ আমাকে মুক্তি দেয় যুক্তিহীন সম্পর্কের গতিহীন গ্লানি থেকে। বদ্ধ ও বাধ্যতামূলক সম্পর্করাজির যাবতীয় রাষ্ট্র-সামাজিক জবরদস্তি থেকে।

রচনা: রাবি, জুলাই-আগস্ট ২০১৩। প্রকাশ: দৈনিক বণিক বার্তা, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৩।

সেলিম রেজা নিউটন

ধর্ষণ বলপ্রয়োগ বলাৎকার

Rabindranath Tagore

১.১ গণধর্ষণের গণতন্ত্র

সত্যিকারের ধর্ষণ এক ঘটনা, আর তার মিডিয়া-কাভারেজ এবং এ সম্পর্কিত লেখালিখি, গবেষণা, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা আলাদা ঘটনা। নয়াদিল্লীর

সড়কে চলমান বাসের মধ্যে কয়েকজন মাতাল পুরুষ কর্তৃক দলবদ্ধভাবে একজন নারীকে ধর্ষণ করে বাস থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করার ঘটনাটিকে আমাদের 'গণতান্ত্রিক' মিডিয়া দিব্যি 'গণধর্ষণ' কথাটা দিয়ে চালাচ্ছে। 'গণধর্ষণ' কথাটা মোটেও গণতান্ত্রিক নয়। 'গ্যাং রেপ' এবং 'গণধর্ষণ' কথা দুটির মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল। নিওলিবারাল বাণিজ্যপুঁজির বৈশ্বিক প্রভুদের তরফে তাঁদের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে 'প্রথম আলো' নামের যে কর্পোরেট-বিজ্ঞাপনপত্রটি বাংলাদেশকে পথ দেখানোর ও পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়, তারা পর্যন্ত 'গণধর্ষণ' অব্যাহত রেখেছে। প্রথম আলো তাই বলে কোনো অগণতান্ত্রিক কাজ করছে তা নয়। বিদ্যমান মিডিয়া-গণতন্ত্রে প্রথম আলো সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যাগুরুরই দলে। মিডিয়ায় ধর্ষণ প্রসঙ্গে কথা বলার সময় ধর্ষিতা নারীকে যেভাবে 'ভিক্টিম' হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তা-ও খেয়াল করার মতো। এই আখ্যা ঘোষণা করে: পুরুষ হলো শিকারী, নারী তার শিকার। যেন ধর্ষণ একটি প্রত্যাশিত ঘটনা।

১.২ প্রলোভন: বিদ্যমান গণতন্ত্রের পলিটিক্যাল ইকনোমি

আজকের সারা দুনিয়ায় প্রলোভন বৈধ ব্যাপার। মৌলিকভাবে দরকারি ব্যাপার। প্রলোভন ছাড়া বিজ্ঞাপন অচল। বিজ্ঞাপন ছাড়া পণ্য অচল।[১] পণ্য ছাড়া নিত্যনতুন বাজারি উৎপাদন অচল। প্রবৃদ্ধি ধপাস। এই হলো নয়া উদারনীতিবাদী আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই হলো বিদ্যমান গণতন্ত্রের পলিটিক্যাল ইকনোমি। টিভিতে পত্রিকায় সিনেমায় নাটকে বিজ্ঞাপনে গল্পে সাহিত্যে প্রবন্ধে এবং গবেষণায় 'প্রলোভন' আজকে প্রধানতম থিম সং। মান্না দে'র সেই গানের কথা কে না জানে: 'ও কেন এত সুন্দরী হলো, অমনি করে ফিরে তাকালো, দেখে তো আমি মুগ্ধ হবই, আমি তো মানুষ'। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হলো: সে স্ট্যান্ডার্ড-সৌন্দর্যের প্রলোভন বোঝে কিনা। এমনই এই লোভের অর্থনীতি যে বন্ধুত্বেও প্রলোভন থাকে। ধর্ষণেও প্রলোভন থাকে। অন্য সব প্রলোভনকে বহাল রেখে ধর্ষণের প্রলোভন উচ্ছেদ করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, খোদ প্রলোভন নামক জিনিসটা কিন্তু থেকেই যায়। প্রলোভন থাকলে তার নানারকম রোগলক্ষণের অভিপ্রকাশও ঘটে। এই যদি হয় খোদ সমাজ-বন্দোবস্ত তাহলে থানা পুলিশ-আদালত-কারাগার, এমনকি ফাঁসি, দিয়েও শান্তি পাব না আমরা।

---

১ কেন বিজ্ঞাপন ছাড়া পণ্য-বিপণন অচল, এমনকি খোদ পুঁজিবাদী অর্থনীতি অচল, সে বিষয়ক আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে বিনয় ঘোষ, ১৯৯১-এর অন্তর্ভুক্ত 'বিজ্ঞাপন ও মন' নামের দুর্দান্ত, ধ্রুপদী প্রবন্ধটি।

১.৩ ধর্ষণ — আইনের শাসনের বিজ্ঞাপন

বলপ্রয়োগ আজকের দুনিয়ায় সবচাইতে বৈধ কাজ। ডারউইনের 'সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট' এর নাম দিয়ে, মার্কসের শ্রেণীবিদ্বেষের নাম দিয়ে, মর্গানের বর্বরতার নাম দিয়ে বৈধ করা হয়েছে জোর যার মুল্লুক তার নীতি। 'মাইট ইজ রাইট' আজ গ্রাহ্য প্রবাদবাক্য। 'মাইরের উপ্রে ওষুধ নাই' তত্ত্ব হাজির কার্টুন পত্রিকার মলাটে। মা-বাবার তরফে বাচ্চাকে মারা, শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে মারা, গৃহস্তের পক্ষ থেকে চোর পিটানো, জনতার উৎসাহে গণপিটুনি, স্বামীজীর স্বহস্তে বউকে পিটানো, পুলিশের লাঠি দিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীকে পিটানো— এগুলো মামুলি ঘটনা মাত্র।

এই সমাজে সহিংসতা বৈধ। বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যুক্তি। পরিবার থেকে প্রশাসন পর্যন্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি বলপ্রয়োগ। বলপ্রয়োগ ও প্রতিশোধ -গ্রহণ খোদ আইন-আদালত-বিচারব্যবস্থার সর্বসম্মত ভিত্তি। 'আইনের শাসন' বলে যে জিনিসটা চালু আছে তা আসলে মহাভারত-কথিত আদিতম শাস্ত্র 'দণ্ডনীতি'। দণ্ড ধারণাটিই পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষের বিশেষ দণ্ড, বংশদণ্ড, লৌহদণ্ড ইত্যাদি। কারাগারে, রিম্যাণ্ডে, আটকাবস্থায় পুরুষের গুহ্যদ্বারে দণ্ডপ্রয়োগের ঘটনা এই এক-এগারোর শাসনামলেও ঘটেছে। আর রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপরা ওয়ার্ডে ইলা মিত্রের যোনীতে গরম ডিম ঢুকানোর ঘটনা তো সেদিনকার ঘটনা মাত্র। ধর্ষণ জিনিসটা তাই আইনের শাসনের নিছক একটি বিজ্ঞাপন বা প্রকাশ। আইনের শাসনের মূলনীতি বলপ্রয়োগ; আর ধর্ষণের মূলনীতি বলাৎকার। এইটুকুই যা পার্থক্য। আসলে ঐটুকুই তো মিল। অভিধান ও অর্থতত্ত্ব বলছে, বলপ্রয়োগ আর বলাৎকার আদতে একই বস্তু।

১.৪ বলাৎকারের শব্দার্থতত্ত্ব

এ সমাজ আসলে বলপ্রয়োগের, বলাৎকারের। সহিংসতা মাত্রেই বলাৎকার। বলাৎকার কথাটার একটি অর্থ যেমন 'ধর্ষণ', তেমনই বলাৎকার কথাটার অপর অর্থ বলপ্রয়োগ, তথা 'শক্তিপ্রয়োগ', 'অত্যাচার', 'জুলুম', 'জবরদস্তিমূলক আচরণ' (বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান)। 'বলাৎকার' হচ্ছে এক দিকে 'বল দ্বারা করণ, বলপ্রয়োগ', 'অন্যায়', 'অত্যাচার'; এবং অন্য দিকে 'বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশ (রেপ)'; শুধু তাই নয়, 'ঋণীকে স্বগৃহে আনিয়া তাড়নাদি দ্বারা ঋণ দেওয়ানো'ও 'বলাৎকার' বটে (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক; 1996-J)। সুতরাং বলাৎকার স্রেফ নারীর ওপরই ঘটে না, পুরুষের ওপরও ঘটে। অভিধান অনুসারে, 'বলাৎকৃতা' যেমন হয়, তেমনই 'বলাৎকৃত' বা 'পরবশীভূত'ও (হরিচরণের বঙ্গীয় শব্দকোষ) হয়। মোদ্দা কথায় এ হচ্ছে, পরের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা

আক্রান্ত হওয়া।

যেহেতু ঘটনাটা বলপ্রয়োগের, আধিপত্যের– টার্গেট সবসময়ই তাই দুর্বল সত্তা। টার্গেট তাই নারী, বৃদ্ধ, বালক, শিশু, গরিব, প্রান্তিক জনজাতি ইত্যাদি। পুরুষশিশুও ধর্ষণ এবং সহিংস যৌন-নিপীড়ন থেকে রেহাই পায় না। বাসায় না, স্কুলে না, স্কাউট ক্যাম্পে না, ছাত্রাবাসে না, মক্তবে না, মাদ্রাসায় না, এমনকি মসজিদেও না। পুরুষ-বাচ্চার বলাৎকার অবশ্য আমাদের সমাজে অনালোচ্য। স্ট্যান্ডার্ড পুরুষতান্ত্রিক কোড মোতাবেক পুরুষ ধর্ষণযোগ্য নয়। ধর্ষিত পুরুষ আরেকটা ‘মাগি’ মাত্র, ‘মরদ’ নয়।

১.৫ আত্মমর্যাদার বিকার, সম্পর্কের বিকার

সমাজে আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্বের বোধ যে পরিমাণে বিকারগ্রস্ত হচ্ছে, সম্ভবত সেই পরিমাণে বাড়ছে ধর্ষণ। যার আত্মমর্যাদাবোধ নাই সে-ই অন্যের আত্মমর্যাদার মূল্য বোঝে না, তাকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে। যার নিজেরই স্ব-অধীনতার বোধ নাই, দাসত্বের অপমানবোধ নাই, সে অন্যের স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না। অন্যের উপর বলপ্রয়োগের মূঢ়তায় সে আনন্দ অনুভব করে। আত্মমর্যাদার বোধ ও স্বাধীনতার বোধের অভাব পূরণ হয় অপরের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর বোধ দিয়ে। এই কর্তৃত্বনীতিতেই সমাজ চলে।

ধর্ষণ হলো সম্পর্কের বিকার। ধর্ষণের দ্বারা সাধিত কৌমার্যের ক্ষতি বা শরীরের ড্যামেজ আসল ব্যাপার না। ‘কৌমার্যের ক্ষতি’ বানানো একটা পুরুষতান্ত্রিক ধারণা মাত্র। যৌন অর্থে বলাৎকারই শুধু নয়, শরীরের ওপর যেকোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা সহিংসতাই শরীরের ক্ষতি করতে পারে। ধর্ষণে সবচেয়ে বেশি বিনষ্ট হয় আসলে আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদার যেকোনো বিনাশই ধর্ষণ। এ হলো আত্মার ক্ষতি। যে-কোনো প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগেই এটা ঘটে। চূড়ান্ততম মাত্রায় ঘটে ধর্ষণে। আত্মমর্যাদা কীভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে তার ওপর তাই নির্ভর করে ধর্ষণের সংজ্ঞা।

১.৬ বিবাহ, ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্ষণ

ব্যক্তিগত মালিকানার উত্তরাধিকার-প্রথাকে নিশ্চয়তার সাথে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার নারীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়লে, কে কোন পুরুষের সন্তান তা নিশ্চিত হওয়া না গেলে, পৃথিবীতে সাদা-কালো ধনী-দরিদ্র দাস-মালিক কর্তা-গোলাম ব্রাহ্মণ-শূদ্র বাঙালি-পাহাড়ি কোনো প্রকারের বৈষম্য টিকিয়ে রাখা যায় না। বৈষম্য না টিকলে কর্তৃত্বতন্ত্রও টেকে না। সব কিছু ভেঙে পড়ে। তাই মালিকের সন্তান যে মালিকেরই, প্রমাণ সহকারে তা চিনতে পারার জন্য বিবাহ বা ‘বিশেষভাবে বহনীয়’ চুক্তির মাধ্যমে নারীকে বন্দি বা নজরবন্দি করে রাখতে হয়। এ

ছাড়া উত্তরাধিকারের উপায় নেই। এ ছাড়া বিবাহেরও অর্থ নেই। বিবাহ্ আসলে একটি রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও আইনগত সম্পর্কচুক্তি যা দিয়ে সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা, যাবতীয় বৈষম্য এবং কর্তৃত্বতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা যায়।

এরই জন্য পাঁচ হাজার বছরের কর্তৃত্বপরায়ণ অসভ্যতা নারীপুরুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। পরস্পরকে বানিয়ে রেখেছে পরস্পরের অচেনা। এ হচ্ছে 'ভাগ করো এবং শাসন করো'র বিশ্বজনীন-সর্বজনীন ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। নারী-পুরুষের এই বিভাজন বহুবিধ রূপ ধারণ করে বিরাজ করছে আজকের পৃথিবীতে। নারীপুরুষের প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী, শাস্ত্রীয় ও রাষ্ট্রীয় এই বিভাজনের একেবারে কেন্দ্রে আছে বিবাহের ধারণা। বঙ্গভারতীয় পুরাণের নবতর পাঠের মাধ্যমে কলিম খান দেখিয়েছেন, বিবাহ্ মানে বিশেষভাবে বহনযোগ্য চুক্তি। বিবাহ্ মানেই বন্ধন। বিবাহ্বন্ধন।

বিবাহ্-বিভাজন আছে বলেই ধর্ষণ এবং দাম্পত্য-সহিংসতা আদৌ সম্ভব হয়ে ওঠে। নারীকে বন্দি বা নজরবন্দি রাখার একটি উপায় যদি হয় বিবাহ্, তো অপর উপায়টি হচ্ছে ধর্ষণ। ধর্ষণ বিবাহেও সিদ্ধ, বিয়ের বাইরেও সিদ্ধ। একে অন্যের পরিপূরক মাত্র। বিবাহ্ হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট দুই প্রতিপক্ষকে শাস্ত্র ও যৌনতার আঠা দিয়ে পরস্পরের সাথে সেঁটে রাখা। এ থেকে যা উৎপন্ন হয় তা ভালোবাসা নয় – হিংসা ও ঘৃণা। পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণ, কন্যাসম মেয়েদের ধর্ষণ বা নিপীড়ন অপ্রচলিত কিছু নয়। (উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নানা অর্থে ব্যতিক্রম যে আছে সে কথা সকলেই জানা।) তাই ধর্ষণের বিরুদ্ধে বলা অথচ বিদ্যমান বিবাহের বিরুদ্ধে না বলা রীতিমতো আত্মঘাতী আস্ফালন মাত্র।

১.৭ কাম প্রেম ধর্ষণ

নারী এবং পুরুষের মাঝখানে উপস্থিত যৌন-ক্ষুধা এবং যৌন-অবদমন। দু-জনের বেলায় এর প্রকাশ দু-রকম। পুরুষের বেলায় আগ্রাসন-আক্রমণ, অর্থাৎ নারীধর্ষণ। নারীর বেলায় যৌনসত্তার 'সেক্সি' বিনির্মাণ ও বিনিময় দিয়ে পুরুষকে ম্যানিপুলেট করা, করায়ত্ত করা। নির্দিষ্ট মাপমতো যৌনতা এখন ক্ষমতা বৈকি। এ দিয়ে পুরুষকে কব্জা করা যায়। দুটোই পুরুষতান্ত্রিক। দুটোই প্রেমহীন। কামপরায়ণ। প্রেম মানে সঙ্গীকে পরিতৃপ্ত করে নিজে সুখী হওয়া। কাম মানে সঙ্গীকে ব্যবহার করে আত্মরতি চরিতার্থ করা। এ আসলে কর্তৃত্বপরায়ণ বাসনা। অথরিটারিয়ান ডিজায়ার অফ ডমিনেশন। এই সুখ আধিপত্যের বিকৃত সুখ – এমনকি খুনের ক্ষেত্রেও, এমনকি ধর্ষণের ক্ষেত্রেও। দুটোই যুগের অসুখ। দুটোই নিওলিবারাল কালপর্বের রোগলক্ষণ। এই রোগ রাজনৈতিক, মানে ক্ষমতাকেন্দ্রিক– সামাজিক নয়। তাই বলে কোনোটাই অপরটার কারণ নয়। একটা আরেকটার ফলাফলও নয়। উভয়েরই কারণ

কর্তৃত্বতন্ত্র। উভয়েরই ফলাফল কর্তৃত্বতন্ত্র। এ দুটোর একটা দিয়ে আরেকটাকে জায়েজ করা যায় না কিছুতেই। দুটোই অগ্রহণযোগ্য। দুটোই বাজারের বিকার। বাজারের যুগে মনুষ্যত্বের বিকার। সমাজের সর্বত্র এই বিকার দৃশ্যমান। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অফিসার-কর্মচারী বিক্রেতা-খরিদ্দার উকিল-মক্কেল বিচারক-অপরাধী ডাক্তার-রুগি নারী-পুরুষ চোর-পুলিশ ইত্যাদি সম্পর্ক সমুচয়ে এই বিকারের আছর পড়েছে।

ধর্ষণে যৌনসুখ নাই। এটুকু বোঝার মতো সাবালক হতে যে আত্মঅনুসন্ধান ও নিবিষ্টতা লাগে তা এই বাজারের যুগে নাই। দম ফেলার সময় নাই কারো। আমি কে? আমি কী ভাবে (যৌনকর্মের পরিণামে) এখানে এলাম? এই কর্মের সারসত্য কী? এর সারসত্তাই বা কী? সুখ কী বস্তু? কাম আর প্রেমের পার্থক্য কী? প্রেম আর যৌন-আনন্দের মধ্যে সম্পর্ক কী? এ সব নিয়ে নিবিষ্ট আত্মঅনুসন্ধানে নিরত থেকে যৌনতা, লিঙ্গসত্তা এবং প্রেম বা আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করার সময় পুরুষ-সমাজের নাই। নারীকূলেরও নাই। এর জন্য দায়ী অবশ্য নারী-পুরুষ নয়। দায়ী আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাজনীতি মানেই চিন্তা না করা। রাজনীতি মানে অনুগত থাকা। আনুগত্য মানেই আনুগত্যের প্রতিযোগিতা। সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা মানেই গণ্ডগোলের আশঙ্কা এবং আশঙ্কার কিছু না কিছু বাস্তবায়ন।

১.৮ ধর্ষণ কোনো ফৌজদারি মামলা নয়

ধর্ষণ তাই ব্যক্তিগত মামলা নয়। ধর্ষণ কোনো ফৌজদারি মামলাও নয়। কোনো ক্রাইমই আসলে ক্রিমিনাল কেস নয়, পলিটিক্যাল কেস। ধর্ষক হয়ে ওঠার আগেই সম্ভাব্য ধর্ষকের সামনে সদাহাজির থাকে খোদ 'ধষর্ণ' এর ধারণা। ধর্ষক, খুনী, চোর, রাজনীতিবিদ বা মুনাফাখোর কেউই 'বিশেষ' কোনো পৃথক এক প্রকার জীব নয়। এরা কারো স্বামী, কারো স্ত্রী, কারো সন্তান, কারো সাথী। সবাই বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকার। প্রত্যেকটা ধর্ষণই তাই রাজনৈতিক ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় ধর্ষণ; প্রত্যেকটা অপরাধই যেমন রাজনৈতিক অপরাধ এবং প্রত্যেক বন্দিই যেমন একেক জন রাজবন্দি। এগুলো রাষ্ট্রপ্রণালীর অন্তর্গত উপাদান মাত্র। প্রশ্নটা পুরো সমাজের সংবেদনশীলতা এবং দায়দায়িত্বের। প্রশ্নটা যুগের চলন পাল্টে দেবার।

কে ধর্ষণ করল, কাকে ধর্ষণ করল – তার চেয়ে বড় কথা হলো ধর্ষণ ঘটনাটা সমাজে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ নিরাপদ না। যেকেউ যখন-তখন ধর্ষিত হবে। ধর্ষণের বিশেষ একটি ঘটনার চেয়ে খোদ ধর্ষণের ধারণা বেশি মারাত্মক। খোদ জেলখানার চেয়ে জেলখানার ধারণা যেমন বেশি বিপজ্জনক। পাথরের কারাগারের চেয়ে কাগজের কারাগার, ভাবনার কারাগার, ধারণার কারাগার অধিক ভয়ংকর।

দিল্লীর চলন্ত বাসের ধর্ষণের চেয়ে বোম্বের ডিজিটাল ধর্ষকাম ঢের বেশি আত্মঘাতী। চোখে চোখে ধর্ষণ, চোখে চোখে ক্ষুধা, অবদমন— নিত্যদিন। শহীদমিনারে অনশনরত গরিব শিক্ষকদের ওপর পুলিশের রঙিন বলাৎকার, শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকের বলাৎকার, ছাত্রসমাজের ওপর ছাত্রলীগের বলাৎকার, শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর গার্মেন্টস-মালিকের বলাৎকার, আসামিদের ওপর কারাগার এবং আদালতের বলাৎকার, অনুগামীর ওপর হুজুরের বলাৎকার, পাঠক আর দর্শকের ওপর মিডিয়ার বলাৎকার নিত্যদিন।

ষাটের দশকে 'মেকানিক্যাল ব্রাইড' বা 'যন্ত্রবধূ' গ্রন্থে মার্শাল ম্যাকলুহান লিখেছিলেন বিজ্ঞাপনবধুর হালচালের কথা। বিজ্ঞাপনের মডেল তখন 'আমাকে দেখো' যুগ পার হয়ে 'আমাকে ছুঁয়ে দেখো'র যুগে প্রবেশ করেছেন। আর আজকের দিনে এসে সেই মডেল বলছেন 'আমাকে আস্বাদন করে দেখো'। এ হলো পুঁজিবাদের আজকের কণ্ঠস্বর। মেকানিক্যাল ব্রাইড এখন রাস্তায়। হাঁটছেন মিডিয়া-ম্যানুয়াল অনুসারে। হাজার বছরের অবদমন ভেঙে ক্ষুধা জেগে উঠছে কামের। হয় তাকে স্বীকার করতে হবে নইলে খুলে দিতে হবে ধর্ষনের সদর দরজা। এই পরিস্থিতি ঢের বেশি আত্মঘাতী টাঙ্গাইলের দলবদ্ধ ধর্ষণের চেয়ে। আত্মঘাতী— কেননা নিজেকে হত্যা না করে কেউ অন্যকে হত্যা করতে পারে না। এভরি মার্ডার ইজ এ সুইসাইড অ্যান্ড এভরি সুইসাইড ইজ এ মার্ডার। নিজেকে ধর্ষণ না করে, খোদ মনুষ্যসত্তাকে বিনষ্ট না করে, সত্তার সতীত্ব নস্যাৎ না করে, কেউ অপরকে ধর্ষণ করতে পারে না। প্রতিটা ধর্ষণ তাই আত্মবিনাশী, আত্মাবিনাশী, মনুষ্যত্ববিনাশী। যাঁরা খুন এবং ধর্ষণের মধ্যে তুলনা করে এক দিকে ধর্ষণকে মহিমান্বিত করেন এবং অন্য দিকে খুনকে নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত করেন, তাঁরা উভয়কেই শাশ্বত করে তোলার চিন্তা-এজেন্ট মাত্র। যে নারী নিজেকে বা নিজেদেরকে এতটাই পৃথক একটা পদার্থ বলে ভাবেন যে একেবারে ভিন্ন একটি ক্যাটেগরিতে নিজেদের দুঃখদুর্দশাকে ফেলতে চান, তাঁরা খোদ নারীকে বিপদাপন্ন করেন, স্বয়ং অত্যাচারকে আড়াল করে ফেলেন।

১.৯ মুক্ত প্রেমময় সমাজের দিকে

আসলে, মনুষ্য-সমাজে কোথাও কোনো ভালোবাসা আর টিকতে পারছে না বলেই ধর্ষণ বাড়ছে। ধর্ষণ আসলে প্রেমহীন সমাজের প্রেম। বলপ্রয়োগ ও বৈষম্যের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর দাঁড়ানো সমাজে প্রেম বাঁচে না। প্রেমে উঁচুনিচু নেই। প্রেম মানে সমতা। প্রেমে জোরাজুরি নেই। প্রেম মানে বলপ্রয়োগের অবৈধতা। প্রেম প্রকৃতিরই নিয়ম। প্রেম মানে পরিচয়, বোঝাপড়া। প্রেম মানে সংহতি, পরস্পর-সহযোগিতা। প্রেম মানে স্বাধীনতা— জিম মরিসনের সেই গানের মতো: 'বন্ধু তো সে, যে তোমাকে পেতে দেয় পূর্ণ স্বাধীনতা, যেন তুমি হয়ে ওঠো তুমিই নিজে'। ভালোবাসা, সমতা,

সংহতি, বোঝাপড়া, পরস্পর-সহযোগিতা আর স্বাধীনতার গুণাবলী প্রকৃতিসূত্রে পাওয়া মনুষ্য-স্বভাবেরই লক্ষণ। মিডিয়াশাস্ত্রের প্রচারণা যা-ই বলুক, এইসব সহজাত মানবীয় প্রবৃত্তি অ্যানার্কিরও লক্ষণ বটে।

বিদ্যমান রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ থেকে বৈষম্য ও বলপ্রয়োগকে উচ্ছেদ করার আলাপ বাদ দিয়ে খোদ বলপ্রয়োগেরই মাধ্যমে ধর্ষণকে উচ্ছেদ করার কথাবার্তা বলে মুখে ফেনা তোলাটা মোটেও অর্থহীন নয়— অত্যন্ত অর্থপূর্ণই বটে। ধর্ষকের গলা কাটা বা নুনু কাটার প্রতিশোধপরায়ণ সমাধান ধর্ষণের যুক্তিবোধকেই বৈধতা দেয়। এতে করে খোদ ধর্ষণের যুক্তিটা উৎপাটিত হয় না। ধর্ষণ থেকে যায়। মাঝখান থেকে রাষ্ট্রের আইনপ্রয়োগকারীদের হাতে আরো ধারালো অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। মোট অত্যাচার বাড়ে।

শাস্তি দেওয়া আর শিক্ষা দেওয়া বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ও আইনের শাসনের কাছে একই ব্যাপার। এ হচ্ছে কর্তৃত্বপরায়ণ আইনপ্রথার প্রাথমিক শিক্ষা বা প্রাথমিক পাঠ। প্রতিশোধই আইনশাস্ত্রের প্রাথমিক ন্যায়শিক্ষা। আইনের শাসনের চোখে ন্যায়নীতি হচ্ছে প্রতিশোধনীতি। এই 'ন্যায়' স্রেফ মাৎস্যন্যায় মাত্র।

মাৎস্যন্যায়ই হচ্ছে রাজনীতি। ধর্ষণের রাজনীতি মোতাবেক নির্দিষ্ট ধর্ষককে আইনত 'ধর্ষণ' করে খোদ ধর্ষণ ব্যাপারটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়— বাঁচানো যায় বৈষম্য ও বলপ্রয়োগভিত্তিক তথাকথিত আইনের শাসনের অনন্ত প্রেমহীনতাকে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ গেছে বৈষম্যহীন-বলপ্রয়োগহীন-বলাৎকারহীন মুক্ত প্রেমময় সমাজ পরিগঠনের দিকে। অ্যানার্কির দিকে।

রাবি: ১৬ই জানুয়ারি ২০১৩

রচনা: রাবি, ১৬ই জানুয়ারি ২০১৩। দৈনিক *সোনার দেশ* পত্রিকায় ১৮ই জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে, এবং দৈনিক *ইত্তেফাক পত্রিকায়* ২৯শে জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত।

সেলিম রেজা নিউটন

সম্পর্ক সিনেমা যৌনতা

Rabindranath Tagore

কাজ, শিল্প ও সম্পর্ক

মুখোমুখি দুইটা ক্যাটেগরি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। বার বার। ঘুরে ফিরে। একদিকে 'শিল্প'। আরেক দিকে 'অ-শিল্প'। আমার প্রশ্ন: মানুষ কি শিল্পবোধহীন হয়? এমন যদি হয়, কিছু লোক থাকে শিল্পবোধসম্পন্ন, আর কিছু লোক হয় শিল্পবোধহীন – তাহলে ধরে নিতে হয় কিছু লোক 'উন্নত', আর কিছু লোক 'অনুন্নত'। তাহলে কিন্তু খোদ ফ্যাসিবাদ জায়েজ হয়। অনুন্নত লোকদের বেঁচে থাকার দরকার কী? মানুষের কোনো কাজে আসে না। তাদেরকে এমনকি মেরে ফেলারও যুক্তি দাঁড় করানো যায়।

'শিল্প' নামের পদার্থটা তাহলে ঠিক কী? এই প্রশ্ন আসে। রবীন্দ্রনাথকে দেখি। দেখি উনি 'কাজ' আর 'আনন্দ' নামের দুইটা ধারণা দিয়ে শিল্প-সাহিত্যকে বুঝতে চান। বোঝাতে চান। মনের আনন্দে মানুষ যা করে, তা পড়ে শিল্প-সাহিত্যের এলাকায়। তা সে করে নিছক ভালো লাগা থেকে। কিছু পাওয়ার আশায় নয়।

উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নয়। শিল্প-সাহিত্য-আর্ট হচ্ছে অকারণ আনন্দের বৃথা যজ্ঞ। বৃথা কর্ম। এর কোনো প্রত্যক্ষ উপযোগিতা নেই। বাজার-মূল্য নেই। এ দিয়ে সংসার চলে না। ক্যারিয়ার হয় না। আর যা করতেই হবে, যা মানুষের ওপরে কর্তব্য আকারে বর্তায়, যা না করলে নিজেকে মুশকিলে পড়তে হয়, অন্যদের সমস্যা হয়, অভিযোগ হয়, নালিশ হয়, শাস্তি পর্যন্ত আসতে পারে– সেটা মানুষের কাজের এলাকা। কাজ মানুষ করে দায়ে পড়ে। ঠেকায় পড়ে। বাধ্য হয়ে। দায় হতে পারে কর্তব্যের। দায় হতে পারে জীবিকার। দায় হতে পারে ধান্দার। কাজে তাই মানুষ আনন্দ পায় না। কাজ মানেই চাপ। অবশ্য যে কাজ আমার নিজের, তার কথা আলাদা। সেটা আনন্দের। এ কাজ করব বলে আমি নিজেই ঠিক করি। অন্য কেউ ঠিক করে দেয় না। চাপায় না। এ কাজের জন্য অন্য কারো কাছে আমাকে জবাবদিহিতা করতে হয় না। এ কাজে শাস্তির ভয় নাই। পুরস্কারের লোভ নাই। এ কাজে সফলতায়ও পরিতৃপ্তি আসে না। তৃষ্ণা অতৃপ্ত থাকে। আরো ভালো করে করার আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়ে। অকারণে। এ কাজে ব্যর্থ হলেও আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথের কাজের এই ধারণাকে আমি মেলাই পুঁজি-তাড়িত শিল্প, কলকারখানা আর ইন্ডাস্ট্রির সাথে। এসবও শিল্পই বটে। আদিতে অন্তত তা-ই ছিল। মসলিন বানানোটা শুধু জীবিকা ছিল না। আনন্দেরও ব্যাপার ছিল। সুখ ছিল তাতে। চৌকাঠ জানলা আর খাট বানাতে গিয়ে মানুষ ছবি এঁকেছে কাঠ-খোদাই করে। অকারণে। ও জিনিস ছাড়াও জানলা হতো, দরজা হতো, শোয়ার খাট হতো। তবুও আর্ট করেছে মানুষ।

সেটা ছিল প্রয়োজনের ওপর প্রতিভার আধিপত্যের কাল। সেটা ছিল কাজের ওপরে আনন্দের আভা ছড়ানোর যুগ। শিল্পের যুগ। কল-কারখানার কাজও ছিল তাই শিল্প। কুটীর-শিল্প। তারপর যখন মানুষের ওপর পুঁজির আধিপত্যের কাল এলো, মনুষ্যসত্তা পর্যবসিত হলো কারখানার নাটবল্টুতে। এলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল 'কাজ' এর ধারণা। বিচ্ছিন্ন হলো মানুষ তার কাজ থেকে। কাজ পরিণত হলো হুকুম তামিল করার কাজে। মালিকের হুকুম। পুঁজির প্রত্যাদেশ। আজকের পুঁজিতন্ত্রে 'কাজ' নামক ধারণাটাই একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ধারণা মাত্র।

শিল্প তাহলে অকারণ। শিল্প হচ্ছে অকারণ কৌতূহলের কাজ। কৌতূহল, প্রশ্ন, সন্ধিৎসা, অনুসন্ধিৎসা– এগুলো মানুষের মনের মধ্যে আসে হুদাই। এ হলো জন্ম-সূত্রে পাওয়া মনুষ্য-স্বভাব। মানুষের প্রজাতিসত্তা। এগুলোর সঙ্গেই, আমার ধারণা, শিল্পের যোগাযোগ। আনন্দের যোগাযোগ। অকারণ অনুসন্ধিৎসায়ই মানুষের আনন্দ। তার সৃজনশীলতা। প্রজাতিসত্তাই তাই মানুষের যাবতীয় শিল্পবোধের উৎস। মানুষ, তার মানে, শিল্পবোধহীন নয়। তা সে হতে পারে না। বাধ্যতামূলক কাজের তাড়না তাকে শিল্প-আস্বাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। বঞ্চিত হয় সে বাধ্যতা-

মূলকভাবে।

এই সকল কিছুর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, শিল্প, কাজ ও আনন্দের ধারণাগুলো আমাদের দুই ধরনের সম্পর্কের মৌলরূপ তুলে ধরে। এক হলো কাজের সম্পর্ক। আরেক হলো আনন্দের সম্পর্ক। অকারণের সম্পর্ক। প্রেমের সম্পর্ক। কাজের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক। কাজের সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক। কাজের সম্পর্ক হায়ারার্কিক্যাল– উঁচু থেকে নিচুর দিকে পদবিন্যস্ত। কর্তৃত্বতান্ত্রিক। কাজের সম্পর্ক কোনো না কোনো মাত্রায় বাধ্যতামূলক, বিরক্তিকর, একঘেঁয়ে, একমুখিন, সংকীর্ণ পদ-অবস্থানগত মর্যাদার বোধ দ্বারা তাড়িত, নিরন্তর ঈর্ষাপীড়িত, ভালোবাসাহীন। কাজের সম্পর্ক পেশাগত। কাজের সম্পর্ক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্য দিকে, আনন্দের সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক নয় – পরিস্থিতিগত, সিচুয়েশনাল। আনন্দের সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক নয়– ব্যক্তিগত। আনন্দের সম্পর্ক আনুভূমিক। আনন্দের সম্পর্ক স্বাধীনতাপ্রিয়, কৌতূহলপ্রবণ, বৈচিত্র্যপিয়াসি, আত্মমর্যাদাশীল, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধসম্পন্ন, এবং ভালোবাসা -মুখর। আনন্দের সম্পর্ক প্রেমের। আনন্দই প্রেমের আধেয়। আনন্দ ও অকারণের সম্পর্কই প্রেমের সম্পর্ক। আনন্দের সম্পর্ক উদ্দেশ্যহীন। নিছক আনন্দে সে আত্মহারা।

সম্পর্কের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। সম্পর্ক নিছক 'যোজনগন্ধে' (কলিম খান, ১৯৯৯) সংযোজিত হয়। শিল্প-সাহিত্য-আর্টেরও কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। উপযোগিতা থাকে না। কারণ থাকে না। 'আত্মপ্রকাশের আনন্দই' শিল্পকলা সৃজন করে। এই হলো শিল্পকলার সাথে শিল্পীর সম্পর্ক। এ সম্পর্ক স্বাধীনতার। সৃজন-আনন্দের। প্রেমের। শিল্প তাই শুধু শিল্পেরই জন্য। অষ্টাদশ শতকের আইরিশ কবি অস্কার ওয়াইল্ডের বানানো একটা বাক্য: 'আর্ট ফর আর্টস সেইক'। শিল্প তার নিজের জন্যই ঘটে। যেমন প্রেম চায় শুধু নিজেকেই। যেমন ফুল তার নিজের জন্যই ফোটে। আর ফুল ফুটলে মানুষ টের পায়। অকারণ আনন্দ হয় তার। 'সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী; দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী। সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য', *সাহিত্য*)। ফুলের গন্ধের প্রতি আগ্রহই মানুষের শিল্পবোধ। ফুলের রঙের প্রতি আগ্রহই মানুষের শিল্পবোধ। মানুষ, তার মানে, শিল্পবোধহীন, প্রেমবোধহীন বা সম্পর্কবোধহীন হতে পারে না।

ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে জবাই করে কাজের সম্পর্ক। জবাই করে কর্পোরেট-দানবের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে। কর্পোরেট সম্পর্কের স্বার্থে। প্রেমের সম্পর্কে বিকশিত হয় সুন্দরের বোধ, শিল্পের সংবেদন। শিল্পের জন্য শিল্পের ধারণা

তো আনন্দের ধারণা। স্বাধীনতার ধারণা। লিবারালবাদ, লাদেনবাদ, লেনিনবাদ – সর্বপ্রকার কর্তৃত্বপন্থার জন্যই বিপজ্জনক তা। শিল্পের সাথে দেখা হয় না কাজের চোখের। এ চোখে শিল্প মানে কল-কারখানা শিল্প। শিল্পের ধারণা তার কাছে কাজের ধারণা মাত্র। শ্রম আর মুনাফার ধারণা। শিল্পকে সে কাজে লাগায় মুনাফা-গন্ধী সমাজ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। বৈষম্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। সর্বসাধারণের ওপর গুটিকয়ের কেন্দ্রীভূত, একচ্ছত্র এবং সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী শাসন-কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে। লিবারাল এবং মার্কসীয় ধারার রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তাই শিল্পের ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপায়। কাজ চাপায়। শিল্পকে পরিণত করে কারখানায়। সংস্কৃতি পরিণত হয় ইন্ডাস্ট্রিতে। মানুষ পরিণত হয় সম্পর্কসুতাবিচ্ছিন্ন বিচূর্ণ সত্তায়। দায় নেমে আসে: শিল্পকে এবং শিল্পীকে কিছু ‘সামাজিক’ দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজের প্রতি তাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। নিছক আনন্দে রাধা নাচবে না। এবং এ দাবি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নয়। শাসক-মতাদর্শের। নিছক আনন্দে পুঁজিপতিদের পক্ষে সমাজ-নিয়ন্ত্রণ করা চলে না। সুতরাং আনন্দকেও কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। শাসকের মতাদর্শ প্রচারের কাজ করতে হবে তাকে। কাজের সম্পর্ক মানে দায় ও দায়িত্বের সম্পর্ক। অনুরাগের সম্পর্ক তা নয়।

সিনেমা যৌনতা ও তন্ত্র

উচ্চৈনিচে ক্রমবিন্যস্ত সামগ্রিক সম্পর্কতন্ত্র নামক জিনিসটা নিজের মূল রূপ আড়াল করার জন্য অধিক পরিমাণে আলোক সম্পাত করে প্রাচীন-অর্বাচীন যুগের বিচারে সম্পর্কনিচয়ের রূপ-পার্থক্য সমূহের ওপর। যেমন বিবাহ সম্পর্কটি নিজেকে যুগে যুগে যেটুকু অভিযোজিত করেছে তার নানান রূপবিন্যাস নিয়ে কথা বলতে বলতে সে ভুলে যায় খোদ বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটার মৌলিক চরিত্রের কথা। বিবাহ মানে চুক্তি। কাজের চুক্তি। বিবাহ মানে বাধ্যতা। বাধ্যতামূলক একগামিতা। বিবাহ মানে উচ্চনিচ-ক্রমতান্ত্রিক, কর্তৃত্বপরায়ণ পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের নিত্য নবায়ন।

আত্মশক্তি, ব্যক্তির স্বরাজ, সমাজর সর্বক্ষেত্রে সামাজিক স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রশক্তির বদলে ব্যক্তি-শক্তি ও সমাজশক্তিকে বিকশিত করে তোলা – এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে কথা না বলে নতুনত্বের কথা, পরিবর্তনের কথা স্পষ্ট করে ভাবতে পারা যায় না। আসলে আমাদের নতুনত্ব-চিন্তা কখনোই স্বাধীনতার সাথে সম্পর্ক পাতায় নি। ফলে আমাদের নতুনত্বের ধারণাও সমাজের নানা শ্রেণীর অনুশীলিত দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত। দীক্ষিত। মুখস্থ। সম্পর্কতন্ত্রের বা সম্পর্কপ্রণালীর পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি ভাবভঙ্গি-চালচলন-কায়দাকানুনের পরিবর্তন।

এসব প্রশ্ন বিবেচনায় না নিয়ে নতুন ধারার সাহিত্য বা নতুন ধারার সিনেমা বা নতুন ধারার রাজনীতি বা নতুন ধারার চলচ্চিত্র বা নতুন ধারার সম্পর্ক হবে বলে

মনে হয় না। বিদ্যমান সিস্টেমটাকেই আমরা নবায়িত করতে থাকব। উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত করতে থাকবে তথাকথিত ‘বিদ্যমান বাস্তবতা’কেই। এ প্রশ্ন বিবেচনায় না নিয়ে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-আর্ট-সিনেমা নতুন সম্পর্কের স্বপ্ন দেখতে পারবে না। ঘুরপাক খেতে থাকবে ‘বাস্তবতা’র গোলকধাঁধায়।

সাধারণভাবে মিডিয়ায়, বিশেষভাবে সিনেমায় মানবীয় সম্পর্ক জিনিসটাকে যেভাবে গড়েপিটে বানিয়ে তোলা হয় তা গুরুতর। সিনেমায় অশ্লীলতা প্রশ্ন, ‘পতিতা’ প্রশ্ন, নারীর প্রশ্ন – বিশেষ করে হিন্দি সিনেমায় নাচে নায়িকাদের ব্যবহার করার প্রশ্ন, এবং হিন্দি সিনেমার জুনিয়র পার্টনার বা হিন্দি সিনেমার মাইনর পার্টনার হিসেবে বাংলা সিনেমায়ও নায়িকা নাচানোর মতো প্রশ্নগুলো বহুল আলোচিত প্রশ্ন। সিনেমার দৃশ্যগুলো কী বলতে চায়? এসব দৃশ্যের অর্থ কী? এটা নিশ্চয়ই আলাদা একটা ভাষা, আমি যার অর্থ বুঝি না। এরা নিশ্চয়ই কিছু বলতে চায়। নিশ্চয়ই এরা কিছু বলছে। বলে চলেছে। আমরা তা না বুঝে এগুলোকে ঢালাও নিন্দা করেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করছি। আমার কাছে এরকম মনে হয়। তামিল-হিন্দি সিনেমার নাচ ইগনোর করা কঠিন। এটা এতো পাওয়ারফুলি প্রেজেন্টেড যে, এই পাওয়ারফুলনেসের একটা ব্যাখ্যা-অর্থ-তরজমায় পৌঁছানোর চেষ্টা করাটা জরুরি একটা তাড়না।

যৌনতাকে দেখা সম্ভব তন্ত্রের আলোকে। স্বাধীনতার আলোকে। তন্ত্র সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই খেয়াল করছে যে: যৌনতাকে শাসক-শাস্ত্র-মতাদর্শ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে। সমাজে নরনারীর মেলামেশার ক্ষেত্রে, আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার যৌন-প্রসঙ্গ নিষিদ্ধ। সর্বপ্রকার যৌন-এক্সপ্রেশন নিষিদ্ধ। পাপ। শাস্ত্রধর্ম – রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে ‘ধর্মতন্ত্র’– বলে নারী নরকের দ্বার।[১]

যাবতীয় শাস্ত্রধর্ম নারীকে নরকের দ্বার হিসেবে দেখে এসেছে। যৌনতাকে আদি পাপ হিসেবে একদম দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে চিহ্নিত করেছে। কয়েক হাজার বছরের এই সার্বক্ষণিক মতাদর্শিক প্রশিক্ষণ আমাদের মনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। খুব শক্ত ধরনের সামাজিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা বেড়ে উঠি। খুব ভয়ঙ্কর মাত্রার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং অবদমনের মধ্য দিয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠি। যৌনতাকে

১ শাস্ত্রধর্ম মানে শাসক-শ্রেণীর ধর্ম। যাজকদের ধর্ম। ধর্ম আদিতে মানুষের ধর্ম। আল্লাহর ধর্ম। ধর্ম আদিতে যাজকদের না। শাস্ত্রের না। শাসকদের না। কিন্তু পরে এটা শাসকদের এবং যাজকদের পাল্লায় পড়ে। চার্চ মোল্লা ঠাকুর পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং রাজাদের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয় শাস্ত্রধর্ম। আসে বিধান। আসে আইনকানুন। আসে জাগতিক শাস্তি। শাস্তির একমাত্র মালিক সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায় শাস্ত্রধর্ম। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে একেই আমরা সত্যিকারের ধর্ম বলে চিনি। কিন্তু ওটা আসলে শাস্ত্রীয় ধর্ম, মানে শাস্ত্রধর্ম।

পাপ বলে মনে করতে থাকি আমরা স্বভাবতই। যেন এটাই স্বাভাবিক।

তন্ত্র মনে করে (আমিও মনে করি, নিজের আক্কেল থেকে মনে করি আগে, পরে তন্ত্রের সঙ্গে মিলাই): যৌনতা আসলে আমাদের জননের সঙ্গে জড়িত। জন্মের সঙ্গে জড়িত। এটা প্রজননের সঙ্গে জড়িত। সমস্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে বংশবিস্তার, পৃথিবীতে টিকে থাকা, অস্তিত্বমান থাকার সঙ্গে যৌনতা জড়িত। এতো ভাইটাল এটা। যৌন-শক্তিকেই তন্ত্র ভাইটাল এনার্জি মনে করে। প্রাণশক্তি বলে মনে করে। প্রজনন-শক্তিকেই তন্ত্র বলে প্রাণশক্তি। ক্ষেত্রশক্তি। বীজশক্তি।

তো যৌনতার মতো এরকম একটা ভাইটাল ঘটনাকে কয়েক হাজার বছর ধরে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। এর কারণ কী আসলে? কারণটা হলো: যৌনতা এমনই একটা ব্যাপার যাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে কিছুই টেকে না। ব্যক্তিমালিকানা না। পুরুষতন্ত্র না। বর্ণ-শ্রেণী-জাতি না। এগুলোর কিছুরই আভিজাত্য থাকে না আর। যত রকমের সামাজিক অসমতা কৃত্রিমভাবে তৈরী করে রেখেছে শাসকশ্রেণী, তার কোনোটাই টিকিয়ে রাখা যায় না নারীকে-পুরুষকে-যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ না করে। এইসব অসমতা হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে বলে এগুলোকে স্বাভাবিক মনে হয়। প্রাকৃতিক মনে হয়।

আদিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি জিনিসটাই (সম্ভবত) পিতৃতান্ত্রিক। আর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেই কেবল জন্মগত/পৈত্রিক উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা যায়। এটা নিশ্চিত করা না গেলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার বলে কিছু থাকে না। সম্পত্তির উত্তরাধিকারই যদি না থাকে, তো এত কষ্ট করে সম্পত্তি তৈরি করে কী লাভ? আর সেই সম্পত্তির পাহারার জন্য সেনাবাহিনী-রাষ্ট্র-আমলাতন্ত্র ইত্যাদি প্রভৃতি এত কিছু পুষেই বা কী লাভ?

আর-সব কিছুর কথা বাদই থাক, শুধু ব্যক্তিমালিকানা না থাকলেই শাসন-শোষণ-নিয়ন্ত্রণ, অসমতা, এবং গুটিকয়ের বিশেষাধিকার থাকে না। এগুলো সমাজের পক্ষে আর দরকার পড়ে না। সমাজ দিব্যি স্বনিয়ম-স্বরাজ-সহযোগিতার ভিত্তিতে, সত্যম-শিবম-সুন্দরমের নীতিতে চলতে তাহলে আর কোনো কৃত্রিম বাধা থাকে না। চিরটা কাল, মানে লাখ বিশেক বছর ধরে মানব-সমাজ এভাবেই চলেছে।

ব্যক্তিগত মালিকানা আসলে আদি পাপ মানুষের। মালিকানা প্রথমত জ্ঞানের ওপর। ক্রমশ সম্পদের ওপর। ব্যক্তিগত মালিকানার এই দুই লক্ষণ। পুঁজি, আর কর্তৃত্ব। এক দিকে এটা হাজার হাজার মানুষের সমবায়ে নির্মিত, প্রণালীবদ্ধ এবং পরিচালিত শিল্প-কল-কারখানার ওপর ব্যক্তির (গুটিকয়ের) মালিকানা। মালিকানা -তন্ত্র। পুঁজিতন্ত্র। অন্য দিকে এটা সম্মিলিত শ্রমের ওপর এবং সমবেত শ্রমে-কর্মে-আনন্দে অর্জিত জ্ঞানের ওপর ব্যক্তির বা গুটিকয়ের কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বতন্ত্র।

'পুঁজি' শব্দটা বাংলায় খুবই মজার। এটা 'পুঁজ' থেকে এসেছে। পুঁজ মানে

বাড়তি জিনিস। যেটা উদ্বৃত্ত। অবশিষ্ট। পড়ে থাকে। ফেলে দিতে হয়। পুঁজটা শরীরের উদ্বৃত্ত। অ্যাবসেস। অ্যাবসেস মানেও অবশিষ্ট বটে। কলিম খান দেখিয়েছেন। 'মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে' নামের দুর্দান্ত বইয়ে। মার্কসও দেখিয়েছেন যা থেকে উদ্বৃত্ত আসে না, তা পুঁজি না। সম্মিলিত শ্রম যখন ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎযোগ্য উদ্বৃত্ত তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখনই জন্মলাভ করে পুঁজি।

মার্কসের কাছেই শিখলাম, পুঁজি হলো মৃত শ্রম। শত হাজার লক্ষ বছরের সঞ্চিত সম্পদ এবং জ্ঞান। টেকনোলজি এবং সম্পত্তি। টেকনোলোজি মানে মুলত 'নো-হাউ'। নলেজ। কোনো কিছু বিশেষভাবে সম্পাদন করার উপায়গত জ্ঞান। প্রকৃষ্ট যুক্তিবোধ: প্রযুক্তি। ভুলে যাওয়ার উপায় নাই, পুঁজিতন্ত্রে জ্ঞানও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন। আইনত। আদতে 'পুঁজি' নিজে কিন্তু সমস্যা না। মানে সামজিকভাবে আয়োজিত-উদ্ভাবিত-কর্ষিত জমি বা কারখানা কোনো সমস্যা না। মনুষ্যজীবন উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের জন্য এগুলো অপরিহার্য বিষয়। সমস্যা হচ্ছে এসবের ওপরকার ব্যক্তিগত অথবা গুটিকয়ের মালিকানার বোধ। একইভাবে, কর্তৃত্ব জিনিসটাও নিজে কোনো সমস্যা না। ব্যক্তির নিজস্ব কর্তাসত্তা অতীব জরুরি একটা প্রজাতি-গুণ মানুষের। ব্যক্তিসত্তা মানেই তো আসলে কর্তাসত্তা। স্রেফ প্রজাতি-নিয়মে, স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে, পাল-বাঁধা গতে জীবন চালানোটা ব্যক্তি-মানুষের জীবন নয়। তার চাই স্বাতন্ত্র্য। নিজস্ব প্রকাশ। অনন্য অভিব্যক্তি। ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে কথায় এবং কাজে। (অবশ্য, কথা বলাটা নিজেই একটা কাজ। এবং 'কাজ' নিজে একটা কথাও বটে।) ব্যক্তির প্রকাশের জন্যই চাই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। নিজের একটা সিস্টেম। নিজস্ব, স্বকীয় সম্পর্কতন্ত্র। স্ব-তন্ত্র। উইলিয়াম ব্লেক যেমনটা লিখেছিলেন, 'আমাকে নিজেই বানাতে হবে নিজের সিস্টেম, তা না হলে দাসত্ব করতে হবে অন্যের বানানো সিস্টেমের', তেমনই আসলে: ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্তাসত্তাই তার স্বাতন্ত্র্যের নিয়ামক। একই জিনিসের দুই অঙ্গ এরা। পুঁজি আর কর্তৃত্বতন্ত্র।

এমনকি এই সেদিনও, খাজুরাহোতে, নিষিদ্ধ ছিল না যৌনতা। কামসূত্রে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। পুরনো অনেক কিছুতেই এটা নিষিদ্ধ ছিল না। বিগত কয়েক হাজার বছরের (যৌন-)নিয়ন্ত্রিত সমাজ আসলে সনাতন-সদাতন-চিরন্তন সমাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করে না। যৌন-নিয়ন্ত্রণের মামলাটা তার মানে স্রেফ যৌন-মামলা নয়। এটা সন্তান ও সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার মামলা। ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণের মামলা। সমাজ-নিয়ন্ত্রণের মামলা। তার মানে স্বাধীনতার প্রশ্ন এটা। মানুষের স্বাধীনতা। ব্যক্তির আর সমাজের স্বাধীনতা। জরুরি প্রশ্নই বটে। এবং প্রসঙ্গত, তন্ত্র আর কিছু না, স্বাভাবিক স্বরাজ-তন্ত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতাশীল সমাজ-তন্ত্র। তন্ত্র হচ্ছে আদিতম অ্যানার্কির অন্যতম অভিপ্রকাশ। তন্ত্র হচ্ছে প্রাকৃতিক—অ্যানার্কিক

স্বাধীনতা। স্বনিয়ম, স্বশাসন আর সহযোগিতার চিরপুরাতন ধারণা। তন্ত্র আমাদের স্বাধীনতা-পুরাণ। স্বাধীনতা-সংহিতা।

তো যৌনতার মতো এরকম একটা জিনিসকে, তথা প্রাণশক্তিকে -প্রাণসত্তাকে, কি একেবারে নিষিদ্ধ করা যায় আসলে? 'পাপ' বলে ঘোষণা করলেই কি এটাকে থামানো যায়? যায় না। এটা কাণ্ডজ্ঞান। তন্ত্রজ্ঞানও বটে। যৌনতা আত্মপ্রকাশ করেই। করবেই। আত্মপ্রকাশ করে হাসিতে। কণ্ঠস্বরে। চোখের জ্যোতিতে। এমনকি চোখের ঠুলিতে। আবরণেও। এ জিনিস আসলে নিজের নিয়মে চলে। চলে প্রাণের সদাবিকাশের নীতিতে। সংবিধান কিংবা দণ্ডনীতি অনুযায়ী চলে না যৌনতা।

যৌনতা এতটাই শক্তিশালী যে কাউকে ছাড়ে না। আমাকে না। আপনাকে না। সেনাপতি-বিচারপতি-রাষ্ট্রপতিকে না। কোনো পতিই ছাড় পান না এর হাত থেকে। কোনো পত্নী কিংবা বিপত্নীক পান না। সবচেয়ে বড়ো হুজুর, সব চেয়ে বড় পুরুত ঠাকুরকেও জায়গামতো কাত করে ফেলে এ জিনিস। এমনকি ৩০ বছর, ৪০ বছর ধরে যোগসাধনা করার পরেও যৌনতার সামান্য কাদায় পিছলা খায় যোগী। মাথা ফেটে যায়। মাথা নষ্ট হয় সন্ন্যাসীর। অ্যাতো পাওয়ারফুল এ জিনিস। ঘটা করে আত্মপ্রকাশই বা করবে কী, ও জিনিস তো আছেই। ইট ইজ অলঅয়েজ দেয়ার। অ্যান্ড হিয়ার। আত্মপ্রকাশের যখন আপনি কোনো 'আইনসম্মত' পথ রাখেন না, তখন তা ঘটনা ঘটায় দুই নম্বরি রাস্তা দিয়ে। চিপাচাপা দিয়ে। যেটাকে আমি 'দুই নম্বরি' এবং 'চিপাচাপা' বললাম, সেটা আসলে এক ধরনের সাবভারসিভ অ্যাক্টিভিটি। গেরিলা অ্যাক্টিভিটি। রাষ্ট্রীয় অন্তর্ঘাতী তৎপরতা। এক প্রকার বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ জিনিসটা কারো জন্যই খুব সুখকর না। কিন্তু বাধ্যতামূলক। প্রাকৃতিক-ভাবে বাধ্যতামূলক বিদ্রোহ। স্বাধীনতার মতো স্বাভাবিক। কর্তৃত্বতন্ত্রের কাছে নিয়ন্ত্রণ যেমন স্বাভাবিক, স্বাধীন মানুষের কাছে বিদ্রোহ তেমনি স্বাভাবিক। বিদ্রোহ আর কিছু না, স্বাধীনতার এক প্রকার ঘোষণা মাত্র। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ঘোষণা। এ স্রেফ নিজের স্বাধীনতাকে অ্যাসার্ট করা। নিশ্চিত করা। কর্মসূচি দিয়ে নয়। ম্যানিফেস্টো দিয়ে নয়। নিছক কৃতকর্ম দিয়ে। মেনিফেস্টো মেনে চলে না বিদ্রোহ। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি পাঠায় না। তবু গোপন থাকে না আসলে বিদ্রোহ। সবাই জানে। কেউ দেখে। কেউ দেখে না। অভ্যস্ত চোখ, বুদ্ধি-দাসের চোখ বিদ্রোহকে সুন্দর দেখে না। কর্তৃত্বের নজরে বিদ্রোহ সদা-অসুন্দর। অশ্লীল। অপরাধ।

এই হলো যৌনতার সাথে অশ্লীলতা আর অপরাধের সম্পর্ক। যৌনতাকে ক্রিমিনালাইজ করেছে কর্তৃত্বতন্ত্র। পর্যবসিত করেছে দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত ফৌজদারি অপরাধে। দেহাত্মার সর্বোচ্চ সুখকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে বিবেচনা করে কর্তৃত্বতন্ত্র। এই জন্যই যৌনতা অশ্লীল। দেহ অশ্লীল। অশ্লীলতার ধারণা এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দণ্ডবিধি। পিতৃতন্ত্র।

এমনিতে মিডিয়ার মালিক তো পিতৃতন্ত্র। সিনেমায়ও সে নারীকে অধীনস্ত করে রাখে। নারী-কর্তৃত্ব অদৃশ্য হতে থাকে। নিষ্ক্রিয় দেখানোর চেষ্টা করে নারীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অ্যাবসলিউট হতে দেয় না মা-প্রকৃতি, আমাদের প্রজাতিসত্তা। পিতৃতন্ত্রের মিডিয়া, পিতৃতন্ত্রের পুঁজি নিজেকে বাঁচানোর জন্য, (যৌন) নিয়ন্ত্রণের বিকাশের স্বার্থে যৌনতারই আশ্রয় নিতে হয় বাধ্য। সে ভাবে, সে মিথ্যা যৌনতা দেখাচ্ছে। সে ভুলে যায় যে 'মিথ্যা' আর কিছু নয়, সত্যেরই এক কিসিমের বিবৃতি মাত্র। সুতরাং আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন যৌনতা স্বয়ং। তাকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না। নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়তে থাকে। ভেঙে পড়তে থাকে অবদমনের ঘের। পিতৃতন্ত্র ভাবে, নারীকে যৌনবস্তু হিসেবেই দেখাতে থাকবে, কিন্তু প্রকারান্তরে হাজির হতে থাকে নারীই। টের না পেয়ে উপায় থাকে না: যৌনবস্তুসত্তা থেকে নারীর মুক্তির সাথেই মিশে আছে পুরুষের মুক্তি। নারীমুক্তির ওপরই নির্ভর করছে সর্বমানুষের – মানবসমাজের – মুক্তি।

তো, হিন্দি ছবিকে – মিডিয়াবাহিত-মিডিয়ানির্মিত যৌনতার যাবতীয় অভি-প্রকাশকে – এই রকম একটা জায়গা থেকে আমি দেখি।

মানুষ যৌনতা থিওরি

যতই আমরা অনানুষ্ঠানিকভাবে আলাপ করি না কেন, একটা পরিসরে দাঁড়িয়ে প্রেম কাম যৌনতা এগুলো নিয়ে আলাপ তোলাটা আলোচকের জন্য রিস্কি একটা কাজ। তদুপরি, একাডেমিক পরিসরে দাঁড়িয়ে তথাকথিত একাডেমিক পরিভাষায় যাঁরা এসব আলাপ তোলেন তাঁদের কথা তোলার যে ভঙ্গি সেখানে একটা একাডেমিক আড়াল তৈরি হয়। আমার কাছে সবচাইতে সহজ লাগে যে একদম সোজা বাংলায় আলাপ করা। এখানে ডিসকার্সিভিটি থিওরির আড়াল তৈরি করা বা কখনো ডায়ালেকটিকসকে হাজির করা – এগুলো দিয়ে কোথায় জানি তথাকথিত একটা থিওরি এসে হাজির হয়।

মানুষের প্রেমের কোনো থিওরি নাই। মানুষ বিষয়ক কোনো থিওরি নাই। এমন কোনো থিওরি নাই যেটা মানুষকে ব্যাখ্যা করতে পারে। একমাত্র মানুষই নিজে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করতে পারে। আরেক জনকে বোঝার চেষ্টা করতে পারে। প্রেম শুরু হয় কোত্থেকে? প্রেম শুরু হয় নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে। দেখার মধ্য দিয়ে। নিজের নানান ধরনের অনুভূতি টের পাওয়ার মধ্য দিয়ে। আরেক দিকে, যাবতীয় থিওরি-বিজ্ঞান-টেকনোলজি ইত্যাদির বাইরে প্রেম একেবারেই একটা ইনবিল্ট মেকানিজম – মানুষের জন্য। মানুষের ভেতরে এটা জন্মসূত্রেই আছে। এবং মানুষের ভেতরে শুধু না, এই মহাবিশ্বে যত রকমের শক্তি-বস্তু আছে তাদের সবার মধ্যেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের স্বাভাবিক ধর্ম আছে। এটা ইউনিভার্সাল। এটা চিরকালই

ছিল। কলিম খান (১৯৯৯) লিখেছিলেন – 'যোজনগন্ধবিকার'। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ থেকে কলিম খান দেখাচ্ছিলেন যে, যুক্ত হওয়ার যে ব্যাপারটা তার একটা গন্ধ আছে – যোজনগন্ধ। আমার যোজনগন্ধ যখন আমার বন্ধু মানসের সাথে মেলে তখন আমরা যুক্ত হই। আর এই যোজনগন্ধে তফাৎ পড়লে আমরা বিযুক্ত হই। কাজেই প্রেমকে আমি পলিটিক্যালি, ননপলিটিক্যালি, বা থিওরেটিক্যালি, সোশ্যালি, ইকোনমিক্যালি দেখতে রাজি না। প্রেম এমন একটা মুহর্ত যেটা মানুষকে লিবার্টি দিতে বাধ্য করে। যে লিবার্টিতে অভ্যস্ত না তাকেও প্রেম স্বাধীন করে তুলতে থাকে। তাঁর নিজের প্রেমের যুক্তিসিদ্ধতার প্রশ্নে সে তিনি প্রশ্ন তুলতে থাকেন প্রচলিত সম্পর্করাজি নিয়ে।

বাস্তবের জগৎ বনাম কল্পনার জগত, অথবা বাস্তবের জগৎ বনাম ভার্চুয়াল জগতের বাইনারি বিন্যাস দিয়ে জগৎবিচার করাটা কাজের না। মাঝখানে অনেক জায়গা থাকে। কল্পনা আর কাজ আলাদা না। কল্পনা নিজে তো একটা কাজ। একটা বায়োলজিক্যাল প্রসেস। হাত দিয়ে যেমন মোবাইল নড়াচ্ছি, ধরে আছি – আমি একটা বায়োলজিক্যাল কাজ করছি – শরীর দিয়ে, রক্ত-মাংস-মজ্জা-ঘিলু দিয়ে। কল্পনাও তাই। এটা একদম রক্তমাংস দিয়ে, ঘিলু দিয়ে, চলমান একটা কাজ। এর সঙ্গে 'বাস্তব' কাজের পার্থক্যের ধারণাটা অনেকখানিই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশনের পরিণাম – যখন কাজের একটা নতুন সংজ্ঞা দাঁড়িয়েছে। যখন পদার্থবিজ্ঞান বলছে যে, বলপ্রয়োগ করার পরে যদি না সরে তাহলে 'কাজ' হয় নি। যার ওপরে বলপ্রয়োগ করেছি তাকে সরতে হবে, কিছু একটা নড়াচড়া তার হতে হবে। তা যদি না হয় তাহলে কোনো লাভ নাই। ইন্ডাস্ট্রি তথা পদার্থবিজ্ঞান কাজকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করল। যা বস্তুগত পদার্থ উৎপাদন করে, যা প্রফিট নিয়ে আসতে পারে সেটা হচ্ছে কাজ। বাকিটা বে-কাজ। অকাজ। কুকাজ। আকাম। সেটা স্রেফ বেহুদা টাইম কাটানো।

কিন্তু ওরকম 'বেহুদা' বলে মানুষের জন্য কিছুই নাই। মানুষ প্রাণীটাই একটা বেহুদা প্রাণী। একেবারেই বেহুদা প্রাণী। এর কোনো আগামাথা নাই। এটা একটা আন্দাজি, মাথা-খারাপ টাইপের প্রাণী। এর কোনো তাল-গোল নাই। মানুষ প্রজাতিই এরকম। অন্য কোনো প্রজাতির মধ্যে এরকম 'পাগলামি' দেখা যায় না – পাগলামি বলতো যদি আপনি চান এটাকে! এটা লিবার্টি। এটা আনন্দ। এটা বৈচিত্র্য। চাঁদের দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন, অথবা হাত না দিয়ে। কেন?! এই প্রশ্নের মতো অবান্তর প্রশ্ন নাই। আপনার লাল রঙ ভালো লাগে কেন? আরেক জনের নীল রঙ ভালো লাগে কেন? আরেক জনের হলুদ রঙ ভালো লাগে কেন? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই। সাহারা মরুভূমি পার হতে হবে কেন? কাঠের গুঁড়ি দিয়ে লতা দিয়ে ভেলা বানিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিতে হবে কেন? বেহুদা আমাকে ঐ দেওয়ালে ছবি আঁকতে হবে কেন – গুহার মধ্যে? আমরা অনেক ব্যাখ্যা

দাঁড় করাতে পারব। থিওরি – থিওরির যুগ, বইয়ের যুগ, ধর্মের পরের যুগ – আমাদেরকে এরকম ব্যাখ্যা করা শিখিয়েছে। ব্যাখ্যা শব্দটার মধ্যকার য-ফলার যে ভাঁজ, সেই ভাঁজ দিয়েই আমরা যার-যেরকম-ইচ্ছা সে মোতাবেক কারণ, যুক্তি, যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা ইত্যাদি দাঁড় করাতে পারব।

আমার কতকগুলার বিশ্বাস আছে। ধারণা আছে। আমার ধারণা, ধারণাগুলো সত্য। এটা আমার একটা অনুমান যে: দু-জন লোক চোখাচোখি হওয়া মাত্র সম্পর্কে লিপ্ত হয়। কোনো না কোনো রকমের একটা সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এটা কেউ ঠেকাতে পারবে না। দু-জন মানুষ কথা বলা মাত্র – এমনকি টেলিফোনে – সম্পর্কে লিপ্ত হয়। ভার্চুয়াল যোগাযোগে যে অবস্থাগুলো আছে, যে অনিশ্চয়তাগুলো আছে, কিংবা নাই, সেগুলো সবই 'বাস্তব'-এর যোগাযোগের মধ্যে আছে। মানুষের মৌলিক তাড়নাগুলো – প্রেমের, সম্পর্কের – একটুও বদলায় নি। যেকোনো দুটো বাচ্চা সেকেন্ডের মধ্যে খেলা শুরু করে দেয়। আমরা পারি না। কেননা আমরা কোনো না কোনোভাবে ট্রেইনড। আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে: ওরকম দেখা মাত্রই অতো পিরিত করার দরকার নাই। একটু ঝামেলা আছে। অনেক ভেজাল আছে। সুতরাং, শুরুটা করতে হবে সন্দেহ দিয়ে – লোকটা কে না কে, কী না কী, তার জীবন-ইতিহাস ইত্যাদি প্রভৃতি।

আরেকটা ব্যাপার। এ কথা মানতেই হবে যে, আলাদা নাম হিসেবে প্রেম কাম যৌনতা ইত্যাদি আলাদা আলাদা পদ তো আছেই। মহাপ্রভুর একটা তত্ত্ব আছে। এভাবে বলাটা বরং ভালো যে, ওনার নামে প্রচলিত একটা তত্ত্ব – উনি নিজে যেহেতু আর বই লেখেন নি। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের কথা বলছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা। এই তত্ত্ব অনুসারে, কথার মুখ্য অর্থ আছে, এবং গৌণ অর্থ আছে। মুখ্যার্থ এবং গৌণার্থ। একটা কথা শোনামাত্রই বা বলামাত্রই যে অর্থটা মনের মধ্যে চলে আসে, সেটা হচ্ছে মুখ্য অর্থ। আর, গৌণার্থ হচ্ছে থিওরি – যুক্তি দিয়ে, তর্ক দিয়ে, পরীক্ষা করে, ভেঙে, বিশ্লেষণ করে তার নানান রকমের প্রকৃত, গূঢ় তাৎপর্য সহকারে অর্থ বের করে নিয়ে আসা। *গীতা*-কে মহাপ্রভু মুখ্য অর্থে পড়তে চান। গীতা তো আছেই! সে রকমই, প্রেম কাম যৌনতা প্রভৃতি আলাদা আলাদা নাম তো আছেই। মহাপ্রভুর তত্ত্বে নাম আছে মানে নামী-ও আছে। অর্থাৎ নামটা যার সে-ও আছে। তার মানে প্রেম কাম যৌনতা এগুলো পৃথক পৃথক সত্তা নিয়েই আছে। তো, মহাপ্রভুর কাছে – আমি একমত বলেই ওনার দোহাই দিচ্ছি – প্রেম আর কামের গুরুতর পার্থক্য আছে। যেটা নিজের জন্য সেটা হলো কাম। আর যেটা বন্ধুর জন্য, প্রেমাস্পদের জন্য – ওটা হচ্ছে প্রেম। যৌনকর্মে, সঙ্গমের সময়, আদরের সময়, ভালোবাসার সময় প্রেমিকের লক্ষ্য হচ্ছে প্রেমিকাকে সন্তুষ্ট করা। পরিতৃপ্ত করা। এতেই তার আনন্দ। নিজের আনন্দ বলে আলাদা কোনো আনন্দ তার নাই যতক্ষণ না ঐখানে আনন্দ

হচ্ছে – এইটা হচ্ছে প্রেম। আর, ও দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি তা জানি না, আমার কিছু ‘কাজ’ আছে সেগুলো আমাকে সারতে হবে – এইটা হচ্ছে কাম।

তাই বলে প্রেম আর কামকে ডিসকানেক্টেড বলে মনে করার কিছু নেই। যখন কেউ প্রেমে আছে, সঙ্গমে আছে, তখন সে কানেক্টেডই আছে – বিযুক্ত অবস্থায় নাই, কামবিযুক্তও নাই। প্রেম আর কামের সম্পর্কটা এক ধরনের ট্রান্সেন্ডেশনের। এটা ট্রানসেন্ড করে। ঊর্দ্ধগমন করে। কাম মানে কামনা। আর কিচ্ছু না। কামনা জগতের সর্বত্র। অক্সিজেনের জন্য অক্সিজেনের। হাইডোজেনের জন্য অক্সিজেনের। যেখানে হাইডোজেন এবং অক্সিজেনের দেখা হলে পরে পৃথক আরেকটা যৌগ বানানোর উদ্দেশ্যে আরেক জনের সাথে দেখা হয়েছে বলে একে ছেড়ে দিয়ে ওদিকে চলে গেল টাইপের অবস্থা হয় – সেই ছেড়ে যাওয়াটাও কামনারই অংশ। এটা কিন্তু বিযুক্তি না। আরেকটা যুক্তি তথা সংযুক্তি মাত্র। যুক্তি মানে কী? আমরা – জগতের প্রপঞ্চগুলো – কে কীভাবে কতটা কার সাথে যুক্ত আছে তার যে বোধ বা উপলব্ধিটাই হলো যুক্ততা বা যুক্তিবোধ। আর কিছু না। কামের পথ ধরেই প্রেমের ওখানে যেতে হয়। কামনা ছাড়া প্রেমের প্রশ্ন ওঠে না। কাম জিনিসটাকে যদি আমি উপলব্ধি করতে শুরু করি – আমি নিজে, নিজের মতো করে যদি সম্যকভাবে জানতে শুরু করি কামনা কী বস্তু, মানুষ কী, ভালোবাসা কী, প্রেম কী, যৌনতাই বা কী – তাহলে একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি এটাই বুঝব – টের পাব – অনুভূতি দিয়ে, শরীর দিয়ে – শরীরের ভেতরেই কল্পনা আছে – যে, আমার সঙ্গীর সুখই আমার সুখ। তখনই কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের পথ পরিষ্কার হতে শুরু করে। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে সত্তার সাথে সত্তার কামনা-বাসনা-ভালোবাসার প্রক্রিয়াগুলো আদৌ এ জগতে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে তারই নাম যোজনগন্ধ ওরফে যৌনতা। সম্পর্ক মাত্রেই তাই দৈহিক, শরীরী, যৌন। দৃশ্য রূপ রঙ রস ধ্বনি স্পর্শ কল্পনা – সমস্তটাই দৈহিক। অযৌন-অশরীরী সম্পর্ক বলতে কিছু নাই।

সম্পর্কের মুহূর্ত

আমার কাছে পরিষ্কারই লাগে। সহজভাবে আমি বুঝি যে, মানুষ একটা মেটা-ফিজিক্যাল প্রাণীই। মানুষ কবিতা লেখার সময় মেটাফিজিক্যাল। মানুষ সঙ্গম করার সময়ও কিন্তু মেটাফিজিক্যালই। মানুষ প্রাণীটাই আসলে স্পিরিচ্যুয়াল একটা প্রাণী। মানুষ স্রেফ ফিজিক্যাল না। এর ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো খুবই স্থূল, এবং তারপরও, এর ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো পর্যন্ত আমাদের অত্যন্ত অজানা। আর মেটাফিজিক্যাল দিকগুলো তো রীতিমতো দুর্বোধ্যই বটে। তো এই মেটাফিজিক্যাল ব্যাপারগুলোকে সাহসের সাথে, দ্বিধাহীনভাবে, কবুল করে নিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে পারার যে মুহূর্ত, মানে নিজের সামনে নিজে দাঁড়ানোর একান্ত নির্জন যে

মুহূর্ত, ওটাই হলো শিল্পের মুহূর্ত। সম্পর্কের মুহূর্ত। সম্পর্ক রচনার মুহূর্ত। নিজের সাথে নিজের 'স্বকীয়' সম্পর্ক রচনা। অপরের সাথে – নিখিলের সাথে – 'পরকীয়' সম্পর্ক রচনা। স্বকীয় আর পরকীয়র আলাপ আদতে তন্ত্রেরই আলাপ বটে– মহাপ্রভুরও আলাপ। সে আলাপ অন্যত্র।

হদিস

কলিম খান, ১৯৯৯। 'যোজনগন্ধবিকার: 'সিস্টেম ডিজাইনিং'-এর একটি সমস্যা', *দিশা থেকে বিদিশায়*, কলকাতা: হাওয়া ঊনপঞ্চাশ প্রকাশনী। [বর্তমান গ্রন্থের প্রথম রচনা হিসেবে এটি সংকলিত হয়েছে।]

এই রচনার খানিকটা অংশ লেখকের *অচেনা দাগ* (আগামী প্রকাশনী, ২০১৫) গ্রন্থের 'কর্তৃত্বতন্ত্র শিল্পবোধ স্বাধীনতা' রচনা থেকে নেওয়া। বাকিটা রাবি-র গণযোগাযোগ বিভাগে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত মানস চৌধুরীর একটি বক্তৃতার ওপর আলোচনার অডিও-অনুলিপি।

মামুন হুসাইন

সংক্ষিপ্ত জীবন সমগ্র ২০১৪

Rabindranath Tagore

এরকম ছবি সে দেখতে পেল— আজ আমার কন্যার জন্মদিন, হাসপাতালে কেউ মৃত্যুবরণ করে নি; আর একটি পাবলিক বেঞ্চে কে এক বৃদ্ধ ঘুমের ভেতর ঈশ্বরের শান্তি ও দয়া উপভোগ করছে। যখন কন্যাটি ওর পেটে সাত মাসের তখন সে স্বপ্নে

প্রসবের আগাম ছবি দেখতে পেয়েছিল: বাচ্চা প্রসব হলো, কিন্তু বাচ্চাটি পুত্র না কন্যা তা আন্দাজ করতে পারলাম না তক্ষণি। হাসপাতালের লেবার রুমে আমি চিৎ হয়ে। কিন্তু চিকিৎসকের হাতে আমি আমার কন্যার 'জন্মদিন' দিতে চাইছিলাম না। ভেবে ভেবে আমি তাই আমার ডক্টরকে নিজের জন্মদিনের তারিখটি জানিয়ে ইলেকটিভ সিজারিয়ানের সময় নির্দিষ্ট করি, যেন আমাদের দুজনের জন্মতারিখ এক হয়। হাসপাতালের লেবার রুমে অপেক্ষা করতে করতে মনে হলো আমি একটি কাজ বা ঘটনার সাথে যুক্ত। হঠাৎ কেউ বললো, ঐ যে... হেড পিপ করছে! আমি জেগে উঠতে চাইলাম। আমার কন্যা, নাকি পুত্র, লাল-সাদা হাত দিয়ে আমার মুখ ছুঁয়ে দিল! আমি যত্ন নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছি, আর ভাবছি, কন্যাকে আমার মায়ের হাতে অর্থাৎ ওর নানিমার হাতে তুলে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বো। আমি ভাবি, তাহলে আমি কী কেয়ার গিভার না কেয়ার রিসিভার?

কন্যা, নাকি পুত্র প্রসবের সেই সময়কাল আমাকে এখনো হঠাৎ হঠাৎ চমকে দেয় যেন! দিন-রাত সবকিছু স্বপ্নের মতো অনুভব হয়; হয়তো ব্যথা ছিল সেই দিন। এপিডুরাল ভালো কাজ করে নি। আমার ভয় হচ্ছিল। ওটি'র আলো আমাকে অপ্রস্তুত করে দিচ্ছিল। দাঁত উপড়ে ফেলার মতো যাতনা। এপিডুরাল কী শেষ পর্যন্ত কাজ করেছিল? অনেক পরে বুঝতে পারছিলাম– আমার পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। কোমর থেকে নীচের শরীরটা অবশ। মেষশাবক যেমন বাধ্যতামূলক স্লটার হাউসে উপস্থিত হয়, আমার তেমন দশা। আমরা কী সবাই রেডি? সার্জনের এই কথায় ভয় হলো এবং কেমন দিশেহারা ভাব! আমার বলতে ইচ্ছে করলো– অমি আমার সিদ্ধান্ত বদলেছি, এই সন্তান আমার চাই না। বুঝতে পারছি আমার শরীর-মাংস-চামড়া অবস্টেট্রিসিয়ানের সিজার এবং নাইফে ক্রমাগত কাটা পড়ছে– এই জ্যান্ত শব্দের জন্য আমি কোনোদিন প্রস্তুত ছিলাম না, একখণ্ড ফ্যাব্রিক যেমন কাঁচির নীচে স্থির-অবশ থাকে, আমি দাঁত চেপে তাই করলাম। আমি চারপাশ দেখছিলাম, অবাক হচ্ছিলাম এবং ভাবছিলাম– আদৌ আমি কী কোনোদিন জীবনে ফিরতে পারব! অক্সিজেন মাস্ক, এ্যানাসথেটিস্টের ভেইন খোঁজার চেষ্টা– মনে হচ্ছিল কয়েক শত যুগের অনিঃশেষ কাহিনী! আমি কী তবে পালিয়ে গিয়েছিলাম? ঘুম-ঘুম হেঁটে বেড়ানোর ভেতর অনুভব হলো– সারাদিন তীব্র গরমের পর শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। আমার কী ঠিক-ঠিক মনে পড়ছে! আমাদের সামনে কেউ দৌড়ে যাচ্ছিল, আর পায়ের সাথে পা মিলিয়ে হাঁটছিল। আমরা নতুন মায়েরা হাসপাতালের জানালা দিয়ে শত-শত নবজাতক বুকে নিয়ে মৃত চাঁদের দেশ দেখছিলাম। অল্প ঘুম, ব্যথা এবং জাগরণের জটিলতায় বিষণ্নতা তৈরি হচ্ছিল। নতুন মায়েরা স্বপ্নের গভীরে দৃষ্টি ছড়িয়ে মনে মনে অসুস্থ মানুষ ও অসুস্থ গাছ চিহ্নিত করার খেলা খেলছিল। নতুন মায়েরা নতুন পোশাকের গন্ধ পাচ্ছিল, কলকাকলীর শব্দ পাচ্ছিল, আর পারিবারিক

গোরস্থানে সমাহিত মাতামহের ঝুলেপড়া নামফলক থেকে শ্যাওলা পরিষ্কার করছিল। অথবা সামান্য ঘুমের বড়ি খেয়ে তারা সংসারের জন্য, বেবিসিটারের ক্রনিক এ্যাবসেনটিজম পাড়ি দেয়ার জন্য, ভালোবাসার জন্য, দুগ্ধ দানের সাহস খুঁজছিল। আর হঠাৎই শেষ রাতের সেই বৃষ্টি– শিশুদের কাগুজে উড়োজাহাজ তখন জল-জাহাজ হতে হতে সকল মৃত বন্ধুদের মুখ, শরীর এবং গন্ধ নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। বৃষ্টির জলে মায়েদের কেউ তখন শৈশবের খেলনা-জাহাজ খোঁজার জন্য রেলিংয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়: সমস্ত সকাল আমরা সেদিন নরম হয়ে যাওয়া চকোলেট, অফিসের মনিটরিং সিস্টেম, সুগন্ধ এবং হেমন্তকাল নিয়ে কথা বলি। আমরা কথা বলি লাটাই, শার্সিতে ভারি বৃষ্টিপাতের শব্দ এবং মৃত শিশুদের নিয়ে। নতুন মায়েদের কেউ ফিসফিস করে– প্রথম সন্তান কনজেনিটালি ডিফর্মড হওয়ার জন্য, সারাজীবন তার আতঙ্ক ছিল। যে ভদ্রমহিলা কবিতা লিখতেন, তিনি বললেন, তার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো লেখা হলো তার কন্যার মৃত্যুর পর। জানা গেল ভদ্রমহিলা গর্ভস্থ শিশুর স্পর্শের কথা, নড়াচড়ার কথা নোট বইতে লিখে রেখেছিলেন। এখন তিনি সবার সামনে লেখার অংশবিশেষ পাঠ করতে চাইছেন; আড়চোখ পরস্পর নজর বিনিময়ের পর সম্মতি জানালে তিনি ধীরে ধীরে পৃষ্ঠা উল্টে চলেন। ভদ্রমহিলার গলার স্বর এবং চোখের ভেতর আমাদের সম্মিলিত ছায়া-গান ভেসে উঠছিল। অনুভব হচ্ছিল– সন্তান ঘুমিয়ে থাকা পেটের ভেতর খানিকটা ডানদিকে কেউ যেন আমাকে দেখছে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। মৃদু আদরের মতো কেউ আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, এক খণ্ড ভেলভেটের ওপর হাতের আঙুল যেমন দৌড়ে যায় তেমনি। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ, লার্ভা এবং ব্যাঙের ছানাপোনা যেমন দৌড়ে আসে, তেমনি অনুভূতি। আমার সন্তান...! কখন ও নড়ে উঠবে জানার উপায় নেই। ওর নিজস্ব একটি রিদম আছে, যা আমার আয়ত্ত্বাধীন নয়। আমি অপেক্ষায় থাকতাম। ঐ যে আবার ঢেউ উঠে আসছে। চামড়ার জায়গাটি আমি আদর করতাম। খানিকটা ভয়ের মতো, শরীরের নীচে আসলে ঠিকঠিক নড়াচড়া করছে তো? নরম স্বচ্ছ আঙুল, ফুলে ওঠা হাঁটু, না হাইড্রোকেফালিক হেড! সন্তান দৌড়ে যাওয়ার বর্ণনায় আমরা এলোমেলো হতে-হতে অন্যমনস্ক হই; অন্যত্র হেঁটে যাওয়ার আয়োজন করি, অথবা আবার একটু থমকে দাঁড়াই– যিনি আমাদের ওয়ার্ডের ছয় নম্বর বিছানায় শুয়েছিলেন, তিনি তখন একটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়; বললেন, একটি বই প্রকাশ হতে চলেছে আমার, নাকি বলবো, একটি গ্রন্থের জন্ম হতে চলেছে? এদিকে আমার শরীর, উদর প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। আমি অপেক্ষা করছি শিশুর; জন্মগ্রহণ করবে, একটি শিশু ও একটি গ্রন্থ! কিন্তু পাঁচ মাসের মাথায় আমার স্টিলবর্ন বেবি হয় এবং আমার গ্রন্থটিও তখন প্রকাশ পায়। বলতে পার শব্দ-বাক্য তৈরির মূল্য আমি, আমার আত্মজের মৃত্যু দিয়ে পরিশোধ করি।

লেবার ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডের বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়া এইসব গল্প-গাছা এতদিন পরেও ঠিক মনে করতে পারছিল; প্রথম শিশুটি স্টিলবর্ন হওয়ার পর ও ঝুঁকে পড়া একটি অশ্বত্থের বনসাই ছুঁয়ে নিজেকে নিয়ে অনেকগুলো কথা বলেছিল বৃক্ষের পাতা মসৃণ করতে-করতে— ঘরে, বাড়ির বাইরে, দেখবে একটি মেয়ের অবস্থান এক রকম, সন্তান তৈরির বিশেষ সৃজনশীলতার কাল এক রকম এবং সব মিলিয়ে নারী হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা অন্য এক অচিন পথঘাট বটে! সব সময় এই এবড়ো-থেবড়ো ভয়-ভয় পথ-ঘাটের দিশা আমরা আগাম হয়তো বুঝতেও পারি না। শিশুর নড়াচড়া, শিশুর ঘুম-ঘুম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দেখতে-দেখতে আমার মৃত বাবার কথা মনে হয়েছিল এবং টেপরেকর্ডারে আমি অন্য এক মৃতব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনার চেষ্টা করি। তখন আমি বনসাইয়ের শেকড়-পাতা ছুঁয়ে আমার সম্ভাব্য হাজার রকমের জীবনের ডালপালা অনুভব করতে পারছিলাম— জীবনের স্বাদ-গন্ধ একটু-একটু ছড়িয়ে যাচ্ছে আর আমাকে পেছন থেকে কেউ ডাকছে। একটি শাখা সন্তান-স্বামীসহ সুখের একটি ঘর। একটি শাখা ডমেস্টিক ভায়োলেন্স। একটি শাখা বাধ্যতা-মূলক গৃহত্যাগ। একটি শাখা রাত জাগানিয়া সন্তানসহ বাবা-মায়ের ঘরে অবস্থান, একটি শাখা ইন্টিমেট-পার্টনার ভায়োলেন্স। একটি শাখা স্বামীর সঙ্গে সংসার করা এবং না করার দ্বন্দ্ব। একটি শাখা বাবা-মায়ের বেজার মুখ। একটি শাখা বোনদের বিরক্তি এবং অসহযোগিতা। একটি শাখা মৃত বাবা এবং বেঁচে থাকা মায়ের সুশীর্ণ মুখাবয়ব। একটি শাখা পত্রিকা অফিসের। একটি শাখা সমালোচক ও সম্পাদকের। একটি শাখা শৈশবের খেয়াঘাট এবং ভেলায় চড়ার অনুভূতি, যেখান থেকে একপাটি জুতো আমি হারিয়ে ফেলি। একটি শাখা নানিমার ঘরবাড়ি, যিনি মামাকে নতুন-নতুন ব্যবসার হদিস দিয়ে, মামার লাগাতার লোকসান তুচ্ছ করে আবারো উঠোন জুড়ে নবজাতক নাতনীর জন্য কাঁথা তৈরির সহস্র সুতা ছড়িয়ে রঙধনু গড়ার সাহস রাখতেন। একটি শাখা হাসপাতালের অধ্যাপকের জন্য। একটি শাখা বুড়ো মাস্টারের জন্য, যিনি অনেকগুলো গাছ, ফুল এবং খাদ্য তৈরির নিয়মাবলি শিখিয়েছিলেন। একটি শাখা বয়স্ক সেই বন্ধুটির জন্য, যার সঙ্গে গমক্ষেতের আড়ালে কুয়াশার একটি সন্ধ্যা অনুবাদ করার সুযোগ এসেছিল। একটি শাখা পাহাড়, সমুদ্র, দেশ ও ভারত-বর্ষের জন্য। একটি শাখা জগতের জন্য। আর এরপরেও গাছ জুড়ে অগুনতি শাখা, কী সব মায়া-ভয় এবং আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে— যা আমি কোনোদিনই হয়তো বুঝতে পারি নি! চেয়েছিলাম এতসব শাখা-প্রশাখার প্রত্যেকটিকে বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে ধারণ করবো; কারণ কেবলমাত্র একটিকে অবলম্বন করার অর্থ বাকি সব কিছুকে চিরকালের মতো বিসর্জন দেয়া, যা আমি চাই নি কোনোদিন। উপায়হীন-বুদ্ধিহীন হয়ে দিধান্বিত হয়ে আমি গাছের নীচে দাঁড়াই। সিদ্ধান্ত নিতে কেমন সংকোচ, বাধা— একককিছু অবলম্বনের অর্থ, অন্যটিকে বিসর্জন দেয়া— যা আমি

কখনো ভাবি নি! দেখি অপেক্ষায়-অবহেলায়-অনাহারে গাছের শাখা-প্রশাখা সব এখন মুমূর্ষু! নীরা বনসাইয়ের শাখা-প্রশাখা দেখতে দেখতে, ভাবনায় ডুবে যেতে-যেতে বনসাইয়ের শেকড় যে ছেলেটি ট্রিম করতে জানে হঠাৎ তার ফোন নম্বর খুঁজতে চাইল। বাড়ির মেইড এখনো পৌঁছায় নি; কাজেই হাতে-বেলা রুটির পরিবর্তে ব্রেড-টোস্ট খেয়ে ঘরের কর্তা হাসান দ্রুত অফিসে বেরিয়ে গেল। নীরা প্রুনিং নাইফ দিয়ে বনসাইয়ের কয়েকটি পাতা ছেঁটে দিল। পুত্র সারা রাত জেগে, খানিক আগে ঘুমিয়েছে। বাবার মন খারাপ, ... নীরা কোনো চাকুরিতে নেই, কেবল গার্হস্থ্য জীবন! নীরা নিজেও মনে-মনে চাকুরি খুঁজছে; এক জায়গায় কথা হয়েছে, ওরা বেসরকারি-ভাবে দাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, ফিল্ডের রিপোর্ট গুলো কম্পাইল করতে হবে। নীরা এসব ভাবছিল আর ঘর-সংসারের এলোমেলো চাদর-বিছানা বিন্যস্ত করছিল। আর ভাবছিল– প্রায়শ ঘটে যাওয়া গোপন ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা, ভাবছিল এ্যাবিউজের কথা এবং সংসার নামক বিপুল যজ্ঞের কথা! বাইরে একটি কুকুর রাগান্বিত স্বরে কথা বলছিল। বোতাম, জিপার এবং রকমারী সুতার দোকানে গতরাতে চুরি হওয়ায় পুলিশের সাজগোজ মোটরবাইক এসেছে তদন্তের লোভে। রাস্তায় ফেলে যাওয়া সুতোয় শিশুরা পা জড়িয়ে আনন্দ করছে। নীরা দেখলো, ওর মেইড পুলিশ এবং সুতোর দোকানের তামাশায় আটকে আছে। চায়ের তেষ্টা হচ্ছে কি! চায়ের আগে লেবু পানি হাতে নিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়ায়। পুরনো সেই মাস্টার মশাইয়ের মতো কাউকে সে দেখতে পেল ভিড়ের ভেতর। অনেক দিন আগে, বাড়ি থেকে আড়াল হয়ে, বুড়ো লোকটার উষ্ণতায় ফুলঝুরি, হরিয়াল ও ধুমকল পাখি চেনার সুযোগ হয়েছিল। বাড়িতে পুত্রকে মেইড-এর কাছে রেখে হঠাৎ পাখি দেখার জন্য সেই পলায়নবৃত্ততা বাবার বাড়ি-শ্বশুর বাড়ির কেউ সরল চোখে দেখে নি। সন্তান ধারণের পর অন্যত্র বন্ধুত্ব-সম্পর্ক স্থাপন নিশ্চয় শোভন নয়! চার-পাশের মানুষ ভ্রূকুটি করে, গালমন্দ করে, আচরণবিধি নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে, আর কথা বলে শ্লীল-অশ্লীলতা নিয়ে। কথা বলে পরিবারের মর্যাদা নিয়ে, বাবার দুঃখিত হওয়ার কাহিনী নিয়ে; কথা বলে মাতৃত্বের স্বরূপ নিয়ে, নৈতিকতা নিয়ে, ফ্রিডম নিয়ে, যৌনতা নিয়ে এবং ভালো মেয়ে-মন্দ মেয়ের উপাখ্যান নিয়ে। বুড়ো লোকটার জন্য কী তার কোনো মায়া জমে আছে কোথাও? অবিন্যস্ত লোকটার সঙ্গে অনেকখানি সময় ভাগাভাগি হয়েছিল, দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল এবং ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে অলৌকিক স্বপ্ন বিনিময় হয়েছিল। চা হাতে সে নিজেকে প্রশ্ন করে– এই বাড়ির লোকটিকে আমি কী কখনো ভালোবেসেছিলাম? আমি নিশ্চিত যে, নামফলকের হাসান এবং বাড়ির ভেতরের প্রকৃত হাসান এক ব্যক্তি নয়। আমাদের কী কোথাও তাহলে পলায়ন করা উচিৎ? নাকি এইভাবেই ঘর-কন্যার লুকোচুরি-খেলাধূলো চলবে? ভেতর থেকে কেউ উস্কে দেয়– চলে এসো, পৃথিবীর

এই দিকটাতে তুমি চলে এসো। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ হয় না। মাঝে-মাঝে খুব দেরিতে বৃষ্টি আসে। আর এই দিকে একটি গলিপথ আছে যেখানে গোপনে কয়েকজন মাহিস্য কচ্ছপ ও শূকরের মাংস বিক্রি করে।

নীরা বুকের মাঝখানে সামান্য ব্যথা অনুভব করে। কাউকে কী বিদায় জানাতে বসেছি? বাবার মুখ, শিশুর মুখ এবং শিশুর সরলতা জলের ভেতর বনসাইয়ের উটকো পাতা হয়ে ভেসে যাচ্ছে। বাবাকে, মাস্টার মশাইকে এবং টেপরেকর্ডারে শোনা মৃত ব্যক্তির কণ্ঠস্বরকে এবার সত্যিই বিদায় জানাতে ইচ্ছে করে। দেরিতে এসে কাজের মেয়েটি রান্নাঘরে শব্দ করে বাসি থালা-বাসন ঘষা-মাজা করছে। পুত্র খিদে পাওয়ার কান্না করছে মশারির ভেতর। নীরা চায়ে মৃদু চুমুক দিয়ে পুত্রকে কোলে নেয়। পুত্র বুকের ভেতর মুখ ডুবিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্থির হয়। নীরা দেখে ভোরের রোদ্দুর জলের মতো শিশুর গা বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। নীরা মনে মনে গণনা করে– ভেসে যাওয়া মুখ, শিশুর মুখ এবং জরায়ুর মুখ! সব বিষয়ে নিশ্চয় আমার কথা বলার অধিকার নেই! রাস্তার মোড়ে একজন পাখিওয়ালা আতুর পাখি হাতে হাঁক দিচ্ছিল। কেউ ভয় পেয়ে কেঁপে উঠছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এত বয়সের পরেও বড্ড কিশোরী মনে হয়। সেই বুড়ো মানুষটির জন্য রাগ হয়, ঘৃণা হয়, ভালোবাসা হয়– তুমি সমস্ত জীবনব্যাপী আমার শেকড় ছুঁয়ে আছ; কিন্তু তুমি আমার নও, এই কথাটি অমান্য করার যুদ্ধ আমি আরো ঢেরদিন হয়তো অব্যাহত রাখব। প্রতি সকালে নাস্তা নামক ছাইপাশ গিলে আমরা সবাই স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য, চাকুরি রক্ষার জন্য, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কী তীব্র ব্যস্ত হয়ে পড়ি। হঠাৎ চ্যাঁচাই কেন? যে তিনটি লোক সকালে কুড়োল হাতে শব্দ করে বৃক্ষ-লতাপাতা চূর্ণ করতো, তারা এখন কোথায় কে জানে? অন্ধ ভিখিরির গা ঘেঁষে দুজন টাইপরা যুবক চলেছে, ছয়জন কবিসম্মেলনপ্রিয় তরুণীর পিছুপিছু। শেষ রাতের বৃষ্টিতে বড় রাস্তা এখন নদী, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কবিরা তাই উৎসব মঞ্চে পৌঁছানোর জন্য বড় রাস্তার নদী পার হচ্ছে স্পনসর-কোম্পানির ট্রাক চেপে। কেউ ভেতরে-ভেতরে ধমকায়– মূঢ়তা অনেক হলো! একটা জায়গা থেকে এখন শুরু হওয়া দরকার। নীরা নিজেও তাই ভাবছিল, শিশু দুধ খেয়ে আবার ঘুম-ঘুম চোখে হাই তুলছে। গলার ভেতর সামান্য বিরক্তি। কেউ যেন তাকে শৈশবের গলায় মজা করে– এক হাতে তালি বাজানোর শব্দ শোনাতে পারবে? কেউ তাকে বুড়ো মানুষের গলায় প্রশ্ন করে– আলোকিত হওয়ার বিষয়টা তুমি জান? আবার সেই বুড়ো মানুষটিই জবাব দেয়– খিদে লাগলে খাও, আর ক্লান্তি এলে ঘুমিয়ে পড়ো... এই হলো আলোকিত হওয়া! নীরা রাত জেগে ক্লান্তি অনুভব করে, পুরো ঘরবাড়ি অগোছালো; এখন কী বাচ্চার পাশে ঘুমিয়ে পড়বে! ঘরের সিনিয়র মেইডের বায়না বাড়ছেই– আজ সমিতির কিস্তি, বোনের বিয়ে, স্বামীর চিকিৎসা, নতুন কাপড় কেনা, মেয়ে ইলোপ করেছে, বেতন

বেশি চাই, জামাইকে রেঁধে খাওয়াবো, নতুন কাপড়ে হাঁটাচলার ফাঁকে প্রাক্তন স্বামীর মুগ্ধতা জাগরণ ইত্যাদির প্রণোদনায় প্রায়-প্রায় ঘরবাড়িতে আর আগের মতো খুঁজে পাওয়া যায় না! নীরার এখন আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় না অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে। খুব ভাবতেও ইচ্ছে করে না। ক্লান্তি বাড়ে, আর ভেতরে ভেতরে কান্নার মতো ক্রোধ হয়। পুত্র না ঘুমিয়ে, তীব্র চিৎকার করতে-করতে, ঘরবাড়ির জিনিসপত্র আছড়ে এইমাত্র ঘুমুতে গেল। অপেক্ষার যাতনায় ওর নিজেরও ঘুম-ঘুম ঝিমুনি আসে। সেলফোন সাইলেন্ট মোডে এনে, ফ্যানের বাতাসে ফর-ফর ক্যালেন্ডারের পাতা উড়তে দেখে। ঘুম-ঘুম জাগরণের চক্রে নীরার ভেতর দু'দশজন লোক যেন কোলাহল করে। কেউ শিস বাজায়। কেউ নতজানু হয়। কেউ হেঁটে-হেঁটে লাল পিঁপড়ার ঢিবির কাছে দাঁড়ায়, কেউ রাবার বনের ভেতর চাঁদের ক্ষয় দেখে। আর সেই আধো-চেনা মহিলাটি, হঠাৎ-ই টানা বারান্দায় চা খাওয়ার বায়না নিয়ে চেয়ার টেনে বসে। তারপর আমার সঙ্গে, আমাদের আরো দু'চার দশজনের সঙ্গে, সন্তান ধারণ না করার পক্ষে গল্প বলে– ... এমন নয় যে, সন্তান ধারণ করার দায়িত্ব আমি নিতে অপারগ। আমি চেয়েছিলাম কেবলই ভ্রমণ করতে। সন্তান যেসব বাধা আরোপ করে, তা থেকে আমি মুক্ত থাকতে চেয়েছিলাম, সন্তান আমার ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনার সঙ্গে যায় না। মনে হয়েছে, প্রচুর জনসংখ্যার দেশে, আমি আর নাইবা রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় বাড়াই। মনে হয়েছে, আমি হয়তো ভালো মা হতে পারবো না, বন্ধুদের কথায় উত্যক্ত হয়েছি– কখন তোমরা বাচ্চা নিচ্ছ, বাচ্চা নিচ্ছ না কেন, বাচ্চা কী নিবেই না সিদ্ধান্ত নিয়েছ! এইসব প্রেসার বহুদিন পর্যন্ত ছিল, কিন্তু আমি নিজেকে আক্রান্ত হতে দিই নি। মা চাইছিল তার নাতি-নাতনী থাকুক, আমার অন্য ভাই-বোনের বাচ্চারা সেই দায়ভার থেকে আমাদের রক্ষা করেছে। সে জানে, জিন-এর আশ্রয় নিয়ে কথা বলার সুবিধা তো আছেই– আমার বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী জিন-এর ভেতর হয়তো এরকম প্রোগ্রামই ছিল, হয়তো এজন্য কেউ কেউ... জাস্ট ন্যাচারল পেরেন্টস...। আমি হয়তো নই...! নীরা আধোচেনা মহিলাটির লম্বা বক্তৃতা শুনে, খুব শেষের দিকে অস্বস্তিতে উঠে বসে। চোখ নিভু-নিভু হয়– জীবন নামক মহাশয় এভাবে কখনো এগোয় না; কেউ ফিসফিস করে– তুমি শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়াও! শুধুই ঘরকন্যার খেলা এখন ক্লান্ত করে। নীরা নামক একটি কন্যা পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি অচেনা পথ ধরে হাঁটতে চেয়েছিল একদিন। রান্না, বাসন-মাজা, স্বামীর জুতোর ফিতে, খাদ্য পরিবেশন ইত্যাদির বাইরে ভাবতে চেয়েছিল– লাইফ ইজ এল্‌স হোয়ার! ভাবতে চেয়েছিল, নিজের একটি কামরা থাকবে, একখণ্ড পার্সোনাল স্পেস থাকবে, নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য আলাদা উঠোন থাকবে! ভাবতে-ভাবতে ক্রোধ হয়, কান্না হয়, আর নানান প্রতিজ্ঞা এসে মস্তিষ্ক ভারগ্রস্ত করে। নীরা ঘুমুতে পারে না। কাজের মেয়েটিকে বুদ্ধি যোগায়; দু'একের

মধ্যে অফিসে ছুটতে হবে, বাচ্চার জন্য খেলার বয়সী কাউকে দরকার। বাবার ডিপার্টমেন্টের একজন আজকে সন্ধ্যায় কাউকে নিয়ে আসবে। নীরা স্নান করতে যায়, হাসানের কথা ভাবে, আর রাগ হয় এবং অসহায় বোধ করে– ইন্টিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স-এর বাংলা অর্থ খুঁজতে খুঁজতে শরীর পানিতে ডুবিয়ে দেয়। জলের ভেতর মানুষের কণ্ঠস্বর বদল হয়। নীরা ভেতরের নীরাকে ধমকায়– তুমি লোকটিকে বিয়ে করলে কেন? আমি আসলে ঘর ছাড়তে চেয়েছিলাম। বাড়ির নিয়ম, বাধা, শাসন আমার ভালো লাগছিল না। তুমি কী তোমার স্বামীকে ভালোবাস? আমি পছন্দ করেছিলাম। বাট ... হি এ্যাট প্রেজেন্ট ইজ জাস্ট আ বোর। একেবারেই সাদা-মাঠা। তুমি এখন কি কর? একদম ভালো লাগে না, ছোট-ছোট অজস্র বিষয়ে আমি সারাদিন উত্যক্ত হই। বিয়ের আগে প্রতিজ্ঞা হয়েছিল– আমরা সারা বিকেল-সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াব, সমুদ্র বা পাহাড়ের কাছে দু'পাঁচদিন লুকিয়ে থাকব, সু-প্রচুর স্ট্রিট-ফুড কোনো রকমের ভয় ছাড়াই খেয়ে যাব অনায়াশে, সে-সব কিছু হয় নি। চারপাশের মানুষ কত পরিকল্পনা করে, আমরা তার কিছুই শুরু করতে পারি নি। অথচ আমাকে অনর্গল জবাবদিহি করতে হয়েছে ওর কাছে, ওর পরিবারের কাছে– আমি নাকি ওর সকল উন্নতির অন্তরায়, সকল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে! সবার সামনে এরকম মিথ্যে জেরার জবাব দিতে-দিতে সেদিন নিজের প্রতি ঘেন্না হয়েছিল– 'ইজ আ উইম্যান অবলাইজড্ টু সাবমিট টু সেক্স উইদ আ হাজবেন্ড হুম সি ডাজ নট লাভ এনি মোর? নীরা স্নানের দরজায় আওয়াজ শুনে মাথার ভেতর ভাঙা ভাঙা জবাব নিয়ে দরজা সামান্য ফাঁকা করে– দুধওয়ালা এসেছে টাকা নিতে। নীরা দ্রুত স্নান শেষ করার আয়োজন নিয়ে ভেজা কাপড় ফ্লোরে রেখেই বেরিয়ে আসে। মাথা চুইয়ে গলা-বুক স্নানের টপ-টপ জলে ভিজে আছে। দুধওয়ালা অসময়ে এসেছে, এজন্য বকুনি দিতে চাইল। কিন্তু হাসানের ফোন, শিশুর কান্না, দুধওয়ালার কানের তুলো থেকে ঝরে পড়া আতরের গন্ধ এবং ঝড়ো হাওয়া ঝগড়া করার দম অনেকখানি ম্লান করে দেয়। নীরা দেখলো, বড়লোক ভগ্নিপতী শ্বশুর মশাইয়ের সিঁড়িতে মাছ নামিয়ে মোটর গাড়িতে চড়ল। বাবার বাড়িতে রাত কাটাতেও এখন ভয় হয়। বোন-মা সবাই পারিবারিক আদালতের মতো প্রতিবার একটি অনুষ্ঠান রচনা করে– নিশ্চয় ফের যুদ্ধ করে, ঝগড়া করে, অসভ্যতা করে, পরিবারের মুখে চুনকালি ঘষে চুপ করে পালিয়ে এসেছিস? আমি কোপ করতে পারি না, আমি বশীকরণের পদ্ধতি জানি না, উত্তম ছলা-কলা জানি না, প্রিটেন্ড করতে পারি না– এসব শুনতে-শুনতে আমি ক্লান্ত ও ভীত! বুঝতে পারি– বাবার বাড়ি, মায়ের বাড়ি, বোনের বাড়ি– নিশ্চয় আমার জন্য সদা অপেক্ষায় থাকে না! তারপরেও বাবার ক্লান্ত মুখ আমার ভেতর জল ছড়ায়। বাবার হাত আমি স্পর্শ করি। বাবার কাঁধে নাক ঘঁষে দাঁড়াই। আর এই মিসফিট-কন্যা হয়ে ওঠার জন্য বাবার কাছে চুপচুপ ক্ষমা প্রার্থনা করি। নীরা চোখ মুছে পুরনো মলিন

বনসাই দেখে, আর ভাঙাচোরা মোম কুড়াতে থাকে যেন যখন-তখন লোড শেডিং শুরু হবে। দুধওয়ালা বেরিয়ে যেতে সাইকেল চালিয়ে যে টিউটর কৃষ্ণাদের পড়ায় তাকে ঢুকতে দেখলো। এই লোকটি গরম পড়লে গলা-বুক উদোম করে ওদের অঙ্ক শেখায়। লোকটির নাম সে মনে করতে পারল না। শিশুকে বুকে নিয়ে নীরা খানিকক্ষণ জাপ্টে দোল দেয়, শিশুর নাক-মুখ ঘষে এবং হাসি দেখার জন্য অপেক্ষা করে...। হাসানের ফিরতে দেরি হবে, ক্লিনিকের এমডি ছোট-বড় ম্যানেজারদের নিয়ে আজ মিটিংয়ে বসবে। নীরা দুপুরে খেতে খেতে কোনো এক পুরনো বিকেল-সন্ধ্যায় ফিরে যায়— মাস্টার মশাইয়ের মতো বুড়ো লোকটা ওর হাতে ভ্রমণ রেখা খুঁজতে খুজতে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কী কবিতা ভালোবাস? খুব চমকে ঘাবড়ে বলেছিলাম, আমি কবিতার প্রতি টান অনুভব করি। বলতে ইচ্ছে করেছিল, আমার ব্যক্তিগত কিছু অন্ধকার আছে, কিছু দ্বিধা, কিছু অসুবিধা। হয়তো সে কারণেই কথাগুলো বলা যায় নি। নতুন রাস্তা গ্যাস লাইনের জন্য হত্যা করে, মেয়র মহোদয় ইতোমধ্যে সৃজনশীল পানি-কাদায় জব-জবে করে তুলেছেন। মানুষ বৃষ্টিতে হেঁটে যাওয়ার মতো পা টিপে-টিপে হেঁটে চলেছে— রাস্তা খানিক বন্ধ, খানিক খোঁড়া, আর খানিকটা ভাঙা। এসব দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামছিল। শিশু দুধ খাওয়ার বায়নায় চিৎকার করছে। কঙ্কাদের বাড়িতে সেই মাস্টার সাইকেল রেখে ভেতরে যাচ্ছে। জাহাজের বাঁশির মতো শব্দ আসছে। খোলা ছাদে কেউ একা আধো-অন্ধকার গায়ে মেখে। নীরা অপেক্ষা করছিল, বাবার অফিসের লোকটি আসবে পুত্রকে সঙ্গ দেয়ার জন্য, খেলার বয়সী ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে। লোড শেডিং শেষ হওয়ার পর ডোরবেল বাজল। প্রথম হাসান এল, কাপড় ছেড়ে শিশুকে এক-দুবার আদর করে টেলিভিশনে ক্রিকেট দেখতে শুরু করল। পরে বাবার অফিসের সেই লোকটি এল বর্ণা নামের এক কিশোরীকে নিয়ে। বর্ণা ওদেরকে মামা-মামী সম্বোধন করার ঘোষণা দিয়ে শিশুকে কোলে করে তখন-ই এ ঘর ও ঘর দৌড়াতে থাকে। বর্ণা একবার লাল বল নেয়, একবার অনেকগুলো কৌটো নেয়, একবার পুরনো বাঁশিতে ফুঁ দেয় এবং জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার মতো শব্দ করে। হাসান কয়েকদিন কথা বলছিল না। কিন্তু জাহাজের শব্দে নীরার দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকায়। নীরা বর্ণাকে পরিশুদ্ধ করার আয়োজনে এ্যান্টিহেলমেনথিক দেয়— এই বড়িটা চুষে খাবি। বর্ণা বড়ি খেয়ে মুখ সামান্য বমি-বমি করে আবার নিবৃত্ত হয়। টর্চ ফেলে দেখে, ওর মাথার উঁকুন রাতের আঁধারে শান্ত হয়ে আছে। নীরা উঁকুননাশক তরল মাথায় ছড়িয়ে বর্ণাকে রাতে চুল বেঁধে ঘুমুতে বলে। অনেক রাতে হাসান শরীর নিয়ে কাছে আসে, বাধ্যতামূলক আদান-প্রদান হলে, ঘুম অনেক্ষণ দূরে হারিয়ে যায়...। নীরার ভয় হয়, উঁকুন-নাশকের বিষ গড়িয়ে ওর চোখ মুখে ঢুকে যায় নি তো? পা টিপেটিপে বর্ণার শোয়ার ঘরে আসে। বর্ণা মুখ হা করে ঘুমুচ্ছে। নীরা ওর মুখের কাছে হাত রেখে নিঃশ্বাসের

শব্দ খোঁজে। জানালা দিয়ে আলো এসে ওর চোখের ওপর। পর্দা টেনে সে একবার বর্ণাকে ডাকে, বর্ণা ঘুমের ভেতর, মা-মা আওয়াজ করে পাশ ফিরে ঘুমুলে নীরা স্বস্তি পায়। ঘুমের তৃষ্ণা হচ্ছে যেন, নীরা ঘুমের সঙ্গে ভাব করে; নতুন চুনকামের গন্ধ ভেসে আসছে, আর দুটি পাখি গান গাইছে দুঃখী গলায়। স্বপ্ন-স্বপ্ন গলায় কে যেন কথা বলে– তোমরা খেলা করছ? নীরা চোখ মেলে সকাল হওয়ার আয়োজন দেখে। হাসান ওয়াশ রুমে অথবা উবু হয়ে জুতার ফিতে বাঁধছে। নীরা অনেকদিন বাদে হাসানের সঙ্গে কথা বলে– আমার আজ অফিস শুরু হচ্ছে, ঋজু বর্ণার সঙ্গে থাকবে। সম্ভব হলে আগে এসো। উঁকুন-নাশক ধুয়ে বর্ণা খানিকটা তরতাজা হয়ে ঋজুকে সকালবেলার রোদ, শাদা বেড়াল, ট্রেনের লাইন, ভেজা পাতা এবং কঙ্কাদের ছাদ দেখাচ্ছিল। নীরা মাকে ফোন করে– পুত্রকে এক দু'বার যেন দেখে যায়, অথবা চাইলে আজ বর্ণাসহ তোমাদের ওখানে থাকতে পারে অফিস থেকে ফেরা পর্যন্ত। নীরা এবার ব্যাগের ভেতর ছাতা নিয়ে ভেঙে ফেলা রাস্তা টপকে দ্রুত অফিসমুখো হয়। অফিসে শুরুতেই দেরি করতে মন সাঁয় দেয় না। একতলা, দোতলা হয়ে তিন তলার শেষ মাথায় প্রকল্প অফিসের সন্ধান পেল। প্রদীপ'দা আগে থেকেই চিনতো। চায়ের জন্য কাউকে বললেন– তুমি বসো, ওয়ারেস ভাই এক্ষুণি পৌঁছাবেন,... কথা হয়েছে, উনি আটকে পড়েছেন ট্রাফিকে। নীরা চা খেতে খেতে অফিস দেখে, অফিসের সাজ-সজ্জা দেখে আর ঝুলে থাকা পোস্টার দেখে। বিশ্ব পানি দিবসের পোস্টারের ছবি যিনি তুলেছেন, নাম দেখে চিনতে পারল, পুঠিয়া রাজবাড়ি দেখার দিন আলাপ হয়েছিল। নীরা একবার উঠে এসে বারান্দা থেকে মাকে ফোন করে– মা ঋজু কী করছে, তোমাকে জ্বালাচ্ছে বুঝি! ফোনের ওপার থেকে মা নিশ্চয় বিরক্তি ছড়িয়ে কথা বলেন না। নীরা অল্প খুশির মতো মুখ করে আবার এসে বসে– প্রদীপ'দা আপনার এখানে বসে কাজের সমস্যা করছি না তো? আপনি বললে, ওয়েটিং রুমেও বসতে পারি। আরে না... কী যে বলো, তুমি এখানেই বসো। নীরা সহজ হওয়ার ভঙ্গিতে পেপার পড়ে অথবা টেবিলে অলস শুয়ে থাকা, গত বছরের এ্যানুয়াল রিপোর্টের উন্নয়নময় ছবি দেখতে-দেখতে চাকুরির নানান গোলক ধাঁধা খুঁজতে বসে। একটু পরেই পুরো অফিস চঞ্চল হয়ে ওঠে, ওয়ারেস ভাই এসেছেন। নীরাকে পরিচয় করিয়ে দেয় প্রদীপ দা। শ্বশ্রুমণ্ডিত, চশমাপরা, অপেক্ষাকৃত ধর্মপ্রাণ লোকটির সাথে কাজ নিয়ে কথা হয়– আমাদের তথ্য সব রেডি-ই আছে, আপনাকে একটা রিপোর্ট করে দিতে হবে। অর্থাৎ গ্রামবাংলায় আমাদের অবহেলিত দাইমায়েরা যা করছেন, তা একেবারেই আনডকুমেন্টেড। এঁরা যে এখনো হারিয়ে যান নি, আমরা সেইটিই গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই। নীরার সেলফোন নম্বর প্রদীপ দা'কে লিখে রাখার কথা বলে ওয়ারেস সাহেব দ্রুত ট্রেনিং মডিউলের খসড়া দেখতে শুরু করলেন– প্রদীপ দা ওর বসার জায়গা করে দিল; আর সময় বলে দিল, কবে রিপোর্ট

জমা দিতে হবে। নীরা দাই প্রশিক্ষণ পুস্তিকার ভূমিকা উল্টে দেখতে-দেখতে, প্রসবের সময় কি কি করবেন, এই অংশটুকু পড়তে শুরু করে। ডেস্কের ওই মাথায় কে যেন খুব জোরে কথা বলছিল, সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হওয়ার আয়োজনের মধ্যেই ডায়াবেটিস মোকাবেলার ব্যক্তিগত খাদ্যময় কৌটো আছড়ে ফেলে সারা মেঝে অর্গানিক মুড়িতে স্যাঁৎলে দেয়। মুড়ি তোলার জন্য কোনো ক্লিনার ছুটে আসে। লোকটি ডেস্ক ছেড়ে করিডোরে দাঁড়িয়ে, সামান্য নীচুগলায় কথা বলার আয়োজন নেয়। নীরা চোখ সরিয়ে দাই মায়েদের প্রশ্নোত্তর, আর ট্রেনিং ম্যানুয়ালের ডু'জ এ্যান্ড ডোন্টস আলাদা করে টেক্সট মার্কারের রঙ ঘষে– ... গজ দিয়ে এমন-ভাবে চেপে ধরতে হয় যেন বাচ্চার মাথা বার হওয়ার সময় মায়ের প্রসব দ্বার ক্ষত না হয়, ফুল জরায়ু থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত নাড়ি ধরে টানাটানি করবেন না, পেটের ওপর থেকে গর্ভের শিশুকে চাপ দেবেন না, জরায়ুর ভেতর অকারণে হাত দিবেন না ইত্যাদি। নীরা ভাবল, প্রদীপ'দা অথবা ওয়ারেস ভাইকে একবার জিজ্ঞেস করবে– গর্ভাবস্থায় দাইমায়েরা একসময় আমাদের দেশে কিছু কিছু লোকচিকিৎসার বন্দোবস্ত দিত, আমরা কী এসবের খানিকটা পরিচয় রিপোর্টে রাখবো? এক জায়গায় পড়লো: কয়েকজন দাইমা আতুড় ঘরে ঝাঁটার কাঠি, সরষে, ডুমুর এবং জুতোর চামড়া ঝুলিয়ে রাখতেন। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে, এই প্রশ্নটা পড়ে নীরা বেশ মজা অনুভব করে– শরীর সুন্দর হলে মেয়ে, ভেঙে গেলে ছেলে; অথবা স্তনের বোঁটা যদি কালো হয় তাহলে ছেলে, আর বাদামি হলে মেয়ে হবে! ছেলে হওয়া এবং মেয়ে হওয়া– এই দুই অভিজ্ঞতা নিয়ে নীরা মাথার ভেতর শব্দ, গল্প এবং কেচ্ছা তৈরি করলো খানিকক্ষণ। দুপুরের আজান হচ্ছে, ও ঘড়ি দেখলো, বেশ আগেই আজান, তাহলে কী এখানে আহলে হাদিস-এর মসজিদ? ডেস্ক থেকে কেউ উঠে যাচ্ছে। পায়ের গোড়ালির অনেকখানি ওপরে ট্রাউজার গুটিয়ে, অজু করে ফেরা মানুষগুলো দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে টুপটুপ। জরুরি ফাইলের সবুজ কালিতে অজুর পানি পড়ে একখণ্ড সবুজ জলরেখা তৈরি হয়েছে। টিস্যু চেপে মুছতে যেয়ে ফাইল আরো সবুজাভ হয়ে উঠছে– এই আয়োজন দেখতে-দেখতে নীরা ক্ষুধা অনুভব করে। পাশের ডেস্কের মেয়েটি বললো, চলুন আপা, লাঞ্চে যাই। অফিসের সেকেন্ড ফ্লোরে সবাই লাঞ্চ করে। মেয়েটির গ্রীবা থেকে গড়িয়ে পড়া উজ্জ্বল-মসৃণ আলো দেখতে-দেখতে, মনে হলো, মেয়েটি বুঝি কম কথার মানুষ। নিজের নাম বললো, তুমান। কিন্তু সিঁড়িতে হাঁটতে হাঁটতে, ব্যাগ থেকে কন্যার ছবি দেখতে-দেখতে দুজন বেশ খানিকটা ব্যক্তিগত গল্প-গাছায় জড়িয়ে যায়– নীরার সম্ভাব্য রাইট-আপ নিয়ে মজার গল্প করলো, অফিসের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে টিপস যোগাড় হলো, স্বামীদের অতি শব্দে ঢেকুর তোলার গল্প এলো, আর গল্পহলো স্বামী নামক কর্তামহাশয়ের বিবিধ সব সৃজনশীলতার জগত নিয়ে– ওয়াশ রুম কী বিশ্রি ভিজিয়ে রাখে, দুদিন

পর পর বালিশের ওয়াড় বদলানো, মুখ দিয়ে এতগুলো লালা, বাজার করতে পারে না একদম, ভুলভাল তরকারি কেনা, সারাক্ষাণ উদোম গায়ে ঠ্যাং চুলকানো, গ্রয়েনে এ্যান্টি ফাংগাস লাগানোর গোপন জারিজুরি, জোর করবে আর প্রতিবার 'প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশন' পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে, টেবিলের না পছন্দ তরকারি ছুঁড়ে ফেলবে, মুখে হ্যালিটোসিস, তাও স্কেলিং করবে না, ... আর শেষমেষ আলোচনা হলো বনসাইয়ে পানি দেয়া নিয়ে– টবের তলায় বেস প্লেটে আমি পানি রাখি আপা, ঐ জলই শেকড়ে ঢুকে পড়ে। তুমান বললো, বনসাই মেলা থেকে একবার শখ করে রঙ্গন আর বটের দুটো গাছ কিনেছিল; কিন্তু আমি ঠিক রক্ষা করতে পারি নি। খুব আহ্লাদে গাছ, আমার এজন্য ক্যাক্টাস পছন্দ, যত্ন-আত্তি কম হলেও চট করে মারা পড়ে না। নীরা একদিনেই অনেকখানি নৈকট্য অনুভব করে মেয়েটির। অফিস থেকে বেরুনোর মুহূর্তে সেলফোন নম্বর লিখতে চাইলে, মেয়েটি কার্ড বাড়িয়ে দেয়। নীরা বললো, আমার তো ভাই কার্ড নেই, কাগজে লিখে দিই। দেখলো একটু-একটু করে চারপাশে আলো কমে আসছে, নাকি উন্নয়নের উঁচু দালান এসে আলো জব্দ করে ফেলেছে। ঋজুর জন্য কিছু কিনবে ভাবছিল– এখন এই অসময়ের কমলা কী ভাল হবে? কমলার সবুজ-হলদে রঙ ছুঁয়ে এক মুহূর্তের জন্য সেলফোন অনুভব করতে চাইলো ব্যাগের ভেতর। নিশ্চিত হয়ে খানিকটা কালো আঙুর, ডালিম, টিব্যাগ, টিস্যুপেপার, দেয়াশলাই একবাক্স, তারপর আরো সব কী লাগবে ভুলে যেয়ে, স্ট্রিট লাইটের আলো কাঁধে-গলায় নিয়ে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে ঠিক ইচ্ছে করছে না, কিন্তু রিক্সা পাওয়া বেশ ভার। একটু চড়া দাম দিয়েই নীরা হাতের বাজারসহ রিক্সায় উঠে বসে। ইচ্ছে করে রিক্সাওয়ালাকে বলে, আপনি খুব আস্তে যাবেন, কেমন? মাকে বললো, রওনা হয়েছি। শিশু ঘুমিয়ে গেলেও, মায়েদের নিভু-নিভু চোখ সারাজীবন কেন এত সজাগ রাখতে হয়? অনেক ওপরে একটি উড়োজাহাজ এবং দু'একটি জ্বলে ওঠা তারা দেখছিল নীরা। কবে স্বর্গের সাপ এসে বলেছিল, জ্ঞানবৃক্ষ থেকে ফল খাও ! আমি সত্যিই সেই ফল খেতে চাই নি প্রভু, অন্য সবাই আমার চেয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠুক! নীরা হতে চেয়েছিল জ্ঞানশূন্য, চিন্তাহীন, মাটির গভীরে লুকানো জলধারার মতো অন্ধ, স্বাভাবিক ও অচিন। উপকূলের বালিরেখার মতো, কোনো ইচ্ছে-প্রতীজ্ঞা কিছুই অবশিষ্ট নেই, কেবল অপেক্ষা– কখন ঢেউ এসে চূর্ণ করে দিবে! মনে হলো গাছের ছায়ারা ঘুমুচ্ছে, আকাশের তারাও ঘুমুনোর আয়োজন করছে আর পুরো বিছানা বিপুল এক রাত্তির! নীরা দুটো স্বপ্ন দেখলো– ছোট্ট ঋজু হাতের ওপর ঘুমিয়ে, আর পছন্দের সেই অদ্ভুত মানুষটি ওর দিকে তাকিয়ে। অদ্ভুত মানুষটি ওর হাঁটার পথে পাতা এবং সৌরভ ছড়িয়েছিল ফুলের। অদ্ভুত মানুষটি ওকে মৃত্যুর পথে সহযোগী হওয়ার নেমন্তন্ন দিল। অদ্ভুত লোকটি বললো পাখি, সমুদ্র, পর্বত ও চাঁদ আসলে তোমার শরীরের গভীর ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। অদ্ভুত লোকটি বললো

তোমার শরীর হলো আমাদের জগৎ, আমাদের পৃথিবী, অথবা তুমি আদতে কিছুই নও, ... নীরা ইজ নাথিং বাট সারেন্ডার টু নেচার্স উইল।

সমর্পিত নীরা বালিশের ওপর গড়িয়ে পড়া মোমের দাগ নখে খুঁটতে খুঁটতে মেঘ, রোদ্দুর এবং খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের নিঃশ্বাস দেখার চেষ্টা নেয়। গৃহ-পরিচারিকা ওয়াশরুমে যায়, ও ঋজুকে আগলায়। ও ওয়াশরুমে যায়, গৃহপরি-চারিকা ঋজুকে সামলায়। ও খেতে বসে, মেইড বাচ্চা কোলে নিয়ে জলের ভেতর পা ডুবিয়ে আরাম নেয়। মেইড খেতে বসে, ও বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে পাহাড়-পাহাড় খেলে। বাচ্চা তীব্র কান্না করে, মেইড কোলে নিয়ে রাস্তার এমাথা-ওমাথা করে। বাচ্চার কান্না থামে না, নীরা তখন বাচ্চাকে নিয়ে ঘুম-ঘুম গান তৈরি করে ব্যক্তিগত সুরে। ঋজু বেড ওয়েটিং করে, মেইডের কাছে শিশুকে রেখে ও চাদর-ম্যাট্রেস বদলে দেয়। মেইডের ডিজমেনোরিয়া হয়, নীরা অফিস কামাই করে। নীরার ইউটিআই হয়, কিন্তু অফিস কামাই করতে পারে না, ওষুধ খেয়ে অফিসে যায়। মেইড বাড়ি যাওয়ার ছুটি নেয়, নীরা সারাদিন ঘর-বাড়ি সামলায়। নীরা চাকুরির বই খুলে বসে, ঋজু এসে বইয়ের ওপর মিলিটারি চেক পোস্ট হয়ে দাঁড়ায়। নীরা কিচেনে, অনর্গল ডোরবেল বাজে। নীরা দাইমায়ের ওপর লেখার প্রস্তুতি নেয়, প্রতিবেশী কেউ এসে চুলের ভেঙে পড়া অগ্রভাগ কাটার জন্য সিজারসহ আসে। নীরা পুরনো গানের এ্যালবাম খোঁজে, সদ্য ডিভোর্স হওয়ার বন্ধুর সেলফোন তখন বাজতে থাকে। নীরা কিচেনের সিংক পরিষ্কার করে, হাসান তক্ষণি ডিনার চাইছে। নীরা বিবাহ বার্ষিকীর পুরনো ফুল ওয়েস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে, খবর হয় চাকুরির ফর্ম তোলার তারিখ আজকেই শেষ হতে চলেছে। নীরা ঘন দুধের চা খাবে, ফ্রিজে দুধ নেই। নীরা বাড়ি-ওয়ালাকে নেমন্তন্ন দিবে, ঘাম ঝরিয়ে সারাদিন রান্না করে এবং টেবিলে মেনোপোজ ও ইমার্জেন্সি পিল নিয়ে গল্প করে। নীরা পছন্দের সেই বুড়ো মানুষটার সাথে একদিন হাঁটতে বেরুবে, তখন মেইড এসে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির নতুন দাবি তোলে কৌশলে। অনেক দিন বাদে এইসব হুজ্জত ভাবতে-ভাবতে আভেন, ওয়ার্ডরোব, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা সেরে ঋজুকে ঘুম পাড়িয়ে, হাসানের দলছুট মোজা জোড়ায়-জোড়ায় সাজিয়ে সজনে গাছ থেকে ঝরে পড়া বিন্দু বিন্দু ছায়া দেখছিল আর সজনে গাছ ঘেঁষে কাঁটা-মেহেদি এবং পাতাবাহারের হেজ এল চোখে। কঙ্কাদের বাড়িতে হলদে-সাদা রঙ্গন ফুটেছে, রাধাচূড়া চিনতে পারলো, আর সামান্য দূরে লঙ্কা জবা। বুড়ো লোকটা ওকে চিনিয়েছিল ব্লিডিং হার্ট–চ্যাপ্টা সাদার ভেতর গাঢ় লাল ফুল। নীরা গগনশিরীষ মাথায় নিয়ে দীর্ঘ উদ্যানের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে আরো নানান বৃক্ষ চিনতে-চিনতে সেদিন হঠাৎ মনে করেছিল– নীরা ইজ নাথিং বাট সারেন্ডার টু নেচার্স উইল। নীরার আবারো তাই মনে হচ্ছে– লতাপাতার সুঘ্রাণ ছিন্ন করে, মাথায় একই শব্দ দৌড়ে যাচ্ছে।... সমর্পণের গল্প-গাছা... সারেন্ডার টু নেচার্স

উইল! রক্তস্রোত কমানোর জন্য, যে দাইমা প্রসূতিকে জবা ফুল ভেজে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, তার লিখিত রিপোর্ট পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হচ্ছিল,... সূতিকা জ্বরের বর্ণনায় এসে খানিকটা থমকে দাঁড়ায়। চাকুরির প্রস্তুতি-গাইড বই পুত্রের কোমল হাতের আক্রমণে যথেষ্ট ধ্বস্ত হয়ে আছে। নীরা বইয়ের পৃষ্ঠা মসৃণ করতে-করতে, শিশুর ঘুমন্ত মুখ থেকে লালা সরিয়ে আবারো সৃজনশীল গৃহকর্মী হওয়ার পরীক্ষায় উচ্চনম্বর অর্জন করতে থাকে লাগাতার। আমাদের মুগ্ধতা বাড়ে: দেখা গেল, নীরা কদাচিৎ মুখ ভার করে। নিকট আত্মীয়দের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জন্মদিনে প্রকাশিত নিউজপেপার জমা রেখে কখনো নিকটবর্তী বার্থডেতে কাগজটি আত্মীয়-কূলের হাতে দিয়ে আসে, যেন তারা জন্মমুহূর্তের পুরনো পৃথিবীকে চাক্ষুষ করতে পারে। নীরা গিফ্‌ট-র‍্যাপ কেনার সময় অল-অকেশন প্রিন্ট খুঁজে বার করে। ব্যাগে ছোট্ট ম্যাগনিফায়িং গ্লাস রাখে, যেন রিডিং গ্লাস ভুলে গেলেও, সপিং'এর সময় লেবেল ও দাম পড়তে কষ্ট না হয়। নীরা অতিথিদের জন্য একটি নোটবই রাখে— কঙ্কা টমেটো পছন্দ করে না, শহীদুল ভাই একেবারে ঝাল ছাড়া, হাসনাত চাচা রাতে রুটি-সব্জি, হিয়ার ডায়েবেটিক,... নো সুগার; যেন পরবর্তীতে আগেই প্রস্তুত থাকা যায়, আর অপছন্দের মিলগুলো রিপিট না হয়। নীরা গেস্ট বাথরুমে অনেকগুলো টয়লেট্রিজ আইটেম নিয়ম করে সাজিয়ে রাখে, আইরনের সময় হাসানের বোতাম খুলে গেলে, তক্ষণি জুড়তে বসে সুতো দিয়ে। বাড়ির লকারের এক্সট্রা চাবি অন্যত্র রাখে, যেন বিপদ হলে খুঁজে পাওয়া যায়। চা খেয়ে চায়ের গুড়ো, টিব্যাগ ফার্ন-এর গোড়ায় দেয়। কাঁচির ধার কমলে কখনো সে শিরিষ কাগজ কেটে-কেটে কাঁচির মুখ ধারালো করে। বোতাম ছিঁড়ে পড়ার অত্যাচার সামলানোর জন্য অনেকবার সে ডেন্টালফ্লসের সুতো ব্যবহার করে। হাসানের সুয়েড জুতো পরিষ্কারের জন্য আলাদা সুয়েড-ব্রাশ হাতের কাছে রাখে। সোয়েটারগুলো হ্যাঙ্গারে না রেখে, ও রাখে ড্রয়ারে এবং সেল্ফে যেন সোয়েটারগুলো অতিকায় ঢিলেঢালা না হয়ে পড়ে। তিনটি আলাদা বাক্সে, ও ঋজুর জন্য নিয়ম করে খেলনা রাখে, যেন শিশু একঘেঁয়েমিতে না পড়ে। মোজা, টিশার্ট এবং জামার ছবি আঠা দিয়ে ও ড্রয়ারে সাঁটে, যেন সবাই দ্রুত প্রয়োজনীয় কাপড়-জামা খুঁজে পায়। প্রত্যেক রুমের পাশে ও লন্ড্রি বাস্কেট রাখে। ফ্রিজ কখনো বন্ধ রেখে সারাদিন ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে। দমকল, পুলিশ স্টেশন এবং বারবার ব্যবহৃত ফোন নম্বরগুলো ও হাতের কাছে রাখে। বাড়ির গ্যাজেট মেরামতের দোকান এবং টেকনিশিয়ানগুলোর নাম-ঠিকানার জন্য আলাদা ফোন-বুক করে। দ্রুত মাফিন তৈরির রেসিপি লিখে রাখে। ফ্রিজ ডিওডোরাইজ'এর জন্য নিয়ম করে বেকিং সোডা রাখে। আর এরপরেও সারাদিন ঘরের খাদ্য, তেলছাড়া রান্নার রেসিপি, ঘর গোছানো, ঘরের কাপড়-জামা, পোষা বেড়াল, হাউস প্লান্ট এবং এক-জন ব্যস্ত কন্যার বেঁচে থাকার রকমফের নিয়ে বিবিধ ভাবনায় ডুবে যেতে থাকে নীরা

বাধ্যতামূলক! ভাবনারা ঘর-সংসারের জল-হাওয়ায় চনমনে হয়; নীরা কঙ্কাদের ছাদ থেকে কাপড় উড়ে বেড়ানোর ছবি দেখে, যষ্ঠিমধুর একটুকরো ডাল মুখে নিয়ে বয়স্ক লোকটির কথা ভাবে– বয়সের এত তফাৎ হওয়ার পরেও আমরা এতকথা বলার, পথ হাঁটার সুযোগ নিয়েছিলাম কেন? সব কি নিছক মুগ্ধতা, বন্ধুত্ব, উত্তেজনা– ঠিক গুছিয়ে আমি ভাবতে পারি না! বিষয়গুলো ওকে এত নাছোড় করে কেন? এমন কী কোনো ঘটনা কখনো ঘটেছিল? বাড়ি পালিয়ে আকাশ, সমুদ্র, পর্বত, পাখি, ঘর-বাড়ি, পুরনো টেরাকোটার মাকড়সা দেখতে-দেখতে রাতে লোকটি অথবা মেয়েটি মৃত্যুবরণ করে এক প্রাচীন রেস্টহাউসে; তারপর বিস্তর কাহিনী তৈরি হয় ঘরে-বাইরে! কে জানে, হয়তো একজন মানুষ সম্পর্কে আমরা বেশিরভাগ খবর পাই গসিপ থেকে! গসিপ আমাদের আমুদে করে, বিনোদন যোগায়, আর লোকটির গোপন আচরণগুলো চাউর করে দেয়। নীরা ভাবে– অচেনা একজন মানুষ কী করে আচমকা যুক্ত হয় আমাদের মাঝে! মিউচুয়াল গেজ– এই কথাটি মনে করলো একবার; চাউনি থেকে লোকটির হয়তো একধরনের সঙ্কেত ঝরে পড়েছিল, হয়তো আমার নিজেরও– মৃদু উষ্ণতা অথবা বলা চলে, পরস্পর আমরা মনোযোগী হয়ে উঠছিলাম। আমাদের সংকোচ হচ্ছিল এবং আমরা একসময় লোনলি হতে-হতে যোগাযোগের দক্ষতা তৈরি করি। একটা সময় আমি যোগাযোগের ফলাফল চিন্তা করে ভীত হয়ে সংযোগ এড়িয়ে গেছি, একটা সময় ডিনাই করে গেছি সমস্ত সম্পর্ক তৈরির উপায়কে; কিন্তু ডুবসাঁতারের এই বিপজ্জনক খেলা আমাকে নিমজ্জিত করে শেষ পর্যন্ত। বড় হতে-হতে, বুড়ো হতে-হতে কত রকম মানুষের সাথে দেখা হয়, বন্ধুত্ব হয়, ভালোবাসা হয় আবার বিযুক্তিও আসে– তুমি চাইলে কথাগুলো আমি বুঝিয়ে বলতে পারি: একদল মানুষ দেখবে নিছক শারীরিক অবয়ব এবং সৌন্দর্য নিয়ে মুগ্ধ হয়; পার্টনারের ওজন, ভাঙা নাক, উঁচু-নীচু দাঁত, থ্যাবড়ানো পা– এসব তার চোখের বিষ। কিছু মানুষের কাছে ভালোবাসার ব্যাপারটি নিছক খেলা, খুব ফ্লার্ট করে, তারপর মজা ফুরিয়ে গেলে দ্রুত অন্যত্র যুক্ত হয়। কেউ যুক্ত থাকে অদ্ভুত এক বন্ধুত্বময় ভালোবাসায়, প্যাসান কম, বহুদিন যোগাযোগ নেই, কিন্তু সম্পর্ক বিপদগ্রস্থ হয় না কখনো। এক জাতের মানুষ আছেন, ভালোবাসাটা তাদের কাছে সপিং-লিস্টের মতো; পরস্পরের ধর্ম, বিশ্বাস, পছন্দ, ক্যারিয়ার ইত্যাদি সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ, বলা যায় দে আর রিলেটিভলি আনরোমান্টিক। আর একদল ভালোবাসার মানুষ আছে, এরা পজেসিভ, সবসময় উদ্বিগ্ন থাকে এবং খুব নির্ভর করতে থাকে, অপরপক্ষের সামান্য অমনোযোগিতা পেলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা এলোমেলো আচরণ করে বসে। আর শেষের দলে, একেবারেই সেল্ফলেস লাভ, গান্ধী-বুদ্ধ-জেসাসের মতো– পার্টনার অন্যত্র যুক্ত হয়েও যদি সন্তান ধারণ করে, এরা নিজের সন্তানবিবেচনা করেই তাকে পরিচর্যা করতে শুরু করবে। আমি জানিনা, মানুষ,

আমার মতো নিছক সাধারণ মানুষ এত সেল্ফলেস হতে পারে কিনা, ... হয়তো পারে, কিন্তু, খুব স্বল্প সময়ের জন্য... ফর ভেরি ব্রিফ এপিসোড! আমি স্বীকার করি – আমার খুব হিংসে হয়, অথবা নিছক ভয়, ... কোনোভাবেই ভালোবাসার মানুষকে হারাতে ইচ্ছে করে না; অনেক দিন আগে আমি এবং আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, অথবা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হয়েছিল– তুমি কী আমাকে পছন্দ কর, আমাকে কী যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হয় নি, ওর কাঁধে হাত দিয়ে হ্যাঁ-না বলতে বলেছিলাম, অথবা সেদিন ইচ্ছে করেই কথা বলি নি। দীর্ঘ সময় নীরবতার পর বললাম, আমি যাচ্ছি। আসলে চেয়েছিলাম ও আমাকে বাধা দিক। হয়তো অন্য কোনোদিন পছন্দের খাবার, গান এবং ঘর-বাড়ি নিয়ে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের বাড়ি এখান থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার, ও আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বলেছিল, তুমি মুভিতে যাবে? আমি রাজি হয়ে যাই। সিনেমা হলে ঢুকে বললাম, আমি বাড়ি যাব। আসলে আমি বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছিলাম না। দেখতে চাইছিলাম, আমাকে নিয়ে ও কতদূর যেতে পারে, সেদিন আমি হয়তো বলেছিলাম– তুমি কী অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছ? হয়তো সে তোমাকে, অথবা তুমি আমার আড়ালে তাকে আরেকটু বেশি পছন্দ কর! আমি ওর কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়াই, ও কী সত্যিই আরো নিকট-বর্তী হতে চাইছে? আমি আরো কাছে এসে বসি। ও দূরে যায় না। আমি একদিন অফিস ছুটির পর অনেক্ষণ অপেক্ষা করি, ও ওয়াশরুম থেকে বেরুলে, গাড়ির ভেতর থেকে, ওর ব্যাগপত্র বের করতে আমি সাহায্য করলাম। আমি চাইছিলাম ও আমাকে ডেট-এর জন্য বলবে। আমি অনেক্ষণ ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর হেঁটে-হেঁটে আমরা কোথাও ওর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বন্ধুদের ওর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম; ভাবলাম বন্ধুরা নিশ্চয় ওকে আমার সম্পর্কে বলবে, তখন ও যদি ফিরে আসে আমি বুঝব ও আমাকে পছন্দ করে। অথবা আমি ওখানে ওর অনুপস্থিতির সময় অন্য কাউকে আমার পছন্দের কথা বলি; ধারণা করি, নিশ্চয়ই ওর কাছে আমার খবর পৌঁছে যাবে; ও যদি আমাকে ইগনোর করে, বুঝব ও আমার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নয়, নাকি ঘটনা অন্য কিছু ঘটেছিল? বন্ধুদের ওখানে, অন্য একজন ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি আকর্ষণীয়, ওর সঙ্গে আমি খানিকটা কথাবার্তা বলে সরে যাই, ... পরে কাউকে জিজ্ঞেস করি– ও কী আমার সম্বন্ধে কিছু বললো?

নীরা এসব ভাবছিল, আর সম্পর্ক তৈরির রকমারি পদ্ধতি নিয়ে টেলিভিশনের বিদ্যা দেখছিল এই সাতসকালে। হঠাৎ মনে হলো, গত কয়েকদিন লেবু-পানি খাওয়া পড়ে নি, নাকের ভেতর কেমন জ্বালা, একঘেঁয়ে একটি সুর ভেসে আসছে। আপনি কেমন আছেন? এখন কী করছেন? নীরা হলুদ জানালা দিয়ে হলুদ গাছের নীচে হলুদ পানির খাল দেখতে পাচ্ছিল। দেখতে পাচ্ছিল একজন হলুদ মানুষকে, বলদ দিয়ে হলুদ জমিতে চাষ করছে, হলুদ মানুষটি হলুদ রুটি খেতে শুরু করলে ওর চোখে হলুদ

সূর্য এসে পড়ল, আর লোকটি হয়ে উঠল জীবন্ত আয়না– আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। নীরা রোদের ছাঁট কমানোর জন্য পর্দা টানে, টেলিভিশন ততক্ষণ আবারো খুলে বসেছে, নতুন এক্সারসাইজ খাতা। আমরা এবার সম্পর্ক নির্মাণের পথ দেখতে দেখতে টেলিভিশনের স্বর অনেকখানি বাড়িয়ে দিই: ... যার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব, ভাবুন লোকটিকে কেন পছন্দ করেছিলেন, আর শুরুটা হলো কিভাবে? এই লোকটি অন্যদের থেকে আলাদা হলো কোন প্রেক্ষিতে? আপনার বন্ধুলোকটিকে পছন্দ করার সাতটি কারণ চটপট লিখে ফেলুন; তিনটি কারণ লিখুন ওকে অপছন্দ করার, সাতটি নিয়ে ভাবুন, যেগুলো নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা যায়; তিনটি বিষয়, অন্যদের সঙ্গে বলা গেলেও বেশি জমে এই বন্ধুটির সঙ্গে। এবার ভাবুন উল্টো দিক থেকে; লোকটিকে দেখছেন কিন্তু কখনো কথা হয় নি, এরকম একজন মানুষের দোষ-গুণ খুঁজে বার করুন... !

নীরা 'দোষ-গুণ'– এই কথাটি এক-দুবার মাথায় নিয়ে কোথাও মৃদু আঁধার জমে ওঠার আয়োজন অনুভব করল। খুব ভারি–শূন্যতার কাপড়-জামা পরে সেই অদ্ভুত পছন্দের লোকটিকে সে আবার অনুভব করতে পারছে, লোকটি কী বেঁচে আছে? দেখা না হলেও, ভাবতে ইচ্ছে করে, লোকটি নিশ্চয় কোথাও দেখা হওয়ার অপেক্ষায়। নীরা ভাবল– লোকটির চোখের ভেতর একদিন সূর্য হেসেছিল; যদিও সব কথা বোঝা যায় নি, কিন্তু মনে হয়েছিল, মস্তিষ্কের কোথাও যেন একখণ্ড হাসি বিস্তৃত হচ্ছে, রাতের হিম কুয়াশার মতো আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম। বারবার বলেছিলাম, আমার পা, তুমি আছড়ে পড়ো না। সারা শহর জুড়ে এতো কেয়োস, আর আমরা হাঁটছিলাম রিদম ছড়িয়ে। বুড়ো লোকটির সুঘ্রাণ স্পর্শ করতে-করতে আমি ঢোলকলমি পাতার ওপর পোকা হেঁটে যাওয়া দেখি। পাতার আড়াল থেকে আমরা পাঁচগ্রাম ওজনের একটি পরিযায়ী পাখি উদ্ধার করি– কয়েক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। পাখিটির পায়ে একটি আংটি পাওয়া গেল, আমরা নম্বর পড়লাম। আমরা দূরবিন, টেলিস্কোপ, ট্রাইপড এবং জিপিএস নিয়ে তাঁবুর ভেতর গল্প করি। তাঁবুর ভেতর আমরা গয়ার, তিলাঘুঘু, ধুমকল এবং ধনেশ নিয়ে কথা বলতে-বলতে লাঞ্চ করি। আমরা ভেজা আল ধরে হেঁটে-হেঁটে নল ও হোগলা দেখার ফাঁকে পা পিছলে আবার পরস্পরের জামা ধরে সটান দাঁড়াই। আর ঘুঘুর মতো কমপক্ষে ৮৮ বছর বেঁচে থাকার স্বপ্ন আঁকি। পুরুষ ও স্ত্রী কোকিল নিয়ে তখন গল্প খোঁজার ঝোঁক আসে, পাখি সংরক্ষণ নিয়ে আমরা মনে-মনে প্রবন্ধের খসড়া করি। বইয়ের পৃষ্ঠায় ধনেশ পাখি এবং সালীম আলীর স্ত্রী তেহমিনার ছবি ভেসে আছে। তখন তীব্র ঝিঁঝির আওয়াজ হয় অথবা আওয়াজ আসে ঘুঘুর মতো। একঘেয়ে শব্দ করতে-করতে ঘুঘু দম্পতি অনুরাগ প্রকাশ করছে। লোকটি অন্য এক পাখির কথা বলে, তক্ষণি নামটি ভুলে যাই, এদের পুরুষ পাখি ঠোঁট দিয়ে সঙ্গিনীর

পালক পরিপাটি করে দেয়।

নীরা যেনবা শরীরে পালক ঘঁষে যাওয়া স্পর্শের ছায়া-আলো অনুভব করে। অনুভব করে– স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসছে। চারপাশে কেমন জ্বর-জ্বর অসুখ। মুখের ভেতর পুরনো ফ্লানেলের স্বাদ এবং মস্তিষ্কে পোড়া রাবারের গন্ধ। অনুভব হয় একখণ্ড শিলাখণ্ড, একটি ভগ্ন হৃদয়, কপালজুড়ে তীব্র চাপ, আর গোপন এক নীরবতা– টলমল ভাসমান নৌকার মতো, পরিযায়ী পাখির মতো, সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে তীব্র লাভার মতো, অথবা একখণ্ড মেঘের মতো– অধরা, অচেনা, কিন্তু তীব্র কর্তৃত্বময়, কেবলই ধরাশায়ী করছে। নীরা ওর শরীরকে এবার জাগ্রত করতে-করতে গার্হস্থ্য কর্মের জন্য একবার বসার ঘরে যায়, একবার হাসানের লাঞ্চ প্রস্তুত করে, আর ঋজুকে বর্ণার কোলে দিয়ে অফিসে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। হাসান ঋজুকে আদর করার ছলে, নীরার গ্রীবা ছুঁয়ে দেয়। নীরা বাইরের রোদ দেখতে-দেখতে খুব ক্লান্ত চোখে হাসানকে পরখ করে। সকালের স্বচ্ছতা সে বাতাস এবং রোদ্দুরের ভেতর আঁচ করতে পারছিল। ডাইনিংস্পেসে আলো থাকার জন্য দেয়ালে ছায়া ভেসে আছে ঋজুর। ঋজুর ছায়া দুলে উঠছে, ওর সামান্য পুড়ে যাওয়া হাতের ওপর। জানালার কাঁচে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি, তারপর আবার আলো ঝিঁকিয়ে ওঠে। গাছের ভেতর লুকোনো পাখির শরীর থেকে গান ভেসে আসছে অনেক্ষণ। নীরা মনযোগী হতে চাইছিল– কিন্তু ভেতরের কেউ তাকে প্রশ্ন করার গলায় কথা বলে; আমাদের শরীর, আমাদের অবয়ব এবং আমাদের ওপর অর্পিত শর্তাবলি আমাদের সঙ্গে নতুন খেলায় মেতে উঠছে; আমরা কী ক্লান্ত? তাহলে তোমাকে রাখব কোথায়? ক্লান্ত হওয়ার অর্থ বিদায় নেয়া। বরঞ্চ আসুন, আমরা সকল দম্পতিবৃন্দ অন্য এক নতুন খেলা খেলতে শুরু করি, যেন সবাই বুঝতে পারে, আমরা ভালো নই, মন্দও নই, কিন্তু আমরা সুখী, সবাইকে নিয়ে ... উই আর হ্যাপি! আমরা আমাদের ভেতরের শূন্যতা পাঠ করতে পারি, কিন্তু সহসা যে দরজাটা বনের দিকে, সেই দরজাটি খুলতে ভয় পাই। হয়তো দরজার শীতলতা আমাদের স্পর্শ করে, হয়তো দরজার তালায় আমাদের হাতের ছাপ পড়ে। কত মানুষকে পছন্দ করেছি, কিন্তু সবাই এত মুখ ঘুরিয়ে রাখে যে, কথা বলতে পারি নি তক্ষণি। আমাদের প্রতিবেশীরা ছিল এ্যালার্জি আক্রান্ত, ওবেস, দাঁত শূন্য, খোঁড়া, তিনবার ডিভোর্সড, লেফ্ট-হ্যানডেড এবং লালচুলের। আমি কী আমার পুত্রকে, হঠাৎ এত শান্ত থাকার জন্য পুরস্কৃত করব? নীরা বাতাসে উড়ে বেড়ানো বনসাইয়ের নীল-সবুজ পাতা এবং মাশরুমের গুড়ো দেখছিল। নীরা আশাবাদী হতে চাইছিল– বর্ণা অনেকটা সময় মিসিং থাকার পর এক্ষণি হয়তো ফিরবে, ঋজুকে সোফাতে বসিয়ে ও নিশ্চয় ওয়াশরুমে, অথবা খেলার সরঞ্জাম আনতে গেছে কঙ্কাদের বাগানে। ও ভাবল, প্রিয় দৃশ্যাবলির মতো বর্ণা এক্ষণি উপস্থিত হবে। ও ভাবল এমন একটি দৃশ্য চকিতে

ঘটবে, যা কখনো ঘটে নি– মাংস বিঁধে যাওয়ার মতো দ্রুততায় বর্ণা হাঁপাতে হাঁপাতে হয়তো ফিরে আসবে, তারপর ঋজুকে কোলে নিয়ে খিল খিল হেসে উঠবে। আমাদের সামান্য সময় বা দীর্ঘসময় পর্যন্ত যে অপেক্ষার স্রোত তৈরি হয়েছিল, তা সবাই নিশ্চয় বিস্মৃত হবে। কালো নাম না জানা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা অফিসের কাপড়জামা পরে অপেক্ষা করছি বর্ণা নামক বেবিসিটার-এর জন্য, সকালের খানিক পর থেকেই ওকে আমারা খুঁজে পাচ্ছি না। বর্ণার সেই বয়স, যে বয়সে পাথরের গল্প শুনতে শুনতে মনে হয় পাথরের শরীর জুড়ে নীল চোখ। বর্ণা খেলা করে কল্পনা, স্বপ্ন এবং দায়িত্বহীনতা নিয়ে। ঋজুকে কোলে নিয়ে ও মনে-মনে আকাশ হয়, পক্ষী হয়, রেলগাড়ি হয় এবং লাফ দিয়ে দিয়ে ক্যাম্পাসের ওদিকটার যেখানে মাটির গুণে অতিশয় ক্ষুদ্রকায় কমলা ঝুলে থাকে, তা স্পর্শ করার খেলায় মগ্ন হয়। বর্ণা গৃহকর্ত্রীর প্রসাধনী গোপনে সরিয়ে রাখে, সেলফোন বাজিয়ে গান শোনে, আর লুকিয়ে অনেকগুলো খাবার খেয়ে মুখ মোছার জন্য আড়াল নেয়। গাছের ভেতর, পাতার সবুজে পা ডুবিয়ে তারপরেই কী ও নিখোঁজ হয়? ও কী হোম-সিক হয়েছিল? নাকি বেতন বৃদ্ধির প্রকল্প হিসেবে মা ওকে এক-দুবেলা নিখোঁজ হওয়ার প্রণোদনা ছড়িয়েছিল? প্রথমবার নিখোঁজ হওয়ার পর, বাবা এবং নীরা থানা-পুলিশ করেছিল; পুলিশের লোকটি, কেন গৃহ-পরিচারিকার ছবি-ঠিকানা সঠিকভাবে লিখে রাখি নি, এ নিয়ে মৃদু ধমক দিয়েছিল। উড়ো ফোন আসছিল– যদিবা মেয়েটি উ'মেন ট্রাফিকিংয়ের কবলে পড়ে, তার সমস্ত দায়ভার আপনাদের! নীরার ক্রোধ হয়েছিল, মন খারাপ হয়েছিল, কান্নার মতো হয়ে তারপর খুব অবসন্ন বোধ করেছিল। ঋজুকে সারাদিন আদর করতে ইচ্ছে হয় নি, কান্নায়-কান্নায় ও কঙ্কাদের বাড়িতেই ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

দুদিন বাদে সবাইকে অবাক করে বর্ণা ওর মায়ের হাত ধরে যখন ফিরল, তখন কেবল সন্ধ্যার আলো জ্বলছে এঘর-ওঘর। নীরা প্রথমে ভাবল– কোনো কথাই সে বলবে না; যেন কিছুই সে দেখে নি, এই ভঙ্গিতে ঋজুর জুতো মুছতে-মুছতে পানির গ্লাসটা টেবিলের কিনার থেকে সরিয়ে রাখে। বর্ণা মাথা নীচু করে, সামান্য চোখ তুলে তাকায়– তারপর মা-মেয়ে একত্রে কথা বলার চেষ্টা নেয়, ... মামী ভুল হয়ে গেছে, ... আসলে গিয়েছিল মনসামঙ্গল গান শোনার জন্য। বুঝতে পারছিল নীরা, ওর বুকের ভেতর ক্রোধের মৃদু ঝড়-বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পুজো, পুজোর আয়োজন, দেবীর হাতে সাপ, পদ্মফুল, মনসামন্দিরের দরজার ছিদ্র, সেবাইতের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া– এসবের ধারাবাহিক উত্তেজক বর্ণনা কিছুই ক্রিয়া করছিল না মাথায়। এদের সম্মিলিত গলার স্বরে ঋজু ততক্ষণে চোখ খুলে ঠোঁটের কোণে মৃদু লালা এবং দুধ নিয়ে সামান্য হেসে তাকালে, বর্ণা সহজ হওয়ার সাহস পায়। নীরা তাচ্ছিল্যের স্বরে ডাকে– যা হাত-পা ধুয়ে আয়, ... মাথায় ফের উকুঁন নিয়ে এসেছিস তো? ও মাথা

নাড়ায়। বর্ণার মা গলার স্বর নামিয়ে নীরাকে ডাকে– কাজে মনযোগী হওয়ার জন্য, চিন্তা করবেননা দিদি, এবার আমি মন্ত্রপড়া তেল এনেছি! কলপাড়ে হাত-পা ধুয়ে, বর্ণার মা ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে খোঁট থেকে তেল এবং অন্য এক পলিপ্যাক থেকে লঙ্কা-গোলমরিচ বের করে। বর্ণা মাথা নীচু করলে ওর মা ধূপের ধোঁয়ায় ডুবে যেতে-যেতে এক-দুবার শাঁখ বাজিয়ে, পুরো তেল উবুড় করে ধরে বর্ণার মাথায়, যেন ওর কাজে মতি হয় এবং কদাচিৎ পলাতক হয়। বর্ণা লঙ্কার ঘ্রাণ নিয়ে গোলমরিচের অর্ধেক মুখে পুরে কর্মযজ্ঞের ধ্যান মগ্নতা নিয়ে আবার গৃহপ্রবেশ করে। ঘরের ভেতর বর্ণা ঋজুকে কোলে নিয়ে হাঁটে, পিছলে পড়ার ভান করে, ঋজুকে ভয় দেখায়, টেলিভিশনে ভয়ারিজম শেখে, আর আবারো পলাতক হওয়ার জন্য বুকের ভেতর গোপন সাহস জমা করতে থাকে। অথবা মন এবং আত্মা ওর আরো বহুদূর দৌড়ে চলে: চাল-চিড়ে, কলাইভাজা মিলিয়ে তৈরি পুজোর নৈবেদ্যের জন্য জিভে জল আসে। মন্দিরের সামনে নাচ-গান দেখে। শিবের স্নান দেখে। চরণামৃত খায়। মিস্ত্রি বাড়ি যায়। পদ্মফুলের মালা গাঁথে। ঢাক বেজে ওঠে। কোন্ পুজোয় যেন, অবিবাহিত মেয়ের যাওয়া নিষেধ, তা ভাবলো একবার, তারপর ভাবনাগুলো আরো ছড়িয়ে সুজি-লুচির ভোগে আটকে পড়ে। কোথা থেকে তখন ফুল ঝরে পড়ে, টিনের চালে ঝুপঝুপ বাতাসার শব্দ। গোঁ-গোঁ শব্দে শুয়োরের চিৎকার। প্রাচীন গাছের নীচে ত্রিশূল, কাঠের খড়ম, ধুতরা, আকন্দ, জলভরা ঘটি, গোলা সিঁদুর এবং পুজোর ফুল মাদুলির মতো বেঁধে দেয়া হযেছে গাই গরুর গলায়, নাকি ফুল ঝুলে আছে গোয়ালে?

বর্ণা ঘুম-ঘুম চোখে, এসব দেখতে-দেখতে স্বপ্ন তৈরি করে; রেলবগিতে চড়ে, জানালার কাঁচে শাকচুন্নি দেখে, শূন্য বাড়িতে হাসানের রকিং চেয়ারে বসে, খাবার ঘরের টেবিল অবিন্যস্ত করে। দেয়ালঘড়ির শব্দ শোনে, ঋজুকে আদর করে, ঋজুর চুল আঁচড়ে দেয়, পরিত্যক্ত আঙুর ফলে হাত ঘষে, আয়নার সামনে উলঙ্গ হয়, অর্ধ -নগ্ন হয়, হাত দিয়ে গলা বুক দেখে, কামিজের নীচে পা দেখে, স্তন ছুঁয়ে চুম্বনের মতো মুখ করে, বিষণ্ন হওয়ার ভান করে, বাতাস খায়, ফুলের পাঁপড়ি বাতাসে ছড়ায়, চোখে আলতো জল ছড়ায়, হাসানের প্যান্ট পরে, আহত জুতোর ইলাস্টিকে হাত ঘষে, ফরফর শব্দে ফ্যানের দিকে কাগজ ছুঁড়ে দেয়, নীরার গলা নকল করে, কারুর প্রেমে পড়ে, সবুজ গাছপালা দেখে, ঋজুর ভেজা কাপড় ছাদে মেলে দেয়, লুকিয়ে নীরার ন্যাপকিন কোমরে বাঁধে, পায়ে একা একা সুড়সুড়ি দেয়, চামচ নেড়েনেড়ে গান গায়, ঋজুকে কান্না করানোর জন্য চিমটি দেয়, কান্না থামানোর গান রচনা করে, ফ্রিজ খুলে চার-পাঁচ রকমের তরকারি নখ দিয়ে খুবলে খায়, দূরে গির্জার শব্দ শোনে, গরিব রাজকন্যার মতো মুখ করে হাসিখুশি হওয়ার রিহার্সেল করে ... তারপর হঠাৎ যখন মনে হলো জীবন এক ভোজসভা, তখন সে আবার বোকার মতো, পাগলের মতো, নিজেকে গৌরবান্বিত করার জন্য দ্বিতীয়বার নিখোঁজ হয়ে

যায়।

হাসানকে বর্ণার পলায়নকাহিনী সংক্ষেপে জানিয়ে নীরা বলে– তোমার সময় হবে? ওদের বাড়িতে যেয়ে আজকেই এর একটা বিহিত করতে হবে। হাসান অফিসের কাজ এবং জঞ্জাল নিয়ে মৃদু বক্তৃতা করে। নীরা ফোন রেখে এবার থানা-পুলিশ না করে বর্ণার এক চর্মকার-মেসো মশাইয়ের সঙ্গে সেলফোনে কথা বলে। বড় হাসপাতালের পেছনের রাস্তা সহজেই চিনতে পারল। পুকুর বা হাতে রেখে, আকন্দের ঝোঁপ ছুঁয়ে লেপরোসি হাসপাতালের সামনে দিয়ে বর্ণাদের বাড়িতে পৌঁছায়। সার-সার ঘর, দমবন্ধ টক গন্ধ এবং ভেজা ধোঁয়া উঠে আসছে। উঠোনে ভেজাকাপড় থেকে জল ঝরছে এবং সেই জল ঘাড়ে-পিঠে নিয়ে দু-চারটি শুয়োর ছানা চনমন করছে। নীরা শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজে ভয় পেয়ে বমির মতো মুখ করে এক পাশে লাফ দিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের টিনের ওপর দেখল পুঁইপাতা, ভেজা চামড়া, শুকনা মরিচ, শিশুর পেচ্ছাবের কাঁথা, মাসিকের ন্যাতা এবং পুরনো আচারের শিসি। নীরা শুনল ঠিকই বর্ণা এসে পৌঁছেছে, কিন্তু সামনে আসবে না। ওর মায়ের খোঁজ করল, মা গেছে 'মডার্ন জননী ক্লিনিক'-এ ক্লিনারের কাজ সারতে। উঠোনে ততক্ষণে বড় জটলা শুরু হয়েছে, বর্ণার এ মাসের অর্ধেক বেতন দিতে হবে– এ রকম দাবি উঠলো। নীরা ভিড়ের মানুষ দেখে সামান্য ভড়কে তাকায়। ভেতরের কোন ঘর থেকে অস্পষ্ট জড়ানো গলায়– 'কার লাগি গাঁথিব মালা, ... এ্যাঁ ... এ্যাঁ, দাঁড়ায় কদমতলায়, বাঁশি বাজায় চিকনকালা'– এই গান ভেসে আসে হাসিস-এর গন্ধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। নীরা বলে, টাকা দিব, তবে ওর মা যেন নিয়ে আসে, আর এবার যেন বর্ণাকে না নিয়ে যায়। অনেকখানি কোমর নুইয়ে এক বৃদ্ধ তখন লাঠিতে ভর দিয়ে মায়া ছড়িয়ে তাকায়– দিদি আপনার তো এখন অনেক গোসসা, কষ্ট হচ্ছে, বাচ্চা সামলানোর ধকল কী কম, পরে আবার ঠাণ্ডা মাথায় ফোন করবেন! নীরা ফোন করার অপারগতা জানালে, লোকটি আবার সামনে এসে দাঁড়ায়, নীরার জামা-কাপড় পরখ করতে-করতে বলে– আপনার মুখের ব্রন ভালো হয় না তো! তো আমি আপনাকে একটা বুদ্ধি বাৎলাই, সকালে জায়ের গোসল করা ভেজা কাপড় দিয়ে চুপ করে মুখ ঘষে নিবেন, দেখবেন, হা-হা... ব্রন'ভি দূর হয়ে যাবে...! নীরার এবার অস্বিস্ত এবং ভয় বাড়তে থাকে– একা একা ওদের কলোনীতে আসা বোধহয় ঠিক হয় নি। ব্রনের অদ্ভুত চিকিৎসা শুনে রাগান্বিত চোখে দ্রুত বেরিয়ে আসে। একবার ভাবলো, এক্ষণি ঘরে ফিরে যাই, ঋজুকে কে সামলাবে? মা নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অফিসে জানাল, ওর শরীরটা ভালো নয়।

পুত্র-সংসার কোনো কিছুতে আমার মন বসে না; ঘরে ফেরা দরকার, কিন্তু ঘরে ফিরতে চাই না। বহুকাল আগে যে ছেলেটি চিঠির ভেতর সুগন্ধ ছড়িয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মায়া এবং মুগ্ধতার কথা বলেছিল– তার কথা মনে হলো; মনে হলো– নীরা

তোমার আজ জন্মদিন! মানুষের জন্মদিন সত্যিই কী কোনো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! নীরা ফোনে ম্যাসেজ পড়ল, কিন্তুপাল্টা ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করল না; জন্মদিনের খবর হাসান নিশ্চয় স্মরণ রাখতে পারে নি, আজকের এই বিশেষ দিনটি, বমির মতো মুখ করে, মুচিপাড়ায় শুয়োরের গা ঘেঁষে আমি উদযাপন করেছি। চিঠি লিখত যে ছেলেটি একদা রাত জেগে জেগে, পড়া নষ্ট করত, বাছাই করা গান যোগাড় করে দিত– তার ঘরবাড়ি, ফোন নম্বর সব আমি জলে বিসর্জন দিয়েছি একযুগ আগে। নীরা বুড়ো লোকটির ফোন নম্বরে কল করে– ফোন বেজে-বেজে শান্ত হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ-ই ওপাশ থেকে ফোন আসে– জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবার পর লোকটি বলে, আমি এবং কয়েক বন্ধু মাছ ধরতে এসেছি টিকেট কেটে। নীরার বলতে ইচ্ছে হলো– আজ আমার জন্মদিন, আপনার সঙ্গে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে, এমনকি মাছ ধরার জন্য আপনার ছাতার নীচে বসে থাকলেও আমি খুশি হবো। নীরার মন ভার হয়– বেড়ানোর কথা, হই-হই গল্প করার কথা সহসা বলা হলো না। হাসান অফিস থেকে কখন ফিরবে কে জানে? লোকটি বললো– বড়শিতে টোপ দিয়েছে, সরষের খোল ভেজে চার করেছে, এখন শুধু অপেক্ষা..., তুমি বললে, ছিপ রেখে তোমাকে দেখতে আসতে পারি। নীরা, অভিমান বুঝতে না দিয়ে, না-না করে। আপনি বরং আমার জন্মদিনে খানিকটা মাছ নিয়ে গল্প করেন! বুড়ো লোকটি, মাছ খেলিয়ে কিভাবে ডাঙায় তুললো পাশের শিকারী তা সবিস্তারে বর্ণনা করে। টোপ তৈরিতে মাখন, পাউরুটি, পোনামাছ, পিঁপড়ের ডিম, এমনকি মদ মেশানো হয়– সেই কথা বললো। আর বললো, কেউ কেউ এই পুকুরে ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো কয়েকজন বিখ্যাত মাছশিকারীকে হায়ার করে এনেছে, ... তোমাকে দেখাতে পারলে ভারি মজা হতো! নীরা নিজেও তাই ভাবছিল। ভাবছিল অবশ্য আরো অন্য কিছু: ক্লাশ পালিয়ে, ঘর পালিয়ে সেই যে কখনো কখনো বুড়ো লোকটার সাথে কোথাও নিঁখোজ হয়েছিলাম এক-দুবেলা– মনে হলো, জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে ওদিকটায় একা-একা কী ঘুরতে বেরুবো? সেবার আমরা সারা সন্ধ্যা-বিকেল খাবার নিয়ে গল্প করেছিলাম– সিমসিদ্ধ, কাটারিভোগ এবং আলুকপির কী এক রান্না খেলাম! কালবাউশ আর দেখি না কেন?– এ নিয়ে বুড়ো লোকটি বেশ খানিকটা আফসোস করে। মুলো দিয়ে বড় শোল, ফুলকপি ভেটকি, সর্ষে বাটা দিয়ে মাখো-মাখো বোয়াল, ভাপা ইলিশ, চিতলের মুইঠ্যা, শীতের বড় কই, ট্যাংরা... সে এক আশ্চর্য জগৎ বটে! মাংসের সাথে টমেটো দিয়ে ওর মা একটা পদ করতেন এখন কোথাও দেখি না। বাটা মসলার মাংস তোমরা নিশ্চয় খুব পছন্দ কর? বিফ ভিন্দালু খেয়েছিলাম এক ফাদারের সঙ্গে, ... সো ফ্যান্টাসটিক! নীরা যেন বা রান্নার ঘ্রাণ এবং খাদ্য পরিবেশনের বিস্তৃত চিত্রকলা দেখতে পাচ্ছিল: গরম কড়াই থেকে সরষের ফোড়ন ছুটে আসছে, পেঁয়াজ বেরেস্তার রঙ বদলে যাচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে।

ঘিয়ের সাথে ময়দা মেশানো হলো। সবজি থেকে পানি ঝরছে। দারুচিনি-গোলমরিচের গুড়া বাতাসে উড়ে যায়। আর চারপাশে ছড়িয়ে আছে, পোস্তদানা, ধনেপাতা, সজনে ফুল, মোচা, এঁচোড়, সর্ষে ঢেড়স, লাউ মুলা, ঝিঙে ডাল, ছিটা-রুটি, ইলিশের ডিম-করলা এবং কাঁচাকরলার ভর্তা! খাদ্যের অলৌকিক জগতে হাঁটতে হাঁটতে নীরা গুর্মে শব্দটা মনে করল একবার এবং এর অর্থ নতুন করে দেখল। আনন্দ আর মজারু খাদ্যের স্বাদ-গন্ধ ভেসে আসছে যেন। কিন্তু অল্প পরেই মন ভার হয়ে আসে, শূন্য-নিষ্ফলা আর বড্ড একা! মৃদু মন খারাপ হয়। তারপর ভেতরটা সাহসের মতো মুখ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি কী অচেনা কোনো চিঠি পেয়েছি আজ সকালে? বুঝতে পারি– লোকটির পাঁচটি আঙুল কলম কামড়ে কাগজে তন্তুবায়ের মতো কাজ করে গেছে। কিন্তু চিঠি পড়তে-পড়তে মনে হলো এই চিঠিতে হাতের লেখা আমার, হাতের অক্ষর আমার এবং কথাগুলো আমার নিজের। অচেনা লোকটির চিঠি আসলে আমিই কখনো হয়তো লিখে ফেলেছি, কারণ আমরা একই পৃথিবীর মাংস ও মাটি ভক্ষণ করেছি কোনো চুক্তিপত্র ছাড়াই। নাকি আমি ভুলো হয়ে যা-তা ভাবতে বসেছি? অজানাকে আসলে আমি ভয় পাই। কেউ আমার নাম ধরে ডেকে উঠলে মনে হয় লোকটি ভালোবাসে আমাকে, অথবা তক্ষণি হয়তো ভুলে যাবে। অফিস থেকে ফেরার কালে রিক্সা থেকে আমি বহুদিন জেলের জানালা দেখতে পেয়েছি। ভেবেছি– কাউকে স্পর্শ করা মাত্রই হাত শূন্য হয়ে যাবে। অনুভব করতে ইচ্ছে হয়– আমার সুটকেস এই শহর ভ্রমণের টুকিটাকিতে ভরপুর। মগজের ভেতর জানালা খুলে আমি জন্মদিনের তারিখ স্মরণ করে হেঁটে যাই আমার পেছনে, আমার যৌবনে এবং গোপন নির্জন গভীরে। কয়েকশো বছরের পুরনো যুবক, পুরনো বন্ধু, অথবা আরো পুরনো কারুর হাত স্পর্শ করে, এবার আমরা শতবর্ষী জনপদের ঘাম-গন্ধ, রঙ এবং পবিত্র চোখ দেখে বেড়াই। মূল শহরে ঢোকার আগে আমরা একদিন বড় একটি পুকুর এবং মন্দির দেখে দাঁড়িয়েছিলাম। সামান্য দূরে নীলকুঠি, ক্যাথলিক গির্জা এবং একটি বিস্তীর্ণ আম বাগান। নীরা এতদিন পরেও বাতাসের আবছা আঁধার অনুভব করতে পারে। খুব কাছ থেকে গির্জার ঘণ্টা শুনেছিলাম সেই প্রথম। আর সেই প্রথম বুড়ো লোকটি খুব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল অদ্ভুত এক ভালো লাগার উত্তেজনায়। লোকটির গা থেকে উড়ে আসা তামাক এবং ডিওডোরান্টের গন্ধ সে যেন এখনি নাকে পেল। রিক্সায় গা ডুবিয়ে সে এইসব দৃশ্যাবলির গন্ধ এবং মায়া আন্দাজ করতে পারছিল, আর তার শরীর এবং আত্মা ক্রমাগত নিখোঁজ হতে থাকে ঘর-বাড়ির চৌহদ্দি থেকে। গলির ভেতর শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার রেশ ভেসে আসছে। সোনার দোকান থেকে এসিডের গন্ধ। তেলেভাজা, পরোটা, পুরি, টিকিয়া, সুতিকাবাব, ফালুদা, লাচ্ছি, আর কী সব বিচিত্র মিষ্টান্ন! খাবার জগতে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা হয়তো সেদিন এক বেলা কাশ্মিরি বাবার মাজারে গিয়েছিলাম। মাজার

থেকে বেরিয়ে বড় একটি স্মৃতিস্তম্ভ। পাশে সেলুন, পানশালা, পার্ক, ছাপাখানা, জাদুঘর, বাজার, বইবাইন্ডার, ছাদ থেকে উড়ে বেড়ানো ঘুড়ি, অপেরা পার্টির অফিস, কালীবাড়ি, ইফতার আইটেমের বিজ্ঞাপন– 'বড় বাপের পোলায় খায়', আর মহল্লা জুড়ে বানরের ঝাঁক!

নীরা রিক্সায় ভেসে যেতে যেতে আরো বিবিধ সব স্বপ্ন-স্বপ্ন গন্ধের ভেতর নিমজ্জিত হয়, অথবা গুড়িয়ে দেয়া সিনেমা হলের বারান্দায় বানরের খেলা দেখার জন্য সামান্য থামে। বানর বর সেজে, লাঠি হাতে হেঁটে চলেছে– এই দৃশ্যে গরিব মানুষগুলো মজা পেয়ে হ্যা-হ্যা হাসে। নীরা রাস্তার পাশ থেকে অসময়ে তৈরি হওয়া ভাপা পিঠা খায়, আর রিক্সাওয়ালাকে আলাদা পয়সা দেয় ওর পছন্দের খাবার খাওয়ার জন্য। ভাপা পিঠার ধোঁয়া মানুষ গোল হয়ে উপভোগ করছে। পিঠা চিবুতে চিবুতে সেলফোন বাজে– একবার মায়ের, একবার হাসানের, একবার শাকিলের। কোনো ফোন সে রিসিভ করল না। বুড়ো লোকটাকে ফোন করল– শুনল এক দম্পতি এসেছে মাছ শিকার করতে, ওরা নাকি রাতেও একত্রে মৎসশিকারী হয়। নীরা মজা খুঁজে পেল। রিক্সাওয়ালা চা-তামাক খেয়ে, শক্তিমান হয়ে আবার প্যাডেল স্পর্শ করে দাঁড়ায়। নীরা ভাবল– আমার সারাদিন জন্মদিনের ব্যক্তিগত উৎসব চলেছে ঢের! এখন ফেরা দরকার, আমি নিশ্চয় এত বিখ্যাত নই যে, বলতে পারব– উপন্যাস না লিখি, আমার নিজস্ব জগতে অন্তত খানিকটা হাঁটার জন্য আমার একটি ঘর ও কিছু টাকা-পয়সা দরকার! সুটকেস হাতে হন-হন, কতবার ভেবেছি বেরিয়ে আসি ঘর থেকে, হয় নি। নীরা কি ভেবে এবার অনেকগুলো জন্মদিনের কার্ড কিনে নিজেই নিজের ঠিকানা লিখে কুরিয়ার অফিসে জমা দিয়ে রিক্সা চেপে বসে– যেন এক সকাল -দুপুর বাড়িতে আবিষ্কৃত হয়, দেশ-বিদেশের অনেকগুলো মানুষ ওকে একযোগে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। অসময়ের পিঠা খেয়ে বুকপেটে সামান্য অস্বস্তি হলেও নীরা মনে-মনে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করে। রিক্সা বাতাসে, সমুদ্রে যাওয়ার মৃদু ঢেউ তৈরি করে। মনে হলো মরুভূমিতে বালি উড়ে যাওয়ার ঢেউ দেখছে। হয়তো ভুল হচ্ছে– আসলে শহরের ধুলো-বালি, মানুষজন অবজ্ঞায় অবহেলায় কী এক ঘূর্ণন তৈরি করেছে! মোড়ে-মোড়ে পাহারারত পাথরের মূর্তি, ছবি, ফোয়ারা– এসব দৃশ্যাবলি মিলিয়ে যেতে-যেতে তখন ওর ভেতর কয়েকজন অস্পষ্ট মানুষের আভাস তৈরি হয়। সে আসলে এতগুলো মানুষ বুকের ভেতর পুষতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু নিরুপায় সমর্পণের ঝোঁকে, সে ভাবে আমার অন্য কোথাও যাওয়া উচিৎ শান্তির জন্য– যেখানে হয়তো কবিতা দেখার চাপ নেই। যেখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কম, কিন্তু স্মৃতির জগৎ একটু-একটু করে বেড়ে চলেছে। নীরা দেখল, একটা রাস্তায় সার-সার অনেকগুলো ফটোগ্রাফের দোকান। ভাবল– আজ সারাদিন আমি অনেকগুলো কনফিউশানের ভেতর হেঁটে গেছি! দেখল ক্রেন, দড়ি, ভারি বিম এবং অদ্ভুত মেশিন

দিয়ে মাটি খুঁড়ে কোনো এক কোম্পানি মানুষের অন্য এক গোপন ইতিহাস খোঁজার জন্য হন্যে হয়েছে। মাটির তলার পাথর থেকে মানুষের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। নীরা দেখল, গির্জার সামনে ভিড়, অনেকগুলো গাড়ি। ভাবল সুস্মি-কুসুমদের বাড়ি হয়ে যাই, আলী আনোয়ার চাচা লিভার সিরোসিসে মারা যাওয়ার পর কোনো খোঁজ নেয়া হয় নি। ফোনে শুনল কুসুম ওর শ্বশুর বাড়ি, আর সুস্মি গেছে ঢাকায়। চাচা ইবসেনের ওপর যে বইটি লিখছিলেন– মৃত্যুর পর জাদুঘর মিলনায়তনে প্রকাশনা উৎসব হচ্ছে আজ। সুস্মি বললো, তোকে টিকিট পাঠাব, ... ডলস হাউস হবে, বাবার অনুবাদ করা। নীরা খুশি হয়, সুস্মির জন্য মন খারাপ করে। মানুষ মারা গেলে কী হয়? কবরের গা ঘেঁষে কেউ গাছ লাগায়। গাছ বড় হয়, ছায়া দেয়, মানুষ ছায়ার নীচে বসে এবং ঝরে পড়া ফল খুঁটে খায়। বহু বছর পর আমি নিশ্চয় সুন্দরী থাকব না, আমার পোশাক, রান্না, ঘরবাড়ি সব পানসে হয়ে যাবে! হাসানের স্টাডিতে ঘন-ঘন দেখা করতে আসা আবৃত্তির এক কন্যাকে দেখে প্রথমে হিংসা হয়েছিল এবং পরে ক্রোধ হয়। হাসানদের প্রতিষ্ঠান কী স্পন্সর করছিল ওর আবৃত্তির এ্যালবাম? নীরার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় নি। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় নি– ঘরের মেঝেতে ইমার্জেন্সি পিলের শূন্য ফয়েলগুলো কোথা থেকে এল? হাসান গিয়েনবারি সিন্ড্রোমে মৃত্যুমুখী হওয়ার সময়, কোথা থেকে লোন করেছিল কাড়ি-কাড়ি টাকা– সে কথাও আর সবিস্তারে বলতে ইচ্ছে হয় নি। মাথার ভেতর ঘূর্ণন শুরু হয়েছিল: নীরা তোমার কী কোনো কর্তব্য নেই– যেমন ধরো তোমার স্বামী, তোমার পুত্র? ... একই রকমের গুরু ও পবিত্র দায়িত্ব আমার নিজের প্রতিও– নীরা জবাব দেয়। কিন্তু সবার আগে তুমি কী স্ত্রী বা মা নও? না, ... সবার আগে আমার জন্ম হয়েছে মানুষের মতো, ঠিক তুমি যেমন! ... তুমি কি আর কখনোই আমাদের কথা ভাবো না? নীরা বলে– অবশ্যই ... তোমার কথা, ঋজুর কথা, ওই বাড়িটার কথা! ... তারপর কী আমি নাটকের মতো, ছোট্ট সুটকেস হাতে দরজা বন্ধ করে শহরের কোথাও নিখোঁজ হয়ে যাব? নীরা ভেবেছে বটে, কিন্তু কোথাও ফেরা হয় নি। অন্যমনস্ক গলায় কথা বলে– শূন্য বাসন-কোসন, গনগনে সূর্য, ময়লা জমে থাকা প্লেট, ফিসফিস কথাবার্তা, কানের লতিতে তিলের সংখ্যা, ঘুমন্ত চুলের ভেতর দৌড়ে বেড়ানো আঙুল– এসব নথিপত্র গোছাতে গোছাতে দিনের পর দিন শিশুর জন্ম রহস্য নিয়ে আমার কী উৎকণ্ঠা গেছে, তোমরা ভাবতেও পারবে না! আমার মধ্যে একটি জীবন,... আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। পেটের ভেতর অদৃশ্য-নরম তুলতুলে পায়ের আঘাতে মধুর এক যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। বোনেরা হাসছিল, আর আমার শ্বাস ওঠানামা হচ্ছিল। আমি বলেছিলাম জীবনের শ্বাস ওঠানামা করছে। তুমি ভাবতেও পারবে না, কীভাবে একটি শিশু জন্ম নেয়। বিরাট থাবার মতো একটি ব্যথা ক্রমাগত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল, আর আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলাম। তারপর এক বিকেল-সন্ধ্যায় বাঁধ

ভেঙে জলের তোড় শুরু হয়। ঐ সময় আমি ছিলাম বিস্মৃতির রাজ্যে। ভয়ঙ্কর জোরে যেন একজোড়া লোহার হাত মোচড় দিয়ে বাইরে আসতে চাইছে। আমার শরীর জুড়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, আর অনেক পরে কী অবিশ্বাস্য একজোড়া চোখ, আমাকে দেখছে, আমি সন্তানের মা হলাম। আমি ভালো মা হতে পারি নি, আমি খুব স্বপ্ন-স্বপ্ন গন্ধ নিয়ে পৃথিবীর পথ হাঁটতে চেয়েছিলাম; তারপর ছোট ছোট নিষেধ– যেমন চাকুরি, রান্না, ঘর-বাড়ি, বেবিসিটার, বেবিসিটারের নিখোঁজ পর্ব, ... এসব আমাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলে।

নাকি আমরা সবাই সংসার নামক মহান ধাঁধায় ধরা দিই স্বেচ্ছায়? রাতের ঠাণ্ডা আকাশ থেকে নিয়ম করে তারা ঝরে পড়ার দৃশ্য দেখি, তারা দেখতে-দেখতে ঈশ্বরের কাছে কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করি, বেবির দুধ গরম করি, অসমাপ্ত সিগারেট কুড়োই অতিথির এ্যাস্ট্রে থেকে, মৃত অর্কিড পরিষ্কার করি, পুত্রের সেবায় সারা রাত জেগে, না ঘুমিয়ে মোরগের তিনটি ডাক শুনি বাধ্যতামূলক। আর দেখি সারা বাড়ি তখন ঘুমিয়ে। ঘুম-ঘুম ঘর-বাড়ির গলি খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে নীরার হঠাৎ মনে হলো– কোনোদিন কেউ চিঠি দেয় নি আমাকে, মানুষ ভালোবাসার লোককে লিখে কী ভাষায়? সেলফোনের নেটে ও এলোমেলো হাত ঘষে, ঘুম আসছে না। লাভ-লেটার লেখার পরামর্শ আছে এক সাইটে; নীরা পড়ার চেষ্টা নেয়– তোমার ডেস্ক থেকে, অমনোযোগী করে, এমন সবকিছু সরিয়ে ফেল। যাকে ভালোবাসতে চাইছ, তার ছবি রাখ তোমার সামনে। পছন্দের গান দাও। সবচেয়ে ভালো কলম এবং কাগজ বার কর, অন্য একটুকরো কাগজে দুটো লিস্ট বানাও: (ক) ছেলেটির / মেয়েটির শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলো (খ) ভবিষ্যতে তুমি যে যুক্ত থাকতে চাও, সে সম্পর্কে আশাবাদের কথা। এবার সম্বোধন করে তুমি লিখতে বস, কেন সে এত স্পেশাল– সে সম্পর্কে অন্তত তিনটি কারণ জানাও। তারপর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে কথা বলো। আর শেষে লেখো– আই উইল লাভ ইউ অলওয়েজ, লাভিং ফরএভার, মাই হার্ট ইজ ইভারস ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে পোস্ট করার আগে এক-দুদিন থেমো– যদি অন্য কিছু যুক্ত করতে ইচ্ছে করে। আর খাম বন্ধের আগে মৃদু সুগন্ধি ছড়িয়ে দিও।

নীরা নিভুনিভু চোখে চিঠির সুগন্ধ নেয়। একটা শেয়াল দৌড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। বাইরে সামান্য আলো। চেনা, আবার অচেনা– এরকম দুএকটি পাখির আওয়াজ হচ্ছে যেন। হাসান হেসে তাকায়– তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ, ঋজু খুশি হবে, এই ভেবে দুরকমের কেজ বার্ড এনেছি গত রাতে। নীরার মনে হলো– সুস্মিদের বাসায় বড় একটা কাকাতুয়া ছিল। ওর বাবার কাশি নকল করতে পারত। নীরা সামান্য ঠোঁট ছড়িয়ে ঋজুকে আদর জানায়; তাকে দেখায়, পাখি এসেছে আমাদের বাসায়। পাখির পায়ে ঝুমঝুমি বাঁধার পরিকল্পনা হয়, পাখির খাবার নিয়ে কথা হয়,– ... আর কবে কোথায় একটি পাখি সাবানগলা জল খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল,

তার গল্প ভেসে আসে। পাখির খাঁচা, নোংরা– কিভাবে পরিষ্কার হবে, এসব নিয়ে যখন ভাবছিল, তখন বাড়িওয়ালা শিশুদের অসুখের কথা বলে, নীরাকে আড়ষ্ট করে– পাখির পালক থেকে ভয়ঙ্কর অসুখ ছড়ায়, ... আমাদের দেয়াল-উঠোন এসব তো ভারি নোংরা হয়ে পড়বে, ... ভাড়া বাড়িতে এসব ঝামেলা কেন করছেন? নীরা ভদ্রমহিলাকে চায়ে চিনির কথা জিজ্ঞেস করে অন্যমনস্ক হয়! সত্যিতো তো, পাখি কেন আমাদের ভাড়াবাড়িতে? ... হাসান পাখির খাবার নিয়ে কথা বলতে-বলতে হাসে– ঋজু বড় হলে, খরগোশ আর শাদা ইঁদুর কিনে দেব। না, নীরা ওর গলার স্বর নিজেই শুনতে পায়, ... ভাড়া বাড়িতে এসব করা যাবে না! হাসান অল্প-নিভু চোখে নীরাকে দেখে; তখন ফোন আসে, ও দৌড়ে বারান্দায় যায় এবং ছুটির দিনেও জরুরি অফিস আছে বলে প্রস্তুত হতে থাকে। পাখি দেখা আর পাখি কেনার চোখ কত যে আলাদা, হাসান কি বুঝতে পারবে?– নীরা ভাবল। অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছে, বহুদিনের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নীরা চা করে দেয় হাসানকে। হাসানকে কী আমি কেবল দোষারোপই করে চলেছি? ও, ওর বাবা-মা, ... শুরুর অপমান, গ্রাম্য নিয়মে অদৃশ্য এক উকিল এনে সালিশ-বৈঠক– এসব আমি মনে রাখতে চাই নি। তবে হঠাৎ যেদিন মনে হয়, সেদিন ঘরের ভেতর আমি নিজেকে কয়েকটি আয়নার সামনে দাঁড় করাই, আয়না দেখছে আরেক আয়না– আমি নিজেকে কয়েক লক্ষ উপায়ে দেখতে পারি; আমার ছায়া, আমার দেহ, অবয়ব, চোখ আয়নার ভেতর টুকরো হতে-হতে আমাকে চূর্ণ করে। আমার মন বলে– এত শব্দ, বাক্য শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারে না; বুকের ভেতর, অথবা শরীরের অন্যত্র যে গোপন-গম্ভীর বাক্য তৈরি হয়, তা শেষ পর্যন্ত থেকে যায় অপ্রকাশিত। বুড়ো লোকটির কাছে আমি শিখেছিলাম– চোখ যা দেখায়, তা হলো তোমার আত্মা, আর তুমি যা দেখ, তা হলো আলো। মুগ্ধ করা বুড়ো লোকটি কী শয়তান না প্রেতাত্মা? আমার চেনা নিয়মগুলো বদলে দেয়ার জন্য বই খুঁজে এনেছিল, যেন আমি সহজেই বিশ্বাস করি; আমরা চটজলদি এক দুপুর অনুবাদের খেলায় মেতেছিলাম– বইয়ের ভেতর আভরণহীন হওয়ার কথা ছিল: পরস্পরকে স্পর্শ কর, যেন তোমার ভালোবাসা মূর্ত হয়। ও তোমাকে যে পরিচ্ছেদে দেখতে চায় তুমি তাই করো। পছন্দের সঙ্গীত নাও। তোমার আবেগ যেখানে যেতে বলে, তুমি সেখানে যাও। দরজা খুলে ভেতরে বস। খুব তাড়াহুড়ো নয়। তোমার ভালোবাসার জলরাশি গড়িয়ে যেতে দাও। কোনো কিছু পাবে, তা না ভেবেই তুমি কাজটা শুরু কর। লম্বা শ্বাস নাও, এবং মুখ দিয়ে স্বাদ অনুভব কর। নীরবতাগুলো ভরিয়ে দাও তোমার নিঃশ্বাস ছড়িয়ে। তারপর আরো ভেতরে ছড়িয়ে পড়, যেমন চাঁদ এবং সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আলোর ছটা। তারপর লোকটির অথবা কন্যার চোখের ভেতর তোমাকে আবিষ্কার কর– একটুকরে মেঘ ভাসছে, জলভর্তি মেঘ! তখন ভালোবাসার আদান-প্রদান তুমি ঘটাতে পার সর্বত্র। তারপর গভীর ঘুমের

ভেতর তুমি স্বপ্ন দেখলে লাগাতার। ... কারণ আজ তোমার জন্মদিন। আজ জেগে ওঠার দিন।

নীরার জন্মদিন আজ– নীরা ভাবল। সারাজীবন আমি যা চেয়েছি, সেসব কী আমার চারপাশের মানুষজন যোগাতে পেরেছে? আমি কী প্রস্তুত ছিলাম? কাউকে অনুরোধ করা কী সমীচীন হবে? আমি কী তখন খুব নার্ভাস ছিলাম? যা অন্যমানুষ চায়, সে-সবের কী ঘাটতি ছিল আমার? মানুষ কী আমার ওপর সারাজীবন কর্তৃত্ব করে গেছে? আমি কী কেবল নিয়েই গেছি চারপাশ থেকে? একবার হাঁটতে বেরিয়ে-ছিলাম, পথের ভেতর গর্ত, আমি পড়ে যাই, অসহায় বোধ করি। কিন্তু বুঝতে পারি, এটি আমার ভুল নয়। আমি দ্বিতীয়বার হাঁটতে যাই যেদিন, সেদিন ভান করি যেন গর্তটি আমার চোখ পড়ে নি। আমি পড়ে যাই। বেরুনোর পর আমার অনুভব হলো, আমি ভুল করি নি। আমি আবারও সেই পথে হাঁটতে বেরুই। পথে গর্তটা দেখে আমি নিজেই পড়ে যাই। বুঝতে পারি ঘটনাটি ঘটলো আমার ইচ্ছায়। অনেকদিন বাদে আমি আবার যখন হাঁটছি, তখন গর্ত এড়িয়ে অন্য পথ ধরে হাঁটতে থাকি। আসলে পথ খোঁজার রকমফের নিয়ে, পথ-খোঁজার উপায় নিয়ে, পদ্ধতি নিয়ে আমি বহুদিন এইসব পরীক্ষা করে গেছি লাগাতার। সব উত্তর তারপরেও নিশ্চয় আমি জানতে পারি নি। তবে আমার ভেতর একদিন প্যাসান তৈরি হয়েছিল কারুর জন্য; লোকটি আমার সঙ্গে ভালোবাসার একঘেঁয়ে কাহিনী না শুনিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এলেবেলে কথা বলেছিল। লোকটির সঙ্গে আমার একটি দীর্ঘ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছিল। আমার পছন্দ-অপছন্দের জগৎ বুঝতে পারছিল লোকটি আর লোকটি ফিরে যাওয়ার পরেও আমি অনেক্ষণ পর্যন্ত বুকের হৃদস্পন্দন শুনতে পেয়েছিলাম। আমি লোকটির স্পর্শ, হাসি এবং আনন্দ জ্ঞাপনের পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার ভেতর আনন্দ টলমল হয়েছিল। আমি শান্ত হয়েছিলাম, আমি অনেক কিছু ভুলো হয়ে দিবাস্বপ্নে ডুবেছিলাম। আবার নতুন সময় কাটানোর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। আর আমার ঘুম এসেছিল সে রাতে, আর মনে হয়েছিল জনে-জনে আমি আমার সব আনন্দের কথা বলতে-বলতে বাচাল হয়ে উঠি!

তখন আমার ঘুম না হওয়ার দিনগুলোর কথাও এক-দুবার ভেসে এসেছিল। ঘুম নিয়ে আমার নানান উত্তেজনা আর আদিখ্যেতার কথাও লোকটিকে শুনিয়ে-ছিলাম: ... কতদিন গেছে, আমি বিছানার ওপর, দৌড়ে চলেছি। ঘুম কখন এল, বুঝতে পারি নি। স্বপ্ন দেখছিলাম, স্বপ্নের ভেতর বৃষ্টি হচ্ছে, ঘর-বাড়িতে হাঁটু পানি, আর বালতিতে জল জমা হওয়ার শব্দ। ... কতদিন ঘুমের ভেতর জেগে গেছি। ঘুমের ভেতর সংসার করছি। জুতা গুছিয়ে রাখছি। নাস্তার টেবিল সাজাতে বসেছি, হাসপাতালে শ্বশুরকূলের ডায়াবেটিক ডায়েট নিয়ে এবেলা-ওবেলা করছি। চোখ দেখাচ্ছি। কিডনি স্ক্যান করছি। মৃত শিশুর অবস্থা বোঝার জন্য আল্ট্রাসনোগ্রাম

করছি। স্টিলবর্ন বেবির জন্য শোক করছি। কবে একজনকে জলে ডুবে যেতে দেখেছিলাম, সেই লোকটিকে হেঁটে যেতে দেখি। দেখি আমি নগ্ন-স্নান করছি। ব্রেক-ফাস্ট করছি। বাচ্চার স্কুলে মাইনে দিচ্ছি। দুপুরে যে হোটেলে গেছি, লাঞ্চ করতে সেখানে মাত্র একটুকরো মাছ অবশিষ্ট। জোরে টিভি চলছে, হাসান মাছ ঘেন্না করে। ও কেবল আমাকে খুশি করার জন্য বসে থাকল। তারপর ঝড় এল, একটি শিশু ভেজা কাককে আশ্রয় দেয়ার জন্য দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল।... আমি আমার স্কুলঘর দেখতে পাচ্ছিলাম। স্কুলের ভাঙা বারান্দায় চাঁদ আটকে আছে। আমাদেরকে বলা হলো চিঠি লিখতে। বিষয় মনে নাই। আমি কোনোভাবেই খাতা-কাগজ খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক আগে, আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, ঘরে এসে আমি ওর ঠিকানায় চিঠি লিখি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পোস্ট করি না।... হোয়াই ডু উইমেন রাইট মোর লেটার্স দ্যান দে পোস্ট?... কে বললো, বাড়ি ভাড়া নিতে হলে তোমাকে বিয়ে করতে হবে? আমার রাগ হলো, আমি আমাকে দেখতে পেলাম, একটি নৌকায় একা। নৌকা ডুবে যাচ্ছে আর আমি সাঁতরে চলেছি... আমি নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। কথা বলছি, এত মাথাব্যথা, তারপরেও খুব সমীহ করে কথা বলার প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি... দেখছি একটি রেলস্টেশন। গ্রামের ভেতর, বুঝতে পারছি না, লম্বা কিউয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কে একজন আমার পিঠের ওপর কাগজ-কলম রেখে ঠিকানা লিখল। আর টেবিল জুড়ে চকোলেট কেক।

নীরা ঘুম-ঘুম স্বপ্ন-দিনের ভেতর হেঁটে যেতে-যেতে মনে করতে পারল– আজ নীরার জন্মদিন। জন্মদিনে মানুষ জাগে। বেঁচে থাকার কৌশল মানুষ মাঝে-মাঝে ভুলে যায় কেন? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি– যে মানুষগুলো অনবরত বলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সভ্যতা এগুচ্ছে মৃত্যুর দিকে– সে লোকগুলোর কথা শুনব না। চারপাশ ভারি হয়ে আসছে, বোঝা হয়ে আসছে– আমি আর নতুন করে সেই বোঝা বাড়াব না। টেকনোলজি, আর্ট এবং লিবার্টির মেলবন্ধন নিয়ে আমরা ভাবতে শুরু করলাম আজ থেকে। আমাদের শরীর এবং আত্মা– পৃথক করব কেন? আমাদের কালের মানুষ, শিশু, কন্যা– এরা বাঁচবে তো? আমার ধারণা হয়– বাঁচানো সম্ভব! জীবন নিয়ে কত বিপুল ক্ষমতাবান মিথ আছে! মিথের ভেতর লুকোনো মানুষগুলো চায় আমরা ওদের শরীরে রক্ত-মাংস দিই, চায় আমরা ওদের আহ্বানে সাড়া দিই, তখন ঐসব মানুষেরা আমাদের শক্তি, সাহস এবং আনন্দ দেয়ার জন্য তৎপর হয়!

নীরা দেখল– একটি বাতাস উঠেছে। ওর মনে হলো– আমি কী আমাকে বোঝাতে পারলাম শেষ পর্যন্ত? বোধ হয় মানুষ পারে না। তবে কখনো, সে যা নয়, সে সম্পর্কে দু-এক কথা জানান দিতে পারে। চারপাশ থেকে সংসারের কলরব এবং মানুষের রকমারি চিৎকার ভেসে আসে। শব্দ আসলে ক্রিয়া। আমার ভেতরে, হয়তো সবার ভেতরেই অজস্র মানুষ, অথবা ন্যূনতম দুজন– আমি নিজে, আর আমার

সম্পর্কে আমার স্বামী/স্ত্রী যা ভাবে! নীরা এসব ভাবছিল, অথবা ভাবছিল নতুন কেজবার্ডের খাদ্যতালিকা এবং দাই বিষয়ক রিপোর্ট লেখার কৌশল নিয়ে। কয়েকদিন টানা অফিস কামাই হয়েছে– ফোনে সত্য এবং দুএকটি হোয়াইট-লাই মিশিয়ে এ্যাপোলজি করল; অফিসে যেয়েই পুরনো তারিখে ছুটির দরখাস্ত করবে। রাস্তার ওপার থেকে স্কুলছাত্রীদের প্লাকার্ড হাতে ডেমোনেস্ট্রেশন দেখল– মাস্টার মশাইয়ের গলায় ফাঁসির দড়ি, ক্লাসের একটি মেয়ে মোলেস্ট হয়েছে। মিছিলের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। নীরা মনে করতে পারল– ওর জন্মদিন গত রাতে শেষ হয়ে গেছে। জন্মদিনে জেগে ওঠার পরিকল্পনা হয়েছিল: নন-প্রেসক্রাইবড ওষুধগুলো ফেলে দিবে, রাত জেগে-জেগে ঘুম নষ্ট করব না, বিশ মিনিট ঘাম ঝরানো ব্যায়াম করব, অতিকম বা অতিবেশি খাবার খাব না, আর নিজেকে সবকিছুর সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর প্রস্তুতি নিব। আর নিজেকে যুক্ত করব অনেকগুলো আনন্দময় কাজে– যেমন সাইডওয়াক ঘেঁষা কফিশপে বসবো, তর্ক করব, এ্যাকুরিয়াম কিনব, জিগ স পাজল বানাব, শৈশবের আনন্দময় দিন খুঁজব, বলবো আপনাকে ভালোবাসি, বই কিনব, স্টিম বাথ নিব, রেডিও শুনব, ম্যাসেজ নিব, রাজনৈতিক আলোচনায় তর্ক করব, নাচ করব, ডায়রি লিখব, চিঠি লিখব, সেক্স নিয়ে চিন্তা করব, ঋজুর খেলা দেখব, দলবদ্ধ হয়ে গান গাইব, সাইটসিয়িং করব, ঘুরব, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভাববো, মাছ ধরতে যাব, মাছের বাজারে যাব, হাউসপ্লান্টগুলোর যত্ন নিব, পুরনো বন্ধুদের নিয়ে রিইউনিয়ন করব, আর কোনো কোনো দিন কিছুই করব না।... কেবল ভাববো আই এম এ্যান ওকে পার্সন!

নীরা আনন্দ খোঁজার অনুপান যোগাড় করতে-করতে ঋজুকে কাছে নেয়, আদর করে। বাতাসে অফিসের একটি চিঠি, আর দাই বিষয়ক রেফারেন্স বইয়ের আলগা পৃষ্ঠা ছুটে যাচ্ছে। বাতাস কমিয়ে দেয়, কিন্তু তখনি উড়ে যাওয়া কাগজ-গুলো গোছাতে ইচ্ছে করে না। চুলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে নীরা পুত্রের ঘ্রাণ নেয়। পুত্রের সঙ্গে কথা বলে। পুত্রকে প্রতিদিনের মতো গল্প বলে। অথবা গল্প তক্ষণি তৈরি হয়– শোন, বাবা... সে এক ঝড়ের রাত। বৃষ্টি হচ্ছিল মুষল। কাকের বাসা ভেসে গেছে। স্থির হলো, এত তীব্র জলেস্রোত যে মাত্র একজন শিশুকে রক্ষা করা যাবে। কাক মা সাঁতরাতে-সাঁতরাতে মধ্যপথে এসে প্রথম বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করে– তুমি আমার জন্য কী করবে, যদি কখনো এরকম বানভাসী হয়ে পড়ি আমি। ও বললো, তোমাকে এইভাবে, যেভাবে তুমি আমাকে বহন করলে, নিয়ে যাব। কাকমা বললো মিথ্যুক, তারপর টুপ করে ওকে জলে ছেড়ে দিয়ে, অন্য শিশুদের জন্য আবার ওদিকটায় চলে আসে। সব শিশুরা একই জবাব দেয়, এবং মাঝপথে প্রতিবারই মা-কাক ওদেরকে জলে বিসর্জন দিয়ে শেষ সন্তানটিকে আনতে যায়। শেষবারের মতো এবার জিজ্ঞেস করে তুমি কি করবে বাছা? সন্তানটি ওর মায়ের মুখের দিকে তাকায়–

মা তুমি আমাকে বহন করছ এজন্য ধন্যবাদ। সময় বাধ্য করলে আমি আমার সন্তানের জন্য, তুমি যা করেছ তাই করব। মা কাক বললো, তুমি আমার মনের কথাটা বলেছ, আমি খুশি হয়েছি। ... নীরা দেখল ঋজু ঘুমিয়ে গেছে অনেক্ষণ। টিভি অন করে ঘরের নিঃশব্দতা ভাঙতে চাইল। বুড়ো লোকটির সঙ্গে কথা হলো ফোনে– ওরা পাখি দেখতে যাচ্ছে, সামনের সপ্তায়। কিভেবে আনমনে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী আমাকে ভালোবাসেন? অদ্ভুত এক জবাব এল– অবশ্যই ভালো-বাসি তোমাকে, তবে বেশি ভালোবাসি তোমার ভেতরের লুকিয়ে থাকা অন্য এক জগতকে। আমার ধারণা, কাউকে আমরা ভালোবাসতে বাধ্য করতে পারি না; কেবল পারি নিজেকে অন্য মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলতে। অথবা ভালোবাসা-যত্ন তুমি যেভাবে চাইছ, সেভাবে অপরপক্ষ হয়তো ফেরত দিতে পারে নি তার দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে! ভালোবাসার রকমফের শুনতে-শুনতে বারান্দা থেকে নীরা দেখল পাখি ডাকছে। হাসান অফিস থেকে রওনা হয়েছে, ওভেন কাজ করছে না কয়েকদিন। যে মিস্ত্রির ফোন নম্বর ছিল, ফোন দিয়েছিল, ফোন ধরে-ছিল ওর স্ত্রী, বললো লোকটি মারা গেছে শবে মেরাজের রাতে। নীরা বুঝতে পারছিল না, কী করা উচিৎ। টিভির কাঁচে সংবাদ দৌড়ে যাচ্ছে: পুলিশ এক ভদ্রমহিলাকে আটক করেছে। সে তার পাঁচটি সন্তানকে ব্রেকফাস্ট করিয়ে পানিতে ডুবিয়ে আজ সকালে হত্যা করেছে– কারণ ছেলেমেয়েগুলো সঠিকভাবে বড় হচ্ছিল না! মা বলছে, আমি আসলে যেভাবে ওদের প্রতিপালন করছিলাম, ওরা কোনোভাবেই বাঁচতে পারত না। বিজ্ঞ টেলিভিশন রায় দিচ্ছেন– ইট ওয়াজ অ্যা মাদার্স ফাইনাল এ্যাক্ট অফ মার্সি! নীরা টিভি বন্ধ করে। রাস্তা ঘেঁষা জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভয়, অস্বস্তি-ক্রোধ-যন্ত্রণা এবং অবসন্নতার মতো একটি স্রোত শরীর ছুঁয়ে নেমে যাচ্ছে। শরীরের ভেতর দৌড়ে বেড়ানো এই ব্যথার জগৎ সে অনুভব করতে পারছিল। এখন খুব মনে হয়– ভালো থাকাটা আসলে দরকার ছিল কাউকে অব-লম্বন না করেই। অথচ কী এক ঘোরের ভেতর কাউকে আঁকড়ে ধরার জন্য চারপাশ কেবল আঁতিপাতি করে গেছি। ক্রমাগত অস্থিরতায় ডুবেছি, নিজেকে ক্ষত করেছি। কান্নায় ডুবে গেছি। নিজেকে আক্রান্ত করেছি। তারপর ঘোরতর শূন্যতা, ভয় এবং অপারঙ্গমতা! মাঝেমাঝে ভাবি শহর ডুবিয়ে বৃষ্টি হয় না কেন? টানা পাঁচ দিনের বৃষ্টিতে আমাদের পুরো ঘর-বাড়ি, শহর স্নিগ্ধ হয়ে উঠুক! ইদানিং সৌন্দর্য, বৃষ্টি এবং যুবাকাল নিয়ে কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সেসব-ই ভেসে ভেসে আসছে– দুর্বিনীত শৈশব, কৈশোরের দিবাস্বপ্ন, সমুদ্র পাড়, তরুণীদের সতেজতা, বাসের গোঁ-গোঁ ইঞ্জিন আর অনেক নীচু হয়ে আসা ঝকঝকে আকাশ। নীরা নিজেকে ধমকে দেয়– বাবার বাড়ি থেকেই তুমি এক তছনছ করা-আত্মা নিয়ে ভ্রমণ শুরু করেছ; জল থই থই, সমুদ্রের দুপাশে খাড়া পাহাড় আর তুমি বসবাস করছ সেই

অচিন দেশে! নীরা বুঝতে পারল... নাটকের মতো, হুট করে স্যুটকেস হাতে, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে কোথাও বেরিয়ে যাওয়া এক বিপুল সম্ভব-অসম্ভবের ভাবনা বটে! নীরা স্থির হওয়ার আয়োজন নেয়, শান্ত হওয়ার কৌশল শেখে, জন্মদিনের প্রতিজ্ঞাগুলো মনে করার চেষ্টা নেয়, আর কেউ তখন গলা, বুক, মস্তিষ্ক, এবং রক্তের ভেতর ফিসফিস করে– তুমি যা দেখ, তা হলো আলো, আর তোমার চোখ যা দেখায় তা হলো তোমার আত্মা। নীরা মস্তিষ্কের ভেতর কথা বলতে-বলতে শান্ত হয়, বাতাসে পাতা ঝরার গন্ধ আসে, লম্বা শ্বাস নেয়, দ্বিধান্বিত হয়, আর নিজেকে খানিকটা-খানিকটা প্রস্তুত করে। বুঝতে পারছিল, বহুদিন পর একটি দুটি জটা খুলে যাচ্ছে– এতদিন হয় আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করেছি অথবা দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। নীরা বুঝতে পারে– আমার নিশ্চয় ক্রোধের অধিকার আছে, কিন্তু নির্দয় হতে পারি না।নীরা বুঝতে পারে– আমার হৃদয় চূর্ণ হওয়ার পরেও জগৎ এই ব্যথা উদযাপনের জন্য কখনো স্থির থাকে না। নীরা তারপর মনে-মনে থিতু হয়– এবং আলো-আঁধার পথ হাঁটতে-হাঁটতে আত্মার কাছে নিবেদিত হয়– সবকিছু জেনে আমি ক্ষমা করছি তোমাদের; কারণ অপমান, ক্রোধ, ঘৃণা আমাকে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বড্ড ভারগ্রস্ত করেছে। কে জানে আমি হয়তো তোমাদের ঠিক কথাটি কখনো বলতে পারি নি। আসলে আমি আমার ক্ষুদ্রত্বকে ক্ষমা করি, মহত্ত্ব প্রমাণের জন্য নয়, যেন তোমাদের কাছে পৌঁছানোর সময় আমি সেদিন নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাই।

রাঢ়বঙ্গ, দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৪, রাজশাহী

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গঃ তারাপুরের বামা ক্ষ্যাপা এবং বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবা কথা

Rabindranath Tagore

বর্তমান রচনাটি প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ***তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ*** (তিন খণ্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৩) গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এই অংশ দুইটির পৃথক কোনো শিরোনাম মূল বইতে ছিল না। এখানে অংশ দুইটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে **তারাপুরের বামা ক্ষ্যাপার কথা** (২৮৯–৩৩৫ পৃষ্ঠা) এবং **বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবার কথা** (১২৫–২০০ পৃষ্ঠা)। এই দুই অংশের

কোনোটিই এখানে একটানা ছাপা হয় নি – মধ্যে মধ্যে অংশবিশেষ বাদ দেওয়া হয়েছে স্থানাভাবে। বাদ দেওয়া অংশগুলো ত্রিবিন্দু (...) দিয়ে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। মূল গ্রন্থটিতে রচনার অংশগুলো বিন্যস্ত ছিল ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি ক্রম অনুসারে। এখানে আমরা এইসব সংখ্যাসূচক উপশিরোনামগুলো মূল বইয়ের মতো করে রেখে দিয়েছি।

'প্রধানত' চিত্রশিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে পর্যটন করেছিলেন। আলোচ্য বইয়ের শুরুতে 'কয়েকটি কথা'য় তিনি জানিয়েছেন, 'তখনকার দিনে সংসারকে ভয়, সেই হেতু সংসার থেকে পালিয়েই বেড়াতাম আর তাতেই এতটা ভ্রমণ-অবকাশে নানাপ্রকার সাধুসঙ্গের যোগাযোগ ঘটেছিল।' তাঁর ভাষায়, 'তখন দীর্ঘ পর্য্যটনে আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল একখানি খাতা, আর তার বুকে-ঢাকা একটি পেন্সিল। তার পাতায় পাতায় ছিল গান আর নানা কথা টোকা, আর ছিল সাধুসঙ্গের নানা আলোচনার নোট। আরও ছিল অনেকগুলি সাধুসজ্জনের স্কেচ – যে সব মূর্ত্তি আমার মনে সাড়া তুলেছিল। ... এই হল তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গের গোড়ার কথা।'

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই সাধুসঙ্গ বিষয়ক রচনাগুলো একে একে প্রকাশ পেতে শুরু করে ১৯৩৬ সাল থেকে। পরে সেগুলো গ্রন্থাকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে এবং আরও পরে অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়।

প্রসঙ্গত, বক্রেশ্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর মহকুমার একটি শহর। বক্রেশ্বর শব্দটি এসেছে স্থানীয় বক্রেশ্বর শিবের নাম অনুসারে। বক্র শব্দটির অর্থ বাঁকা; ঈশ্বর অর্থে ভগবান। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, সত্যযুগে লক্ষ্মী ও নারায়ণের বিবাহ অনুষ্ঠানে সুব্রত মুণি দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অপমানিত হন। ক্রুদ্ধ ঋষির দেহ আটটি বাঁকে বেঁকে যায়। তিনি অষ্টাবক্র ঋষি নামে পরিচিত হন। বহু বছর শিবের তপস্যা করে ঋষি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই ঋষির নামানুসারে জায়গাটিরনাম হয় বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বর শাক্তধর্মের পবিত্র ৫১টি সতীপীঠ বা শক্তিপীঠের অন্যতম এবং একটি গুরুত্ব-পূর্ণ তীর্থ। এরকমই আরেকটি শক্তিপীঠ হচ্ছে তারাপীঠ (বা তারাপুর)। এটিও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় দ্বারকা নদীর তীরে, রামপুরহাট শহর হতে ৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী। এই শহর তান্ত্রিক দেবী তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য খ্যাত। তারাপীঠ এখানকার 'পাগলা সন্ন্যাসী' বামা ক্ষ্যাপার জন্য প্রসিদ্ধ। বামা ক্ষ্যাপা এই মন্দিরে পূজা করতেন এবং মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রে কৈলাসপতি বাবা নামে এক তান্ত্রিকের কাছে তন্ত্রসাধনা করতেন। বামাক্ষ্যাপা তারা দেবীর পূজাতেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মন্দিরের অদূরেই তাঁর আশ্রম অবস্থিত। (দ্রষ্টব্য: 'বক্রেশ্বর'; 'শক্তিপীঠ'; 'তারাপীঠ' – বাংলা উইকিপিডিয়া।)

এই রচনার সাথে লেখকের আদি স্কেচগুলো ছেপে দেয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে পৃষ্ঠাসজ্জার স্বার্থে নয় মোটেও। স্কেচগুলোকে বরং মূল রচনার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। — *সম্পাদক*

তারাপুরের বামা ক্ষ্যাপার কথা

১

তারাপুর আসিতে মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে যতটা, বোধ হয় রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে তার চেয়ে একটু বেশী হাঁটিতে হয়। আমি এখানে মল্লারপুর হইয়াই আসিয়াছিলাম। মাঠের পথে, অনেকটা দূর হইতে তারা-মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। তারাপুর গ্রামখানি ধানজমি হইতে অনেকটাই উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। বর্ষাকাল, পথে কাদা হইয়াছে। গ্রামখানি বড় অপরিষ্কার, গ্রামের মধ্যে রাস্তাটায় দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মন্দির সংলগ্ন স্থান, ক্ষ্যাপাবাবার কুটির। শ্মশান-ক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত স্থান, দ্বারকা নদী পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শ্মশানে দেখিলাম ছোট্ট ছোট্ট জাম নীচে পড়িয়া আছে, এইরূপ জামগাছ এখানে অনেক।

গিয়া উঠিলাম একেবারেই বামার কুটিরে অথবা চালাঘরের সম্মুখের চালায়। বামার ভালো নামটি বামদেব। তিনি কুটিরের বাহিরেই বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধ এবং অথর্ব অবস্থা তখন তাঁহার, বসিয়া বসিয়া যেন ঝিমাইতেছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের এক বান্ধব একবার এখানে ক্ষ্যাপার কাছে আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কাছে যেসব গল্প করিয়াছিলেন তাহাতে মানুষটিকে পিশাচ-সিদ্ধ মনে হইয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে তাঁহার নিজ মুখের একটা কথা এইরূপ; তাঁর কাছে বসে আছি, দেখলাম শ্মশান থেকে একটা কেলে কুকুর একটুক্‌রো মাংস মুখে করে এলো তিনি সেটা তার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিলেন, খানিকটা আবার তা থেকে ছিঁড়ে বার করে নিয়ে কুকুরটাকে খাইয়ে দিলেন, খা, খা বাবা খা, এই কথা বোলে। এখন এ সকল কথা আমার মনে ছিল; ভাবিতেছিলাম, সত্যই কি এই মানুষটি ঐ কাজ করিয়াছিলেন?

অবশ্য পাশ-মুক্ত হইলে মানুষের মনে ঘৃণার ভাব থাকে না, কোন দ্রব্য অথবা কোন ব্যক্তি অথবা কোন অবস্থার উপর ঘৃণার ভাবটা একেবারেই লোপ পায় জানা ছিল, সেইজন্য আরও বিশেষ করিয়াই দেখিতেছিলাম, ঐ মূর্তির মধ্যে যাহা আছে বাহিরে তাহার কিছু দেখা বা বুঝা যায় কিনা। যাহা হোক, তিনি ঝটিতি একবার চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলাম কি বিশালায়ত চক্ষু – তাহাতে লালের আভা। অবাক হইয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমে প্রণাম করি নাই। দুই একজন আরো যাঁহারা সেখানে ছিলেন, তাঁহাদের একজন বলিলেন: ইনি ক্ষ্যাপা বাবা যে, প্রণাম করলেন না! আমি তখন উঠিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার মূর্তিতে এমন একটি আকর্ষণ আছে যাহাতে প্রণামের কথা মনেই হয় নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: কোথা হতে আসা হচ্ছে বাবা!

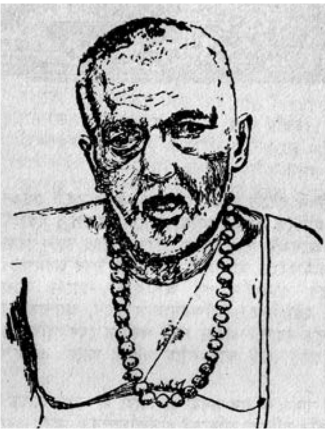

আমি অট্টহাসের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন: ওখানে গৌরীকান্ত ভৈরব আছে নাকি? আমি বলিলাম: নামটি তাঁর জানি না তো। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পর তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে চলিয়া গেলেন। বাবার সঙ্গে দুই একজন ভক্তও গেলেন, আমিও উঠিয়া সরোবর এবং মন্দিরাদি স্থান দেখিতে লাগিলাম।

মন্দিরটি পুরানো, বাংলার বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্য– তাহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য ততটা নাই, পোড়া ইটের নানাপ্রকার গড়ন আছে, মন্দিরসংলগ্ন ভোগ রান্নার স্থান, বিশাল প্রাঙ্গণ– চারিদিকেই প্রাচীর। বক্রেশ্বর কালীবাড়ীর যে ভাবের সংস্থান তারামন্দির তাহাপেক্ষা অনেক প্রাচীন, উন্নত, সুরক্ষিত এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ। স্থানটি দেখিয়াই আমার প্রাণে আনন্দ হইল, ভাবিলাম, কিছুদিন এখানে থাকিব। মন্দির পার্শ্বেই একটি ঘাট-বাঁধানো রম্য সরোবর।

একটি ব্যক্তি শ্যামবর্ণ, মধ্য আকারের, দীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু দুটি– নামটি তার নগেন পাণ্ডা। তিনি ঘাটের চাতালে বসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। এখানে পাণ্ডাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী, নগেন পাণ্ডা এখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বলিতে হইবে না, ইনি একজন গোঁড়া তান্ত্রিক। গলায় তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কবচ। চরস আর গাঁজাই হইল সারাদিনের চল্‌তি নেশা। 'কারণ'টা রাত্রেই চলে। একজন যুবা, বেশ ফর্সা রং, চক্ষু দুইটি তার কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রোগা শরীর, বড় বড় চুল, অল্প গোঁফ দাড়ি– তিনি

বাবার কুটীরের সব সময় সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধান করেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, আবার গাঁজা ডলাই-মলাই করেন আর শেষে বাবার প্রসাদ পান।

স্নানাদি সারিয়া লইলাম। শুনিলাম, দ্বিপ্রহরের পর মা'র মন্দিরে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা। এখনও অনেক দেরী দেখিয়া শ্মশানের দিকে বেড়াইতে গেলাম। বেশ বিস্তৃত শ্মশান। তাহার মধ্যে জাম গাছই যেন বেশী। পথ হইতে নদীতীরে অনেকটা লম্বা শ্মশানভূমি। চারিদিকেই নর-কপাল ও অস্থির ছড়াছড়ি। বামার সাধন-স্থানটুকু বেশ চওড়া করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেদিনটা এইভাবে দেখাশুনা করিয়াই কাটাইলাম। রাত্রে বাবার আশ্রম-কুটীরের চালার একপার্শ্বে শয়নস্থান ঠিক করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি একপার্শ্বে আর বাবার ঘরে সেই অধ্যক্ষ যুবাটি — অপর পার্শ্বে।

সকালে বাবা পুকুরঘাটে বসিয়াছিলেন — সঙ্গে পাণ্ডাদেরও কেহ কেহ ছিলেন। শরীর খারাপ যাইতেছিল কয়দিন, আজ স্নান করিবেন। একটি শিশু বালককে যেমন করিয়া স্নান করানো হয়, বাবাকে সেইরকম সকলে মিলিয়া স্নান করাইয়া দিল। তারপর বাবা একটু ধূমপান করিলেন।

আজ সারাদিন এত বাইরের ভক্তগণের আমদানি ছিল যে একটু শান্তিতে কথা কহিতে বা তাঁহার কাছে কিছু আসল কথা শুনিতে পাই নাই।

বৈকালে একটু ফাঁক পড়িল,— বাবা তখন বিশ্রাম করিতেছিলেন,— আমি গিয়া বসিলাম। নগেন পাণ্ডা ও আরও সব কে কে ছিল যেন।

একজন আসিয়া বলিল: বাবা— বাবু আইচেন যে, তাঁর মেয়্যাঁও আইচে, ছেল্যাকে নিয়া আইচেন— আপনাকে দেখাতে। মন্দির-বাড়ীতে আছেন, এই আসবেন এইখানে এখনি। মেয়্যাঁ অর্থাৎ স্ত্রী।

বাবা কিছুই বলিলেন না, না—রাম, না—গঙ্গা।

কতক্ষণ পরে একটি ভদ্রলোক সঙ্গে স্ত্রী, কোলে একটি এক বৎসরের ক্ষুদ্র রুগ্ন শিশু সন্তান, আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

বাবা বলিলেন: তোর ছেলেকে নিয়ে এয়ছিস্?— কিন্তু ওরকম নিয়ে এলে হবে না, তুই ওকে আমায় দিতে পারবি?

ভদ্রব্যক্তি বড় কাতরকণ্ঠে তাঁহার চরণের প্রান্তে মস্তক-স্পর্শ করিয়া বলিলেন: বাবা এ আপনারই সন্তান, আমার নয়, যা আপনার ইচ্ছা তাই হবে বাবা—

আচ্ছা, আচ্ছা। বেশ ত বল্লি,— এখন যা বলি, তাই কর দিকি! ছেলেটার গা থেকে সব কাপড় খুলে নে— নিয়ে ঐ শ্মশানের উপর মাটিতে ফেলে রেখে আয় গা, যা।

শুনিয়া জননী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রাণে বল ছিল, তিনি বলিলেন: তোমার কান্না কেন? যাঁর ছেলে তিনি যেখানে

রাখতে বোলবেন সেইখানেই রাখতে হবে। চলো, ওঠো–

স্নেহ-কাতরা জননী মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিলেন: ওখানে শেয়াল কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে যে– কি ক'রে ওখানে,–

স্বামী কোন কথায় কান না দিয়া – চলো চলো, ওঠো – বলিয়া সন্তানকে কোলে লইয়া চলিলেন। জননীও উঠিতেছিলেন, বাবা তাঁহাকে বলিলেন: মা, ওখানে তুই যাবি কেনে, তুই হেথা বসে থাক, বাবা আসুন, এলে যাবি গা।

কাজেই তিনি বসিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্যে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণেই তাঁহার স্বামী আসিলেন। তখন বাবা বলিলেন: যা তোরা এখান হোতে চলে যা, যেয়ে মন্দিরে বোস্ গা যা। তাঁহারা আবার বাবাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বাবা তখন তাঁহারই একজনকে বলিলেন: দেখ ত বাবা কেলোটা কোথা?

একটু উঠিয়া সে ব্যক্তি বাহিরে দাঁড়াইয়া বড় গলায় 'কেলো' কেলো' 'কেলো' বলিয়া ডাকিলেন, অল্পক্ষণেই ফিরিয়া আসিলেন– সঙ্গে এক কালো কুকুর।

কুকুরটা ভয়ানক কালো, দেশী গ্রাম্য কুকুর হিসাবে বেশ বড়, চক্ষু দুইটি যেন জ্বলিতেছে। সে আসিয়া বাবার কাছে সুমুখের পা দুটি ছড়াইয়া তাহার উপর মাথাটি রাখিয়া দিল। বাবা তাহার গায়ে হাত দিয়া একটু আদর করিলেন তারপর যেমন করিয়া আপন অনুগতজনকে আজ্ঞা করেন, সেই ভাবে বলিলেন– যা কেলো, তুই শ্মশানে ছেলেটাকে দ্যাখ গা যা। শুনিবামাত্রই কুকুরটি উঠিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল। বাবা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যে সকল ব্যক্তি ওখানে ছিলেন– তিন চারটি

লোক, একটা আতঙ্কে সকলেই যেন অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে বাক্য নাই।

আমার একবার মনে হইল— দেখিয়া আসি শিশুটি কীভাবে শ্মশানে পড়িয়া আছে। কিন্তু কৌতূহল থাকিলেও বিস্ময় এবং একটা আতঙ্ক মিলিয়া এমন একটি ভাবে আমায় অভিভূত করিয়াছিল, আমি উঠিতেই পারিলাম না।

দ্বিপ্রহরের পর প্রসাদ পাইবার সময় ওখানে সকলে সমবেত হইলে দেখিয়াছিলাম, সেই ভদ্র ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে একটি বিষাদের ছায়া।

আমরা প্রায় পাশাপাশি বসিয়াছিলাম, কিছু কথাবার্তাও হইয়াছিল। পরিচয়ে জানিলাম, কলিকাতায় থাকেন এবং রেল অফিসে কর্ম্ম করেন, নিজ বাড়ী জিরেট বলাগড়। সন্তান হইয়া বাঁচে না, চারিটি সন্তান শিশুকালেই গিয়াছে— এইবার তাই বাবার কাছে আনিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষেই বাবার শিষ্য, সাত বৎসর। বাবা বৈকালে যাইতে বলিয়াছেন ছেলেটিকে লইয়া—

প্রায় দেড়টা নাগাৎ প্রসাদ পাওয়ার পর যখন আমি বাবার কুটীরে আসিয়া বসিলাম তখন বাবা নিজ-শয্যায় শুইয়াছিলেন, ঘুমান নাই। পাশে একজন বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে তিনি শুইয়া আছেন; দুই একটি কথা অস্পষ্ট গোঙানির মত মধ্যে মধ্যে আমার কানে আসিতেছিল। তাঁহার আওয়াজই ঐরূপ, অবশ্য বয়স হইয়াছিল বলিয়াও বটে, তাহার উপর দাঁতগুলি বোধ হয় বেশীর ভাগই গিয়াছে— সেইজন্য কথা কহিতে গেলে গলার স্বর ঐরূপ অস্পষ্ট হইত।

যিনি বাতাস করিতেছিলেন, তিনি নিকটেই ছিলেন— আমি ছিলাম কতকটা দূরে, বাহিরের দিকে। সেই কালো কুকুরটি ছাড়া অপর চারটি কুকুর বাবার ঘরের দরজার নিকটেই শুইয়াছিল। একটি সাদা, একটি লাল, একটি হলুদ রং, অপরটি খয়ের রং— বোধ হয় উহাদের মধ্যে সাদাটি গর্ভবতী ছিল, সে মধ্যে মধ্যে বাবার কাছে যাইতেছিল; তখন বাবা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছিলেন। কুকুরগুলির উপর বাবার অসীম স্নেহ দেখিলাম। উহাদের নাম আছে। যথা— কেলো, ভুলো, শ্বেতফুলি, লালি এইরূপ।

বেলা তিনটা নাগাৎ বাবা উঠিলেন,— গাঁজা চলিল, তারপর বাবা আমার দিকে দেখাইয়া বলিলেন: ওঁকে দাও।

নগেন্দ্র পাণ্ডা বলিলেন: উনি এ সব খান না। বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি ব্রহ্মচারী বট!

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম: না না আমি গৃহী,— আপনাকে দর্শন করতেই এখানে এসেছি।

শুনিয়া বাবা বলিলেন: তোমার কিছু অসুখ আছে নাকি?

আমি বলিলাম: না, আমার শরীরে কিছু অসুখ নেই। তবে ভবব্যাধি যদি বলেন তা আছে।

বাবা: শরীরে অসুখ-বিসুখ কিছুই নেই, তবে আমার কাছে কি করতে এয়েছ?

আমি: অসুখ কি ব্যাধি না থাকলে কি আপনার কাছে আসতে নেই?

তিনি: কৈ, কঠিন রোগ না হলে ত কেউ আমার কাছে আসে না। ঐ দেখ না, এক মরা ছেলে নিয়ে এলো গা, বাঁচিয়ে দাও,– আমি কি করবো, তারা-মা যা করবেন, তাই হবে। আমি কি ডাক্তার বটি?

তখন দেখিলাম, বাবার ভাবটি বেশ প্রফুল্ল।

কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে গরদের জামা-চাদর-পরা মোটাসোটা একজন ধনবান ভদ্রলোক আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন।

বাবা মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিলেন: কে, অমর্ত?

হ্যাঁ বাবা! বলিয়া তিনি আবার প্রণাম করিলেন।

মেয়্যাঁটি মারা গেছে বটে?

তিনি বলিলেন: কি আর বোলব বাবা, মার ইচ্ছা। তারপর,— অসুখের সমস্ত ইতিহাস বিবৃতি, সে কথায় আমাদের কাজ নাই।

বাবা আমাদের বড়ই সরল লোক। এতটা বয়স হইয়াছে কিন্তু গম্ভীর বলিয়া ধরিবার যো নাই। আমাদের পক্ষে তাঁর ভাষা বুঝা শক্ত। কারণ একে ত বাবা পল্লীগ্রামের মানুষ, তার উপর তাঁহার কথা সংক্ষিপ্ত— বুঝিয়া লইতে পারি, কিন্তু ব্যাখ্যায় বড় হইয়া যায়। সেই জন্য মাঝে মাঝে ঠিক বাবার উক্তিগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া বলিবার চেষ্টাই করিতেছি।

বাবা খুব রসিক লোক, বোধ হয় তাঁর প্রত্যেক কথাই রসিকতা-মাখানো। একটা কথা বলিয়া এমনভাবে মুখের দিকে চাহিবেন, যাহাতে কথার সহজ রহস্যটি অনুভব করা যায়— তবে তিনি গম্ভীর, নিজে যেন ধরা দিতে চান না। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্যও রহস্য-মাখানো। এইভাবে তিনি কথা কহিতেন। আজ সকালে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া কিছু শুনিব বলিয়াই বাবার কাছে গিয়া বসিয়াছি। একজন নিয়তই তাঁর কাছে আছে, উঠা-বসায় সাহায্য করিতেছে। ব্যাধি তাঁর বিশেষ-কিছু আছে বলিয়া বোধ হইল না, কিন্তু কেমন অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন, কথা সব সময়েই চলিতেছে, মাঝে-মাঝে অতি করুণ, হৃদয়ভেদী-স্বরে, মা, কিম্বা তারা, তারা, বলিয়া ডাকিতেছেন। চক্ষু যেন জল-ভরা, রক্তবর্ণ, তাহাতে জ্যোতি। যখন আমার দিকে চাহিলেন, মনে হইল একেবারে আমাকে গ্রাস করিয়া লইলেন। একটু ভয় হয় সে চাহনি দেখিলে;— কিন্তু কথা শুনিলে সাহস আসে।

আমার দিকে চাহিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন, বাবা, বড় ছোট বেলায় ঘর ছেড়েছ,— গিন্নিটি কি মনের মত হোলো না বুঝি?—

আমি চুপ করিয়াই থাকিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু জবাব দিতে হইল। বলিলাম: আমি ত ঘর ছাড়ি নি!

তিনি: ঐ হোলো, বৈরিগীর খাঁচা নিয়ে ত ঘোরা-ফেরা হচ্ছে! কিছু বলিলাম না দেখিয়া তিনি নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, যথা— বেশ করে ঝেড়ে, দমভোর যৌবনটা ভোগ করে এলে ভালো হোতো বাবা, বুঝছ না! দুটি চারটি ফলও হয়ত হোতো, জীবনের রসটা ভালো করে ভোগ করলে যোগটা ভালোই হোতো তাই বলছি।

এমন সময় কলিকাতার বাবুটি তাঁর সেই রুগ্‌ণ সন্তানটি কোলে, প্রফুল্ল মনে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন, পশ্চাতে স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবার সহচর সেবকও গাঁজার কলিকাটি সেই সময় লইয়া বাবার হাতে পৌঁছাইয়া দিলেন। বাবা প্রফুল্লভাবে বলিলেন:— কেমন তোর ছেলে ত বাঁচল?

সে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ-গদ স্বরে বলিলেন: বাবা, এ ত আপনার, আমার ছেলে কেন বলছেন?

বাবা বলিলেন: মা-ই বাঁচিয়েছেন— আমার কি সাধ্য— ও কথা বলতে নেই। তবে তোকে ত মানুষ করতে হবে। আমি ত ওকে মানুষ করতে পারবো না। যা— ঘরে যা, যেয়ে তারা মার নামে ওকে ডাকবি। সে ব্যক্তি তখন পকেট হইতে কি একটা বস্তু তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া কি ভাবিয়া আবার রাখিয়া দিলেন, পরে বলিলেন: ও বেলা যাবো তখন আমরা, এ বেলা প্রসাদ খাবো এখানে। তবুও বাবাকে ত কিছুক্ষণ দেখতে পাবো। বাবার সঙ্গে আমাদের—

বাবা বাধা দিয়া বলিলেন: সব শালা চোর এখানে,— টাকা-কড়ি দিস না, কোথায় রাখবো। তার চেয়ে কিছু মাল দিয়ে যাস্ । মাল অর্থে নেশার জিনিস।

বাবা এবার কলিকাটি লইয়া টান দিলেন, একটি কেমন আওয়াজ হইল। এমন কখনও শুনি নাই। প্রসাদ লইয়া সেবক পশ্চাতে বসিয়া গেল।

সেই ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বাবা তখন আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: এই দেখ কেমন গেরস্ত সংসারী, সাধনও আছে মার কৃপায় আবার সংসারী, কাজকর্মও হচ্ছে। ছাড়াছাড়ি নেই, সংসারকে ভয় নেই। এমন না হোলে মার কৃপা হবে কেন? বাবাজীর গোড়ায় গলদ।

আমি বলিলাম: খুলে বলুন, তা হোলে বুঝতে পারবো।

তিনি: ঐ ত গোড়াতেই ভয়। ঘরে থাকবো না বাইরে যাবো। শেষে ভেবেছিস কি ধাধায় পড়তে হবে নি? মাকে ত জানো নাই বাবা— সে কেমন মেয়্যঁ,— দেখবে তখন বুঝবে যখন ঘোরপাক খাওয়াবেক।

আমি বলিলাম: যদি বলি মা-ই ত সব করাচ্চেন।

বাবা তখন সেই ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া আমাক দেখাইয়া বলিলেন: এই দেখ্ ঠ্যাঁটা,— যদি মা-ই সব করে থাকে জানছিস, তবে অত হিসাব করে সব কাজ করছিস কেনে? মা-কে ধরে এক জায়গা বসে থাকগা যা না!

আমার এ সময় তর্ক-বিতর্ক আনার অভিপ্রায় নয়, উদ্দেশ্য বরং সাধুসঙ্গ করা— তার ফলে যদি কিছু পাওয়া যায়। বামাক্ষ্যাপারও শরীর খারাপ। মনে হয় ইহার পর এক বৎসরের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন আমি কলিকাতায়। যাহা হউক এখন আর কিছু বলিলাম না।

আমার যেমন ধারণা হইয়াছিল— অন্যান্য সাধু যেমন লোক-সঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, কিছু জানিতে বা বুঝিতে চাহিলে বিশেষভাবে ধরিতে হয়, বাবার সে-সব নাই। কারণ বাবার সর্বদাই শিশুর মত ভাব, বিচার-বুদ্ধি পূর্বক কিছু বলেন বা করেন তাহা বোধ হইল না। যখন তিনি কারও সঙ্গে কথা কন, সে কথার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তাহা বুঝা যায় না, আর তাঁর ভাষা এমন যে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না তাহা বলিয়াছি। যাঁহারা নিয়তই তাঁহার কাছে থাকেন তাঁহারা ব্যতীত অন্যস্থানের লোক চট্ করিয়া তাঁহার কথা ধরিতে পারেন না।

ভাবিলাম, ওখানকার একজনকে না ধরিলে তাঁহার সঙ্গে কথা কওয়ার সুবিধা হইবে না। নগেন পাণ্ডা বলিয়া একজনের কথা বলিয়াছি– বাবার সঙ্গ লাভের আশায় গিয়াছি এবং আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া এখানে কিছু সাহায্যের জন্য কাল অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমার মনে হইল তাঁহার পরিচিত এবং ভক্ত-বিশেষ ব্যতীত বাবা আর কাহাকেও তেমন আমল দিবেন না। কিন্তু নগেন পাণ্ডা বলিল যে উহা ঠিক নয়, বাবার স্বভাবই ঐরূপ, তাঁহাকে জোর করিয়া না ধরিতে পারিলে, নতুন লোক হোক বা পরিচিতই হোক কেহ সহজে তাঁর কৃপা বা স্নেহ পাইতে পারে না। তারপর যে ব্যক্তি যে ভাবের, যে দলের অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোক তিনি তাহা বুঝিতে পারেন, এবং সেই ভাবেই তার সঙ্গে ব্যবহারও করিয়া থাকেন। নগেন বলিল, যদি আমি তামাক বা গাঁজা প্রভৃতি খাইতে পারিতাম তাহা হইলে সুবিধা হইত। অর্থাৎ সেখানে চট করিয়া স্থান পাইতাম, বাবারও অনুগ্রহ হইত। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, উহা ঠিক নয়।

যাহা হউক, এখন নগেন পাণ্ডা বাবাকে আমার সম্বন্ধে বলিল: বাবা, ইনি আপনার কাছে কিছু শুনতে চান, সেইজন্যই এসেছেন। শুনিয়া বাবা বলিলেন: ওঃ– কথা শুনতে এসেছে? এই-ত কথা হচ্ছে, শুনে যাও,– কিছু দক্ষিণে এনেছ? বাবা রসিক লোক। দক্ষিণে অর্থাৎ গাঁজা আমি বুঝিতে পারি নাই, নগেন বুঝিয়াছিল সেইজন্য বলিল, উনি ওসব পছন্দ করেন না, তা ছাড়া উনি ছেলেমানুষ, ওঁর কাছে ওসব কিছু নাই। উনি বেদাচারী।

বাবা বলিলেন: তবে কালী বল তারা বল, বাবা! মায়ের নামই সার, আর কি করতে পারবি বল। আমরা মদ ভাং খাই আর মায়ের চরণে পড়ে থাকি, মা যা করেন। আর কিছু কথাবার্তা তো জানি না। বলিয়া একবার, তারা-মা, এমন অপূর্বভাবে বলিলেন যে তাহা শুনিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। যেমন শিশু মাকে ডাকে সেইরূপ তাঁহার মধ্যে একটি জীবন্ত এবং ব্যাকুল অনুভুতি।

তারপর বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন: হ্যাঁ, বাবা, তোমার গুণের কথা ত কিছু জানলাম না।

আমি বলিলাম: আপনার কাছে এসেছি, আমাকে দয়া করুন। আমার ত গুণ এমন কিছু নাই যার কথা বলে আপনাকে খুশী করতে পারবো।

তিনি বলিলেন: তা হোক, মুখে যে গুণের কথা লেখা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বাবা, লুকালে হবেক কেনে।

সস্ত্রীক ভদ্রলোকটি শিশু-কোলে, এই সময় বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মন্দিরের দিকে গেলেন।

এমন সময় বেশ হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ শরীর, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চক্ষু, উজ্জ্বল কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লাল কাপড়-পরা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ হইবে,– এক ব্যক্তি আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া বসিল। বাবা নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন সজীব হইয়া উঠিলেন, বলিলেন: সাঁইতে থেকে এই এলি নাকি?

সে ব্যক্তি বলিল: মজুমদার মশাইও এসেছে, দুপুরে আপনার কাছেই আসবে বলে গাঁয়ের মধ্যে গেল। কাল সারা রাত ধরেই কাজ চলেছিল– দেখছি উয়ার মনের গতিক ভালো নয়।

বাবা বলিলেন: তবে উ মরবে গা, ক্রিয়া-কর্ম না করে শুধু কারণ খেয়ে ফুর্তি করবো বল্লেই কি মার দয়া হয়,– উয়ার কথায় আর কাজ নাই,– মা বুঝবেন গা। তু একটা মায়ের নাম কর– সেই ভালো হবে।

তখন সেই ব্যক্তি বেশ সতেজ গলায় রাজা রামকৃষ্ণের একখানি গান ধরিল,–

দীন-তারিণী, দূরিতবারিণী, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণাধারিনী,
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বাস্বরূপিণী।

সে গানটি এমনই মধুর– শুনিতে শুনিতে বাবার চক্ষে আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। গানের শেষ লাইনটিও মনে আছে–

বৈশেষিক বেদান্ত নাহি পেয়ে অন্ত, অনন্ত তোমায় চিনিতে পারেনি।

তারপর বাবা বলিলেন: সেইটা বলত! নগেন পাণ্ডা বলিল: কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে– সেইটা? তখন তিনি সেইটি ধরলেন–

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে বিষয়-বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়া মহতত্ত্ব, ছাড়ি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
সর্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনে আপনে।

গানখানি শেষ হইলে গাঁজা চলিল, বাবা প্রসাদ করিলেন। বাবা দুলিতেছেন,

চক্ষে ধারা, আবার টানিতেছেন,– শেষে কাশিতে কশিতে ছিলিম্‌টা ভক্তের হাতে দিলেন।

নগেন পাণ্ডাও প্রসাদ পাইল, পাইয়া উঠিয়া গেল। তখন বাবার দিকে চাহিয়া একজন বলিল: আপনার কাছে আমার কথা আছে বাবা। বাবা বলিলেন: বল কেনে। কিন্তু সে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, ভাবটা এই যে আমার সম্মুখে অর্থাৎ আমি সেখানে থাকায়, তাহার কথা বলিতে আপত্তি আছে। দেখিয়া আমি তখনই নদীতীরে শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া এক জামগাছের তলায় বসিলাম। ভাবিতেছিলাম এখানে কি করিতে আসিলাম, কেনইবা আসিলাম। বাবার সাঙ্গোপাঙ্গ এমনভাবে ঘিরিয়া আছেন নিরিবিলি একটু যে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিব তার যো নাই। মনটা খারাপ হইয়া গেল। এখানে আর থাকিব কি না ভাবিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল: বাবা আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

২

অন্তরে একটু বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম হয়ত বাবার দয়া হইয়াছে। গিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে না বসিতেই তিনি বলিলেন: বাবা, মনে দুঃখ পেলে তাই ডাকলাম। তা উ শালা আমায় যে চুরির কথা বলে–সে হয়ে গেছে উ কথায় আর কাজ কি, যা হয়ে গেছে তার কথায় আবশ্যক কি আছে। তু গান করিস নাকি? ছিরচণ* তু কি বলিস?

ঐ ছিরচণই গোপনীয় কথা বলিয়া আমায় উঠাইয়া ছিল। সে ব্যক্তি সায় দিল, বলিল: হ্যাঁ উঁয়ার কলকাতার গান একটা হোক না।

আমি তো অবাক, শেষে অব্যাহতি পাইলাম একখানা ব্রাহ্ম-সঙ্গীত গাহিয়া। বাবা বলিলেন: তোর স্বরটা নরম বটে।

ঐ ছিচরণ দেখিলাম, তখন হইতে আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বাবার সভায় গাঁজা-প্রসাদ পাইয়া ছিচরণ উঠিল, আরও দুই তিন জন উঠিল। লোক কমিয়া গেলে আমারই সুবিধা। দুজন ছাড়া আর সব যখন গেল– আমি তখন বাবার কাছ ঘেঁষিয়া পায়ে হাত দিলাম। দিবামাত্রই বাবা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন: ওরে শালা পায়ে হাত দিতে হবেক নাই, তু বলনা কি বলিস। পায়ে হাত দিয়ে আমার মন ভুলাতে আইচিস্‌, খোসামুদ্যা!

আমি বলিলাম: আপনি তো মনের কথা বুঝেছেন, আপনি আমায় দয়া করুন।

---

* তাহার নামটি মনে নাই, হয় শ্রীচরণ গোবিন্দ কিংবা ঐরকম একটা কিছু হইবে। আর চুরির কথা এই যে, বাবার কিছু টাকা কিছুদিন পূর্বে চুরি হইয়া যায়– সে কথা যথাসময়ে হইবে।

তিনি বলিলেন: তু-ত এখন দুচার দিন এখানে থাকবি, একটু ঠাণ্ডা হ কেনে, তবে সব হবে যেঁয়ে। মনটা তোর ভালো বটে।

আমি বলিলাম: আপনি আমায় ঠাণ্ডা করে দিন। আমি বড়ই চঞ্চল।

তিনি: আমি করলে হবেক কেনে, তু আমার কথা লিবি কেনে। তোর এখন প্রাণটা ঘুরতে চাইচে, ঘুরতেও হবেক তোরে অনেক– তা বেশ, ঘোর না দিক কত। দেখ যেঁয়ে মায়ের কাণ্ডকারখানাটা। একটু থামিয়া মৃদুকণ্ঠে আবার বলিলেন, ঠাণ্ডা হতে চাস্তো আমি যা বলি তা শুন, আমি বলি ঘরকে যা। ঠাণ্ডা হোতে আর জায়গা কোথা, কোনখানে ঠাণ্ডা হোতে হবেক নাই। তোর মা বাবা আছে?

আমি: হ্যাঁ, বাবা, মা, ঠাকুরমা, দিদিমা–

তিনি: আর বলেতে হবেক নাই–ঐ হয়েছে ঘরে যেঁয়ে বাপ মায়ের চরণ পূজা করগা, তাইতেই, সব পাবি গা, সব হবে। শুনিয়া আমার মনে হইল যে আমাকে ভাগাইবার জন্য এরূপ ভাবের কথা বলিতেছেন!

আমি তখন বলিলাম: দেখুন, একটা অন্তরের কথা আজ আপনাকে বলছি। সদা সত্য কথা কহিবে, কখনও মিথ্যা বলিবে না, কাহারও কিছু চুরি করিবে না, প্রবঞ্চনা করিবে না, পিতা মাতার সেবা করিবে, তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে অথবা তাঁহাদের ভগবান জানিয়া মনে-প্রাণে অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের তুষ্ট রাখিবে ইত্যাদি ভালো ভালো কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি আর নীতি-পুস্তকে পড়ে আসছি কিন্তু প্রাণ ত চায় না তাঁদের দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে। ভগবানকে দেখতে পাই না, কল্পনায় তাই হয়ত বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করি– কিন্তু বাপ-মাকে চক্ষের সামনে নানাভাবে আমাদেরই মত সহজ ভাবেই পাই বোলে হয়ত ভগবানের মত ভাবতে কোন কালেই পারলুম না। কেমন যে এক দুর্বলতা এসে পড়ে– মনে মনে ঠিক করলেও কাজে পারি না।

তিনি বলিলেন: কেন রে–

আমি বলিলাম: বাপ-মার উপর ভগবানের ভাব এনে যে ব্যক্তি তা আমার আসে না। আমি তাঁদের সৎ-পুত্র হোতে পারলাম না,– আমার বাড়ী ভালো লাগে না, তাঁদের সঙ্গ ভালো লাগে না।

তিনি বললেন: হ্যাঁ দেখ আমার দিকে– যে যেমন ছেল্যা তার বাবা-মা– ভগবানও সেই রকম দেয়। তুই ঠ্যাঁটা হয়েছিস্ তাই উঁয়ারাও ত ঐ রকম হইচে। তু যদি ভালো,– সোজা রকম মানুষ হতিস্ উঁয়ারা ভালো হোতো। আসলে তু ত ভগবান চাস না, তুই হেথা-সেথা যাবি, আর করে বেড়াবি, এখন তাই তোর মন। তা তাই কর কেনে,– তবে বাপ-মাকে ভক্তি করে করবি, তাদের দোষ দেখে তাদের অমন হেলা করবি কেনে?

আমি: আপনার কথায় এখন তাই ভালো মনে হচ্ছে– কিন্তু তাঁদের ভগবান

বোলে ত ভাবতে পারি না– এইটাই বড় দুঃখ যে।

তিনি: মনে জানবি বুড়া বাপ-মাকে যে খেতে না দেয়, সেবা না করে সে শালা কোন দিনও ভগবানকে পাবে নাই।

আমি: বাবা আমার কাছে খেতে পরতে চান না– সে জন্যে ভাবনা নেই কিন্তু তিনি ত আসলে আমাদের এড়িয়ে থাকতে চান।– এখন আমরা মানুষ হয়েছি, আপনি চরে খাব, তাঁর কাছে আসবো না, কোন কিছু জানাবো না এই তিনি চান। তবে আমি উপার্জন করে যদি তাঁর হাতে এনে দিতে পারি– আর তাঁর কাছে কিছু আশা না করি তা হোলে তিনি সুখী হবেন।

তিনি: আমার কথা তুই ত নিচ্ছিস না,– আমি বলি তু তাদের সেবা করবি, তাদের প্রসন্ন রাখবি। তাতেই তোর কাজ হবেক।

আমি: আমার সেবা ত তিনি চান না–

তিনি: তু বড় ঠ্যাঁটা– তিনি চাইবে কেনে। তু আপনি করবি গা।

আমি: দেখুন সত্যি কথা, আমার এমন প্রবল ভক্তি নেই যে তিনি না চাইলেও আমার মনের জোরে তাঁকে আমার উপর সন্তুষ্ট করে নিজের জন্ম সার্থক করি। আমার মনে হয়, এখন তাঁর কাছ থেকে তফাতে থাকলেই ভালো হয়। দূরে থেকে যে টুকু ভক্তি শ্রদ্ধা মনে রাখতে পারি কাছে থাকলে, নানা প্রকার ব্যবহার দেখে তা পারি না। কাজেই তাতে লাভ নেই জেনেই আমি বাইরে দূরে দূরেই থাকি।

তিনি: দেখ্ তোর যখন বিয়া হইচে তখন তোর এমনটা ভাব তাঁদের ভালো লাগে নাই। তু ঘরকে যা চলে, মায়ের চরণ ধরে পড়ে থাকগা– সেই তোর এখন কাজ। টাকা আনবি, বাপের হাতে দিবি, সংসার ধর্ম্ম করবি, তাই ভালো।

বাবা এই সব কথাই বলিতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন তাঁর কথা আমার মনে ধরিতেছে না, তখন বলিলেন:

এই দেখ্ কেনে মানুষের বুদ্ধি– আমরা মুখ্যু, জানিস কিনা, কলেজে পড়ে পণ্ডিত হই নাই, শাস্তোর পড়ি নাই, কিছু জানি নাই, বল ত, বাপ মা বেঁচে থাকতে কোথায়, কোন শাস্তোরে ঘর ছেড়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে? তোরা এমনই ঠ্যাঁটা হয়েছিস, ঘরের ভগবান ফেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মরিস–তোর কি লাজ লাগে নাই?

আমি: দেখুন, সত্যিই আমি যে হতভাগা তাতে তোন সন্দেহ নেই,– না হ'লে বাপ মাকে ভগবান বোলে ভক্তি না করতে পেরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? সময় সময় যেন বুঝতেও পারি যে হয়ত আমি ঠিক কাজ করছি না– কিন্তু বাপের উপর ভগবান বোলে ভক্তি যদি না আসে ত কি করি, -বলে দিন আমাকে।

–কেন হয় না বল দেখি তোর,– আমি ত ছেলে-বেলা থেকে বাবা যা বলতো তাই শিরোধার্য্য করেছি। বাপে বোললে– চল গানের পালা গাইবি গা, আমি তখনি

গেছি। বাপে বোললে– ও কাজ করিস না, তখনি সে কাজে গুরুজ্ঞান করিচি। (গুরুজ্ঞান অর্থাৎ অনিষ্ট জ্ঞানে পরিত্যাগ) তু-ই পারিস না কেনে?

আমি বলিলাম: আপনার মত বুদ্ধি যদি আমার থাকবে, তাহলে আমার এমন অবস্থা কেন,– আমরা বেশী বুদ্ধিমান কিনা। বাপের মধ্যে অনেক দোষ দেখতে পাই। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এইসব নিত্য নিত্য দেখে আর ভক্তি থাকে না।

–আরে তু শালা, বাপের খুব ঠেঙ্গানী খেয়েছিস বুঝি?–আমি কি ঠেঙ্গানী খাইনি মনে করেছিস?– আমিও খুব খেয়েছি, মার হাতেও ঠেঙ্গানী খেয়েছি, তাতে কি হয় দোষ করেছিস মারবেন নাই।

আমি: ভগবানের কি অমন কাম ক্রোধ আছে, তিনি কি তাঁর সন্তানকে এমনভাবে পীড়ন করেন?

–আরে এটা বুঝিস না, বাঁকা ত্যাড়া একটা নোয়াকে সোজা করতে হলে পিটতে হয়– সোজা হোলে ত কথা ছিল না, তুই ত্যাড়া বাঁকা ছিলি, তাই ঠেঙ্গানী খেয়েছিস– ভগবান যাকে বলিস তিনি ঐ মা তারা, ওই কি মারে নি বাবা? উ-ও ত মারে সময় সময়– যখন দেখে যে না ঠ্যাঙ্গালে ছেল্যাটা সোজা হয় নাই– তখন দেয় খুব করে বসায়ে।

আপনার কথা শুনে এখন বুঝতে পারছি ব্যাপার, কিন্তু তখন ও সব ভাবতে পারি নি, তাঁদের দোষ বলেই ভেবেছি।

তিনি: আমি এত কথা কইব কেনে, তুই আপনি বুঝে লে না, তোর বুঝবার ইচ্ছা থাকলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন যেঁয়ে। তুর ভগবান আর কুথা আছে, যাদের থেকে ঐ শরীর হয়েছে তিনিই তুয়ার ভগবান। মা যিনি গভ্যে ধরেছেন তিনি ঐ মা, তাই বলি, ঘরকে চলে যা– যেঁয়ে করে দেখনা কেনে, ঠিক হবেগা।

আমি: তাঁরা চান আমি চাকরী করি উপার্জন করি– তাহোলে তাঁরা সুখী হন! কিন্তু আমার যে চাকরী করতে ভালো লাগে না।

তিনি: ঐ ত গাঁয়ের কুড়ের মরণ, কেনে তু চাকরী কর না তাতে দোষ কি?

আমি: চাকরি করতে আমার ইচ্ছা যায় না, কি করি বলুন দেখি?

তিনি: বাপ মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ কি, তাঁদের দ্বারা ছেল্যার কতটা ভালো হতে পারে, তার ধারণা এখনকার সন্তানদের ত নাইই, আবার বাপ মায়েরও নাই। এই কথা বলিয়া বাবা একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমার বোধ হইল ইনি দেখিতেছেন, আমি তাঁহার কথা কিরূপভাবে লইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কেন এমনটা হোল, বলুন,– আপনার মুখে শুনলে তবে যদি বুঝতে পারি।

তিনি তখন বলিলেন: তুই ঘরকে যেয়ে তাঁদের অনুগত হয়ে ভক্তি করে দেখগা যা, তাহলে সব বুঝতে পারবি।

আমি বলিলাম: জোর করে ভক্তি করা যায় কি? আমার প্রাণ যা-চায়, তা না পেলে তাঁকে কেমন করে ভক্তি করি– মনে হয় বাল্যকাল থেকেই আমার বাবাকে যমের মত ভয় করতে শিখেছি, তাঁকে দেখলেই আমার ভয় আসে মনে তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারি না, তিনিও আমাদের কাকেও নিজের কাছে নিয়ে দু'দণ্ড বসতে চান না। বড় হয়ে কাজের জন্য যে টুকু যাওয়া তাঁর নিজের দরকারমত ডাকেন, সেটি হয়ে গেলেই আর যেন কোন সম্বন্ধ নেই।

তিনি সব শুনিয়া বলিলেন: দেখ্ আমি মুখ্যু মানুষ, বড় বড় কথা জানিনি, সোজা কথা বলি শোন। তোর মধ্যে যে সব ভালো ভালো ভাব, জ্ঞান, ভক্তির এই যে সব ধারণা জন্মেছে– সেটা তুই কি করে পেলি আমায় বল দিকি?

আমি: আমার বোধ হয় আমি যেমন ভাব, সংস্কার নিয়ে জন্মেছি সেসবই এখানে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে–

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: ওরে ঠ্যাঁটা দুষমন কোতাকার, যে তোকে ছিষ্টি করেছে সে যদি তার গুণগুলা না দিয়ে ছিষ্টি করতো তা হোলে তু কোথা পেতিস বল দিকি আমায়? তোর ভিতরে যে যে গুণ আছে বোলে গরব করিস তু–সে সবই তোর জন্মদাতার দেওয়া– না হোলে তু পাবি কুতাকে– য়্যা–

আমি: তবে সে জিনিসগুলি আমি তাঁর মধ্যে আমার মনোমতভাবে দেখতে পাইনা কেন?

তিনি: তাঁর মধ্যে অবশ্যই তা আছে, তুই বুঝতে পারিস নাই, তবে তার প্রকাশের ধরণ আলাদা রকম এই যা,– এই দেখ্ তোর মধ্যে ভগবানে সহজ ভক্তিও আছে, আবার সন্দেহও আছে– সেই জন্যে তুই জ্ঞানের দিকটাই ভালো মনে করেছিস, আর তাই পাঁচ জায়গায় অম্বল চেকে বেড়াচ্ছিস– তোকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় তোর জন্মদাতারও ভগবানে সহজ ভক্তি আছে– আবার বিচার করতে গেলে সন্দেহ অবিশ্বাসও আছে, তবে তুই নিয়ে সে কিছু যাচাই করেনি, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, যার জন্যে তোর মনের মত ভাবগুলি তার মধ্যে দেখতে পাস নাই। আর ঐ যে তোর ভয় বলছিস্ ঐ ভয়টা তাঁর পীড়নের জন্যই হোক বা রাগী স্বভাবের জন্যই হোক সেটা ত ঐ ভক্তির আর এক ভাব। ভয় দিয়ে তোর সম্বন্ধটাকে জোর করে রেখে দিয়েছে। একটু বুদ্ধি করে ঐ বাপকে ধরলেই তোর সব কিছু হয়ে যায়– তাতে তারও কল্যাণ হয়, তোকে সৃষ্টি করা সার্থক হয়।

আমি: আমি বেশ ভালোই জানি তিনি আমাকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিতে চান না। তিনি আমাদের দূরে রাখতে চান।

একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,– সেটারও মানে আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম: কি তাঁর ভাব, দয়া করে বলুন শুনি।

তিনি: তিনি গোড়া থেকে যে সব ব্যবহার করেছেন সেগুলিকে তুই অন্যায়,

অত্যাচার ভেবেছিস, সেগুলা সে ত জানে, তাঁর মনে আছে, তু ত সেগুলা তাঁর অপরাধ বোলেই ধরে নিয়েছিস, মন থেকে মিটাতে পারিস নাই, সেই কারণেই ত সে আর তুর ঘেঁষ নিতে চায় নি। আবার এদিকে দেখ কেনে, তু যেমন তাকে ভালো দেখিস নাই, সেও ত তুকে তার মনের মত দেখে নাই, তু ত তার মনের মত হতে পারিস নাই, সে কেমন করে ঘেঁষ দিবেক তুকে? তোর দিক থেকেও তাঁকে যেমন বিচার করেছিস, তাঁর দিক থেকেও ত তোকে দেখতে হবেক। তা তুকে যদি সে না ল্যায় তু মনে কোন খোঁটা রাখিস না। সে পিতা, জন্ম দিইছে ত, তার লেগে মনে কিছু গোল রাখিস না,–

আমি বলিলাম: যদিও একটা ভয় গোড়া থেকেই আছে বটে কিন্তু তার জন্যে আমি বরং নিজেকে তাঁর কাছে অপরাধী মনে করি কারণ আমি যে ঠিক তাঁর মনের মত হোতে পারি নি সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি। দুঃখ একটু আমার মনে বরাবরই আছে যে, বাবার সঙ্গে আমার একটা প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারলো না, যা অন্য অনেকের আছে। যেখানে কোন সংসারে বাপে ছেলেতে একটা ভালোবাসার, প্রেমের সম্বন্ধ দেখি, আমার প্রাণটা হু হু করে ওঠে যে, আমার জীবনে সে সুকৃতি নেই। তবে আমি এটা জানি যে, তিনি আমায় মনে মনে ভালো বলেই জানেন, মুখে প্রকাশ করেন না।

তিনি: দেখ্ দেহ ফুরালে সম্বন্ধ ফুরায় নি। তু যত ভালো, যত বড় হবি সে তুর বাপ হয়েই থাকবেক, শেষ অবধি দুজনায় প্রেম না হোলে চলবে নি। তু ঠিক জানবি তার তুকে চাই, সে তুকে ভুলবেক নি। হেথায় যতটা দূরে সে থাকে, সেই পরলোকে আর তা নাই, সব সোজা হয়ে যায়। আচ্ছা, জন্মদাতার কথা ত হঁ্যা গেল, এখন মায়ের কথা বল দেখি তু মাকে তো পুজা করতে পারিস? মাকে তুষ্ট করলেও জগদম্বাকে পাবি।

আমি: দেখুন, মা আমার খুব ধার্মিক আর ভালোমানুষ, কিন্তু আমাদের সংসারে যত কিছু অশান্তি,– তার বেশীর ভাগ যিনি সংসারের কর্তা বা গিন্নি– তাদের উদার ব্যবহারের অভাবে কিম্বা সংকীর্ণতার ফলেই হয়ে থাকে। মেয়েমানুষের এইসব দুর্বলতা আমরা যদি উপেক্ষা করতে পারি তা হোলেই ভালো, না হোলে আমাদেরও তার মধ্যে জড়ায়, আর দুঃখের একশেষ করে। সেই জন্যেই আমার ধারণা হয়েছে যে সংসার থেকে বেরিয়ে না গেলে, সম্বন্ধচ্ছেদ না করলে, কোন প্রকারে আত্মকল্যাণ নেই। বাড়ীতে আমাদের নিত্যই অশান্তি, বাড়ীতে ত থাকতে পারি না কাজেই জননীকে সেবা আমার ঘটে ওঠে না,– মায়ের উপর আমার যে ভক্তি তা মনে মনেই থাকে।

তিনি বলিলেন: সে কথা লয়, অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে ঐ মাকেই জগৎজননী ধারণা করে তারই চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারলে, তোর আর অন্য

কিছুই দরকার হবে নি।

আমি: যে সব তত্ত্ব আমি জানতে চাই তা তো মায়ের কাছে পাই না, তিনি লেখাপড়া বা জ্ঞান-বিদ্যার ধার ধারেন না;– বাবাও কখন তাঁকে শিক্ষা দেন নি কিছু, কাজেই আমায় সেই জন্যে বাইরে আসতে হয়।

তিনি: যদি মনে প্রাণে ঐ মাকেই ইষ্ট বোলে বুঝতে পারিস ত ঐ থেকেই তু যা যা চাইবি সে সবই তোর মাঝে আপনি ফুটবে গা। তা তোর সে সব ত হবে না, আপনার মাকে ইষ্টদেবতা করে ধরা, একি সহজ কথা এ সবার হয় কি? তাই ত এত ঘোরপাক খেতে হয়্ ঘরে আছে ভগবান, তু তাকে চাবি না। তু কর কেনে যা তোর মন লাগে। হ্যাঁ দেখ্–, বাপে মায়ে মেল না হোলে সন্তান মেল হবে কি করে। বাপের এক ধাঁচা (প্রকৃতি) মায়েরও আর এক রকম, তার ফলও হবেক তেমনি।

আমি: সত্য কথা,– আমার মা বাবার কথা আমি জানি, বলতে পারি। বাবা আমার ভয়ঙ্কর বলবান, উদ্ধত প্রকৃতি, অনাচারী (ভোগী), আর মা আমার নিরীহ, ত্যাগী, শান্ত-শিষ্ট, নিরক্ষর, শুদ্ধাচারী, পূজা-তপস্যা-পরায়ণা, ভীরু স্বভাব–

তিনি: ঐ রকমই পনের গণ্ডা এখানে, কাজেই এ ভাবের ছেল্যা মেয়্যা জন্মাচ্ছে। হ্যাঁ দেখ্, তারা মা ঐ রকম মেয়্যাঁর সাথে ঐ রকম দস্যি পুরুষগুলার মেল করায়েঁ মনের মত মানুষ তৈরী করেন। আমরা তাঁর খেলা কি বুঝি তিনি কি ভাবে কি রকম মানুষ তৈরী করেন– কোন্ কাজে লাগান তা কি আমরা জানি? মা মা, তারা– বলিয়া বাবা অর্ন্তমুখী হইলেন।

এমন সময় বাবার পরিচারক ব্যতীত সকলেই উঠিয়া গেল। আমি আরো কাছে সরিয়া বসিলাম। বাবা স্থির নিস্পন্দ।

কতক্ষণ পর আমার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন: তোর ভালো হবেক, ইটা তোর উঠতি জন্ম, মা তোকে ভালো পথেই নিয়ে যাবেন। তু তোর মা বাবা হোতেই উঁঠবি গা, বাপ তোর ভৈরব বটে?

আমি: তা ত জানি না– তিনি ত মন্ত্র তন্ত্র কিছুই নেন নি– তিনি বলেন, যাকে ভক্তি হবে, গুরু বলে মানতে ইচ্ছা হবে তাঁর দেখা পেলে মন্ত্র নেবেন। আমার বোধহয় তাঁর মন্ত্রদীক্ষার উপর বিশেষ আস্থা নেই। বিশেষত কুলগুরুর উপর তাঁর মোটেই শ্রদ্ধা নেই, আর আমারও ঠিক সেই ভাবটা এসেছে। বাবা বলেন, ভগবান সকলকার, মনে মনে ডাকলেই হোলো।

তিনি: মদ ভাঙ্গ খায় বটে?

আমি: হ্যাঁ, ওসব যৌবনকালে খুব বেশী ছিল, এখন অন্য ভাবে–

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: কোন ঠাকুরে তাঁর মন, জানিস তু?

আমি: তা ঠিক জানি না, তবে তাঁর মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প কখনও কখনও শুনেছি– রাম, কৃষ্ণ আর শিব, এই তিনের কথাই তিনি বিশেষ বলতেন।

যখনই যার কথা বলেন আমার মনে হয় সেই তাঁর ইষ্ট, কিন্তু কাজে অনাচারী–

তিনি: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তু শালাদের আবার আচার– শক্ত মনিষ আচার মানবে কেন,– তবে গুরু না হোলে ত কুণ্ডলিনী জাগবেন নাই!

এই কুণ্ডলিনীর ব্যাপার আমায় জানিতে হইবে, এখন বোধ হয় সুযোগ উপস্থিত।

৩

পরদিন একটু সুবিধা বুঝিয়া ক্ষ্যাপার কাছে গিয়া বসিলাম, তখন সেখানে আরও দু'তিন জন উপস্থিত। বাবা রসিক লোক, একটু রসিকতা না করিয়া কথা কহিবেন না, বলিলেন: চিল পড়েছে যখন, কুটাটা না লয়ে উঠবেক্ না। ছিলিম চলিতেছে– সেটা আর না বলিলেও চলে। এখন কাকে লক্ষ্য করিযা এ কথাটা বলিলেন, আমি বুঝিলাম,– কিন্তু আর কেহ মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া– একবার আমার দিকে, একবার বাবার দিকে চাহিতে চাহিতে কত কি ভাবিতে লাগিল কে জানে!

নগেন পাণ্ডা ছিল চালাক লোক, বুঝিল আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন– খুশী হইয়া বলিল: কেমন এবার বাবাকে পেয়েছেন দেখি।

আমি বলিলাম: বাবা যে সদাশিব, তা কি জানেন না!

এই বার বাবা একটু চেষ্টা করিয়া উঠিবার ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাঁর সেবক আসিয়া ধরিয়া সাহায্য করিলেন এবং চালার বাহিরে লইয়া গেলেন, দুই তিনটি কুকুরও চলিল।

জন দুই-তিন গ্রামের লোক আসিতেছিল,– পথে বাবাকে দেখিয়াই প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন: তোরা কে বটিস? তাদের মধ্যে একজন বলিল: আমরা–পলুর পাতা নিতে এসেছি গুটিপোকার লেগে, হোই ওখানে গাড়ীতে চালান দিয়েছি, বলি বাবাকে দেখ্যা আসি একবার।

ইহারা গুটিপোকার চাষ করে, ভিন্ন গ্রামে থাকে,– মধ্যে মধ্যে গুটির জন্য পলু-পাতা যোগাড় করিতে দূরে আসিতে হয়। একেবারে অনেক দিনের খোরাক যোগাড় করিয়া গো-গাড়ী বোঝাই দিয়া লইয়া যায়। সেই সময় ফিরিবার মুখে একবার বাবাকে প্রণাম করিয়া যায়। বাবা এদের ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, আর অন্তরে অন্তরে আশীর্বাদ করেন। গাঁজাটা-আস্‌টা সাধ্যমত সেবার জন্য তাহারা কিছু দিয়াও যায়, কারণ বাবার আশীর্বাদের ফল তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। তারা বলে, বাবা জেন্ত দেবতা।

বাবা এখন তাহাদের বলিলেন: দিয়্যা যা কিছু গাঁজার লেগে,– শুনিবামাত্রই তাহাদের একজন কোঁচার খুঁট খুলিয়া কিছু পয়সা,– ডবল পয়সা, আর একটা দুয়ানি মিলাইয়া চার ছয় আনা বাবার পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। বাবা প্রসন্ন হইয়া

বলিলেন: যা, তোদের গুটি তাড়ায় পাকবে, দেখবি।

এখানে যারা বসিয়াছিল– নগেন পাণ্ডা, আর দুই একজন, তারা ত প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া গেল। আমি অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার পাশে, কেলো, ভুলো, লালী প্রভৃতি দুই তিনটি বাবার প্রিয় ভক্ত, পচা মড়া খাইয়া আসিয়া নানা ভঙ্গিতে শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। যে সকল খাদ্য তাহারা খাইয়াছে, জঠরে গিয়া বিষম দ্বন্দ্ব শুরু করিয়াছে, পাশে বসিয়া নানা প্রকার শব্দ– চোঁ-চোঁ, গোঁ-গোঁ শুনিতেছি, আর দেখিতেছি, তাহারা স্থির থাকিতে পারিতেছে না, মধ্যে মধ্যে বড় ছটফট করিতেছে, বেশ বুঝা যায় একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছে।

কতক্ষণ পর বাবা আসিলেন– আমি এবার কুণ্ডলিনীতত্ত্ব শুনিবার জন্য একটু কাছে ঘেঁষিয়া কেমন করিয়া কথাটা উঠাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

বাবা বসিয়াই,– মা, মা, বলিয়া দুইবার ডাকিলেন– সেই শব্দে আমার অন্তর কেমন করিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যত কিছু সঙ্কোচ সব কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে আমি শুরু করিলাম:– আপনি যে কুল-কুণ্ডলিনী জাগার কথা কাল বলে-ছিলেন,–

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ পর বলিলেন: মা যে ঘুমিয়ে আছেন ঐ মূলাধারে, তাঁকে জাগাতে হবে নাই? সে না জাগলে কে মুক্তি দিবে– কার সাধ্য?

আমি: আপনি আমাকে একটু অনুগ্রহ করুন, খুলে না বললে আমি কি করে বুঝবো বলুন,–

তিনি: ক্যানে আমি তোকে ও গুহ্য কথা বোলতে যাবো, তুই কি দীক্ষা নিবি, না তন্ত্রমতে সাধন করবি, যে জানতে চাস!

আমি: ঐ সকল গুহ্যতত্ত্ব আমার জানবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি আমায় অপাত্র মনে ক'রে না বলেন, তবে আর কি করতে পারি। আপনার কাছেই পাবো এই ভরসায় অত দূর থেকে এসেছি। যদি আপনি আমায় বুঝিয়ে দেন তবে ক্ষতি কি হবে আমি বুঝতে পারি না।

তিনি: যে সাধন-ভজন করবে না, কেবল হেথা-সেথা বেড়াবে, আর পাঁচজনের কাছে পাঁচটা শুনবে তার কাছে এ সব বল্‌লে নষ্ট হবে যে,–

আমি: আপনি বোলতে চান কুল-কুণ্ডলিনি কেবল তান্ত্রিকদেরই শক্তি, অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধক যাঁরা, তাঁদের কুল-কুণ্ডলিনী-শক্তি নেই, না তান্ত্রিক মতে সাধন না করলে তাদের ও শক্তি জাগবে না কখনও?

তিনি: দেখ তু চালাক বটে,– খুব বুদ্ধির কথা বোলেছিস। কুণ্ডলিনী সবারই আছে, সবারই জাগবে, তবে সাধন করলে, আর সময় হোলে। কুণ্ডলিনী না জাগলে কারো কিছুই হবে নাই। এক স্থানে, ধীর হয়ে সাধন করলে তবে সে জাগবে। আবার সাধন না করলে ঘুমাবেক।

আমি: তাই ত আমার জানতে ইচ্ছা, কেমন ব্যাপারটি, এসব আপনার কাছে শুনতেই এসেছি। শুনলে উপকার ছাড়া অপকার ত হবে না।

তিনি: তবে কিছু গাঁজা নিয়ে আয়। অমনি শুনবি নাকি?

আমি: পয়সা আছে, গাঁজা ত নাই। বলিয়া চার আনা বাহির করিয়া সেবকের হাতে দিলাম। তখন তিনি বলিলেন: সরে আমার আরো কাছে আয়। যেই তিনি ঐ কথাটি বলিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। চক্ষু তাঁহার করুণায় পূর্ণ এবং অমানুষিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল, যেন অনন্ত রহস্যের আধার, এমনই বোধ হইল, আর তাহা দেখিয়া বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম। সাহস বা শক্তি যেন সবই লোপ পাইল।

কাছে গেলে তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিলেন, বলিলেন: চাদর খোল্, কাপড়ের কসি আল্‌গা করে দে। সেই সব করা হইলে তিনি হাত নামাইয়া একেবারে মেরুদণ্ডের শেষ যেখানে, সেখানে আনিলেন: দেখ্ আমি বলে যাই, তুই দেখে নে,– তা হোলে সব বুঝতে পারবি।

তাঁহার স্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চে, হৃদয় এক অনির্বচনীয় ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দৃষ্টি সহজেই অর্ন্তমুখী হইয়া গেল,– আমি স্থির।

শিরদাঁড়ার নীচে যেখানে শেষ গাঁট সেই অস্থির উপর একটি আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া তিনি বলিতেছেন: ওরে তোর যে সে কাজ হয়ে গেছে,– তবে শালা তুই আমার সঙ্গে চালাকী করছিস বটে? শুনিয়া একটা ভয়ের ভাব আসিল, তারপর আনন্দ হইল। আমি বলিলাম: আপনি কি বোলছেন, সত্য বলছি আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস করুন।

তিনি: দেখ্, তুই জানিস আর নাই জানিস, হয়ত জানতে নাও পারিস, এখানে আমি দেখছি যে তোর পাক খুলেছে। এই এখানে কুণ্ডলিনী-শক্তি সাড়ে তিন পাক দেওয়া সকলকারই থাকে। মায়ের যে সংসার-গণ্ডী এইখানেই,– এই মায়া-মমতা, অহংকারের এমন কি যত কিছু ভোগ আর স্বার্থ এইখানেই তার প্রথম গাঁট। খুব বড় রকম গাঁট, এটা শক্ত করে বাঁধা আছে। যাদের খোলে– এই ছোট্ট সংসার-গণ্ডীতে আর তারা সুখ পায় না। ছাড়িয়ে যাবার জন্যে যখন ছটফট করে তখন গুরু বা সৎপুরুষের আশ্রয় পেলে এইখানকার গাঁট খুলতে থাকে। এখানকার পাক খুললে প্রথম লক্ষণ তার এই দেখা যায় তার ভগবানে ভক্তি হয়, এ ছোট্ট সংসার থেকে মা জগদম্বার বিরাট সংসারে প্রবেশ করতে প্রবৃত্তি হয়। আর তার প্রকৃতি পাগলের মত সেদিকে ছুটতে থাকে। সংসারের ছোট খাটো কোন জিনিসেই আর কিছুমাত্র সুখ থাকে না। এমন কি মাগছেলে, ইন্দ্রিয়-সুখ পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই সময় বুঝতে হবে যে পাক খুলে সোজা হয়েছে। আর সোজা হলেই তার মুখটা উপরের দিকে ফিরে যায়: তখন উপর-মুখো চলতে থাকে।

এই যে শিরদাঁড়ার সব নীচের জায়গা, এর নাম মূলাধার চক্র– এইখানেই গাঁট, ঐ গাঁট খুলতে বড় গোল– ওটা খুললেই কুণ্ডলিনী আর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে না, সোজা হয়ে উপরের দিকে যেতে থাকে। মা, মা, তারা–

বাবা একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোর গুরুসঙ্গ কত দিন হয়েছে রে? আমি বলিলাম: প্রায় দু বছর হোলো। শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: কি রকম অবস্থায় হোলো খুলে বল্ আমাকে।

আমি সব বলিলাম: ভগবান রামকৃষ্ণের কথাই প্রথম– তিনিই আমার জীবনে সর্বপ্রথম আকর্ষণ, প্রথম গুরু,– তাকে স্বপ্ন দেখা, কথা শুনা, তারপরে ঘরে কিছুই ভালো না লাগা, জীবন্ত গুরু কোথায় পাবো বলিয়া নানা স্থানে সাধু-দর্শন-শেষে কলিকাতায় স্বামী পরমানন্দের সাক্ষাৎ; তাঁর আকর্ষণ; তারপর ক্রমে ক্রমে দীক্ষা ইত্যাদি।* সব শুনিয়া তিনি বলিলেন: দেখছি ঐ সময়েই তোর এটা হয়েছে,– এখন ত ঊর্ধ্বগতিই দেখছি– দেখিস সাধন যেন ছাড়িস না বাবা, তা হোলে আবার ঘুমাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা,– আপনারা বলেন, যে তান্ত্রিক সাধন-প্রকরণের মধ্যে দিয়ে না গেলে কুণ্ডলিনী-শক্তি না কি কারো জাগে না। একথা কি সত্যি? অন্য কোন ধর্মের সাধনে তা হবে না?

তিনি: একথা তোকে কে বোলেছে– যত শালা অওগোণ্ডর কথা। তোর খিদে যদি পায় তখন ভাত খেলে তোর যেমন পেট ভরবে, ডালরুটি খেলে কি তার চেয়ে কম পেট ভরবে? আসল কথা যার যা জোটে তার তাই খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করতে হয় ত! এখানে কত রকমের মানুষ, কত রকমের খাওয়া, যে বলে ভাত ছাড়া আর কিছুতেই পেট ভরবে না সে নিশ্চয়ই গেঁও মনিষ–ভাত ছাড়া আর কিছু খাওয়ার ধারণা নাই। তারা মা ত এই সব ছিষ্টি করেছে– যত ধর্ম সব ত তারই ছিষ্টি। যার দেশে যে রকম খাওয়া চলিত সে তাই খাবে ত, ধর্মও ত সেই রকম?

আমি বলিলাম: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বোলতেন, এমন সহজ সত্য সুমুখে থাকতে তবু ধর্ম সাধন নিয়ে এত লাঠালাঠি আমাদের এ দেশে দেখা যায়।

তিনি বলিলেন: এক রাজার রাজত্ব– তার মন্ত্রী আছে, লেঠেল সেপাই আছে, সেনাপতি আছে, গোমস্তা, চাকরবাকর, সংসারের কত সবই আছে। আবার গুরু-পুরুত ঠাকুর-বামনও আছে। যে যা কাজ করে তার প্রকৃতি, বুদ্ধি সেই রকমই হয়ে থাকে। যারা লেঠেল–তারা লাঠিবাজিই বোঝে ভালো, তা ধর্ম নিয়েই হোক বা ঘরের মাগ, ছেলে, পাড়াপড়শি নিয়েই হোক–ওই রকমই তাদের বুদ্ধি।

ঠিক যেন রামকৃষ্ণের কথাই শুনিতেছি। বলিলাম: এখন, তারপর বলুন।

তিনি বলিলেন: কুণ্ডলিনী জাগেন মানে মানুষের মধ্যে যত ছোট ছোট হীনভাব আছে, মন সেসব ছেড়ে বড়র দিকে লক্ষ্য করে। কারো যোগযাগ, কারো বিদ্যা, কারো

* প্রথম কথা *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ* ১ম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ।

ধর্ম, কারো ভগবান— কারো বড় বড় কর্ম যাতে অনেক মানুষের ভালো হয়, ঐসব দিকে প্রবৃত্তি যায়। জীবনের মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগার প্রথম লক্ষণই হোলো, যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাকে হীন, কষ্টকর, ঘেন্নার জিনিস বোলে মনে হয়। সে কিছুতেই আর সে অবস্থায় থাকতে চায় না, পারেও না; বিষম ছট্‌ফটানী আসে—বেরিয়ে যাবার জন্যে।

আমি: তারপর?

তিনি: তারপর, এই যে মেরুদণ্ড—এর মাঝ দিয়ে পথ আছে বরাবর মাথার ভিতর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত। কিন্তু সে-পথে কি ঐ শক্তি নাড়ী ধরে একেবারেই যাবে? তা যাবে না, গাঁট খুলে যাবার পরও আর একটা চক্র আছে, স্বাধিষ্ঠান চক্র বলে তাকে—সেইখানে ঠেকে যায়।

তিনি তাঁর স্পর্শ দিয়া স্থানটি দেখাইলেন, বলিলেন: এখানে ঠেকে গেলে সাধন চাই পেরিয়ে যেতে। যার যে-পথ সেই পথে এগিয়ে যেতে চেষ্টা লাগে না? বিনা চেষ্টায় কি বস্তু লাভ হয়? যারা যোগ-ধ্যান নিয়ে থাকে তারা ঐখানে একটু কঠিন তপস্যা করে। তান্ত্রিকদের কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, গুরু দেখিয়ে দেন, তাই করলে চক্র পেরিয়ে যায়। এই দেখ্ এইখানে মূলাধার আর ঠিক তার উপর এই স্বাধিষ্ঠান।

আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আর শরীরের মধ্যে অপূর্ব এক ভাবের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমি: যারা তন্ত্রমতে সাধন করে না?

তিনি: তাদের কথা তারাই জানে। তাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে যে চেষ্টা— তাই ত সাধন। সব ধর্মেই এই ক্রম আছে, একটার পর একটা পেরিয়ে যেতে হয়— না হোলে একেবারে হুড়মুড় করে কি যাবার যো আছে! ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে যেতে হবে।

আমি: তারপর?

তিনি: তারপর মণিপুর চক্র বোলে আর একটি গাঁট আছে। নাভির বিপরীত দিকে মেরুদণ্ড যেখানে, এই দেখ্ হেথায়— বলিয়া, সেখানে স্পর্শ করিয়া দেখাইলেন—এটি পার হোলে তখন কাজ সহজ হয়। নূতন নূতন শক্তি তার মধ্যে জাগে আর তখন মনের আনন্দে সাধন আপন পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এই মণিপুর অবধিই যা কিছু স্থূল তুচ্ছ ভোগের বাধা থাকে। এই মণিপুর চক্র পর্য্যন্ত মানুষের যত ছোট ছোট ভোগ আর কামনার ভাবগুলির প্রভাব প্রবল থাকে, কিন্তু যার লক্ষ্য বড় আছে মনের জোর আছে তাকে আর ওদিকে টেনে রাখতে পারে না, তবে খুব সহজেও একে পেরিয়ে যাবার যো নাই। যারা অসাধারণ মানুষ, খুব শক্তিমান, তারা কাটিয়ে যায়। যাদের মনের জোর কম তারা এই তিনটির মধ্যে পাক খায়—মোটের উপর লক্ষ্য যার স্থির নয়—মন উন্নত হয়নি, তার পক্ষে এ চক্র ছাড়িয়ে উঠা কষ্টকর। এর উপরে

না উঠলে কেউ মানুষ হোতে পারে না—তন্ত্রমতে এর উপরে উঠলে তবে বীর সাধক হয়, না হোলে পশু। পশুভাব যত কিছু তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ এই তিন চক্রের মধ্যে বাঁধা থাকে।

আমি: এই তিনটি হোলো কঠিন, পরমহংসদেবের কথাতেও আছে। তিনিও বলেছেন গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, সাধারণ মানুষের মন এই তিন চক্রের ভিতর ঘোরাফেরা করে, আপনার সঙ্গে তাঁর কথার মিল—

তিনি বলিলেন: হাঁ, হাঁ, তিনি মাকে পেয়েছেন, সিদ্ধ মনিষ, তিনি এ সব ত জানেন। যে জানে সে বলবে নি ক্যানে!

আমি বলিলাম: তা আমি বলি নি, আপনি মেরুদণ্ডের দিকে ঐ স্থানগুলি দেখিয়ে দিলেন আর তিনি বলেছেন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি—তাই বলছি।

তিনি: কুণ্ডলিনী-শক্তির আনাগোনার পথ হোলো ঐ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে—তিনি হয়ত সাধারণ মনিষের কাছে লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি বলেই বলেছেন। আসলে গুহ্য বা লিঙ্গ বা নাভি দিয়ে নাড়ীর পথ নয়, কি রকম জানিস, এই দেখ্ হেথা। তু সহজ মনিষ নয়, শালা চালাকী করে সব জেনে লিচ্ছিস। বলিয়া স্পর্শ করিলেন— আমি অপূর্ব সুখময় অনুভূতির সঙ্গে পর পর গাঁট অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

এইবার বাবা সদয় হইয়া কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব দেখাইলেন। আর এখন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োজন নাই জানিয়া সরলভাবেই বলিতেছি। আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে আগা গোড়া একটি অতি সূক্ষ্ম পথ আছে। সেই পথই প্রাণের পথ বা নাড়ী, আমাদের প্রাণশক্তি এই পথে নিরন্তর ঊর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি করেন। অতীব সূক্ষ্ম ইহার অস্তিত্ব।

ঐ প্রাণ বায়ু নয়, বা বায়ুর সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে মেরুপথে সাধারণ প্রাণের গতাগতি। গতাগতি অর্থে একবার উপর হইতে নীচে মূলাধার আবার নীচে মূলাধার হইতে শত উপরে সহস্রারে যাতায়াত চলিতেছে, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। চক্ষের পলক পড়িতে যতটা সময় আমরা হিসাব করিতে পারি, সেই সময়ের মধ্যে আমাদের সুস্থ শরীরে প্রাণের যে কতবার ঊর্দ্ধ-অধঃ গতাগতি হয় তাহার ধারণা করিতে পারি না। ঐরূপ ক্রিয়ারত প্রাণশক্তিকে ধরিয়া যোগমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। তন্ত্রে ঐ প্রাণশক্তিকে মা, আর ঊর্দ্ধ-অধঃ গতি-ক্রিয়াকে নৃত্য বলা হইয়াছে অর্থাৎ মা নাচিতেছেন, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই। বিজ্ঞানের ভাষায়, প্রাণের স্পন্দন ইহাকেই বলে।

এখন ঐ ক্রমে প্রাণশক্তিকে ধরিয়া অগ্রসর হইলে সর্বনিম্নে মূলাধার, যেখানে মেরুদণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্ত, ঠিক তাহার উপর একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ আছে দেখা যায়, তাহাকেই যোগশাস্ত্রে মূলাধার-চক্র বলে। নিরন্তর স্পন্দিত প্রাণশক্তি সেই পথে বাহির হইয়া গুহ্যদেশে ক্রিয়া করেন। ঐরূপে মূলাধারের কিছু উপরে লিঙ্গমূলে মেরূপথের মধ্যে আর একটি দ্বার বা অতি সূক্ষ্ম পথ— প্রাণশক্তি সেই পথে নিঃসৃত

হইয়া ঐ অংশে ক্রিয়া করেন, তাহার তান্ত্রিক নাম স্বাধিষ্ঠান-চক্র। ঠিক নাভির সোজা মেরুদণ্ডের মাঝে ঐরূপ আবার একটি সূক্ষ্ম পথ, তাহাকে মণিপুর-চক্র বলে। তাহার উপর হৃদপিণ্ডের সমসূত্রে মেরুপথে অপর সূক্ষ্ম দ্বার, যাহা হইতে প্রাণশক্তি ঐ স্থানে অর্থাৎ ফুসফুস ও হৃদয়ে ক্রিয়া করেন। তাহার তান্ত্রিক নাম অনাহত-চক্র, যেহেতু আমাদের ধুক্-ধুকি বা হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া শব্দময় এবং মৃত্যু অথবা নির্বিকল্প সমাধি ব্যতীত কখনও সে শব্দ-ধ্বনি বন্ধ হয় না। তাহার উপরে, কণ্ঠের সমসূত্রে যে সূক্ষ্ম পথ প্রাণশক্তি সেই পথে নির্গত হইয়া কণ্ঠে ক্রিয়া করেন— তাহাকে বিশুদ্ধাক্ষ্য-চক্র বলে। তাহার উপর শেষ চক্র—যেখানে মেরুদণ্ড আরম্ভ, চলিত কথায় সেই স্থান ভ্রূ দুইটির মধ্যে বলিয়া নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের আরম্ভ যেখানে সেই স্থান, অতীব সূক্ষ্ম ভাবের সৃষ্টি, যেখান হইতে প্রাণক্রিয়ার আরম্ভ, তাহার নাম আজ্ঞা বা প্রজ্ঞা-চক্র। তাহার উপর আর কোন চক্র বা কর্মকেন্দ্র নাই। উপরে অনন্ত ব্যোম, দেহাতিরিক্ত অখণ্ড চৈতন্য সত্তা—সেই পরমাত্মার রাজ্য—তাহাকে সহস্রার বলা হইয়াছে। মেরু মধ্যগত সূক্ষ্মতম প্রাণপথের কর্মকেন্দ্রের রূপে যে ছয়টি চক্র উহা ভেদ হইলে আত্মা পরমাত্মায় অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দভাবে মিলিত হন, সুতরাং সৃষ্টির পারে চলিয়া যান।

এখনও এই যে মেরুদণ্ডের আরম্ভ স্থানে প্রথম চক্র যাহাতে প্রজ্ঞা-চক্র বলে— যেস্থান হইতে প্রাণশক্তির ক্রিয়া শেষপ্রান্ত মূলাধার পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে, ঐ প্রজ্ঞা-চক্রই প্রাণের আরম্ভ এবং লয়ের স্থান। ঐ স্থানটি নাড়ীচক্রের মধ্যে প্রধান, মহান এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ স্থান, যেহেতু ধারণা ধ্যান তত্ত্বনির্ণয়, উচ্চ উচ্চ অনুভূতি, প্রকাশ, আবিষ্কার, মোট কথা মনুষ্যজীবনের, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, প্রেরণা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ যাহা কিছু ঐখানেই লাভ হয়। ঐ স্থানে উন্নত জীবের তৃতীয় নয়ন প্রকাশিত হয়।

এখন গুরুকৃপায় বুঝা যাইতেছে প্রাণের স্বাভাবিক রূপটি, যাহা, অতি সূক্ষ্ম ঊর্ধ্ব-অধঃ স্পন্দনময় আর, আশীর্ষ মূলাধারাবধি স্পন্দনের অবকাশে মেরুপথে সংযুক্ত দেহযন্ত্রের ছয়টি কেন্দ্র হইতে অবিরাম নিঃসৃত প্রাণশক্তি যাহা এই স্থূল শরীরের সর্বাংশ ক্রিয়াশীল রাখিয়াছে। আরও দেখিতেছি, প্রাণের দ্বিবিধ ক্রিয়া—এক হইল স্থূল দেহাদি চালনা, অপর চিন্তা অনুভূতি প্রভৃতি মন বুদ্ধির ক্রিয়া—এই প্রাণ দুই ভাবেই অবিরাম ক্রিয়াশীল। ছয়টি কেন্দ্রপথে প্রবাহিত হইয়া যেমন দেহের প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে—সেই প্রাণ আবার প্রজ্ঞা-চক্রে স্থির হইয়া অন্তঃ-করণের যাবতীয় ক্রিয়াও সম্পন্ন করিতেছে—এই সকল কার্য্য যুগপৎ চলিতেছে—বিরাম বা বিচ্ছেদ নাই। এইবার কুল-কুণ্ডলিনীর সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুভূতি এবং বিচারের সময় আসিয়াছে।

বিবর্তনবাদটিকে মনুষ্য-জীবনের মধ্যে আনিয়া ধরিতে হইবে। এই বিশাল জগৎ

সৃষ্টির মধ্যে প্রাণী-জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি হইল মানুষ। যেহেতু দেখা যায় মানুষই সকল ইতর জীবের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। এই যে মানুষ বংশ, নানা ভাবের বৈচিত্র্য লইয়া জগতের সম্পদের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও স্পন্দনের অধিকারী হইয়াছে,—তন্ত্রশাস্ত্রে এই মানবের পরিণতি অনুসারে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা আছে। তাহা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ প্রথমে পশু, তারপর মানুষ বা বীর—তারপর দিব্য অর্থাৎ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশু হইতে মানব-শরীরে বিবর্তনকালে সেই জীবের উন্নত প্রাণশক্তির কতকাংশ আত্মারূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়—যাহা ক্রমোন্নতির ফলে (অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তর ভোগ কর্ম জ্ঞানাদির ফলে) জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হইয়া শেষে পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়। পশুভাবে মানবের প্রথম অবস্থায় জীব-প্রাণের উত্তমাংশ ঐ যে আত্মা, তখন সুপ্তভাবে অর্থাৎ অবিকশিত অবস্থায় মূলাধারে বর্তমান থাকে। মূলাধার বলিতে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম নাড়ী বা প্রাণপথের শেষ প্রান্তে অবস্থিত প্রধান কেন্দ্র বা চক্র বোঝায়। প্রাণের মধ্যস্থতায় ঐ স্থান হইতে জীবাত্মার প্রথম মানব-জীবনের কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে এবং ঐ কেন্দ্রকে মূল করিয়া জীবাত্মার সর্ববিধ গতি নির্ধারিত হয় বলিয়া এবং প্রাণশক্তি আত্মার আধাররূপে ঐখানে অবস্থিত বলিয়া ঐ কেন্দ্র বা চক্রকে তন্ত্রশাস্ত্রে মূলাধার বলা হইয়া থাকে।

যেমন কালের মধ্য দিয়া জীব পশু হইতে মানব হয় তেমনই কালের মধ্যে দিয়া ঐ আধারভূত প্রাণশক্তির মূল যে আত্মা, মনুষ্যত্বে বিকশিত হইবার প্রতীক্ষায় থাকেন, যেমন গর্ভস্থ শিশু মায়ের উদরে বাড়িতে থাকে ঠিক তেমনি। তখন আত্মার অবিকশিত অর্থাৎ ঠিক গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা, সেইজন্য তন্ত্রের মধ্যে এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া সুপ্ত বলা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন যে, স্থূল ভাবাপন্ন পশু-প্রকৃতির প্রথম স্তরের মানুষের ঐ সুপ্ত আত্মা প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাড়ে তিন পাক দিয়া কুণ্ডলাকারে সাপের মত মূলাধারে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকেন। এই ভাবে ভোগ ও কর্মদ্বারা জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞান বা চৈতন্য শক্তির সহায়তায় তাঁহার সম্যক পুষ্টি হয় তখন সেই আত্মা বিকশিত হন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, জীবাত্মা স্বরূপে প্রতিভাত হইতে ক্রমবিকাশের অবস্থায় কতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন, পরে উপযুক্তরূপে শক্তিমান হইলে তবে পূর্ণ বিকাশের অবস্থা প্রাপ্ত হন। কালের মধ্যে শক্তিতে পটু হইয়া শেষে কালাতীত হইয়া যান। প্রকৃতিই এ শক্তি যোগাইয়া তাঁহার বিকাশের সহায়তা করিয়া থাকেন, সেই জন্য এক সম্পর্কে শক্তিরূপা প্রকৃতি আত্মার জননী, পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তিনি হন প্রিয়তমা। কুল-কুণ্ডলিনী জাগরণের ইহাই সার কথা। মানুষের, দেহে আত্মা বুদ্ধি ঐ পর্য্যন্ত থাকে যে পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিত না হন—এটুকুও জানিয়া রাখা ভালো।

যত কিছু শিবশক্তি-রহস্য রূপকের আকারে ইহার মধ্যে আছে যাহা সহজ সত্যকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে আমাদের তাহাতে প্রয়োজন কিনা সুধীজনে ভাবিয়া

দেখিবেন।

ক্ষ্যাপা বাবা বলিলেন: তু এখন যা, হজম করগা–

আমি বলিলাম: ষট্‌চক্র মধ্যে আর আর ব্যাপার যে বাকি,– বাবা,–

তিনি: তু এখন উঠে যা তো, কাল আসবি আবার, যা। দক্ষিণা চাই,– নিয়ে আসবি দক্ষিণা, অমনি হবে না এসব অমনি অমনি হবার লয়, জানবি।

৪

দুই দিন আর ক্ষ্যাপার কাছে আমলই পাইলাম না। নানা প্রকারের মানুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে– আর সে সমাজে যে সব কথা হয়, পরস্পর যেভাবে সম্ভাষণ চলে তাহাতে সাধুসঙ্গের আশা ক্ষীণ হইয়া যায়। বাবার কোন দিকে লক্ষ্যই নাই, আপন মনে, আপন ভাবেই সমাহিত:– কেবল মাঝে মাঝে, মা, মা বলিয়া ডাকেন, আর যত গ্রাম্য কথার প্রভাব ঝাড়িয়া ফেলেন।

বাবার কিছু টাকা ছিল। কিছুদিন পূর্বের কথা– এই টাকার যে ঠিক পরিমাণ কত তা নির্ণয় করিতে পারি নাই,– তবে, ওখানকার কোন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম তিন চার হাজার টাকা হইবে,– টাকাটার কথা, যিনি তাঁর বিশেষ বিশ্বাসভাজন– অমুক পাণ্ডা ছাড়া সম্ভবত আর কেহ জানিত না। কারণ সেই ব্যক্তি তখন বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভক্ত বা সেবক ছিল। তারপর সেই টাকা বাবা তাঁহার আশ্রমের একস্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থান বাবা ব্যতীত আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই ধূর্ত সেবক পাণ্ডা কোনপ্রকারে তাহা জানিতে পারে। টাকা লোভের বস্তু, বিশেষত সংসারী মানুষের পক্ষে। ইহার লোভ সামলানো খুবই শক্ত। বেচারা উহার আকর্ষণ এড়াইতে পারে নাই। পাণ্ডাঠাকুর খুব সাহসী লোক বলিতে হইবে যেহেতু তাহার এই কাজটি একেবারেই সেখানকার লোকের কল্পনার অতীত।

একদিন সকালের দিকে ক্ষ্যাপা বাবা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন– সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আমার টাকাটা কোথায় গেল! সেদিন আবার অমুক পাণ্ডা অনুপস্থিত, বাবা ঠিক বুঝিতে পারিলেন, এ কাজ তারই, অন্য কাহারও এতটা সাহস হইবার নয়। যখন অমুক পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হইল, বাবা তাহাকে বেশ শান্তভাবে, পিঠে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন: টাকাটা বার কোরে দে, তোর ভালো হবে। কিন্তু যে ভালোটা সম্প্রতি হস্তগত, তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য রকমের ভালোর গুরুত্ব বুঝা সকলের ধাতে সয় না, বিশেষত তার মত এক পাকা সংসারী মানুষের। কাজেই সে ব্যক্তি তখন, বাবার টাকা হারাইয়াছে শুনিয়া একেবারে যেন আকাশ হইতেই পড়িল। তখন বাবার বুঝি তাহাকে একটু জব্দ করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি থানা পুলিশ করিলেন। শেষে আদালতেও গড়াইল। তারপর যখন,

তাঁহার কাহাকে সন্দেহ হয় জিজ্ঞাসা করা হইল, বিচারকের কাছে বাবা নিঃসঙ্কোচে তখন সেই অমুকের নাম বলিয়া শেষে জানাইলেন— সে ব্যতীত আর কেহ এ কাজ করিতে পারে না, কারণ কেবল সেই এটা জানিত আর কেহই ইহার কথা জানে না।

তারপর যখন সে ব্যক্তি দেখিল আর রক্ষা নাই, তখন যা হইয়া থাকে,— বাবার পায়ে জড়াইয়া কাঁদা-কাটা করিল— বাবাও জল হইয়া গেলেন, বলিলেন: আগে বলিস নাই কেনে? বাবা শেষে তাহাকে এই দণ্ডদান করিলেন যে তাঁহার আশ্রমে সে আর যেন না আসে। দিন কতক দণ্ড ভোগের পর সকলে দেখিতে পাইল তাহার হাঁপানীর অসুখ হইয়াছে— আর সে বাবার আশ্রমের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু আবার ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিলেও তাহার কিছু সুবিধা হইল না, অসুখও সারিল না।

আমি যখন যাই তাহাকে প্রত্যহই বাবার দরবারে হাজির দেখিতাম। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বাবার সঙ্গে কথা কহিতেও দেখিতাম কিন্তু বাবার তেমন স্নেহের প্রকাশ দেখি নাই।

সেই অবধি বাবা, কাহারো নিকট কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, ঐ অর্থ যে অনর্থ— দেখিস না?

যে ব্যক্তির কাছে এই সকল শুনিলাম সে বলিল: আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি সাধু লোক, মার কৃপায় কিছুরই অভাব নাই— আপনি কেন টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন? তাহাতে বাবা বলিলেন: ওসব ঐ বেটি মায়েরই ঘটাঘটি জানিস না— টাকাটা আপনিই এলো, ভাবলাম এখন রাখি যখন কারো কাজে লাগবে তখন দেওয়া যাবে। তা হোলো ভালো, যার কাজে লাগল সে মনিষটাকেও চেনা গেল। মায়ের টাকা, তিনিই ওটার ব্যবস্থা করলেন যেঁয়ে।

এখন যাহা বলিতেছিলাম—

দুইটি দিন কাটাইয়া বাবা তৃতীয় দিনে সদয় হইলেন, আমিও কাছ ঘেঁষিয়া বসিলাম। আজ এখন আমি তাঁকে ধরিয়া বসিলাম— আপনি খুলে বলুন যে সকলকারই কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগে কি না; বিনা সাধনে জাগে কিম্বা এই জাগার জন্য বিশেষ সাধনের প্রয়োজন হয়?

বাবা বলিলেন: যারা তান্ত্রিক, এই ধর্ম আশ্রয় করেছে, দীক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম সাধনও হোলো কুণ্ডলিনী জাগা নিয়ে। সবার গোড়াও বটে সবার শেষও বটে।

আমি: যারা অন্য ধর্মের লোক—

তিনি: তাদের ধর্মের মধ্যেও এই কুণ্ডলিনী জাগাবার সাধন আছে, হয়ত তার চেহারা একটু আলাদা, কিন্তু সব কিছু সাধনের গোড়ার কথাই হোলো ঐ কুণ্ডলিনী, ও না জাগলে কিছুই হবে নাই।

আসল কথা এই যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে শক্তি সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ গতানুগতিক ভাবের ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে প্রেরণা জোগাইয়া উচ্চতর জীবনপথে পরিচালিত করে তাহাই কুণ্ডলিনী-শক্তি। সে শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে প্রথমে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, পরে দেশকাল ও পাত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। ক্ষ্যাপা বাবা বলেন যে, পুরুষের পক্ষে নারী আর যৌবন এই দুইটির সঙ্গে ঐ শক্তি জাগরণের প্রধান সম্বন্ধ। এই জন্য তন্ত্রোক্ত বামমার্গের সাধনে ঐ দুইটিই প্রধান। অনেক বলেন, এই বামা ক্ষ্যাপা দক্ষিণমার্গের সাধক। এখন তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রথম হইতে বহুকাল ইনি বামাচারী অর্থাৎ ভৈরবী লইয়া সাধন করিয়াছেন, এখানকার অনেকের কাছেই শুনিয়াছি। নগেন পাণ্ডা বাবার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে অনেককাল কাটাইয়াছিলেন— তাহার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহা যথাসময়ে বলিব।

সাধারণত তন্ত্রের মধ্যে সাধনের দুইটি পথ— বামমার্গ ও দক্ষিণমার্গ। এই সাধন, দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীর সঙ্গে সহজ নিয়মেই বাঁধা। যখন তন্ত্রধর্ম এদেশে প্রবল ছিল তখন ঐ সকল সহজ প্রণালীর সাধন কতকটা সম্ভব হইত এখন কিন্তু সম্ভব নহে। এখনকার সমাজে সাধারণ মানুষের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও ভুল হয় না। যেভাবে এখনকার শিক্ষা-দীক্ষা চলিতেছে তাহাতে সাধারণ দেশবাসী-জনের ওভাবে বামমার্গে সাধন চলিতেই পারে না। কারণ সমাজের যে অবস্থায় ইহা আচরণীয়— সে অবস্থায় সাধারণভাবে প্রত্যেক নর নারীর নিজ নিজ জীবন-পথ নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। কোনও এক বিশিষ্ট ধারায় জীবনযাপন-প্রণালীর প্রভাব ইহার মধ্যে থাকিলে সাধনে সহজেই বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কারণ আসল তন্ত্রে, স্ত্রী-পুরুষের যে সম্বন্ধ তাহা হিন্দু বিধি-নিয়মের বহির্ভূত। সেই কারণে আরও হিন্দু প্রধান ভারতে তন্ত্রধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের একটা আপোষ হইতে পারিয়াছিল, পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকাশ ঘটে নাই। সেকালে যাহা কিছু তন্ত্রোক্ত ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল— তাহা হিন্দু সমাজের বাহিরেই ঘটিয়াছিল। যাহা হউক কথা এই যে,— বামার কথা শুনিয়া কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরণের ব্যাপারেই এখন আমার ধারণার মধ্যে যাহা স্পষ্ট হইল তাহা এই যে, যখন কারো জীবন আর কিছুতেই গতানুগতিকভাবে বদ্ধ থাকিতে চায় না— অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি ও স্থূল স্বার্থময় ভোগের মধ্যে তৃপ্তি পায় না তখনই তার কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হন। জাগরণের লক্ষণই হইল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মনের ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন— একথা পূর্বেই জানা গিয়াছে। এখন, সকল জাতির, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অন্তরক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটে তাহা জানা গেল। এই নিয়মেই মানুষ পশুভাবের প্রভাব ছাড়াই— মনোবুদ্ধি-প্রধান হইয়া ক্রমে উচ্চ উচ্চ ভাবানুরূপ কর্মে অগ্রসর হয়। এই রূপে সে গুরুভাবে পৌঁছায় এবং বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ইহাই জগদম্বার সনাতন নিয়ম— এই নিয়মের মধ্য দিয়া

পার্থিব সকল জীবের গতিই নির্দিষ্ট। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী জাগরণ বৈজ্ঞানিক সত্য, সর্বকালে, সর্বদেশে মানুষ সমাজের অন্তরক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল– ব্যষ্টিতেও যেমন ইহার ব্যতিক্রম হয় না, সমষ্টিতেও তাই। তবে সমষ্টির কথা বহুদূর।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই কথা দুইটি ব্যাপারকে সহজ করিবার জন্য আমিই লাগাইয়াছি – বাবা ও-কথা দুইটি ব্যবহার করেন নাই। তিনি ভাবের মুখে বলিয়াছিলেন, একজন মনিষের যেমন কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগে তেমনি মানুষগোষ্ঠীর ভিতরও জাগে, তবে তখন সত্যযুগে আসে। ব্যাপারটি পরিষ্কার করিতেছি। বাবার কথা সাধারণ লোকে কিভাবে লইত তাহা আমি জানি না, কারণ সাধারণ লোকে তাঁহার মুখে কথা শুনিয়াই যে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে বা ধরিতে পারিবে তাহা আমার মনে হয় না। তাঁহার কথা প্রথমটা গ্রাম্য ভাষার সহজ সরল প্রকাশ বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু সেভাবে শুনিলে সাধারণে কেহই বোধ করি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর তাহা ছাড়া, তাঁহার কথার আক্ষরিক অনুসরণও খুব সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষত যখন কোন বিশেষ তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কথা কন; যাহা তিনি প্রায় করেন না। যেভাবে আমি (সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই) তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়াছিলাম– কদাচ কেহ এরূপ যোগাযোগ ঘটাইতে পারিয়াছেন। একথা তিনিই আমাকে কয়েকবার বলিয়াছিলেন। যাহা হউক এখন সমষ্টির কথা এই যে,–

মানুষ প্রত্যেকেই ভিন্ন প্রকৃতির– প্রত্যেক জনই আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজে কতকটা মিলে-মিশে থাকে তো? প্রত্যেকেরই একটি আলাদা শরীর, নাড়ী (সূক্ষ্ম শক্তি এবং প্রাণের যাতায়াতের পথকে তন্ত্রে নাড়ী বলে),– প্রাণশক্তি, বুদ্ধি, মন, আত্মা এইসব নিয়েই একজন মানুষ, তেমনি এই পৃথিবী জুড়ে একটি শরীর আছে আর সেই বিরাট শরীরেও ঐসব নাড়ী, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা আছে, আমরা জগতের জীবকোটি তার মধ্যেই আছি। সাধারণ মানুষ যারা পশুত্ব নিয়ে আছে তারা এর কিছুই জানে না, যারা মানুষ বা বীর হয়েছে তারা আভাস মাত্র পায়, যারা দিব্যভাবে গিয়েছে তারা জানতে পারে, যারা একেবারে পাশমুক্ত হয়েছে তারাই প্রত্যক্ষ করে। এক সময় মায়ের ইচ্ছায় এখানকার মানুষগোষ্ঠীর ভিতর কুণ্ডলিনী জেগে ওঠেন, তখনই সত্যযুগের পালা পড়ে।

অর্থাৎ তখন এই হয় যে মানুষ-সমাজে তুচ্ছ স্থূল-ভোগাদির প্রভাব ছাড়াইয়া একটি বিরাট চৈতন্যের প্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখনই তাহাকে সত্যযুগের আবির্ভাব বলিতে হয়। যে যুগে মানবসমাজ আত্ম-তত্ত্বে অথবা ধর্মের চরম অনুভূতিতে মুখ্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকে সেই ত সত্যযুগ? যে যুগের ধর্ম, কর্ম, তপঃ, আচার সবই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দমুখী হইয়া গতিমান– সেই যুগই ত সত্যযুগ?

এখন কথা হইল, একজনের মধ্যে কিভাবে, কোন্ অবস্থায় কুণ্ডলিনী জাগেন এই কথা লইয়া আজ অনেক কথা বলিলেন, তাহা বিশদ ভাবেই বলিতেছি। উত্তরে–

তিনি প্রথমে সাধারণ ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, বিশেষ অধিকারী না হইলে কাহারও কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগে না, মূলাধারে ঘুমাইয়াই থাকে। তারপর কথা প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনায় বলিলেন— সকলকার জীবনে একবার ঐ শক্তি জাগিয়া উঠে, কিন্তু আবার ঘুমাইয়া পড়ে। তখন কোন্ কোন্ অবস্থায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ শক্তি জাগে তাহাই ছিল প্রশ্ন। এখন ইহাও জানিয়া রাখা ভালো এ ব্যাপারে তথাকথিত বিদ্বান মূর্খে ভেদ নাই অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যার স্থান নাই।

তিনি বলেন,— মানুষের যখন যৌবন আসে, সহজ ভাবেই তখন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য প্রাণ ছটফট করে। তারপর যখন তাদের মিলন হয়, ভালোবাসা সহজভাবেই তাদের প্রাণের মধ্যে বিকশিত হয়— নাম তার প্রেম, প্রণয় এইসব, তখন তাদের জীবনে যে আনন্দ তা হিসাব করবার জিনিস নয়— তখনই কুণ্ডলিনী জাগেন। এই গেল স্বাভাবিকভাবে জাগরণের কথা— তারপর কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মত কেউ কেউ আবার অল্পবয়স থেকেই অর্থাৎ যৌবন আসবার পূর্ব থেকেই ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ পাবার জন্যে লালায়, তারপর যৌবনের মধ্যে এসেও নানা উপায়ে লালসা মেটাবার চেষ্টা করে এমনও ত দেখা যায়,— তাদের কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে কুণ্ডলিনীর জাগরণে ঘটে না। তাদের চঞ্চল চিত্তের মধ্যে ইন্দ্রিয়-সুখটুকু ছাড়া আর কিছুতেই লক্ষ্য থাকে না বলে তাদের অধোগতিই হয়ে পড়া স্বাভাবিক। যৌবন-বিকাশের সঙ্গে যাদের জাতীয়-সংস্কার অনুযায়ী সামাজিক প্রথায় বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিলন ঘটে, তাদের জীবনের মধ্যে যে আনন্দ, যে সার্থকতা বা যে বস্তু লাভ হয়, সে জিনিস ঐ লম্পটদের ত হোতে পারেই না। তাদের হয় কি, বেশীদিন ইন্দ্রিয়-সুখকেই প্রবলভাবে ধরে থাকলে সামাজিক ন্যায় ধর্ম না মেনে কেবল ঐ একটা জানোয়ারী সুখের আস্বাদন করতে করতে প্রতিক্রিয়ার আবর্তে পড়ে যায়— সেসব লোকের যৌবনের শেষের দিকে একটা বৈরাগ্য আসে— ঐ সময়েই কুণ্ডলিনী জেগে উঠেন।

আমি বলিলাম: যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, যারা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকায় বললেন, তাদের ঐ অবস্থায় অনাচারের ফলে তাদের কুণ্ডলিনী-শক্তি তখন কিভাবে কিরূপ অবস্থায় থাকেন?

আমার এই কুট প্রশ্নটি শুনিয়াই তিনি চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন: তাতে তোর কাজ কি রে শালা ওসব ব্যাজার কথা বলিস কেনে? ওতে তোর লাভ কি?

আমি তখন মিনতি করিয়াই বলিলাম: দেখুন, আমরা গোড়া থেকেই সকলে সাধু প্রকৃতির মানুষ নয়, যৌবনের আগে স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু কিছু অন্যায় যে করি নি তা সাহস করে বলতে পারি না। আর এখনকার দিনে যে প্রকৃতির নিয়মেই আমাদের সকলকার যৌবনের পূর্ণ বিকাশ হয়ে প্রেমানন্দে জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনের যোগাযোগ ঘটছে তা নয়— সেই জন্যেই জানতে ইচ্ছা করে—

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: সত্য করে বল দিকি তোর কত বয়সে রসবোধ

হয়েছিল?

আমি বলিলাম: বোধহয় নয়-দশ বছর বয়স থেকেই নারী রূপের প্রভাব, দেখাশুনায় অনুভব করেছি–

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তার আগে?

আমি: তার আগে মা, মাসিমা, দিদিমা, ঠাকুরমাদের মুখে রূপকথার গল্পে নানা প্রকার বর্ণনায়, নায়ক-নায়িকাদের মিলন-বিরহের ব্যাপারে বেশ একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি মনে হয়। কোন কোন রূপবতী, দীপ্তিময়ী কিশোরীর রূপ, তাদের লাবণ্য মনকে আকর্ষণ করতো, তাতে মনের মধ্যে একটা অস্ফুট বেদনা অনুভব করতাম– এসব এখনো মনে আছে।

তিনি: আচ্ছা আরও আগে, কত ছোট বয়সের কথা মনে আছে বলতে পারিস?

আমি: বোধহয় যখন আমার বয়ঙ্ক দু'বৎসর তখন আমার শরীরের উপর ভয়ানক একটা আঘাত লাগে– তখন থেকেই বোধহয় আমার সব কথাই মনে আছে।

তিনি: দেখ্, শিশুকাল থেকেই যে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঐ রসানুভূতি জাগে, তার বেশীর ভাগ কারণ মেয়েদের গায়ের গন্ধ, স্নেহবশে কোলে নিয়ে টেপাটেপি, চুমু খাওয়া, বুকে নেওয়া, নানারকমের কাতুকুতু দেওয়া ইত্যাদি। শিশু-ছেলে নিয়ে অসংযত যত কিছু আদর আত্মীয়া মেয়ে মহলে ঘটে থাকে আমাদের বাঙ্গালার প্রত্যেক সংসারে বিশেষত অশিক্ষিত মূর্খ মেয়েদের মধ্যে শিশু-ছেলেকে নিয়ে এমন অনেক ভাবের ঘাঁটাঘাঁটি হয়– যাতে অতি অল্প বয়স থেকেই বেশ স্পষ্টভাবে ওটা জেগে ওঠে আর সংস্কারকে প্রবল করে। এসব প্রত্যেক ঘরে হয়, এতো গোড়ার কথা,– ছোঁয়া-ছুঁই ব্যবহার যে ঐসব রসের ব্যাপারে কত বড় শক্তিমান তার হিসাব নাই। শিশুরা ত অসহায় তাদের ত সহজে হয়; বালক যুবা বৃদ্ধ লোকের শরীরেও ওর প্রভাব কম নয়। আচ্ছা এখন বল, সুর গান বা বাজনার প্রভাব তোর উপর কি রকম ছিল। তোর গান ভালো লাগতো?

আমি বলিলাম: শিশুবেলা থেকেই ভালো লাগতো খুব,– এত ভালো লাগতো যে ছেলেবেলায় পড়াশুনা ফেলে যাত্রা শুনতে ভালোবাসতাম। একবার যাত্রা শুনলে দু'তিনদিন পড়াশুনায় মন লাগতো না।

তিনি বলিলেন: গান আমারও খুব ভালো লাগতো। খুব ছেল্যা বয়স থেকেই ভালো লাগতো। আমিও গান করতে পারতাম ভালো রে। গানও ত রস বটে– সব রসই এক রস হোতো– ঐ আদিরসই গোড়া জানবি।

আমি বলিলাম: এখন প্রসন্ন হয়ে বলুন যা জিজ্ঞাসা করেছি?

তিনি যেন অবাক হইয়া বলিলেন: কি?

আমি: ঐ যে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের–

তখন স্মরণ করিয়াই বলিলেন: হাঁ হাঁ, ওদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি বেবাগে

জেগে ওঠে, তাদের মাথা খেয়ে দেয় যে–

আমি: কি রকম, খুলে একটু বলুন, না হোলে বুঝতে পারবো কি করে?

তিনি:বুঝতে পারিস নাই? তাদের লক্ষ্য থাকে ত শুধু ঐ শরীরের আয়েস, তাতে হয় কি, কেবল ঐ সুখের ইচ্ছাই খুব বেড়ে উঠে, কোনও মেয়্যাকে ভালোবাসতে পারে না; মেয়্যা দেখলেই কেবল ঐ সুখের কথাই মনে হবেক– তা ছাড়া আর কিছুই তার মনে হবে না। মায়ের সোজা নিয়মের দিকে তাকাতে পারে না, মন যেদিকে টানে সেই দিকেই যেতে হবেক তাকে। যখন ঐ ভাবে যেতে যেতে ইন্দ্রিয়-সুখ অনেকটা ভোগ হয়ে যায় তখন ভিতরে ভিতরে কুণ্ডলিনী পাক খুলতে থাকে তাদের মধ্যে তখন একটা অবসাদও এসে পড়ে, তেজক্ষয় হোলে পর।

আমি: তা হোলে ওভাবে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের শক্তিক্ষয়েও কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন?

তিনি: তা জাগবেন নাই? তু যদি গোঁ-ভরে, লালস করে একদিকে অন্ধ হয়ে ছুটিস ত ধাক্কা খাবি না? পথ না দেখে ছুটলেই পড়তে হবে যে। তখনই চৈতন্য হবে। যে কেউ ভুল করে গোঁয়ারের পারা, চোখে দেখে না, কানে শুনে না– একবাগে দৌড়ায়, ফলে তাকে এক জায়গায় ধাক্কা খেতেই হবে যে; আর তখন চৈতন্য হবেক। ও শক্তি আর ঘুমায়ে থাকতে পারবে না, জেগে উঠবে। মায়ের রাজত্বে ওটি হবার যো নাই যে গো!

আমি: আর যৌবনের স্বাভাবিক গতিতে বয়সের সঙ্গে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বিবাহিত জীবনেও ত কুণ্ডলিনী জাগেন?

তিনি: হাঁ, যদি দুঁয়ার মধ্যে ভালোবাসা জন্মে থাকে তবেই হবে;–না হোলে শুধু ইন্দ্রিয়-সুখের লক্ষ্যটাই বলবান হোলে শক্তি জাগে না। যেখানে দেখবি একজন আর একজনকে না ভেবে থাকতে পারে না, দু'জনার মধ্যে খুব টান ধরেছে–ঐখানেই শক্তি জাগার কথা বুঝতে হবেক।

আমি: তা হোলে একজনের মধ্যে প্রেমের বিকাশ হোলেও জাগে?

তিনি: হাঁ, তা জাগবেক নাই, প্রেম কি সহজ কথা নাকি, সকলকার বিয়ায় কি প্রেম জন্মায়? মায়ের কত অনুগ্রহ থাকলে তবে সে একজনা প্রেমের অধিকারী হয়?

আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, আর কোন কোন অবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগেন বলুন না? আপনার কথা শুনে আশা হয় যে তা হোলে সকলকারই কোন না কোন সময় কুণ্ডলিনী জাগবেন।

তিনি: দেখ্, গুরুলাভ হোলেই শক্তি জাগেন। সে-রকম গুরু হোলে চ্যালার শক্তি জাগিয়ে দিবেন যে।

আমি বলিলাম,– কেউ যদি গুরু না মানে?

তিনি চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন: গুরুকৃপা ছাড়া কিছু হবার যো আছে নাকি!

যখনই হবে, গুরুর কৃপা ছাড়া কি করে হবে; বলিয়া উদ্দেশে তিনি যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিলেন: শালা গুরুর কৃপা মানবেন নাই—খৃস্তান হইছেন।

অনেক কষ্টে শেষে বুঝাইতে পারিলাম যে গুরুর কৃপা প্রাণপণ করিয়াই মানিয়া থাকি—এখন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি বলিলেন: হাঁ দেখ্—যদি কারো কঠিন বিপদ-আপদ আসে, কি কঠিন রোগ হয় যেমন মরণের কাল এলো মনে হবে, সে অবস্থায়ও তার কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন। আর অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র-ঘটিত মনঃকষ্টে পড়লেও ঐ শক্তি জাগে,—আর বাড়াবাড়ি করিস্ না—বুঝলি?

তাহা হইলে ইহাই পাওয়া গেল যে কুণ্ডলিনী-শক্তি কার কিভাবে জাগিবে তাহার ঠিক নাই। মোটামুটি যে কয়েকটি অবস্থায় জাগে তাহা এই:—

১) স্বাভাবিক যৌবনকালে স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ে, মানবের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ঐ শক্তি জাগে।

২) অস্বাভাবিকভাবে যৌবনের ব্যভিচারে— উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-প্রতিক্রিয়ার ফলেও ঐ শক্তি জাগে।

৩) যাতে প্রাণের ভয় আছে এরূপ কোন কঠিন বিপদের মধ্যে পড়িলেও ঐ শক্তি জাগে।

৪) কঠিন রোগের মধ্যেও ঐ শক্তি জাগে।

৫) অতিরিক্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘটিত গভীরতম মনঃকষ্টে, অথবা যেকোনো কারণে হোক— অসহনীয় দুঃখের ফলেও কুণ্ডলিনীশক্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠেন।

ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, কঠিন দুঃখ বা গভীর মনোবেদনার ফলে যদি শক্তি জাগতে পারেন তা হোলে বেশী কিছু সুখের ব্যাপারেও ত তা হোতে পারে?

তিনি একবার তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন: হাঁ তা ত হোতে পারে বটে। কোনো সময় কারো জীবনে হয়তো এমন কিছু ঘটে যাতে তার আনন্দের সীমা থাকে না—এমন সুখ, যাতে সংসারের আর কোন সুখকে সুখ বলে মনে হবে না, তখনও ঐ শক্তি জেগে উঠবেন। সুখ হউক বা দুঃখই হউক মানুষের জীবনে বা প্রাণে যাতে জোরে ঘা লাগে তাইতেই জেগে উঠেন যে।

তাহা হইলে মানুষের অতি সুখের মধ্যে বা ফলেও ঐ শক্তি জাগরিতা হন?

৫

একটু থামিয়া ক্ষ্যাপা কতক্ষণ পর বলিতেছেন: যেভাবেই জাগুক না কেন আবার ঘুমাবার সম্ভাবনা আছে। যখন জাগলো তখন কিছুকাল খুব উচ্চ অবস্থা থাকলো—তারপর আবার ধীরে ধীরে অহংকার জেগে উঠল, মনে হোলো আমার এতটা উচ্চ অবস্থা হয়েছে—কৈ আর কারো ত এমন অবস্থা দেখতে পাই না—এই ভাবে আবার ক্রমে নেমে পড়তে আরম্ভ করলে—শেষে আবার ঐ শক্তি ঘুমিয়ে পড়লো; এই রকমই ঘটে থাকে।

আম বলিলাম: তা হোলে উপায়?

তিনি: উপায়, পিছনে গুরুশক্তি না থাকলে এমন ত হবেই। গুরুশক্তি না পিছনে থাকলে কারো সোজা উঠ্‌বার যো নাই হেথা, মায়ের কড়া নিয়ম যে,—তবে লোকের চক্ষে গুরুশক্তি দেখা দিক বা না দিক, ভালো মনিষের দিকে গুরুর দিষ্টি থেকেই যায়—আবার তাকে তুলে দেন। কি-রকমটা হয় জানিস,— পতন হোলো পর তার আবার সেই অবস্থা পাবার লেগে প্রাণটা ছটফটায়,—তখন সে আবার একটু কষ্ট করে—সেই অবস্থা পাবার জন্যে, পেয়েও যায় শেষে অবশ্য। ও এমনই সুখ যে একবার সে সুখের আস্বাদ পেলে আর কিছুই ভালো লাগবে না। যার ও শক্তি জেগেছে সে বুঝে, অপরে কি জানবে?

তিনি কতক্ষণ পর বলিতে লাগিলেন: যেটা পরে মানুষকে বড় করে উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়, ছোট ছেল্যা অবস্থার মধ্যেও সেই রসাভাস দেখা যায়। ও সংস্কার ত মানবসমাজে আদিকাল থেকেই চলে আসছে। কারো খুব অল্প বয়সেই ইন্দ্রিয়ে বা মনে প্রকাশ পায়, তবে ওটা ঢাকবার জিনিস বোলে ঢাকাই থাকে। আবার ওদিকে যে রসবোধ জাগে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, কোন সুযোগ সংযোগের ফলেই ত জাগে? আবার সেই সুযোগ সংযোগের অভাবে আপনিই ঢাকা পড়ে যায় ছেল্যা-মেয়েদের মধ্যে। প্রকৃতি নিজেই ঐ রসঘটিত ব্যাপারকে গুপ্ত রেখেছে। যার প্রকাশ হয় তার নিজের কাছেই হয় সাধারণত অপরের কাছে গোপন থাকে। কোন কোন ছেলে বা মেয়্যার ও সংস্কার খুব তেজি দেখা যায় ত, তাদের খুব তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি। তাদের ভিতরে শক্তির প্রভাব বেশী থাকে বলেই ঐ সব ব্যাপারেও সাধারণের তুলনায় একটু আগেই প্রকাশ পায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: যাদের তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি বলছেন তাই বলেই কি তাদের রসবোধ খুব কম বয়সেই দেখা দেয়?

তিনি: এই আদিরসের অনুভূতি সূক্ষ্মভাবে সংস্কারগত হয়ে সকল শিশুরই মনের মধ্যে থাকে, সুপ্তভাবেই থাকে এটা বুঝিস ত? তা হোলে, যেমন যেমন চৈতন্যশক্তির বিকাশ হোতে থাকে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ভোগ আস্বাদনের শক্তি বাড়তে

থাকে। যে শিশুর সব ইন্দ্রিয় সুস্থ, সবল, তাদের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীর জেগে ওঠে—যখনই সুযেগা পায় বা যোগাযোগ ঘটে, তবে দুর্বল বা অসুস্থ শরীর যাদের তাদের তুলনায় সুস্থ ছেল্যাদের আগেই প্রকাশ পায়। সব বাপ মায়েতেই তা জানতে পারে সকলের আগে, যদি লক্ষ্য করে,— বাপ-মা থেকেই সন্তানে ওটা পায় কিনা!

আমি: আচ্ছা, তখন তোকে শিক্ষা দ্বারা ঐ সব শিশুদের ভিতর থেকে ও সকল ভাব দুর করতে পারা যায় না?

তিনি: মর্ শালা, শিক্ষে দিয়ে আগুনকে চাপবি কি করে, সেদিকে যা দিয়ে আগুনকে ঢাকা দিবি তাই-ই পোড়াবে যে! তুই বলিস্ কি রে বোকা, আদিরস, যা সৃষ্টির মূল শক্তি তাকে শিক্ষে দিয়ে উল্‌টে দিবি! একি কিছু বুঝবার বা জানবার জিনিস নাকি, বাইরের কিছু একটা, যা থেকে ওদের তফাৎ রাখবি। এ-যে ইন্দ্রিয়ের জেন্ত অনুভব, অন্য কিছুতেই ঢাকা পড়বে নাই। সব কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়,—ওটিকে আর কাউকে শিকুতে হয় নি।

ঐ শক্তিটাই সব শক্তির মূল, সেই জন্যই ওকে মূলাধার শক্তি বলে। যার যতটা ঐ শক্তি প্রবল তার অনুভব শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ হয়, ধী বা ধারণা-শক্তি প্রখর, অতি অল্প বয়সেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতের যে ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি, গভীর তত্ত্ব সকল বিচার, সিদ্ধান্ত,— সব ঐ মূলীভূত আধার শক্তিরই ফল। যে শিশু ভবিষ্যতে মহা বিদ্বান বা জ্ঞানী বা কর্মী হবে, তার গোড়া থেকেই এমন কি বালক অবস্থার আগে থেকেই আদিরসের সংস্কার খুব প্রবল দেখা যায়। কিন্তু এমনই প্রকৃতির নিয়ম শিশু অবস্থা থেকেই সেই সব ছেলে মেয়েদের মনে এটা যে বিশেষ গোপনীয় এ সংস্কারও স্পষ্টভাবে তাদের মধ্যে দেখা দেয়,— তাই-ই শেষে এ ব্যাপারে সংযমের সহায়তা করে।

আমি: ঐ অবস্থায় তাদের সংযম বোলে কিছু একটা ফোটে কি?

তিনি: যোগাযোগের অভাব আর সংযম এক জিনিস না হোলেও বাইরের চেহারাটা একই। যার দ্বারা মহৎ কিছু হবে, তাদের বেলা রসবোধ জাগলেও প্রকৃতি-জননী ঐ ব্যাপারে কাজের বেলা যোগাযোগের অভাব ঘটিয়ে দেন, শেষে সংযমে পরিণত হয়ে তার প্রতিভা নানাদিকে বিকাশ পায়।

আমি: যোগাযোগের ঘটাঘটির ব্যাপারেও তাঁর হাত আছে নাকি, আশ্চর্য্য ঠেকে!

তিনি: দেখিস্ না, ঐ অবস্থায় সংযমের মত একটা কিছু যদি না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজে ছেলেরা অতি অল্প বয়সে, বালক বলে গণ্য হবার আগে থেকেই যৌন-ব্যবহার লোক-চক্ষের সুমুখেই সুরু করে দিতো, লাজ-লজ্জা, কোন রকম সঙ্কোচ কিছুই থাকতো না। একটি শিশু হয়ত আর একটির সঙ্গে ঐরসের খেলা করছে এমন সময় যদি বয়স্ক কেউ সেথায় এসে পড়ে তখন স্বভাবতই তারা বিরত

হয়,—তার সংস্কারে আপনা থেকেই একটা সঙ্কোচ এসে পড়ে— তাই-ই পরে বয়সকালে সংযমের স্পষ্ট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম একটা সঙ্কোচ যদি ঐ শিশু বয়স থেকেই না থাকতো তা হোলে মানব-সমাজ ছাগলের সমাজে পরিণত হোতো যে। আর এটা ঠিক জানবি কি শিশু, কি বালক-বালিকা, কি যুবক-যুবতী যতই গোপনে তাদের আদিরস-ঘটিত অথবা অবৈধ ব্যাপারকে গোপন রাখতে যত্ন করুক না কেন প্রকৃতি সাহায্য না করলে সেটা গোপন থাকতে পারে না। প্রকৃতি ঠিক জানেন কার কোন্ কাজটা কতটা গোপন রাখতে হবে। তাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে সব কিছু ঘটনাই গোপন বা লোকচক্ষে প্রকাশ পায়। নিজ সৃষ্টি রক্ষার জন্যই তিনি কোনও ব্যাপার প্রকাশ বা গোপন করেন। সমাজে এমনটা দেখতে পাওয়া যায় না কি যে এক ব্যাপার এমন বহুদিন গোপন থেকে পরে প্রকাশ পায়,— সংশ্লিষ্ট লোকেও তা জানতে পারে না,— যখন প্রকাশ করবার হয় তখনই তাঁর ইচ্ছায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন কর্মকর্তারা তার ফলভোগ করেন। সকল ব্যাপারেই এটা হয়ে থাকে, শুধু ইন্দ্রিয়-ঘটিত ব্যাপার বোলে নয়। গুপ্ত ততদিন যতদিন তাঁর অভিপ্রায়।

আমি বলিলাম: এ ত বড় অদ্ভুত ঠেকে, প্রকৃতির হাত আছে এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে!

তিনি: তুচ্ছ, উচ্চ ওসব কথা নয়,— আমরা এখানে রয়েছি কেমন, ঠিক মায়ের কোলে শিশু যেমন থাকে ঠিক তেমনি। শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখন মায়ের দৃষ্টিতে শিশুর সবটাই দেখা যায়। শিশু বরং মায়ের অনেকটাই দেখতে পায় না। আমাদের যতই কেন বিদ্যা-বুদ্ধি-চাতুরী থাক না ও-চক্ষুকে এড়াবার যো নাই।

আমি: আচ্ছা, সে চোখটা থাকে কোথায়, কোনখান্ দিয়ে তিনি এ সব দেখেন?

তিনি: ভেবে দেখ দেখি, কোনখান্ দিয়ে তিনি আমাদের সবটাই দেখতে পান?

আমি: ধারণাটা বড়ই শক্ত,— তবে আমার যা মনে হয় বোলতে ভরসা হয় না।

তিনি অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বল না, না হয় ভুলই হবে তাতে ক্ষতি কি,— আমি তো শেষে শেষে তোকে বোলতে পারব—

আমি বলিলাম: আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের চক্ষেই আমাদের সব কিছুই তিনি দেখেন।

তিনি: কি রকম, খুলে বল না।

আমি: ধরুন, আমরা যা কিছুই করি না কেন, ভালো বা মন্দ যত কাজ সে সব আমি করছি বোলেই ত করি,— আমাদের সব কাজ আমাদের ত ভালোমতেই জানা থাকে। আর তিনি ত অন্তর্যামী, আমাদের সকল ব্যাপারই আমাদের মধ্যে অন্তর্যামী হয়ে তিনি খুব স্পষ্টভাবেই জেনে ফেলেন। যা আমরা জানি তা তিনি সবই জানেন।

তিনি: হাঁ, এ ত ঠিকই বোলেছিস্— তু শালা সব জানিস্ , ন্যাকা সেজে হেথায় এসেছিস্— বল্ দেখি ঠিক কিনা?

আমি: আচ্ছা, এটা খুব আশ্চর্য্য মনে হয় না কি যে, তিনি এতটা কাছে আমাদের অন্তরের মধ্যে আছেন অথচ আমরা তাঁর থাকাটা কল্পনায়ও আনতে পারি না। কোনও গোপন কাজ করে যেন একটা সংস্কার বশে মনে করি সকলের চক্ষু এড়িয়ে চতুরের কাজ করলাম।

তিনি: পশুজন্ম ঘুচলে পর তবে ঐ সব জ্ঞান হয়। (তন্ত্রে মানবের যে তিন অবস্থার কথা আছে; যথা– মানুষ প্রথমে পশু, তারপর বীর বা মানুষ, শেষে দিব্য-শক্তির বিকাশে দেবতা,– সেই হিসাবেই এই পশুর কথা বলিতেছেন।) কুণ্ডলিনী না জাগলে ত সে দিকে যাবার পথ নাই। পশুজন্ম আর বীর বা মানবজন্ম এই দুইটা জন্মই দীর্ঘকালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সব কিছুই কালের ভিতর দিয়ে হবে যে। ছিষ্টির এতটা ভোগ, এতটা শক্তির খেলা এ সব ত ভোগ করতে, জানতে হবে– সে কি দুই এক দিনের ব্যাপার?

আমি: থাক্ ও সব কথা, এখন বলুন আমাদের মত মানুষ যাদের এ সব জানতে শুনতে ইচ্ছা হয়, সৎপথে যেতে প্রবৃত্তি হয়, কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠলেও এত বাধা আসে কেন, সোজা পথ পাওয়া যায় না কেন? উদ্দেশ্য ত সৎ আছে, অবশ্য অহংকার করে বলি নি,–

তিনি: না, না, অহংকার হবে কেনে, যথার্থ কথাই ত বলছিস। হ্যাঁ দেখ, তুই যে সৎ উদ্দেশ্যের কথা বলছিস্– এখন কতটা তুই ঐ সৎভাবকে আঁটালো করে ধরেছিস তা ত তুর জানা নাই। মনে হয়ত হোলো তুই সৎ ভাবেই চলেছিস, কাজে দেখা গেল কোন সুযোগ যদি এলো ত অসৎভাবেই ফেঁসে গেলি, এমন ত ঘটে।

আমি: হ্যাঁ তা ঘটতে পারে বটে, সত্যি কথা গলদ আছে আমাদের এই সৎভাবে থাকার মধ্যে– এটা আমরাও দেখতে পাই যখন মনটা সরল থাকে! কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেও অনেক সময় পথের জটিলতা ঘুচাতে পারি না–

তিনি: একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে আছে এখানাকার সকলকার সব ব্যাপার যে,– কোনটা নিছক আলাদা নেই ত, কাজেই ব্যাপার সব জটিল চট করে কাজ হবে কি করে। তেমন তেমন জোর যদি থাকে ত তবেই জটগুলা কাটা যায়, ছেঁড়া যায়। তবে কুণ্ডলিনী জাগার সঙ্গে সঙ্গে এমনই একটা শক্তি পাওয়া যায় যে সব থেকে নিজের উদ্দেশ্যটি ঠিক আলাদা করে নেওয়া যায় তাইতেই ভালো হয়। তারপর পশুজন্মের সকল মানুষেরই মেয়্যাদের আসল পরিচয়টা পেতেই বিলম্ব হয় বেশী, তাইতেই অনেক কাল যায় যে। তারপর ধন-মান-টাকার কথা আছে, মেয়্যা আর টাকা এই দুটাই আগুন নিয়ে খেলা করার পারা। শুধু সহবাসের সুখটি লক্ষ্য করে মেয়্যাদের দেখলেই পুড়তে হবে।

আমি: রামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথা বলেছেন, তনি সাধুদের ও দুটাই ত্যাগ করতে বলেছেন। কিন্তু দেখুন পুরুষদের বিপদটা এই ব্যাপারে খুব বেশী, মেয়েদের

কিন্তু ও সব ভাবই নাই, তাদের মধ্যে সংযম এতটা বেশী বা লালস, অবশ্য ভগবানের ইচ্ছাতে, এতটা কম যে তাদের পতনের সম্ভাবনা খুবই কম। গোড়া থেকেই তারা সব ত্যাগ করতে পারে।

তিনি: না তা ঠিক না। ত্যাগ তারা মন থেকে সহজে করতে পারে না, তবে সব কিছুই ধৈর্য ধরে সইতে পারে; কিন্তু পুরুষের সঙ্গে পড়লে তারা ভালোবাসার জন্যে সব কিছুই ছাড়তে পারে। অত দিনের ধৈর্য্য, অত দিনের ত্যাগ এক কথায় ছেড়ে দেয়– যদি পুরুষকে অনুগত দেখতে পায়। আসলে সরল মন বোলে তাদের ভোগান্তিও বেশী। মহাপ্রকৃতি মেয়েদের অতটা সহ্য করবার শক্তি যদি না দিতেন তা হোলে এ সংসার ছারখার হয়ে যেতো।

আমি বলিলাম: পশুভাবের মানুষ যারা তাদের কথায় আমাদের কাজ নেই। ভাগ্যক্রমে যথাসময়ে ঐ যে কুণ্ডলিনী-শক্তি জেগে উঠেন তখন থেকেই ত মনুষ্যত্বের কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু তাও আবার ঘুমিয়ে পড়ে বোলছেন যে– এ ত ভয়ের কথা?

তিনি: হাঁ, যৌবনের সময় ঐ যে স্বাভাবিক কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগা, ও জায়গায় যদি সতর্ক না থাকা যায় তাহোলে আবার সুপ্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তারপর আবার যে জাগে সেই জাগাতেই মহৎ ফল লাভ হয়।

আমি: যদি বা জাগলো আবার সুপ্ত হবার সম্ভাবনা কেন?

তিনি: প্রথম জাগায় ভালো ঘুম ছাড়ে না– ভেবে দেখ, যে সব প্রবৃত্তি এতকাল একজনের ধাতে স্থায়ী হয়ে বোসেছে তা কি একেবারেই বদলে যেতে পারে? যেতে যেতে কতদিন যায়; সেই জন্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেও একেবারেই সে-রকম ঘুমাতে পারে না, আবার জেগে উঠবার জন্যেই মুকিয়ে থাকে। মনে কর, পশুভাবের ইন্দ্রিয়, সুখের লালস, স্বার্থপরতা, অপরের সুখ তুচ্ছ করে নিজের সুখ-দুঃখকেই বড় করে দেখা সে গুলা কি একেবারেই যায়? প্রথমে যৌবনের কামজ-সম্বন্ধ নিয়ে নারী-সম্ভোগ, যার আকর্ষণ এতটা প্রবল থাকে সেটা থাকতে ত কিছু ভালো কাজ বা উচ্চ ভূমিতে গতি হবে না–সেই জন্য দ্বিতীয়বার যখন শক্তি জাগে তখন ঐ ভাবের কামজ-নারী-সম্বন্ধের উপরও একটা ঘৃণা এসে পড়ে।

আমি বলিলাম: ঘৃণা থাকাও ত ভালো নয়; ঘৃণা লজ্জা এ সব তো এক-একটা পাশ, ঘৃণা যদি কোন জিনিসের উপর থাকে তা হোলে ত সেই পাশে বদ্ধ থাকাই হোলো?– নয় কি?

তিনি: অবশ্য প্রথমটা তা হয় বটে, সেটা প্রতিক্রিয়ার ফলেই হয়। কিন্তু তারপর আপনার প্রকৃতির সঙ্গে সেটা মানিয়ে নিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের আসল সম্বন্ধ জ্ঞান হোলেই সেই ঘৃণার ভাবটা উবে যায়– তাই হোলো কুণ্ডলিনী জাগরণের মুখ্য ফল।

আমি: তাহোলে কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল কি এই নর-নারীর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান?

তিনি: মনে কর যখনই মানুষ বড় হয়ে নিজ শক্তিতে মহৎ ভাব সকল প্রকাশ করতে থাকে,– যেমন ঋষিকল্প মানুষেরা, আসলে তাদের স্ত্রীকে ত্যাগ করবার আর দরকার হয় না– তাদের এমনই একটা সহজ ভাবের স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ-জ্ঞান পাকা হয়ে যায় যাতে রক্ত-মাংসের দেহগত সম্বন্ধটা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে যায়। শুধু যৌন-সম্বন্ধ-জ্ঞান মাত্র নয়, জগতের সকল ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধটাও বদলে যায়। ঐ জ্ঞানই হোলো ঐ শক্তি জাগরণের মুখ্য ফল। প্রথমে যে সব ভোগ আকর্ষণের বস্তু থাকে,–পরে চৈতন্যের আলোতে সে সকলের রূপ বা প্রভাব উল্টে যায় অথচ কোন বস্তুর লোপ হয় না। দ্বিতীয় জাগরণে এই সব উচ্চ ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়– তা থেকে পতন নাই। তখনই এখানকার সকল বস্তুর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সার্থক হয়, তত্ত্বজ্ঞান ফোটে, সকল ভোগ সকল জিনিসের স্বরূপ দেখা যায়।

আমি: এ জগতে ভোগ আর কর্ম, শেষে জ্ঞান– এই ত এখানকার মোটা কথা; অবশ্য শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ঠ ভেদ অধিকার নিয়ে কথা আছে।

তিনি: হ্যাঁ, সাধারণভাবে ভোগ, কর্ম আর জ্ঞান এই তিনটিই আসল। ভোগের মধ্যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নিয়ে যে ভোগ, তার মধ্যে মৈথুনে ঐ সব কটাই একসঙ্গে তৃপ্ত হয় বোলে যৌবনে তার আকর্ষণই সকলের বড়। তারপর হোলো অর্থ বা ঐশ্বর্য ভোগ, তারপর শেষ হোলো জ্ঞান এবং লোককল্যাণ সম্পর্কে যত কর্ম আছে– গুরু-ভাবে তার শেষ ফল হোলো জন এবং সমাজ থেকে শ্রদ্ধার আকাঙ্ক্ষা– গুরুপদে প্রতিষ্ঠাই হোলো এখানকার শেষ ভোগ বা কর্ম!

আমি: মোটামুটি ভোগ এই তিনটি হোলেও আমার মনে হয় চতুর্থ একটি আছে।

তিনি: কি?

আমি: আত্মজ্ঞান বা কোন বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তপস্যা বা কর্ম।

তিনি: আত্মজ্ঞানের জন্য ঐকান্তিক যত্ন হোলো এ জীবনের মূল উদ্দেশ্য– তার ফলাফল শেষে ঐ গুরুভাবের মধ্যে গিয়েই পড়লো– আলাদা হোলো কি করে?

আমি: কেন, এই জগত-সৃষ্টির কৌশল, পদার্থ-বিজ্ঞান ব্যাপারে সৃষ্টিতে কত কত মূল উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধানও দেশের কত পণ্ডিত মহাত্মা এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের তপস্যায় জীবনপাত করছেন– কত কত আবিস্কার করেছেন, তাতে,–

তিনি: তাঁরা কি লোক-সমাজের উপকারের উদ্দেশ্য নিয়ে এসব করছেন না?

আমি: তা হোতে পারে– তবে মূলত সেসব কাজ ত প্রেরণামূলক,– আর নিঃস্বার্থ ভাবেরই মনে হয়।

তিনি: তা হবে! কিন্তু প্রথমত তার মধ্যেও তাঁদের আনন্দ পূর্ণমাত্রায় আছে– কাজেই সেটা উচ্চস্তরের ভোগের মধ্যেই এসে পড়লো। তারপর তাঁর তপোলব্ধ জ্ঞান, যা তিনি রেখে যেতে চান, সেও ত ঐ গুরুপদের পর্য্যায়ের মধ্যে পড়লো। ঐ মূল

তিনটি থেকে পৃথক আর একটি তাকে কি করে বলা যায়?

আমি: তা ঠিক না হোক, এসব ত উচ্চ উচ্চ ভাবের অবস্থা বলতে হবে।

তিনি: তা তো হবেই, ঐগুলোই ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভোগের মধ্যে এলো। তাতে দেখতে পাবি– ঐসব উচ্চ ভোগের মধ্যে তাঁদের উঁচু অবস্থায় নারী, ধন বা অর্থের সম্বন্ধ থাকলেও তার সঙ্গে কোন মলিন ভাবের সম্বন্ধই নেই। এটুকু বুঝে লাভ আছে।

আমি: তা বটে, ঐসব উচ্চস্তরের মানুষ যাঁরা– তাঁরা সঙ্গে স্ত্রীও রেখেছেন অর্থও রেখেছেন, কিছুই ত্যাগ করেন নি। এতে আমার মনে হয় যে আমাদের ভারতে মানুষের ধাতে ত্যাগ ত্যাগ করে একটা যাপ্য বায়ু-রোগের প্রভাব আছে।

তিনি: এই দেখ্ না কেন, মেয়্যা মানুষই বল্ আর ধন বা অর্থই বল এদের সঙ্গে যথার্থ পরিচয় হয়ে গেলে সেসব ত তার জীবনে সাধনের সহায় হয়ে যায়। হেথায় মেয়া-মরদের স্বরূপ-জ্ঞান হোলো। এদের সঙ্গে তোর যথার্থ সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়ে যায়, তখনই জীবন সার্থক হয়। আর সেইটাই বুঝবার লেগেই না মেয়্যা-মরদের এতটা ঘাঁটাঘাটি! পশুভাবের যা-কিছু সবই এই দেহকে নিয়ে– দেহজ্ঞান যাদের বেশী তারাই ত পশু, আর ভোগ-বিলাসের জঙ্গলের মাঝে দলবেঁধে ঐ পশুগুলোই ত চরে বেড়াচ্ছে, এটা ত বুঝেছিস?

আমি বললাম: তা তো খুব ভালো করেই বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই অগাধ পশুত্ব থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায় কি বলে দিন আপনি।

তিনি: আহা, এতটা শুনে, এতটা বুঝেও বোকার মত কথা বলিস কেনে। অনায়াসে পশুত্ব ঘোচাবার কত সহজ পথ এখানে রয়েছে,– শাক্ত হলেই পশুত্ব ঘুচবে, শক্তিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করলেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করলেই শাক্ত হওয়া যায়। শুধু এ দেশের মানুষের কথা নয় সারা পৃথিবীর মানুষের শাক্ত হওয়া ছাড়া পশুত্ব ঘোচাতে আর অন্য উপায়ও নাই। দেবীসুক্তে জানিস দেবী কি বলছেন?

আমি: সে আর জানবার দরকার নেই, এখন একটা শুভ খবর আপনাকে দি, শুনে সুখী হবেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষই শাক্ত হয়ে গিয়েছে। সহজ ভাবেই তারা অনেককাল আগেই শক্তিকে আশ্রয় করে জগদম্বার শ্রেষ্ঠ সন্তান বোলে পরিচয় দিয়েছে– কেবল ভারতবর্ষের হিন্দু বলতে যাদের বুঝায় তারা ছাড়া। দেশের এরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যেকোনোও উপায়েই হোক শক্তিকে দেশের সকল হিন্দু অধিবাসীর ভিতর থেকে তাড়িয়ে জড়াবস্থা আনতেই হবে, না হোলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে শীঘ্র পরলোকে পৌঁছে বৈকুণ্ঠ অধিকার করা যাবে না,– এরা বলছেও শাক্ত হয়ে কোন লাভ নেই– কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থটুকুই হোলো ভাববার জিনিস।

শুনিয়া ক্ষ্যাপা বাবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন: তাঁরা না হয় শীঘ্র শীঘ্র গিয়ে ভূতনাথের দল বাড়ালেন, কিন্তু যাদের সৃষ্টি করে গেলেন, তাঁদের বংশধরেরা,– তাদের জন্যে কি করে গেলেন?

আমি: তাদের জন্যে– যাতে তারা জগতের শ্রেষ্ঠ শাক্তদের চিরকাল অবিশ্রান্ত-ভাবে পদসেবা এবং পাদপূজা করে ধন্য হোতে পারে তার পথ উপায় করে গেলেন, আর শেষে বাপ-পিতামোর পাকা মার্কামারা পথ ত আছেই– আর বাবা ভূত -নাথও আছেন। যাক ওকথা ... এখন আমার শেষ কথা একটু আছে দয়া করে যদি শেষ করে দেন, ... সেটা এই যে তান্ত্রিকদের যেমনভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় অ-তান্ত্রিকদের কি ঠিক সেই রকম হয়?

তিনি: তান্ত্রিকদের কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগানো, আর তাকে প্রত্যেক চক্রের ভিতর দিয়ে তোলা– সে সব আলাদা সাধন, তাতে মজা আছে। সাধারণ মানুষ সেসব মজা পায় না। মনে কর, অনেককাল থেকে কত কত সাধক যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেক চক্রে পদ্মের কথা বলেছেন,– প্রত্যেক পদ্মের মধ্যে পৃথক পৃথক দলের কল্পনা আছে– প্রত্যেক চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী আছেন, বীজ মন্ত্র আছে– যেমন যেমন এক একটি চক্র ছাড়ায় কুণ্ডলিনীশক্তির নানা ভাবের বিকাশ অনুভব করা যায়। এসব আলদা সাধন– এর একটা মহৎ উপকার এই হয় যে শক্তির উপর আয়ত্ত বিস্তার করা যায়। অনুভব করা যায় ঐ শক্তি কখন কোন্ চক্রে কিভাবে ক্রিয়া করছে– তার ফল কি হচ্ছে। তাতে ধী-শক্তি তীক্ষ্ণ হয়, অন্যান্য শক্তির বিকাশ হয়। এই পদ্ধতি অতি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত। এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-শক্তি প্রত্যেক চক্রের মধ্যে থাকার ফলে যে যে ভাব হয়, যে যে স্ফূরণ হয় সে সকল অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দের স্ফূরণ হয় তার তুলনা নেই। তান্ত্রিক যাঁরা ঐ শাস্ত্র অনুযায়ী যথার্থরূপে সাধন করেন, তাঁদের সেটা বিশেষ লাভ যা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষে পেতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ঐ ধরনের কিছু কিছু সুবিধা আছে যা অপর দলে নাই। এতো জানা কথা। তান্ত্রিকদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি নামে যা বলা হয়েছে তা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে আত্মশক্তিরূপে প্রকাশ। প্রথমে অবস্থা বিশ্লেষণ করেই ওকে কুণ্ডলিনী বলা হয়েছে– ঐ শক্তি জাগরণের পর আত্মাতেই ওর চরম পরিণতি অর্থাৎ ওর শেষ, আত্মার সঙ্গে এক হোয়ে মিলে যাওয়ায়।

আমি: আপনার কথায় এ বিষয়ে আসল কথা এই বুঝা গেল যে, অধ্যাত্ম জীব-চৈতন্যকেই তান্ত্রিকেরা কুণ্ডলিনী-শক্তি রূপে ধারণা করেছেন। তারই জাগরণ থেকে চরম পরিণতি পর্য্যন্ত একটি অপূর্ব অধ্যাত্ম-সাধন পথ তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছেন, যার হদিস অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের কেহ পায় না। তন্ত্রে এই-ই পরম গৌরবময় স্বার্থ সিদ্ধির পথ। জগতের যত ধর্ম-সাধনের পথ আছে, এটি তার মধ্যে একটি নিজ বিশেষ মহিমায় উজ্জ্বল, অনন্য সাধারণ একটি পথ যার কথা সভ্যসমাজের অধিকাংশেরই অজ্ঞাত। কেমন এই ত? এখন বলুন জীবাত্মার সঙ্গে কুণ্ডলিনীর আসল সম্বন্ধটা কি?

তিনি: এখন জীব বলতে হবে, জীবাত্মা নয়। জীবের সঙ্গে তার সম্বন্ধ, প্রথম

অবস্থায় তাকে তার অংশও বলা যায় আবার তার প্রকৃতিও বলা যায়। যৌবনে যেমন মানুষ তার প্রেমের আধার-স্বরূপ জীবন সঙ্গিনীকে পেয়ে পূর্ণ হয়– আনন্দময় হয়, সেই রকমই এদের সম্বন্ধ, তারপর শেষে জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার আশ্রয় পেয়ে পূর্ণ হয়,– সেই রকমই এই কুণ্ডলিনী, জীবের সঙ্গে মিলিত হয়ে, এক হয়ে উভয়েই পূর্ণ হয়, যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ দুই-ই– অপূর্ণ থাকে। তারপর, এটা বুঝতে হবে যে প্রথম স্তরের স্থূল মানুষের মধ্যে যে জীব, তা শক্তিরূপেই অধিষ্ঠান করেন। তারপর নানাভাবে ভোগ আবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেমন অবস্থা-বিশেষে কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হন তখন দুজনেই দুজনকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কালের মধ্য দিয়েই এই শক্তির বিকাশ হয়,– বিকাশের পূর্বে জীব নিজেকে শক্তি মাত্র ভাবতে পারে, কারণ তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গেই তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ থাকে– তখন তার অস্তিত্বের সবটাই স্থূল। ক্রমে ইন্দ্রিয়-গ্রামের সঙ্গে মনাদি পুষ্ট হলে পর,– কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্ভব হয়,– এই-ই চৈতন্য শক্তি– সাধারণত একেই সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ বলে। প্রথমে ছিল ঘুমিয়ে অর্থাৎ তার ক্রিয়া দেখা যায় নি– এখন জাগরণে তার ক্রিয়া দেখা গেল। আসলে জীবের চৈতন্য শক্তিই হোলো কুণ্ডলিনী, জেগে উঠে তার গতি হয় বিকাশের পথে অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রের পানে; সেই কেন্দ্র; হোলো প্রজ্ঞাচক্র, যেটা প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা সবেরই কেন্দ্র, কি না অধিষ্ঠান-স্থান; মানুষের সব কিছু ধারণার স্থান হোলো ঐখানে। পূর্ণ যৌবনের প্রভাবে যেমন নারী তার স্বাভাবিক প্রাণের টানে ভর্তার সঙ্গে যোগাযোগ অপেক্ষা করে, মিলনের কাল যত নিকট হয়, ততই তার ব্যাকুলতা বাড়ে– তারপর হয় যোগাযোগ বা মিলন। একই সত্তায় পরিণত হয়ে, জীবের হয় পুনর্জন্ম, চৈতন্য শক্তির যোগে তখন তাঁর উপাধি হয় জীবাত্মা। তখন পরমাত্মার পূর্ণতা ও অনন্ত ভাবদুটি ছাড়া আর সব ভাব বা ঐশ্বর্য্য ফুটতে থাকে জীবাত্মার মধ্যে। অবশ্য এই ফোটার ব্যাপারে কত জন্ম-জন্মান্তর হয়, তার হিসাব রাখছে কে, ওদিকে জীবের স্থূল ইন্দ্রিয়জ ভোগের ঘোর মেটাতেই কত জন্ম কাটে– তার ঠিক নাই। পরে জীবাত্মা পরমাত্মার লাগ পেয়ে সর্বজ্ঞ হন, পূর্ণ হন, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হন,– এই হোলো জীবাত্মার ইতিহাস; আর রাধা-তন্ত্রের সার কথা।

আমি স্তম্ভিত,– নির্বাক বিস্ময়ে, অবাক হইয়াই রহিলাম কতক্ষণ।

বাবা বলিলেন: যাঃ, এখন আর জ্বালাস না তু, চলে যা!

আমি বলিলাম: তা ত হোলো, এখনও একটা কথার মীমাংসা হয়নি যে।

বাবা বলিলেন: আবার কি? এরপর আরও কি কথা হবে রে শালা, তু বলিস কি?

আমি: এর পরের কথা নয়, আগের কথা। নর-নারীর আসল সম্বন্ধটা কি? কেমন করে আমরা এই মোহঘটিত সম্পর্ক থেকে উদ্ধার পেতে পারি?

তিনি বললেন: ও ত আপনিই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হবে, ও কারুকে বোলে দিতে হয় না। তোর ত বিয়া হয়েছে, সন্তান হয়েছে, তু ত সব জানিস,– কেমন করে জন্ম দিতে হয় সে কি তোকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে নাকি?

আমি: সে ত একটা ব্যাপক মোহঘটিত ব্যাপার– আসল সম্বন্ধটা তা হোলে কি? জানতে ইচ্ছা হয় না কি?

তিনি: ও ত শেষের কথা, এখন সে কথা কেন? সময় হোলে মানুষের তা আপনি বুঝে।

আমি: দেখুন, আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার কত লাভ। আমরা যেসব তত্ত্ব জানতাম না তা আপনার কাছে শুনে আমাদের কত উপকার। কুণ্ডলিনীর কথা শুনে ভরসা হোলো যে প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই ও শক্তি জাগে– এমন কথা আগে কোথাও শুনিনি যে তান্ত্রিক না হোলেও শক্তি জাগে।

তিনি: ও সবই গুহ্য কথা, রহস্য প্রকাশ করতে নাই,– সব কি বলতে আছে রে! আচ্ছা, তুই-ই চেষ্টা চেষ্টা কর না– কেন ভাবতে, নরের সঙ্গে নারীর আসল সম্বন্ধটা কি! আমি বরং একটু আভাসে তোকে সাহায্য করছি,–

ভেবে দেখ্, ঐ মেয়্যারা কি রকমে ছিষ্টি রাখছে– তাকে প্রথম তুই পেলি কোথা? প্রথমে দেখ, তোকে মা হয়ে পেটে ধরলে, তারপর এই জগৎ সৃষ্টির মাঝে তোর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তোকে প্রসব করলে– তারপর বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করলে– তুই বড় হলি। যেমন যেমন তোর ভাব তেমন তেমন শক্তি পেলি, সামর্থ্য পেলি, শৌর্য্য-বীর্য্য পেলি, ক্রমে জোয়ান হয়ে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনতে লেগে গেলি! আর একলা যেন থাকা চলে না, এতো সব থাকতেও কোনখানে বড় একা একা ঠেকে। তখন বৌ হয়ে এলো তোর জীবনের সাধ পূর্ণ করতে, সংসারের রহস্যময় নূতন নূতন সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য পড়লো, ভোগের নেশা লেগে গেল, একেবারে মশগুল। নেশার ঘোরে কত সৃষ্টি করে ফেললি– তার সঙ্গে মিলে জগতের কত কিছু দেখলি, কত কিছু জানলি– যদি সঙ্গে সঙ্গে দিব্য-ভাবের খোঁজ পেয়ে গেলি তো ভালো, সব সম্বন্ধ সার্থক হয়ে গেল,– নিজের সঙ্গে সকলকারই স্বরূপ দেখতে পেলি, আর তা যদি না হোলো তবে মানুষ হয়েই রয়ে গেলি, পুরোনো ভোগের মক্সো চলতে লাগলো, আর সে তোকে শান্ত রাখলে কোনো তাপ না লাগে, তোকে আগলে তোর সেবাতেই লেগে রইলো।– যতকিছুর তোর পাপ, তাপ, অসুখ, অশান্তি– আবার অপরদিকে তোর সুখ, সম্পদ, দুঃখ, উচ্চ-নীচু যত ভাব, তোর আদর-অনাদর, মান-অপমানের বেগ ধরে জীবন-সঙ্গিনী হোয়েই রইলো। তোর সৃষ্ট জীবগুলি বড় হয়ে তোর জগৎ-সংসারকে সফল করলো, – তুই হলি কর্তা, – সে তোর পিছনে, তোর সব-কিছুর বোঝা নিয়ে সঙ্গী হোয়ে রইলো। তারপর কাল পূর্ণ হলে, যদি তুই আগে টেঁসে গেলি তো ফাঁকি দিলি; আর যদি সে আগে গেল ত তোকেই বুঝবার ভার দিয়ে গেল যে সে

তোর কে ছিল? সে না হোলে তোর আসা, এত বড় হওয়া– এত কাণ্ড করার কোন সম্ভাবনাই ছিল কি?

এখন বুঝে দেখ্ না কেনে তার সঙ্গে তো কিসের সম্বন্ধ – বা কোথায় সম্বন্ধ।

আমি অনেকক্ষণ যেন স্তম্ভিত হইয়াই রহিলাম। বাবা স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না বটে কিন্তু যে বস্তুর আভাস দিলেন সেটা ত সহজ বা সরল ব্যাপার মনে হয় না। একটি অস্পষ্ট বিশাল নগ্ন সত্য যেন মুর্তি ধরিয়া অন্তঃকরণের সবটা জুড়িয়া উঁকি মারিতেছে, – এ কি!

ইতিমধ্যে বাবার সেবক, ছিলাম প্রস্তুত করিয়া হাতে ধরাইয়া দিল এবং দূরে পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল!

আমি ভাবিতেছি, – এক জীবনেই যেন চক্র সম্পূর্ণ হইয়া গেল – ব্যাস্ তারপর আর কোনই সম্বন্ধ নাই! তারপর আবার মনে হইল ঠিক যেন বিরাট পথে পথিকের সঙ্গে পথিকের দেখার মত– মধ্যে কতকটা পথ একসঙ্গে চলিয়া শেষে আর যেন সম্বন্ধ নাই,– তাহা হইলে দার্শনিকেরা যেমন বলিয়া থাকে। একথাটা কিন্তু অত্যন্ত স্থূল।

ইতিমধ্যে বাবা কখন কলিকার কাজ শেষ করিয়াছেন লক্ষ্য ছিল না, হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, বলিতেছেন: না না, এক জন্মেই সব শেষ হবে কেনে, আসলে দুজনের শেষ একসঙ্গেই হবে যে!

শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: সে কখন, জন্মান্তরে নাকি?

তিনি বলিলেন: জন্মান্তর? ও ত দিনরাতের ব্যাপার! তার হতে যদি তোর কিছু ভালো হয়ে থাকে তোর হতেও তার কিছু ভালো ত হয়েছে বটে? তুইও যেমন তাকে চাস, সেও ত তোকে চায়, তুই যেমন তাকে ছাড়তে চাস নাই সেও তোকে ছাড়তে চায় নাই– দুজনা দুজনার কাজ গুছিয়ে ল্যায় যে! ছাড়াছাড়ি এই শরীরটাতে হোলো, কিন্তু বাকি সবই রইলো। যতক্ষণ না শেষের কাজ মিটে।

আমি: জীবন-সঙ্গিনী আবার জন্মজন্মান্তরেও ধাওয়া করেন নাকি?

তিনি: ভয় করে নাকি তোর? যথার্থই তুই যদি তাকে চাস, সত্যই তোর টান যদি থাকে তবেই তো ধাওয়া যদি তা না থাকে তবে কে তোকে ধরতে যাবেক, কার এত মাথা-ব্যথা বল্ দিকি?–

৬

তারা পীঠে বামার সঙ্গ আরও কিছুদিন, বোধহয় দশ বারো দিন পাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে যে কয়টি দিনের ব্যাপার আমার মধ্যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা বলিয়াই ক্ষ্যাপা বাবার প্রসঙ্গ শেষ করিব।

একদিন সকালে দেখি, তাঁর ঐ চালার মধ্যেই তিন চার জন ভক্ত, তার সঙ্গে

ক্ষ্যাপা বাবাও আছেন। বাবা একেবারে চুপচাপ বসিয়া আছেন, মনটা বোধহয় ভালো ছিলনা, কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব তাঁর মুখে। শরীরটা বাঁকিয়া গিয়াছে, – সোজা বসিতে পারেন না, তাহার উপর অসুস্থ শরীর। কুকুরগুলি ঠিক কাছেই আছে, লালি, শ্বেতফুলি, কেলো, ভুলো এরা সব বাবার সাঙ্গপাঙ্গ। এদের সম্বন্ধে তাঁর যে ভাব তা অসাধারণ। অসাধারণ এইজন্যই বলিতেছি যে আমরা বা আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ কুকুর পুষি অনেকটা সখের খাতিরেই, তাও আবার উহা য়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণেই। আবার একদল বাড়ি হইতে চোর ছ্যাঁচড় তাড়াইবার জন্য পোষে, আবার এক শ্রেণীর গৃহস্থ কুকুর পোষে, পায়রা পাখি পোষে, বিড়াল পোষে, জীবে দয়া আছে তাই! তবে এই শেষের ভাবটা খুব কম লোকেরই হয়। কিন্তু ক্ষ্যাপা বাবা তাঁর এই কুকুরগুলিকে যেভাবে দেখেন তা ঠিকমত বিচার করিলে তাহাকে অপত্যস্নেহ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বাপ তার ছেলে ও মেয়েকে যেভাবে দেখিয়া থাকেন– কেলো, ভুলো, শ্বেতফুলি প্রভৃতিকে তিনি ঠিক সেইভাবেই দেখিয়া থাকেন একথা বলিলে কিছুমাত্র বেশী বলা হয় না। যাই হোক এই কুকুরের মধ্যে শ্বেতফুলি যেটি, সেটি সে সময় ছিল গর্ভবতী। আজ সকালে এখন দেখি বাবা তার পিঠে হাত বুলাইতেছেন। আমি কিছুই আশ্চর্য্য হই নাই, চুপ করিয়াই দেখিতেছিলাম। হাত বুলাইতে বুলাইতে বাবা একজনের দিকে ফিরিয়া– বোধহয় নগেন পাণ্ডাই হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন,– আর কতদিন আছে বল দিকি এর বাচ্ছা হতে? সে বলিল,– এই শীঘ্রই হবে বোধ হয়। বাবা বলিলেন, এইবার প্রথম কিনা তাই ভয় হয়– তা কি রকম হবে বল্ তো?

সে বলিল,– কোন চিন্তা নেই বাবা মায়ের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক মনে হয় দূরস্থ ভক্তই হইবেন, তিনি বলিলেন, – এগুলি সব ঠিক যেন আপনার সন্তান – এমনটা আর কোথাও দেখিনি।

বাবা একবার সেই ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, আমার সন্তান? ঐ তারা মায়ের সন্তান! এখানে যারা আছে সব তারা মায়ের। এরা কেউ ছোট জীব নয়। কৈ নিয়ে যাও দিকি এদের কোথাও এখান থেকে, – পারবেনা, কখনো পারবেনা। এরা সবাই মায়ের আশ্রিত।

এই পর্য্যন্ত ঐ কুকুর সম্বন্ধে কথা তখন হইয়াছিল– তারপর আমি উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম, আমার কথা এখন হইবে না– এরা ত এখন কেহই উঠিবে না গাঁজা ডলাই মলাই হইতেছে, উহা শেষ হইতে অনেক দেরী,– অন্য সময়ে একবার চেষ্টা করিব। দুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবার প্রবন্ধ আছে পূর্বেই বলিয়াছি।

দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম হইয়া গেলে বৈকালের দিকে গিয়াছি, তখন একা বসিয়া একটা বালিসে হেলান দিয়া,– আর কেহই নাই। উত্তম সুযোগ বুঝিয়া বসিবামাত্রই তিনি বলিলেন, – আমি ত তুমার কথাই ভাবছিলাম – কি ব্যাপারটা বল দেখি?

আমি বলিলাম, আপনি যে ঐ কুকুরগুলিকে মায়ের আশ্রিত সন্তান বললেন, সেটা কি রকম তাই জিজ্ঞাসা করচি।

ওরা ত মায়ের আশ্রিতই বটে, ওরা সব মায়ের ভক্ত, জন্মজন্মান্তরের কর্মক্ষয় করতেই এখানে রয়েচে, ওরা সবাই সাধুলোক।

সাধুলোক?– এই সাধুলোক বলতে আমি কি বুঝবো দয়া করে বলুন–

দেখ তোরা ভারি তক্ক করিস্, আমি ত বললুম– তবুও বুঝতে নারলি? ওরা কত তপাস করেচে– কত সাধন করেচে তবে না এখানে মায়ের থানে এসে থাকতে পেয়েচে? তুই থাক্ দিকি কতদিন এখানে থাকতে পারবি? তা হচ্চে না বাবা, মা তোকে রাখবেন না, তোকে যেতেই হবে।

আমি ত যাব যাব করেই এখনকার দিনগুলি কাটাইতেছি– মন ত উঠিয়াছি, বুদ্ধি কেবল আরও কিছু পাইবার আশায় ধৈর্য্য ধরিয়া বিলম্ব ঘটাইতেছে!

সেদিন আর কোন কথাই হইল না– প্রকাণ্ড একদল যাত্রী প্রায় বারো-পনেরো জন মেয়ে-মরদ ছানা-পোনা সিউড়ি হইতে আসিয়া হাজির হইল ঐ আশ্রমে। আমি তো উঠিলাম।

বীরভূম ছাড়িয়া যাইব ঠিক করিয়াছি– এবার কামাখ্যা কামরূপের দিকে মন টানিতেছে। কিন্তু বামার কাছে যেন আরও কিছু পাইবার বস্তু আছে এই আশাতেই এখনও যাইতে পারি নাই। মনে হয় এমন মানুষ গেলে আর হইবার নয়।

অনেকেই জানেন না যে বামাই বীরভূমকে গত চল্লিশ বৎসর সাধন কেন্দ্ররূপে জাগ্রত রাখিয়াছেন। এই জাগানোর একটা ইতিহাস আছে। বীরভূম এমনই স্থান যেখানে তন্ত্রধর্মের অভ্যুদয়কাল হইতে কোন না কোন মহাত্মা বা তন্ত্রমতে সিদ্ধযোগী, কোন না কোন সিদ্ধস্থান আশ্রয় করিয়া তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তি প্রসারিত এবং এই ভূমির লোকসমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন যাহা পরবর্তী সাধকগণের পক্ষে সিদ্ধিলাভের পাথ সুগম করিতেছে। এই বীরভূমি কখনও দীর্ঘকাল সাধক-সিদ্ধ-কৌল-শূন্য ছিল না। কতকাল হইতে যাঁরা যাঁরা এই বীরাচারের ক্ষেত্রে, কোন না কোন সিদ্ধপীঠের সিদ্ধাসন আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিলাভের পর বহুদিন পর্য্যন্ত তন্ত্রমাহাত্ম্য সজীব রাখিয়াছেন,– পর পর তাঁহাদের নাম একদিন কথা-প্রসঙ্গে ক্ষ্যাপাবাবা বলিয়া দিলেন। সেখানে নগেন পাণ্ডাও ছিল। আগেই বলিয়াছি এই নগেন, যদিও লোকটার অধ্যাত্ম রাজ্যে বড় বেশী অধিকার হয় নাই কারণ তাহার পার্থিব কামিনীকাঞ্চনে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল তথাপি বাবা তাকে কতকটা আলগা দিতেন। তিনি বলিতেন, হোক কেনে টেঁটা, মনিষটার বুদ্ধি আছে, চালাক বটে–অত বুদ্ধি কারও নাই। বাবা সেদিন পূর্ব পূর্ব সিদ্ধপীঠের সিদ্ধ-কৌলগণের নাম করিলেন; আমরা সবাই আগ্রহপূর্বক শুনিতেছিলাম। যখন তিনি চুপ করিলেন তখন নগেন জিজ্ঞাসা করিল বাবা, আপনার পর আর কে এখানকার মাহাত্ম্য রাখবে? উপস্থিত এমন ত কাকেও

এখানে দেখি না। বোধহয় শেষ হয়ে গেল তন্ত্রের সিদ্ধি।

ঐটুকু শুনিয়াই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, – মা তারার ইচ্ছা, তিনি আবার কাকেও রাখবেন থানে;– কেন?– আমাদের তারা, (অর্থাৎ তারানাথ, তাঁর শিষ্য) সে হবে না কেউ একজন?*

শুনিয়া নগেন কি যেন একটা কথা বলিতে গেল কিন্তু তাকে বলিতে হইল না, – বাবা স্বয়ং যেন বুঝিয়াই বলিলেন, ওটার একটা দোষ আছে বটে, – উ বড্ড রাগী মনিষ বটে, – ওটি থাকতে সিদ্ধি নাই।

নগেন বলিয়া ফেলিল, বড্ড অহংকার, দম্ভও আছে। শুনিয়া বাবা খুশি হইলেন না। বলিলেন– তারা মায়ের ইচ্ছা হয়ত– ওসব দোষ যেতে কতক্ষণ? ও গলদ থাকবে নাই; এখন থেকে ওর লজর পড়েছে দেখিস নাই?

এই পর্য্যন্ত কথা। নগেনের একটু যেন ঈর্ষার ভাব ছিল তাহার উপর। তারা বাবাকে খুব বশ করেচে একথাও নগেনের মুখে একবার শুনিয়াছিলাম আসলে তারা একটু স্বাধীন প্রকৃতির লোক,– ওখানে তার মত শক্তিশালী আর কেউ নাই সেই জন্যই বাবা তাকে বেশী ভালোবাসেন। এ বিষয়ে তারা,– হয়তো একটু অধিক মাত্রায় সচেতন ছিল। একবার মাত্র তাকে বাবার কাছে দেখিয়া-ছিলাম। তাহার শক্তির দম্ভ তখনই তাহার ব্যবহারে প্রকট ছিল।

যাক্ সেদিনের কথা ঐ পর্য্যন্ত। তার পরদিন সকালে বাবার আড্ডার কড়া তামুক চলিতেছিল, – বাবার আসনের পাশেই, একরকম গা ঘেঁষিয়া সাদা কুকুরটি শুইয়া-ছিল, সে এখন বাবার কাছ-ছাড়া হয় না। শুধু গর্ভবতী নয়, বোধহয় আসন্নপ্রসবা। বাবা বলিলেন,– শ্বেতফুলিটা কেমন দুর্বল বোধ হঁচে না রে?–

নগেন ছিল, রহস্য করিয়া বলিল,– এইবার আঁতুড়ের ব্যবস্থা আর একটা দাইয়ের দরকার যে বাবা?–

বাবা, বালকের মত সরল,– বলিলেন, তাইতো বটে রে, তু কেনে একটু তল্লাস কর না বাবা, গাঁয়ের মধ্যে তোদের ত জানাশোনা আছে সব? নগেন বলিল, ভাবচেন কেনে আপনি,– মা তারা সব ঠিক করে দেবেন। বাবা পরম আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন,– তা বটে তো, ঠিক তো, তবু কেমন ভয় লাগে রে – বাঁচবে তো? কটা বাচ্ছা হয়রে? – আমি ত দেখি নাই, তু জানিস?–

নগেন বলিল, তা দুটো থেকে চারটে পর্য্যন্ত হয় বাবা।

আমার ভালো লাগিল না এইসব কথা, উঠিয়া যাইব কিনা ভাবিতেছি,– বাবার

---

* এ সম্বন্ধে বাবার মন্তব্য ভিত্তিশূন্য প্রমাণিত হয় নাই।– তার অন্তর্দৃষ্টিই তাহাকে দেখাইয়াছিল যে তারানাথ সিদ্ধ হইয়া কালে তন্ত্রসাধনার ধারা বজায় রাখিবে। তার উত্তর কালে তাহাকে আসন পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। শেষে তারার আসন ছিল বহরমপুরের গঙ্গাতীরে।

নজরটা ক্ষীণ হইলেও সেই বড় বড় চোখ দুটি অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর ধরিলেন এবং মনের ভাবটি তৎক্ষনাৎ ধরিয়া ফেলিলেন, – বাবা এবার যাবার সময় জ্ঞানের পুঁটলী বোঝাই দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টায় আছ বটে? কুত্তোর কথায় কিছু জ্ঞান নাই, তাই উঠিবে কিনা ভাবচো বটে?– এ্যাঁ? না কি বলতো ঠিক করে।

বাধ্য হইয়াই সত্য বলিলাম। তখন বামা কতকটা সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন– এই তো বুদ্ধি তুমার গো,– তাই বলচি। কুকুর কি মানুষ লয়, মা জগদম্বার সৃষ্টি লয় বটে?

আমি হাসিয়া বলিলাম, কুকুর মানুষ?–

বাবা বলিলেন,– মানুষ লয়?– এমন সময় ভুলো কোথা হইতে আসিয়া বাবার কাছেই তার ল্যাজের উপর বসিল এবং অতি সহজভাবে, বেশ বুদ্ধিমানের মত যেন বাবার মুখের দিকে এমনভাবে তাকাইল– মনে হইল এখানকার কথা শুনিতে আসিয়াছে, সে যেন আমাদেরই একজন। আমি অন্তঃকরণের মধ্যে যেন সত্যই কিছু একটা অনুভব করিলাম,– অদ্ভুত অনুভূতি। বাবা বলিলেন,– কোলকাতার বাবু,– এসব তুমাদের কালেজের পুঁথিতে লিখা নাই যে গো।

...

তারপর আজিকার মত উঠিব কিনা ভাবিতেছি, দেখি একে একে নগেন পাণ্ডা প্রভৃতি দু'তিনজন যাহারা ছিল সবাই উঠিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি আর উঠলাম না। কেবল বাবার সেবক ছোকরাটি রহিল। পরে বাবার হুকুমে সে ঘরের ভিতরে কি একটা কাজে গেল। আমি তখন কাছ ঘেঁষিয়া বাবার পা হাত দিয়া ধরিলাম, বলিলাম, শুনেছি আপনি কুমার ব্রহ্মচারী, কামজিৎ ঊর্দ্ধরেতা, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন যেন আমি ঐ ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্তি পাই। ও প্রবৃত্তি আমার মধ্যে উৎকটভাবেই রয়েছে। তাই আমার ভয় খুব বেশী।

শুনিবামাত্র বাবা পায়ের উপর হাত দুটি নিজের দুটি হাত দিয়া ধরিলেন;– তারপর এক অদ্ভুত বিস্ময়ের ভাব তাঁহার ঐ বিশাল নয়ন দুটিতে ফুটিয়া উঠিল, এমনইভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,– আমি কুমার ব্রহ্মচারী? কার কাছে শুনেছ বাবা? লগেন বাবা বলেছে বটে?

আমি বলিলাম, না, তিনি নয়, তবে এখানকারই একজন বলেছে।

বাবা বলিলেন, সে লতুন এসেছে বোধহয়,– জানে না, তুমায় ভুল বলেছে বাবা। আমরা তান্ত্রিক, এককালে ভৈরবী-চক্রে নিয়ম মতোই না ক্রিয়া করেছি?– পঞ্চম-কারের কোনটাই বাকি রাখিনি বাবা। তবে কখনও পাগল হয়ে ইন্দ্রিয় সুখের ভরাডুবি করিনি। বাবা এটুকু সত্যি মায়ের কৃপায়, ক্রিয়ার মধ্যেই সব শেষ করেছি, তা ঐ মদই বলো আর ভৈরবী মেয়েমানুষই বলো। গুরু ছিলেন কাছে, টিকি ছিল তাঁর

হাতে বাঁধা, তাই পার হতে পেরেছি।

বাবা বলিলেন,— বালক-বেলা থেকে মাকে ধরেই পথ চলেছি, মাকে ধরে থাকলে আর ভয় নেই। ঐ মা-ই সকল সাধনই করিয়েছেন তন্ত্রের নিয়মে। গুরুরূপে কাছে কাছে থেকেই শেষ পর্য্যন্ত সাধন হয়ে গেলে তখন ছেড়েছেন, আর তখন থেকেই মায়ের কোলকে বসে আছি গা। কিন্তু উ বড় কঠিন। একবার যে স্বাদ পেয়েছে তার আর গতি নেই। বাঘের ছা রক্তের স্বাদ পেলে আর রক্ষা নাই। সেইজন্য গোড়া থেকেই পথ বন্ধ করতে হয় যে বাবা, সে কি সবার হয়?— মা আমাকে দিয়ে সৃষ্টি করাবেন নাই, তাই আর ও কাজের দরকার হোলো না। হ্যাঁ দ্যাখো, বলিয়া আমার গা ঠেলিয়া বলিলেন: মন তোমার যতই সাধনের ভিতর বসবে,— ততই ওসব তুচ্ছ হয়ে যাবে। তুমাদের ত এখানকার মত তন্ত্রের সাধন লয়, তোমাদের শক্তি-চালাচালির ব্যাপার নাই।—

তোমাদের শক্তি-চালাচালির ব্যাপার নাই—তোমাদের এসব ভয় নাই বাবা।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, হ্যাঁ দ্যাখো,— একটি মেয়্যা, নিজ স্ত্রী ভোগ করলেই তো গেয়ান হয়ে গেল, সুখটা এই রকম। ও সুখ দু'রকম হয় না, এক স্ত্রী সম্ভোগেই ওর দফা শেষ করে দিতে হয়। বুদ্ধিমান যারা, গুরুশক্তির আশ্রয় পেয়েচে যারা, বুঝতে পারে রূপের মোহে মেয়্যামানুষ ঘাঁটা, ও নরক ঘাঁটা—নিবৃত্তিমার্গের মনিষকে মা ঠিক বুঝিয়ে দেন— ঐ ভাবের বুদ্ধি থেকেই সংযমের শক্তি আসে। এই সার কথা জেনে রাখ, বাবা।

আবার একটু থামিয়া বলিলেন,— হাঁ দ্যাখো, বাবা! একটা গূঢ় আছে এর মাঝে। পুরুষ অভিমান যাদের কঠিন, ষাঁড়ের পারা, তাদের হতে মা ছিষ্টি করায়ে নেন্, ঐ ছিষ্টির জন্যেই তাঁদের কামের আগুন বেশী থাকে। গাঁয়ে দেখ নাই, গাই গরু কতো, ষাঁড় একটা-দুটোই যথেষ্ট, তাতেই কত গরু হঁয়্যা যাবে।

বুঝিলাম।

আবার বলিলেন,— তবে ছিষ্টির বীজ ভিতরে থাকতে সংযম, মিথ্যা কথা,— সে কখনও হবেক নাই।

আজ এইখানেই শেষ।

বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবার কথা

সিউড়ি হইতে বক্রেশ্বরের যে পথ, উহা প্রশস্ত এবং নয়ন-বিমোহন। দুই ধারে বড় বড় গাছ। অর্জুন গাছ বেশী। অশ্বত্থ, পাকুড়, কাঁঠাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় জাতের গাছও চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ওধারে সকল জমিই উঁচু নীচু, ঢেউ খেলানো,— মালভূমি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই বীরভূম ও বাঁকুড়ার সর্বত্রই। কোথাও কোথাও মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের মত লাল মাটিও আছে। নিম্ন বঙ্গের স্যাঁৎসেতে ভাব

একেবারেই নাই। প্রভাতের মেঘলা আকাশের সঙ্গে পথের দুই ধারে ঘন পত্র শাখাময় তরুর সারি এবং দূরস্থিত গভীর শালবনের একটা আশ্চর্য্য ঘন সম্বন্ধ আছে, যাহা পথিকের মনকে ভুলাইয়া দেয়। পথশ্রমের কথা আভাষেও মনে আসিতে দেয় না। আবার তাহার মধ্যে যখন মাঝে মাঝে সূর্য্য প্রকাশিত হন, অকস্মাৎ তরু-গুল্ম-লতাপূর্ণ বনভূমির শোভা পরিবর্তিত হইয়া যায়, মনে হয় যেন বিশ্ব-আত্মার সকল প্রকাশটুকুই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, অস্পষ্টতা কোথাও নেই। যেন নিসর্গের অস্তিত্ব রৌদ্র-জ্বালার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তরুতল, ছায়ায় স্নিগ্ধ, তার পাশে দীপ্তাংশ জ্বালাময় হইয়া গিয়াছে।

প্রায় দুই ক্রোশের মাথায় একটি বাঁকের মুখে একটা বিশাল অর্জুন গাছ, তাহার তলায় দুই-চারিজন লোক বসিয়া কথা কহিতেছে, তামাক খাইতেছে, আর দূরে মাঠের দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছে। সেখানে হাল-কাঁধে দুজোড়া গরু, চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম: বক্রেশ্বর কোন্ দিকে যাব?

—আপুনি কোন্ গাঁয়ের বট?

—কলকাতায়ই আমাদের ঘর।

—কিসের লেগে বক্কোমুনির থানে যাইছেন? মানত আছে বটে?

—পীঠস্থান কিনা—তাই।

—যান্ ক্যান্নে হৈ সোজা হো বাঠে, গাঁয়ে যেঁয়ে উঠবেন গা। হোই যে গাঁ দিশছে।—কোথা হোতে আইছেন?

সিউড়ি থেকে আজ আসছি, বলিয়া পা চালাইলাম; পশ্চাতে শুনিলাম,—মনিষটা ভালো বটে গো! এবারে বড় রাস্তা ছাড়িয়া বামে চলিলাম। ধূ-ধূ মাঠ, দূরে দূরে এক একখানি গ্রাম দেখা যাইতেছে ঘন রেখার মত। উঁচু নীচু মাঠ, তার মাঝে দুই-একটি বড় গাছ। বহুদূরে ঈষৎ নীল রেখা, কোন পাহাড় হইবে। দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম। কুলদাবাবু বলিয়া দিয়াছিলেন, কালীবাড়ীতে গিয়া উঠিবেন। তাহাই আমি করিলাম।

...

অন্নগত প্রাণ বলিয়া কালীবাড়ীর কথা প্রথমে বলিলাম, যেহেতু সেইখানেই দৈনন্দিন অন্নের ব্যবস্থাটা ছিল, তাই দুই-মাসকাল নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বন্দ্বে কাটাইতে পারিয়াছি। বক্রেশ্বরে আসিয়া বক্রেশ্বরের কথাই প্রথম এবং প্রধান। ইহা অবশ্যই প্রথমে জানা ছিল যে এখানে সতী-অঙ্গ পড়ার জন্য এ পীঠস্থানের মাহাত্ম্য কম নয়, বক্রেশ্বর ভৈরব এই স্থানের অধিপতি। তাহার উপর আবার মহাযোগী অষ্টাবক্র এই স্থানে সাধন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহা সিদ্ধপীঠ। তন্ত্রমতে মহা মহা কঠিন সাধন-সকল এই সিদ্ধপীঠে বহুকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিদ্ধাসন এখানে বহুকাল হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে এখন আর এখানে কোন সাধক নাই। সিদ্ধপীঠের চিহ্ন এখন যে কয়টি এখানে আছে তাহার মধ্যে যে এক বিশাল নিদর্শন এখনও রহিয়াছে তাহা বোধ হয় অন্য আর কোনও পীঠে নাই। একটি উচ্চ প্রকাণ্ড গোলাকার বেদী, মধ্যে একটি বিশালায়তন মহীরুহ। এত লম্বা গাছ কোথাও আমি দেখি নাই। ক্যালিফর্ণিয়ার জঙ্গলে যে দানবাকৃতি বৃক্ষের কথা শুনি, এটি যেন তার ছোট ভাই। কাণ্ডটি ফাটিয়া ফাটিয়া, অসংখ্য গভীর রেখাপাত করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; মধ্যে কোথাও শাখা বা পত্র নাই। শীর্ষদেশ কতকটা শাখাপত্র সমন্বিত, প্রায় একটি ছাতার মত। উপরের দিকে চাহিলে মাথার পাগড়ি খসিয়া পড়ে। পাতাগুলি বেশ বড় বড়, ছোট নয়, অনেকটা সেগুন পাতার মত, আকৃতিটি একটু বিভিন্ন ধরণের। ঐ বেদীতেই অনেকানেক সাধু মহাপুরুষের পায়ের ধূলা পড়িয়াছে। গাছটি যে কত কালের তাহা ওখানকার কেহই জানে না। আমি ১৯১৫/১৬ সালের কথা বলিতেছি, এই বিশাল শমী বৃক্ষটি কত বড় বড় ঝড়-ঝাপটা খাইয়া এখনও নিজ শক্তিতে দাঁড়াইয়া আছে— ইনি যে কত কালের, কত কত ব্যাপারের সাক্ষী তাহা কেহ জানে না।

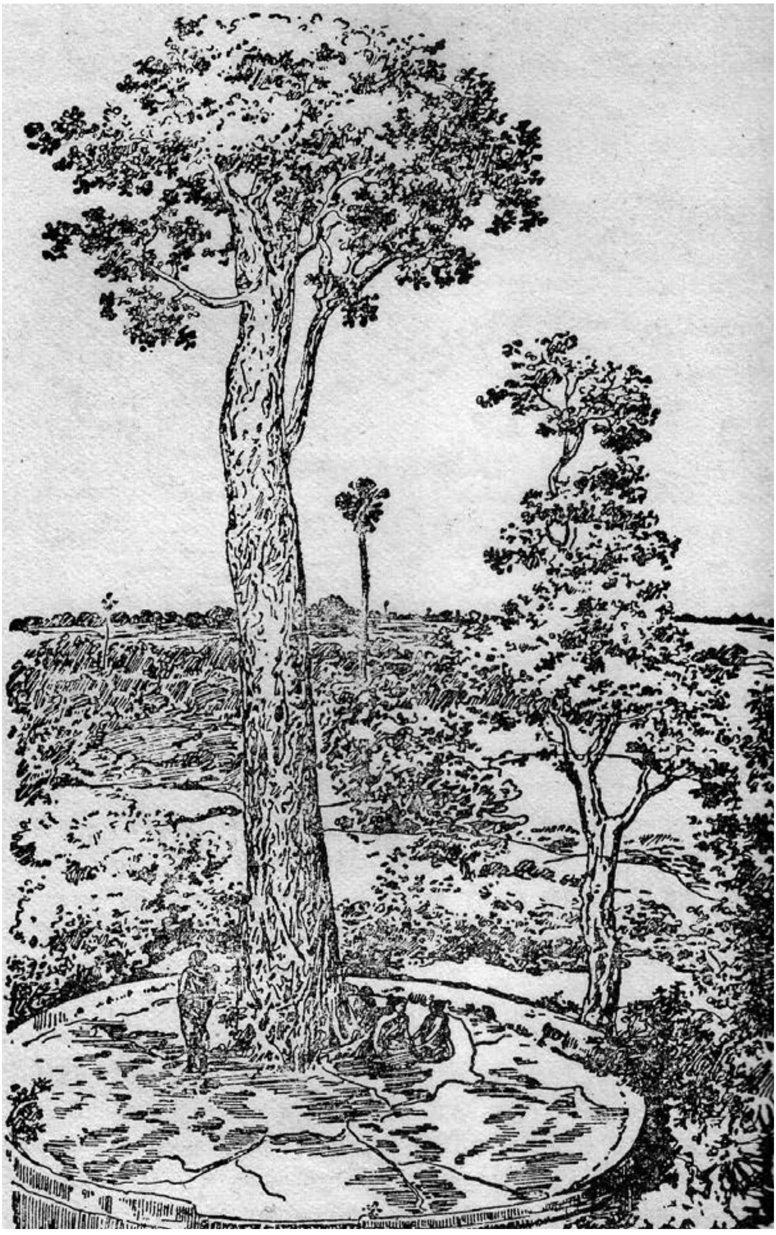

এখন ইহার চারিদিকে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেই বিশাল বটবৃক্ষ। ঠিক অষ্টাবক্র মুনির সিদ্ধাসনের উপরেই। তার পাশের কুণ্ড। সর্বত্র কুণ্ডগুলি যেমন হইয়া

থাকে, এখানেও তাই—কুণ্ডগুলি বাঁধানো, পাঁচ-ছয়টি সিঁড়ি নামিয়া কুণ্ডের জলে হাত দিতে হয়। অল্পবিস্তর সকল কুণ্ডই উষ্ণ। এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলিই বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য, গোড়ায় এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না।

...

এই কুণ্ডটি বক্রেশ্বর ভৈরবের মন্দির-পার্শ্বেই। এক সময়ে এখানে বহু তান্ত্রিক সাধকের অবস্থিতি ছিল। এখন, অর্থাৎ যখন কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি ওখানে উপস্থিত হইলাম, তখন দুইটি মূর্তি ওখানে দেখিলাম, অবশ্য সে দুইটি আমায় কিছুমাত্র আকৃষ্ট করিবার যত্ন করেন নাই, শ্রদ্ধাও আমার কিছু হয় নাই—কাজেই ঘনিষ্ঠতাও হইতে পায় নাই। এই দুই জনের মধ্যে কোন্‌টি আসল, কোন্‌টিই বা মেকী তা চিনিয়া লইবার শক্তি ত আমার মত লোকের না থাকারই কথা,—তথাপি বিচক্ষণতার অভিমান ত আমার কিছু আছেই, তাহার উপর নির্ভর করিয়া মনে করিলাম ইহার মধ্যে একজন ভালো, অপরটি মেকী। যেটিকে ভালো অনুমান করিলাম, অর্থাৎ প্রথমেই দুই-চারিটি কথা শুনিয়া, অপর জনের সঙ্গে তুলনায় কিছু ভালো বলিয়া লইতে আমার মন পছন্দ করিল, তাঁর নাম বৈদ্যনাথ বা বোদে পাগলা।

...

বক্রেশ্বর মন্দিরের পিছনে লম্বা বারান্দা, তার ছাদ ঢালু, বেশ উঁচু দাওয়ার মত। দেওয়াল ও ছাদ সবই পাকা, বেশ মোটা খুঁটি, সেজন্য দাওয়ার সঙ্গে তার মিলটা বেশী, চওড়া প্রায় ছয় হাত, লম্বা চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেখানে অনেক লোকই থাকিতে পারে। সেইখানেই আমার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। দিনমানেও ঐখানে থাকিতাম।

তখন বর্ষা, শ্রাবণ মাস। প্রখর রৌদ্র বেশী দিন ভোগ করিবার সুযোগ হয় নাই। বাহিরে শিবালয়ের উচ্চ ভূমি হইতে নামিয়া কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ সারি সারি চলিয়াছে। চারিদিকেই প্রাচীর বেষ্টিত, একদিকে জলে নামিবার কয়েকটি ধাপ, সেদিকটা কতকটা খোলা। চতুষ্কোণ বড় চৌবাচ্চার মত। ফুটন্ত জল অবিরাম উঠিতেছে এবং একটি প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া পাপহরার অঙ্গে যাইয়া মিশিতেছে। সকলগুলিই এক রকম। কুণ্ডগুলির এক দিকে পথ, অপর দিকে বেলগাছ, তাহাতে ছোট ছোট ফল ধরিয়াই আছে। দুই-চারিটা আম, জাম, জামরুল গাছও আছে। কুণ্ডগুলি এবং পাপহরার মধ্যে যাতায়াতের পথ উঁচু-নীচু, ঘন তৃণগুল্ম আচ্ছাদিত, কেবল চলিবার স্থানটুকু কাঁকর মাটি, পাথরে ঢাকা। পাপহরার ওপারে দক্ষিণে শ্মশান, বাকি সকল স্থানই জঙ্গলময়, একেবারে নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বক্রেশ্বর পীঠস্থানের চতুর্দিকেই নানাপ্রকার ধ্বংসাবশেষ। মন্দির, আবাসস্থান, ইষ্টক-নির্মিত নানাপ্রকার গৃহ সকল যেভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়—উহা এক

সময় ঘন জন-সন্নিবিষ্ট পল্লী ছিল,—বহু লোকের অবস্থিতির চিহ্ন সকল এখনও জীবন্ত দেখিতেছি। এই ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব লোপ হইতে এখনও অনেক দিন যাইবে। অশ্বত্থ ও বট এই দুইটি বৃক্ষই খুব শীঘ্র শীঘ্র এই সকল কীর্তি-ধ্বংস-লীলায় সহায়তা করিয়াছে। এখানে ম্যালেরিয়া নাই, কিন্তু মশার উপদ্রব অত্যন্ত এবং অসহ্য।

যদি প্রাচীন কালের কথাই ধরা যায়,—এই অষ্টাবক্র মহাযোগীর আশ্রমটি বড় কম ছিল না। এখানে কম করিয়া সহস্রাধিক আনুষ্ঠানিক যোগী, ব্রহ্মচারী, প্রবর্তক, শিষ্য সেবকাদির অধিষ্ঠান ছিল। বহু ধনবান গৃহী, বণিক, নরপতির যাতায়াত ছিল। এখানকার যত প্রতিষ্ঠান, একসময় কাশী কোশল অবধি বিস্তৃত হইয়া যোগমার্গের কত শত সহস্র মানুষের বিশিষ্ট আকর্ষণের বস্তু ছিল। সাধনের যে সকল বিশিষ্ট ক্ষেত্র ভারতে আছে, এক সময় এ ক্ষেত্রটি তাহাদের তুলনায় বড় কম ছিল না।

১৪*

বক্রেশ্বর শিবমন্দির, মহাযোগী অষ্টাবক্র স্থাপিত সেই পুরাতন মন্দির এটি নয় যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্তি বা বিগ্রহ সেই বটে। প্রাচীন মন্দিরটি প্রাচীন কালেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তার পর আবার অবস্থানুযায়ী নির্মিত হইয়াছে। কয়বার হইয়াছে তাহা জানা যায় না। এখনকার মন্দিরটি অতি সাধারণ, বাঁকুড়া মন্দির স্থাপত্যের সরলতম অনুকরণ; কেবল চূড়া হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পল দেওয়া আছে। তার পর সাধারণ ঘরবাড়ির দেওয়ালের মত। দ্বারের কোন শিল্প-বৈশিষ্ট্য নাই। ভিতরে প্রবেশ করিলে ছোট অন্ধকার একটি সমচতুষ্কোণ নাটমন্দিরের অবয়ব। তার পরই অন্ধকারময় গর্ভগৃহ।

এই মন্দির-অধিষ্ঠিত প্রাচীন লিঙ্গের পূজার ব্যবস্থা পাণ্ডাদের উপর বহুকাল হইতেই অছে। পাণ্ডাদের বংশ কম নয়। তাঁহাদের পুতিতুণ্ড উপাধি, ব্রাহ্মণ-বংশীয়। এই উপাধির ব্রাহ্মণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কেবল দক্ষিণ বাঙ্গালায় আমার মাতুলেরা কয়েক ঘর বর্তমান। যাহা হউক এখানকার পাণ্ডারা সকলেই গৃহস্থ। তাঁহাদের এক এক ঘরের উপর পালাক্রমে এক এক দিনের পূজা ভোগরাগ প্রভৃতি নির্দ্ধারিত আছে। সেদিনকার যাত্রীদলের নিকট যত কিছু পূজার জন্য আদায়, প্রণামীর টাকা পয়সা ইত্যাদি, সমস্তই সেই পাণ্ডার। প্রতিদিনই প্রাতে একদল পাণ্ডা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া হল্লা করিত, সেটা প্রায় আড়াই প্রহর অবধি

* *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ* বইয়ের শুরুর ১২টি অংশ পার হয়ে আমরা ১৩ সংখ্যক অংশের মধ্যবর্তী একটি জায়গা থেকে বর্তমান রচনাংশটি বর্তমান এই *অভ্যাসের অন্ধকার* গ্রন্থের জন্য চয়ন করেছি। তার জন্যই এখানে 'শুরুতেই' ১৪ সংখ্যক অংশ দেখাচ্ছে। —*সম্পাদক*।

চলিত। ভোগ ও আরতির কাজগুলি শেষ হইতে প্রায় দুইটা হইত। যাত্রীদল বেশী থাকিলে, বেলা আরও বেশী হইত। পূজার ব্যাপারে যাহাই হউক না কেন, বক্রেশ্বর শিবের নিত্য পায়সান্ন ব্যতীত অন্য কোনও ভোগের ব্যবস্থা দেখি নাই।

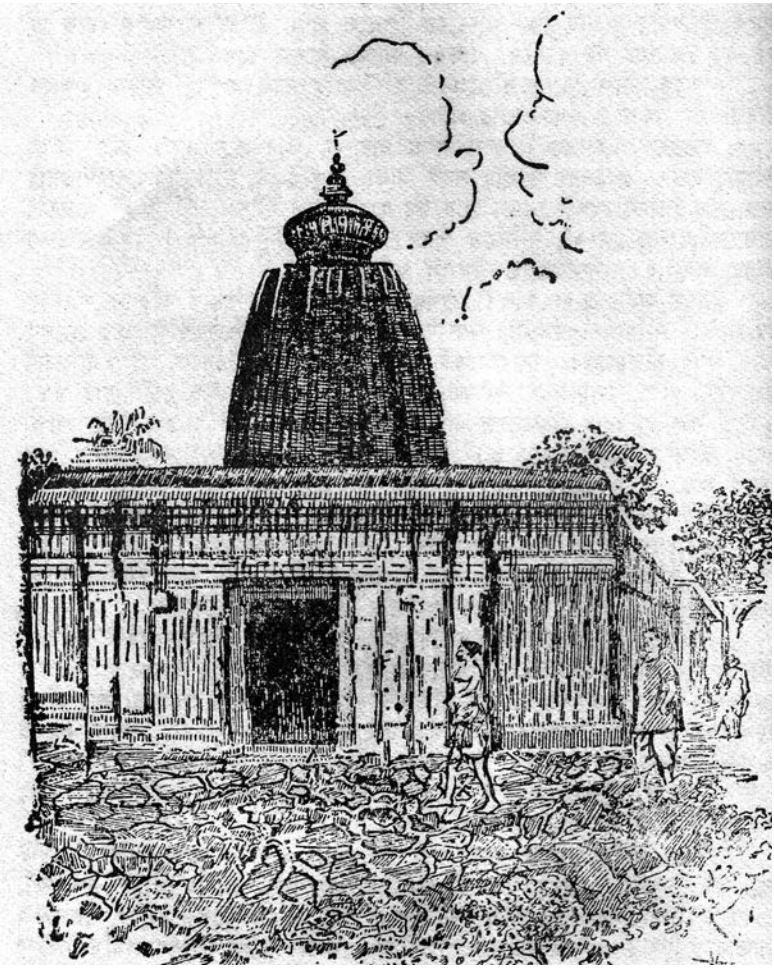

ওখানে, মন্দিরের পশ্চাতে দাওয়ায় আশ্রয় লইবার পর দুই-চারি দিন গত হইলে একদিন কালীবাড়ি হইতে প্রসাদ পাইয়া আসিয়া বসিয়াছি,—একজন পাণ্ডা ছোট একটি থালায় ঢালা পায়সান্ন আনিয়া বলিল: প্রসাদ, নিয়ে নিন।

কোনো পাত্র না থাকার কথা যখন আমি বলিলাম, তখন সে বলিল: এই পাত্রই এখন আপনার কাছে থাকুক, কাল নিয়ে যাব। বলিয়া চলিয়া গেল। এদিক ওদিক

চাহিয়া দেখি আমাদের বৈদ্যনাথ আসিতেছে। এইমাত্র এক সঙ্গেই আমরা কালীবাড়ীতে প্রসাদ পাইয়াছি। আমি ডাকিলাম এবং প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।

বৈদনাথ বলিল: তা হবেক্ নাই – আপনি খান কেনে। আপনার লেগে আইচে আমি লিব কেনে?– আমি বলিলাম: এই মাত্র খেয়ে আসছি,–

বাধা দিয়া বৈদ্যনাথ বলিল: আমুও ত আপনার সঙ্গেই খেয়্যাঁচি। তাহা হইলে কি করা যায়–শেষে দুইজনে মিলিয়াই প্রসাদটি শেষ করিতে হইল।

সেই অবধি প্রত্যহ একটি থালায় পায়সান্ন প্রসাদ আসিত, একদনও বাদ যায় নাই। এখন বৈদ্যনাথকে লইয়াই কথা।

জিজ্ঞাসা করিলাম: বৈদ্যনাথ, তোমার ভৈরবী আছে শুনলাম। আছেই ত, বটে। কাল বাদে পরশু যাবগা, লিয়ে আসব হেথায়। কেনে, আপুনি ভৈরবী লন নাই?–আপনাদের সাধন কেমন?

আমি বলিলাম: আমার অন্য পথ বৈদ্যনাথ, তবে তোমাদের ভজন সাধন দেখতেই এখানে এসেছি। একবার তোমরা আমায় চক্রে নিয়ে যাবে?–

–তাতে কি, আপুনি এলেই ত হয়, তবে আমাদের চক্রে গেলে পঞ্চ-মকার করতে হয়। আপনি করতে পারবেন?–আপনি ত মদ মাংস খান না।

আমি বলিলাম: শুধু দেখব। তখন বৈদ্যনাথ বলিল: তা হবেক কেনে, বাপু–অন্য বৈরাগীদের আমাদের ভিতর নিতে লারবো। বাধা আছে। তবে চক্রেশ্বর* যদি মন করেন তবেই হতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: নদীতীরে ঐ শ্মশানে যে একজন উলঙ্গ সাধু থাকেন তাঁর কি ভাব?

বৈদ্যনাথ: ও যে অঘোরী,–উনি ত ক্ষ্যাপা বাবা, ওঁর কথা ছেড়ে দেন।

আমি: ওঁর ভৈরবী নাই?

বৈদ্যনাথ: না, ওঁর ওসব দরকার নাই, উনি সিদ্ধ।

আমি: কতদিন উনি এখানে আছেন?–

বৈদ্যনাথ: আমি ত বছর দেড়েক দেখছি, উনি ত বরাবর থাকেন না, মাঝে মাঝে চলে যান।

আমি: কোথায়?

বৈদ্যনাথ বলিল: তা বলতে লারী, চলুন না ওঁর কাছে,–যাবেন? আমি বলিলাম–যাব বটেই এক সময়, কিন্তু এখন নয়। সেদিন যে তাড়া করেছিলেন একজনকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিয়ে–আমার ভয় করে ওরকম ভয়ঙ্কর রাগী লোকের কাছে যেতে। তোমরা যখন যাও, কিছু বলেন না?

---

* চক্রের মধ্যে একজন প্রধান থাকেন, তিনি চক্রেশ্বর।

বৈদ্যনাথ হাসিয়া বলিল: ওঁর রাগ কোথা?– রাগবেন কেন,–মাঝে মাঝে সকলে যে জ্বালাতন করে, বাবা, ওমুক দাও, তুসকো দাও, আমার রোগ সারিয়ে দাও– এসব বরৈ যে জ্বালাতন করে। তা একটু ভয় দেখিয়েছেন।

আমি বলিলাম: উনি কি রোগ ভালো করতে পারেন? কব্‌রেজী জানেন বুঝি?

বৈদ্যনাথ: খার কোবরেজী, ওঁর কোবরেজী জানতে হবেক কেনে,– ওঁরা যে ভগবান। যাকে যা বলেন, যাকে যা দেন তা ঠিক হয়। সেবারে একটি মানুষকে একেবারে খেয়ে দিলেন?

আমি: খেয়ে দিলেন? কি রকম, তাকে মেরে কাঁচা খেয়ে ফেল্লেন না কি?

বৈদ্যনাথ বলিল: তা হবেক কেনে, সে যে উয়াকে এখান হতে উঠবার লেগে কোম্পানির সাহেবকে বলেছিল গো। তাই তাকে খেয়ে দিচেন। তিন রাত্তির গেল না, কলেরা হয়ে মোলো গো। বাবাকে চটালেই মুস্কিল। সে মরবে, তাকে যমের ঘরকে যেতে হবেক যে।

আমি বলিলাম: তা হোলে কাজ নেই অমন লোকের কাছে গিয়ে, কি বল বদ্যিনাথ?

বৈদ্যনাথ: তা আপুনি চলুন না কেনে, কিছুই হবেক নাই। আপুনি ত ভালো মানুষ বটে।

আমি: যদি যাই ত তোমারই সঙ্গে যাব, বুঝে সুঝে একদিন যাব। অচ্ছা, উনি ত দিনের বেলায় বেরোন না, সমস্ত দিনই কি ঐ কুঁড়ের মধ্যেই থাকেন?

বৈদ্যনাথ: তাই তো থাকেন, কদাচ কোন দিন বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু ঐ শ্মশান থেকে আর কোথাও যান না। এক একদিন সকাল থেকে জলেই আছেন। কখনও ডুবছেন, কখনও উঠছেন, কখনও বা ভেসে চললেন মড়ার মত। ওঁয়ার কথা বলেন কেনে।

আমি: আচ্ছা, তুমি কি ঠিক জান উনি তান্ত্রিক নন?

–হাঁ গো, ঠিক জানব না কেনে,–তাহলে ত বৈরবী থাকত। এতদিন ত এখানে রইছেন কখনও ত কোন ভৈরবীর সঙ্গে কিছু দেখলাম না। একবার এক ভৈরবী ক্ষ্যাপা বাবার কাছে গিয়েছিল, তখন ঘরের মধ্যে ছিলেন, তার পর বেরিয়ে এসে এক ঠেঁয়ে বসলেন গা। ভৈরবী মেয়েটিও বসল। তার পর, অনেকক্ষণ আমরা এদিক থেকে দেখছি,–বেলা শেষ হয়ে এসেছে, ভৈরবী চক্ষের জল মুছতে মুছতে চলে এল। তার পর আর কাউকে দেখি নাই।

আমি: আচ্ছা, উনি খান কি?

বৈদ্যনাথ: খাবেন একবার রাত্রে। কোন রাতে হয়ত খেলেন না। দেখেছি যদি খান ত ঐ রেতেই খান।

আমি: তুমি রাত্রে কখনও গিয়েছ।

বৈদ্যনাথ: হেঁ, যাব নাই কেনে, আমায় ত উনি ভালোবাসেন বটে। দিনে যাঁই, রেতে যাঁই, আমায় কখনও কিছু বলেন না।

—ওঁর সাধন ভজন কি রকম দেখেছ?—

—ওঁর আবার সাধনের কি, উ লাগবে কেনে, উনি ত সিদ্ধ,—ওঁর ও সব কিছু করতে হয় না।

—তোমায় কি বলেন? কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?

—আমার কি দরকার, আমি জিজ্ঞাসবো কেনে?—যাই, পেণাম দিয়ে বসি, আর তামাকটা আসটা পেসাদ পাই,—কখনও কারণ করলাম। তা এক কলসী খেলেও কে বলবেক যে বাবা কারণ খেঁয়্যাচে। একবার একজনরা শববাহ করতে আইছিলো, আমার সামনে দেখেছি, একটি কলসী খাওয়া করায়ে দিইছিলো। যেমন বাবা তেমনি বাবা, কিছুই নেশা হোলো নাই। কতক্ষণ পর একবার প্রস্রাব করলেন, ব্যস্। ওঁর কারণ-করা দেখে তাদের নেশা ছুটে গেল গা। বলে, বাবা, এমন কুথাও দেখি নাই।

—আচ্ছা বৈদ্যনাথ, তোমার এসব কি মনে হয়, ঠিক করে আমায় বল দেখি! বৈদ্যনাথ মাথা চুলকাইয়া বলিল: ওঁর শক্তি আছে বৈকি! অথচ কোনও ভৈরবীও নাই, কোন শক্তি সঙ্গে রাখেন না তবে সত্য বলতে কি,—ও সব ভূতসিদ্ধি মনে হয় বটে গো! না হোলে এমনটা পারবেক কেনে! কি বলেন আপুনি?

—তোমার ওঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা খুব—না?

—তা হবেক নাই, অতটা ক্ষমতা, কিন্তু কোনও দোষের কথা বলতে লারবো। কোন দিন কিছু দোষ ত দেখলাম না মশয়। উনি শিব বটে গো। দেখবেন, আপুনি ত যাবেন, দেখবেন।

বৈদ্যনাথের কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল বাড়িয়া গেল বটে কিন্তু ভয়ও তার সঙ্গে কম ছিল না। ভাবিলাম, বৈদ্যনাথকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র যাই। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, কখন গেলে দেখার সুবিধে হবে বল দেখি?

হাসিয়া সে বলিল: হোই দেখেন দেখি, আপনার যখন ইচ্ছা তখনই যাবেন।

—আচ্ছা রাত্রে সুবিধা হয় না?

—হবে না কেনে,—উনি ত ঘুমান না, ওঁর ঘুম নাই। আজ এতদিন আইচেন আমরা কখনও ওঁকে ত শুতে দেখলাম না।

—সারা রাত করেন কি?

—কখনও চুপ করে বসে থাকেন, কখনও ঘুরে বেড়ান ঐ শ্মশানে জঙ্গলে, যেখানে খুসী।

—তবে চল, আজই রেতে যাব।

—আজ যে আমি সাঁইতে যাব গা, ভৈরবীকে আনতে, বললাম না?

—তা হোলে তুমি এলে পর তখন হবে, কি বল?—

—তাই করবেন। আপুনি একলা যান না, কি হবে, খেয়ে ফেলাবে নাকি, বাঘ না ভালুক?—

—ঐ যে বললে, উনি খেয়েছেন একজনকে। কি জানি, আমার একলা যেতে ভরসা হচ্ছে না। কেমন একটা সঙ্কোচ হচ্ছে। —তা হোলে থাক্, তুমি ফিরে এলেই হবে তখন।

আমি বোলে রাখি, বৈদ্যনাথ বলিল,— শেষে আমায় দোষ দিবেন না,— আমার দেরী হয়েও যেতে পারে। দুই-চার দিন হয়ত হবেক বিলম্।

...

ওপারে দেখি সেই অঘোরী বাবা— একটা গাছের তলায় বসিয়া আছেন। যাই একবার, দেখি কি ভাব-ভয়ের লেশমাত্র মনে আসিল না। এখন একলাই আছেন। এই অবস্থায়ই যাওয়া ভালো। গিয়া প্রণাম করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

আমার দিকে একবার চাহিয়া আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কোন কথা বলিলেন না। আমারও প্রথমে কোনও কথা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। বসিয়া তাঁহার মূর্তিটি দেখিতে লাগিলাম।

স্থূল দীর্ঘ শরীর, শ্যামবর্ণ, মাথার চুল খুব ছোট চোট, উদরে মেদের পরিমাণ কম নয়। তাহার উপর উলঙ্গ,— বিশাল চক্ষে নিম্ন দৃষ্টি, স্থির অচঞ্চল শরীর। যেন পর্বত একটি, গম্ভীর প্রকৃতির উদার বক্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত— কত কাল তাহার ঠিক নাই। অনেকক্ষণ ধরিয়াই দেখিলাম। তিনি একবার একটু নড়িলেন, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন: এখানে কি মনে করে?

মুখে আমার কথা যোগাইল না, কি বলিব হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। কতক্ষণ পর উত্তর একা মনে আসিল বটে কিন্তু এতক্ষণ পরে বলাটা শোভনীয় মনে হইল না তাই চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি কিন্তু আর চুপ করিলেন না, মুখ খুলিলেন: তোর কি চাই এখানে— শালা— তোরা ত বামনা, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর পা পূজো করবি, বছর বছর একটা করে জন্ম দিবি, কোম্পানীর জুতো খাবি, মেগের কাছে এসে তম্বি করবি— থাকবি! এখানে কি রে শালা। বল্, এখানে তোর কি দরকার?—

তাঁহার এ প্রকার ক্রোধ বা কোপের ভাষায় আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। মনে হইল বৈদ্যনাথ যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক,— উনি কি রাগ করেন, ওঁর রাগ নাই। বাস্তবিকই তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ক্রোধ লেশ নাই, অথচ মুখের কথাটায় যেন কত না ক্রোধ এবং বিদ্বেষের রং লাগানো। যেন আগুনের আকার, অপূর্ব এই চরিত্র!

প্রাণের মধ্যে আমার এক অপূর্ব আনন্দের রোল উঠিল। যেন এক পাত্র অমৃতধারা আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর ঢালিয়া দিল এবং উহার স্পর্শমাত্রেই এক ঘন শীতল প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গেল— আমি

কতক্ষণ আপনার মধ্যে আপনি মাত্র রহিলাম, বাহিরের সঙ্গে কোনও যোগ রহিল না।

আশ্চর্য্য এই সাধুর ভাবটি। মুখে দুর্বাক্যের স্রোত চলিতেছে,– কেহ কাছে দাঁড়াইয়া শুনিলে ভাবিবে যে তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা,– ভয়ঙ্কর বিদ্বেষের বশেই একজনের প্রতি তাঁহার এই অশ্রাব্য কটু সম্ভাষণ অনর্গল বাহির হইতেছে,– কিন্তু তাঁহার এই বাক্যবাণ যাহার উপর আসিয়া লাগিতেছে তাহার প্রাণের মধ্যে পরম প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন ভাবেরই উদ্দীপনা হইতেছে না।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম সেদিন বৈদ্যনাথ ইঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিল, অর্থাৎ ওঁর কি রাগ আছে? উনি যে সিদ্ধ পুরুষ।– ইহা যে কেমন সত্য তাহা আজ এখন প্রত্যক্ষই অনুভব করিলাম। এ কি অদ্ভুত ভাবসিদ্ধি,– দুর্বাক্যের মধ্য দিয়া তিনি আমার প্রাণের মধ্যে অমৃত সিঞ্চন করিতেছেন। যেন আমার কত কালের, কত প্রিয়তম বন্ধু,– আপনার জন, কে ইনি? যিনি এই প্রথম সম্ভাষণেই আমাকে একেবারে তাঁহার প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তার পর সেদিনের কথা আরও কিছু যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কতকটা বলিব।

–ওরে শালা,– বল্ না, কি কত্তে এখানে এলি? শালা, তুমি সাধু ঘাঁটতে এসেছ,– আমার সঙ্গে মাংটামো,– হারামজাদা, তোর সর্বনাশ হবে যে রে,– বল্ শালা বল্?– কি মনে করে এলি তুই বল?–

এক একটি অপ্রীতিকর বাক্যের মধ্যে মহাপ্রীতির উৎস অনুভব করিতেছিলাম। যখন তিনি থামিলেন আমি আনন্দের নেশায় টলমল, আমার গা দুলিতে লাগিল। কি অদ্ভুত অবস্থা, একবার সুমুখে একবার পিছনে দুলিতে দুলিতে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি কি যে বলিলাম তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম না,– কিন্তু তিনি তাহার পর যাহা বলিলেন তাহা আমার মনে আছে।

অঘোরী: আচ্ছা তুই আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দে। এত ধর্মের– এত ব্যাপার থাকতে তুই তন্ত্রের কথা শোনবার জন্য, তন্ত্রমন্ত্রের সাধনপ্রণালী জানবার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছিস কেন?

আমি: লোকে তন্ত্রকে যতটা হেয় মনে করে, ঘৃণ্য মনে করে, আমার ধারণা, আর নিশ্চিত ধারণা, তন্ত্র তা নয়। এর মধ্যে মহৎ কিছু আছে আর নিশ্চয়ই আছে, যা আমায় জানতেই হবে। না জানতে পারলে যেন আমার মুক্তি নেই। এইই, আমার ভিতরের কথা।

–তোর ধারণা যেটা সেটা তোর অনুমান ত?

–হয় ত তাই কিন্তু সে অনুমান গভীর সত্যকে ভিত্তি করেই আমার বিশ্বাস।

–ও বিশ্বাসও একেবারেই ফাঁকা।

–আমি বলিলাম: কেন?

–তোর সত্য যে গভীর সেটাও ত তোর অনুমান। এখন অনুসন্ধান করতে গিয়ে,

তোর মতে যেটা ভালো নয় এমন কিছু যদি দেখতে পাস তাহলে ত সেটা মানতে পারবি না বা বিশ্বাস করবি না– কেমন নয় কি?

—তাহলে কি সত্য সত্য এমন কিছু আছে নাকি এই তন্ত্রসাধনের মধ্যে?

—সেকথা ত নয়, এখানকার কথা এই যে, তুই এমনই একটা তন্ত্রধর্ম খুঁজচিস্ যার সঙ্গে তোর মনোগত ধারণার সম্পূর্ণ মিল আছে।

—তন্ত্রধর্ম সম্বন্ধে এতাবৎকালে যা শুনেছি ও পড়েছি তাতে মোটামুটি একটা ভাব ত ভিতরে গড়ে উঠেছে বটেই– আর তাই তো স্বাভাবিক; আর সেটা যে আমার সংস্কারগত ভাব থেকেই উৎপন্ন তাও তো স্বাভাবিক।

—সবই স্বাভাবিক তা ত সকলেই মানে,– এখন তোর কথা তাহলে এই তো দাঁড়াচ্চে– তোর আদর্শ ধর্ম্মমত যা তুই তন্ত্রধর্মের মধ্যেই পেতে বা সফল করতে চাইছিস?– নয় কি?

এর পর আর না বুঝিয়া থাকিবার যো নাই। যা সরল সত্য তা এই যে, আমার ধর্মাদর্শকে তন্ত্রোক্ত সাধনের মধ্য দিয়া সার্থক করিতে চাই, আর সেই জন্যই আমি তন্ত্রমনের সাধুসঙ্গে অভিলাষী হইয়াছি। এমনি শুধু কৌতূহলবশে যে জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা নয়, তার সঙ্গে আরও যে খানিক গুহ্য কারণ ছিল তাহা আজ এই কথোপকথন সূত্রে পরিষ্কার হইয়া গেল।

তখন আবার একটা প্রশ্ন হইল, তন্ত্র ধর্মের উপর আমার এই যে সহজ শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ—এর মূল কোথায়? আমরা শাক্ত বংশের সন্তান, আমাদের পিতৃপুরুষের এই ধর্ম সম্বন্ধে অনেক সাধনলব্ধ জ্ঞান বা সিদ্ধির মহিমা সংস্কারগত হইয়া আছে— আমাদের মত বংশধরগণের মধ্যে সময় ও সুযোগ-মত চিত্তক্ষেত্রে সেগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং অনুসন্ধানে ব্রতী করায়। আমাদের রক্তের মধ্যে এই শক্তিমার্গের সাধনা বা উপাসনার বীজ বর্তমান রহিয়াছে।

এই কথায় আরও জানা গেল যে, একই সাধনের ধারা আন্তরিক ও ব্যবহারিক ভাবে বংশানুক্রমে চলে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বংশধরেরা অন্তরে অন্তরে দেশ কালোপযোগী বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়া লন তাঁহাদের বিশিষ্ট মনোধর্মের প্রেরণায়। ধর্ম যেমনই হউক না কেন, একটা বংশের মধ্যে তার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া গেলে তার ধারা বন্ধ হইয়া যায়,—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বংশের ধারাও লুপ্ত হয়। এই ভাবে সৃষ্টিতে বংশ-বৃক্ষের বীজ হইতে বিশাল মহীরূহে পরিণতি, শেষে কালের হাতে তাহা নিঃশেষে লোপ পাইয়া যায়।

—তন্ত্রমতের সাধনা দেখতে এয়েছ শালা,—জোচ্চোর। যে মতের উপর তোর শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আন্তরিক টান নেই তার সাধনপ্রণালী দেখবার তোর কি অধিকার রে শালা চোর। তোকে কে তা দেখাবে?– অ্যাঁ,—বল্ শালা, সাধন প্রণালী পদ্ধতি, প্রকরণ, দেখে তোর কি ফল হবে?

তাও ত বটে, প্রকরণ, প্রণালী বা সাধনপদ্ধতি দেখিয়াই বা আমার কি লাভ?—তার সিদ্ধির ফল যা, তার সঙ্গে ত আমার সিদ্ধির কোন ভেদ নাই, সেই অদ্বয় চৈতন্যে, নিত্যানন্দ ভাবে স্থিতি, আত্মায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি—নাই বা দেখিতে পাইলাম তন্ত্রমতের সাধনপদ্ধতি।

এই ভাবের কথাই মনের মধ্যে চলিতেছিল। তিনি আবার আরম্ভ করিলেন,—এই শালা, অমাবস্যার রাতে একলা শ্মশানেতে মড়ার বুকের ওপর বসে জপ করতে পারবি? তুই মদ খেতে পারবি, বল্ শালা,—মাছ মাংস তৃপ্তি করে খেতে পারবি,—সেঁটে খেয়ে দেয়ে, কোমরে জোর করে ন্যাটো হয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গে লাগতে পারবি? তার পর উঠে নির্বিকার চিত্তে চন্দ্রামৃত পান করতে পারবি? শালা, তুমি তন্ত্রের সাধন দেখতে এসেছ শালা,— যোনিকীট!

বৈদ্যনাথের কাছে শুনিয়াছিলাম উনি অঘোরী,— তান্ত্রিক সাধনের কথা উনি জানিলেন কি করিয়া। অবশ্য জানা আশ্চর্য্য নয়— তন্ত্রের ব্যাপারে পূর্ণ সম্যক জ্ঞান ইঁহার যখন আছে—তখন আর ভাবনা কি?—মনে বড়ই আনন্দ পাইলাম—পর পর তিনি নিজ গুণে সকল কৌতুহল মিটাইয়া দিলেন। সে অবশ্য শেষের দিকে।

...

এখন এই মহান্ শক্তিধর মানুষটির মুখে পর পর যে কয়েকটি কথা শুনিলাম তাহাতেই আমার মনের বক্র গতি সোজা হইয়া গেল।

—ওরে শালা বল্ ত, তোর বিদ্যে কতটুকু,—কটা পাশ করেচিস, কত বই পড়েছিস?—

আমি নিঃসঙ্কোচে বলিলাম: আমার বিদ্যা কিছুই নেই—যেটুকু পড়েছি তা পরিচয় দেবার মত কিছুই নয়, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে—

—ওরে, এ শালার আবার মৌখিক বিনয়ও আছে—এ্যাঁ,—বল্ দিকি ও সব ঢং ছেড়ে দিয়ে—তোর মনে এখনও পড়াশুনোর গোমোর আছে কি না?— সত্যি বল্‌বি রে শালা, খবরদার,— হ্যাঁ।

আমি দেখিলাম যে তিনি আমার মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখিতেছেন,—বলিলাম: দেখুন, কখনও কখনও আমার একটু অভিমান আসে বটে কিন্তু তাকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিই নি। ছেলেবেলা থেকে দর্শন শাস্ত্র, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় যে যোগ-সাধন, সে সম্বন্ধে কৌতূহল আর পড়াশুনা বা আলোচনা করবার প্রবৃত্তি খুবই প্রবল ছিল, আর তাইতেই এ পথে কিছু কিছু জ্ঞানের আভাষ যেন পেয়েছি মনেও হয় বটে কিন্তু আমার চিত্ত এখনও রাগদ্বেষ মুক্ত হয় নি,—আকাঙ্ক্ষা লোভ লালসা এ সব ঠিক আগেকার মতই আছে, আর এমন অবস্থা আমার ত হয়নি যাতে মনে হয় যে আমার সব পাওয়া হয়েছে কিম্বা স্থায়ী ভাবে আমার কর্ম্মশক্তি চৈতন্যমুখী হয়ে অবিচ্ছেদে সেই দিকেই যাচ্চে,—কাজেই এমন অবস্থায় আমি যে

মহাউদ্বিগ্নচিত্ত—এই অনুভবটাই বেশী হয়,—তাহলে কেমন করে আমি অহংকার মনে মনে পোষণ করতে পারি।

—ওরে শালা বেদো[১], এ যে বেশ আসল দোষের কথাগুলো সামলে বললি—সাধারণ লোকের চেয়ে তোর ধর্ম্মোজ্ঞান বেশী আছে, এ কথাটি যে চাপা দিয়ে গেলি রে শালা। আমার কাছে লুকোনো?—অ্যাঁ।

—সে কথাও পূর্বে আমার বেশী বেশী মনে হতো বটে, এখনও হঠাৎ পূর্ব-অভ্যাসের ফলে কখনও কখনও হয়ত মনে এল, তবে আমি ও ভাবকেও কেটে দিই। এখন আমার বোধ হয় ও কথা আর বেশী মনে আসে না বা দাগ পড়তে পায় না।

—কেন?—কি তোর কাটান মন্তোর বল্ ত দেখি?—

—সেটা এই, এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে জীব মূলে স্বভাবে এক হলেও ব্যবহারে সকলকার জীবনের উদ্দেশ্য সমান নয়। প্রত্যেকের কর্ম ও ধর্মজীবন আলাদা, বিদ্বান, পণ্ডিত, মূর্খ, চাষা-ভূষা, উঁচু-নীচু সমাজে যত জীব, সবাই পৃথকভাবে জগৎ দেখছে, বিষয় ভোগ করছে। কাজেই এখানে এ অহংকারের স্থান নেই যে আমি ওর চেয়ে বেশী জানি বা আমি ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন: তবু একটু আছে কিনা, ওরি মধ্যে সামান্য রকমের একটু,—অবিশ্যি অত বড় করে দেখা না দিক্; বল্ শালা ঠিক করে— ওরি মধ্যে একটু আছে কি না—

আমি বলিলাম: হ্যাঁ বোধ হচ্চে যেন আছে। ঠিক বলেছেন আপনি—ওটা যেন—

তিনি চিৎকার করিয়াই বলিলেন: ঐটুকু এককালে প্রকাণ্ড হবে রে শালা, বিষের ছোবল মারবে—এখন তোলা রইল।

তার পর আবার বলিলেন: তোর গুরুগিরি করবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে কি না টের পেয়েছিস? ঠিক বলবি,—বল্ শালা, কেমন ধরেছি, হাঃ হাঃ হাঃ—বিকট হাসিয়া আমার চক্ষের উপর তাঁর সেই তীব্র দৃষ্টির একটি আঘাত করিলেন। উহা আমার অন্তরে লাগিয়া আনন্দে বিহ্বল করিয়া তুলিল। বলিলাম:

অন্তরে, আবার দেখুন, আমার এ বিশ্বাসও আছে যে ইচ্ছা করলেই গুরু হওয়া যায় না। মানুষ সমাজেও অর্থকরী বৃত্তিতে যেমন অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, বেশ্যার কাজে সকলেই যথেষ্ট পারদর্শী হতে পারে না, তেমনি অধ্যাত্ম ধর্মে যে কেউ ইচ্ছা করলেই গুরু হতে পারেন না। পরমহংস দেবের উপদেশে এটুকু খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছি। ভগবানের অভিপ্রায় এর মধ্যে যদি থাকে তবেই সিদ্ধকাম হয়ে মানুষে গুরু হতে পারে। এ ছাড়া আমার আরও একটি বিশেষ ধারণা সম্প্রতি হয়েছে যে—অধ্যাত্ম পথে গুরু এক, সেই তিনি ছাড়া আর কেউ গুরু নেই, হয়নি, হবে না, হতে পারে না।

---

১ বৈদিক অর্থে। — *সম্পাদক*

তিনি বলিলেন: শালা আবার শাস্তোরের ঢেঁকুর তুলেছিস?—বল্ শালা ঠিক করে,—ওরি মধ্যে, তাঁর শুভ ইচ্ছা কল্পনা করে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে দরকার হয়, তিনি যদি তেমনি বিধান করেন এই বলে একটু গুরুগিরির ইচ্ছে, ধরি মাছ না ছুঁই পানির মত, বল্ শালা ঠিক করে—এমনি একটু ইচ্ছে, সরু শিকড়ের মত ভিতরে জেগে আছে কি না।

বলিলাম: সত্য—এটুকুও আছে যেন বোধ হচ্ছে এখন। সর্বনাশ,—আমি কিন্তু এটা চাই না।

শুনিয়া তিনি এমন আকাশ-ফাটা হাসি আরম্ভ করিলেন বোধ হয় পাপহরার ওপার হইতে স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল, আমি কিন্তু উঠিতে চাহিতেছি না দেখিয়া তিনি বলিলেন,—কই উঠ্লি না যে।

আমি বলিলাম: খাওয়ার ইচ্ছা নেই, ক্ষুধাও নেই, তৃষ্ণাও নেই, সব যেন ভরে রয়েছে।

তিনি: যা যা শালা—নিয়মরক্ষে করতে হবে না,—তোর জন্যে যে সকলে বসে আছে?

কাজেই আমি উঠিলাম। আহারের পর পাপহরার তীরে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন প্রায় আড়াই প্রহর বেলা। অঘোরী আর সেখানে নাই,—তবে শ্মশানের কিছু দূরে এক ভৈরব ও ভৈরবী সামনাসামনি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে দেখিলাম। দুজনেই জোয়ান। অঘোরীর সঙ্গে এদের কি কিছু সম্বন্ধ আছে?

আমার ইচ্ছা হইতেছিল একবার ওদিকে যাই, দেখি তিনি কোথায়, কিন্তু এই যুগল মূর্তি দেখিয়া আর যাইতে পা উঠিল না।

আমি অন্যদিকে যাইতেছিলাম। পুণ্ডরীক, কালীবাড়ির ম্যানেজার, তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন,—চলুন, আজ আপনার আসনে গিয়া কথাবার্তা কওয়া যাক্।

আহারের পর আমি নিকটেই এখান-সেখান করিয়া বেড়াইতাম। বলিলাম: চলুন

একটু ঘোরা যাক্।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুণ্ডরীক চলিলেন। আমি যাইবার সময় সেই নবাগত ভৈরব দম্পতিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি এঁদের জানেন, অঘোরীর সঙ্গে এঁদের কিছু সম্বন্ধ আছে কি? অনুমান করিয়াছিলাম হয়ত চেলা হইবে। কিন্তু পুণ্ডরীকের মুখে শুনিলাম তা নয়,—এখানে এঁরা এই প্রথম এসেছেন। এখন আমরা দেখিলাম, আমাদের পিছনে তাঁরা দুজন আসিতেছেন।

দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ দাঁড়াইয়া গেল। আমিও দাঁড়াইলাম। তাঁহারা একজন আগে একজন পিছে, আসিয়া পুণ্ডরীকের সুমুখে পৌঁছিলেন। ভৈরব প্রথমে কথা বলিলেন: আমরা কামরূপ থেকেই আসছি, এখানে কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা।

শুনিয়া পুণ্ডরীক যেন বিশেষ চিন্তিত হইয়াই বলিলেন: আমরা কালীবাড়ির লোক, বক্রেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আপনি মন্দিরে গিয়ে, দেখেশুনে একটি স্থান ঠিক করে নিয়ে থাকতে পারেন—এখানে সাধুসন্ত যাঁরা আসেন তাঁরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিয়ে থাকেন, কারো অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। বলিয়া পুণ্ডরীক ঠাকুরবাড়ির দিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারাও সেই দিকে চলিলেন। তখন পুণ্ডরীক ভৈরবকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনাকে কি বলে আমরা ডাকব?

তিনি বলিলেন:—আমার নাম সিদ্ধ করালী। বলিয়া তিনি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমরাও রাস্তার বাঁকের দিকে চলিলাম।

বাঁক ফিরিয়াই এখানে একটি সুন্দর দৃশ্য চক্ষে পড়ে। একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ এবং বট গাছ, একসঙ্গে দুইটি। তাহার তলে ক্ষুদ্র একটি মন্দির। এত ছোট যে তাহার মধ্যে মানুষ বা কোন জীবজন্তু ঢুকিতে পারিবে না। কোন বড় মন্দির গঠন করিবার পূর্বে,—প্রাচীন কালে এই ধরণের ছোট একটি মন্দিরের ছাঁচ মিস্ত্রিরা আগে গড়িয়া লইত। পরে ইহা বড় মন্দির গড়িতে সাহায্য করিত। বড় মন্দির গড়া হইয়া গেলেও ছোটটি আদর্শরূপে থাকিয়া যাইত। এ রকম অনেক স্থানেই আছে; আর, ইহার সঙ্গে অনেক কিছুরই সৌসাদৃশ্য আছে। বড় একটা কিছু গড়িবার পূর্বে ছোট মনোমত একটি আদর্শ গড়া এ প্রদেশের প্রাচীন রীতি।

এই বক্রেশ্বর পীঠে এমন কোনও মহান শিল্প বা স্থাপত্যের চিহ্ন এখন নাই যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে এ স্থান শিল্প-গৌরবে কোন সময় সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু এই শ্যাওলা-ধরা পুরাতন ক্ষুদ্র আদর্শটি দেখিয়া কত কথাই না মনে আসিতেছিল।

কতকগুলি ডোমের মেয়ে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, নদী তীরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া, সঙ্গে ছোট-বড় কয়েকটি ছেলেও আছে। গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইতেছে, মনের আনন্দে বেড়াইতেছে আর গান করিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে আর তাহার ভাষা লক্ষ্য করিলে, সভ্যতা অভিমানী কাহাকেও দ্বিতীয়বার শুনিতে হইবে না। তাহাদের মনের মধ্যে আনন্দ—একটি অপূর্ব বন্য রাগিণীর সঙ্গে এই অশ্রাব্য শব্দগুলি মিলিত হইয়া তাহাদের কন্ঠ হইতে যেন অমৃত ঝরিতেছে। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সে গান প্রাণকে আকর্ষণ করে। কি করুণ সুর! যে ভাষার মধ্যে প্রিয়কে যথেচ্ছাচারী,

লম্পট এবং অক্ষম বলিয়া অনুযোগ করা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির ব্যবহার-দোষে নারী স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, তাহার বর্ণনা যে গানে করা হইয়াছে, তাহার ভাষা নাই-বা লইলাম!

অপেক্ষা করা কষ্টকর, বিশেষত আমার মত যারা চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ তাদের পক্ষে। এই যে অঘোরীর কাছে একটু আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি, আবার কতক্ষণে দেখা হইবে এখন তাই চিন্তা। লোভ লাগিয়াছে। যেন তাঁর কাছে আমার গুপ্ত রত্নাগারের চাবি আছে, তিনি খুলিয়া দিলেই আমার সর্বার্থ-সিদ্ধি হইবে।

সন্ধানে আছি আবার কতক্ষণে দেখা হইবে। বাহিরে একবার আসিলেই হয়, গিয়া ধরিব। যে দু'জন ভৈরব-ভৈরবীকে দুপুরবেলা দেখিলাম তাহারা এখন দেখি তাঁহার কুটীরের দিকে আনাগোনা লাগাইয়াছে। দেখিলাম ইহারা থাকিতে ত আমার সুবিধা হইবে না, আমি চাই তাঁকে নিরালায় একলা ভোগ করিতে। চলিয়া গেলাম নদীতীরে—অনেক দূর। যখন আর ইহারা থাকিবে না তখন যাইয়া ধরিব। রাত্রেই খুব সম্ভব দেখা হইবে, তখন ত আর কেহ থাকিবে না, বেশ হইবে।

রাত্র এক প্রহরের মধ্যেই এখানকার সব নিশুতি, আর কেহ জাগিয়া থাকে না। বিশেষত এ জায়গাটা গাঁয়ের বাইরে। কেহ বড় একটা এদিকে ত আসে না, কেবল শবদাহ করিতে যাহারা আসে তাহারাই এদিকে রাত্রে থাকে। এখানকার নিস্তব্ধতা ভয়ঙ্কর,—একটি উপভোগের বস্তু। কালো আকাশে অগুন্তি তারা জ্বলিতেছে—আর সে গাঢ় কালিমার ছায়ায় যেন পৃথিবী ছাইয়াছে। দূরে দূরে গাছগুলি ঘোর কালো, তার পর আকাশের ছবি। এই সময় একবার অঘোরীবাবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। কবিতার ভাষায় যেন অভিসারে চলিয়াছি—সাপখোপের ভয় এখানে খুব আছে কিন্তু আমার তা বড় একটা মনে আসে না। মেয়েলি কথা একটা শুনিয়াছিলাম ছেলেবেলায়—সাপের লেখা, আর বাঘের দেখা। যে বয়সে, যে রকম মনের অবস্থায় এটা শুনিয়াছিলাম—তাহাতে উহার সার সত্যটি সেই যে একেবারে অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া বসিল আর টলিল না। এখনও বিশ্বাস স্থির আছে যে মৃত্যুটা যদি সাপের কামড়েই হইবে এরূপ লেখা থাকে তাহা হইলে আর কোন রকমেই তা এড়ানো যাইবে না, আর যদি ভাগ্যক্রমে বাঘের সঙ্গে এই নিরস্ত্র-জাতির কাহারও চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ঘটে তবেই বুঝিতে হইবে ভবযন্ত্রণার হাত এড়াইবার সময় আসিয়া উপস্থিত। সুতরাং বিনা প্রতিবাদেই সম্মোহিত হইয়া অস্তিত্বলোপের সুযোগটি তাহাকে দেওয়াই ভালো।

পাপহরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, ওপারে শ্মশানে একটা চুলি জ্বলিতেছে। যে আলো হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় সৎকারের মধ্য অবস্থা, বেশ জোর আলো— তবে উচ্চশিখা নাই— চারিদিক হইতেই ছোট ছোট অনেকগুলি শিখা উঠিতেছে, জোর বাতাসে যেন এক একবার নিবিয়া যাইবার মত হইতেছে। দেখা গেল, চুলিটার একটু দূরে দুটি লোক। একটি উবু হইয়া বসিয়া আছে, অপরটি লাঠি

হাতে দাঁড়াইয়া। আর চুলির শিয়রে দাঁড়াইয়া অঘোরী—এক হাতে লাঠি, অপর হাতে চিমটা। আর কাহাকেও দেখা গেল না। ভাবিয়া লইলাম যে আজ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা খুবই অল্প। অবশ্য দাহ করিতে শ্মশানে দুইটিমাত্র লোক আসে নাই। আরও অনেকেই আছে, তাহারা হয়ত কাছেই কোথাও আড্ডা করিয়াছে।

এখানে প্রায়ই অনেক দূর গ্রাম হইতে শব লইয়া সৎকার করিতে আসে। যাহারা আসে তাহারা এই সৎকারের সঙ্গে নিজেদেরও বেশ একটু কারণানন্দ দিয়া সৎকার করে। তাহাতে শোক-মোহের আঁচটিও তাহাদের গায়ে লাগিতে পায় না। এ অঞ্চলের সৎকার এই প্রকারই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে আমি কি করিব তাহাই কতক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। ফিরিয়া যাইব, না একবার দেখিব ভাবিতেছি—। বোমা-ফাটার মত একটা আওয়াজ হইল, শবের মাথাটি ফাটিল। এমন সময় দেখিলাম উলঙ্গ অঘোরী তাঁহার পার্শ্বে যে একটি নরকপাল পাত্র পড়িয়াছিল—ক্ষিপ্রহস্তে উহা চিমটা দ্বারা উঠাইয়া লইলেন এবং শবের মাথা হইতে যে গলিত তরল মস্তিস্ক পড়িতে লাগিল—সেইখানে ধরিলেন। প্রায় আধ-পাত্র পূর্ণ হইল। তিনি হাতটি টানিয়া লইলেন, তার পর কুটীরের দিকে চলিলেন। আমি তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ওপারে গিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন: এই শালা, তুই রাত দুপুরে এখানে কি করতে এলি?—অ্যাঁ!

আমি বলিলাম: দিনমানে দেখা পাওয়া ত সহজ নয়, খুঁজতে হয়!

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া তাঁর কুটীরের দিকেই চলিলেন, আমিও না দাঁড়াইয়া তাঁহার পিছু লইলাম। তিনি কুটীরে ঢুকিলেন, আমিও ঢুকিলাম। ভিতরে আলো—একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। পাশেই একটা বড় মান-পাতায় ভাত বাড়া আছে, ধোঁয়া উঠিতেছে। হাঁড়িটিও পাশে রাখা আছে।

তিনি কপালপাত্রটি ভাতের কাছেই রাখিলেন। তার পর আমায় বলিলেন: তুই কি আমার খাওয়া দেখতে এলি নাকি—তিনদিন পরে আজ অন্ন ভোগ।

আমি বলিলাম: আজ আমি তাহলে আসি,—আহারের পর ত আপনি বিশ্রাম করবেন?

তিনি বলিলেন: এখানে বিশ্রামের কি দেখলি রে শালা,—তোদের মত আমরা খেয়ে উঠে মাগ নিয়ে শুয়ে পড়ি না রে শালা,—দেখ্ না, এসেছিস্ ত বসে দেখ্, খাওয়ার পর কি রকম বিশ্রাম। বোস্ ঐখানে, বোস্।

মাটির মেঝেয় একটি ময়লা মাদুর পাট করা পাতা আছে— তাতেই আমি বসিলাম। এমন সময় দুইজন লোক দরজায় উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল: বাবা, কারণ এসেছে, এইখানেই সেবা হবে কি? তিনি বলিলেন: নিয়ে আয় এদিকে।

একটা মাঝারি গোছের কলসী আনিয়া তাহারা বসাইয়া দিল। ঘরের কোণ দেখাইয়া তিনি বলিলেন: পাত্রটা আন্ এদিকে। পাত্র আসিল। তিনি সেই কলসের

উপর করাঙ্গুলী চালনা করিয়া তাহাদের বলিলেন: তোদের পাত্র কোথা? তাহারা পাত্র আনিলে তিনি উহাদের পাত্রটি ভরিয়া দিলেন, তার পর উহাদের পান করিতে আদেশ দিয়া কলসীতে চুমুক দিয়া সবটুকুই শেষ করিলেন। প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—যাহারা কারণ আনিয়াছিল তাহারা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল—তিনি 'না' 'হাঁ' কিছুই বলিলেন না, তেমনি বসিয়া আছেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি কথা কহিলেন:

তোর মতলবখানা কি বল্ দিকি? আমি বলিলাম: ওখানে ভাত যে জুড়িয়ে গেল?

তিনি বলিলেন: যাক্‌গে, কারণানন্দ চলেছে, এখন খাবার ঝোঁক নেই,—তুই খেয়েচিস্?

আমি বলিলাম: হাঁ, রাত্রে সামান্য একটু জলযোগ করি, তা সে অনেক-ক্ষণ হয়ে গেছে।

তিনি বলিলেন: তা হোক, তোর ত পেটে খিদে আছে। আমি স্বীকার করিলাম। পরে বলিলাম: তা ক্রমে ক্রমে ক্ষুধা-বোধও আর থাকবে না।

—খাওয়ার জিনিস দেখলে লোভ হয় না? খেতে ইচ্ছা করে না?

—তা হয়ত হয়,—কিন্তু সংযমও দরকার? খাওয়ার ধান্ধায় ত থাকার দরকার নেই!

—সংযম কাকে বলে? ক্ষুধার সময় খাবার দেখলে খেতে ইচ্ছা হবে, তাই চেপে রাখার নাম সংযম নাকি?—কি বলিস্?

—লোভ এলে কি তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? তাহলে ত প্রবৃত্তির আগুন আরও জ্বলে উঠবে।

—তুই যে ক্ষুধার সময় জোর করে না খেয়ে থাকবি, আবার তাকে সংযম বলবি, এ যে অবাক কথা বলিস্—কোথা থেকে এ রকম সংযম শিখলি?

আমি বলিলাম: ক্ষুধার সময় যদি আমি আহার সংযম না করি তবে কখন সংযম অভ্যাস করব, খিদে পেলে পর পেট ভরে খেয়ে সংযম হয় নাকি?

তিনি: আচ্ছা, কাম-ইন্দ্রিয় সংযমের বেলা কি রকম সংযম অভ্যাস করিস্ বল্ ত?—সেও ত ঐ রকম, শরীরে মনে স্বাভাবিক কামের প্রবল উত্তেজনা রইল, ভোগের উপকরণও সুমুখে রয়েচে, অথচ সেই সময় কষে ল্যাঙট এঁটে থাকার নামই তোদের সংযম নাকি,—কেমন?—খুলে আমায় বল্ দিকি?

—আমার প্রবৃত্তিকে যদি প্রশ্রয় দি তাহলে সংযম হবে কি করে?

—প্রবৃত্তিটার আসলে উৎপত্তি কোথায়? আমায় বল্ আগে।

—মনেই ত প্রথমে প্রবৃত্তিকে দেখতে পাই।

—তার পর?

—শরীরে তার ভোগ!

—তাহলে প্রবৃত্তির গোড়া ত মন, সংযম কোন্ খানে কাজ করে?

—সংযম ত মনেই হবে!

—বেশ ত বল্লি, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের বেলা কষে ল্যাঙট আঁটতে যাস্ কেন? তাতে কোথায় সংযম রক্ষা হয়?

—মনেই হ'ল আসল প্রবৃত্তি, কিন্তু শরীরেও ত বেড়া দিতে হয়?

—শরীরে বেড়া দেওয়ার ফলে কামের প্রবৃত্তি আর শরীরে আসে না, তুই এই কতা বলছিস্—বল্ দিকি ঠিক করে, এত বেড়া দেওয়ার পর তোর মধ্যে কোন প্রকার সুযোগ পেলে বা তিলমাত্র উপলক্ষ্য হলে কামের উত্তেজনা হয় কি না?

—তা হয়।

—স্বপ্নে স্খলন হয় কি না?

—কখনও কখনও হয় বটে।

—যুবতী মেয়ে দেখলে ইন্দ্রিয়-সুখের উপাদান বলে মনের মধ্যে রং ধরে কি না?

—তাও হয় বটে।

—তবে তোর সংযমের উপকারটা হয় কোন্ খানে, ল্যাঙট-আঁটার ফলই বা কি? ভেবে দেখেছিস্?

—আমার ধারণা, এখন হয়ত কিছুদিন এমনই কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাবে, পরে অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর কোনও চাঞ্চল্য থাকবে না।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন: তুই কি মনে করেছিস্ যে কাম-ইন্দ্রিয়কে ল্যাঙট এঁটে জয় করে ফেলবি? তুই জানিস এই কাম প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় উত্তেজনাটা কি, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি?

—প্রজা-বৃদ্ধির জন্যই, সৃষ্টির ধারা রক্ষার জন্যই এই কাম প্রবৃত্তি, এইটুকু মাত্র জানি।

—একবার সংসর্গে একটি ফোঁটায় ত একটা সৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু এত বড় উদ্দাম প্রবৃত্তি, এতটা শক্তি সারা জীবনেও যেন এর আশ মেটে না, এমন ধারা এক একটি প্রবাহপ্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার সার্থকতা কি? প্রকৃতির তুল্য হিসাবী কেউ আছে নাকি? তিনি এমনটা করলেন কোন্ প্রয়োজনে?

—আমার মধ্যে এই একটি প্রশ্ন আছে, এখনও এর কিছু বিশেষ উত্তর পাইনি। এর উত্তর আমি দিতে পারব না, আপনিই যখন এটা তুলেছেন—আমার মনে হয়, আপনার দয়াতেই আমি এর মীমাংসা পাব।

—আচ্ছা, বল্ দেখি কর্মেন্দ্রিয়ের প্রথম কোন্‌টি?

—বাক্, রসনা।

শেষ ইন্দ্রিয় কোনটি?

—উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গ।

তিনি বলিলেন: কর্মেন্দ্রিয়ের আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়ে যে যে শক্তির কাজ হয় সেগুলি কি বস্তুত পৃথক পৃথক মনে হয়?

—একটিই শক্তি,—কর্মের বেলায় পৃথক পৃথক যন্ত্রের মাঝ দিয়ে কাজ হচ্চে। এটি বেশ বুঝতে পারি।

—বেশ বল্লি এখন বল্ মন আর প্রাণ এর বিশেষ কি?

—মনকে ইচ্ছাশক্তি বলতে পারি, আর প্রাণ, শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরীরে সকল ক্রিয়াই সম্পন্ন করচে, কিন্তু মূলে পৃথক নয়, প্রাণেরই একভাগ মন হয়ে আমার যাবতীয় কর্ম চালাচ্চে।

—বেশ, এখন বোঝ এই 'আমি' বলে যে সত্তা, কর্মজগতে মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণের মধ্যে দিয়ে এখানে কর্ম-ভোগাদি করছেন এর মূলশক্তি, বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়ে উপস্থিত ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ক্রিয়া করচেন না কি? এটা অনুভব করতে কি কিছু গোলমাল আছে?

আমি বলিলাম: না, এটা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

তিনি: তাহলে বুঝে দেখ্ যে, আদি চৈতন্যশক্তি আমাদের মধ্যে সূক্ষ্ম-রূপে বুদ্ধি থেকে সুরু করে ক্রমশ সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্য দিয়ে সর্ববিষয়ে শক্তিমান করে রেখেছে। যোগশাস্ত্রের মত সেই আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার পর্য্যন্ত যার ক্রিয়া অবাধ, তাকে তুই কি মনে করিস্? তন্ত্রমতে সেই কুণ্ডলিনী।

এই যে আমাদের প্রাণ, কামময়, কাম-বীজই হ'ল আদি, এই শক্তি সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে স্থিতি বা পুষ্টি এবং লয় বা মুক্তি পর্য্যন্ত এক একটি জীবের জীবনে কাজ করছে। অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এর সঙ্গে। জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের জীবনই হ'ল এই কাম, একে তুই ল্যাঙট দিয়ে বশ করবি কি করে?

আমি বলিলাম: নীচ থেকে উপরের পথে, ধ্যান-ধারণার পথে চালাবার জন্য এই চেষ্টা, এ ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

তিনি: তোর মধ্যে জীবসৃষ্টির যে বীজ আছে তাকে বেরোবার পথ দিবি নি? প্রকৃতি তোর মধ্য দিয়ে যে কয়টি জীব-সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন তার অনুকূল পথে না গেলে তো ইষ্টলাভ কেমন করে হবে? তুই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বা জগতের কি কল্যাণ করবি?

আমি বলিলাম: ধরুন, আমি যদি স্থূল-সৃষ্টি বাড়াবার দিকে না গিয়ে উচ্চমার্গে আমার চৈতন্য শক্তিকে চালনা করি?

তিনি: আগে তোর প্রকৃতিগত কর্মবীজকে না ফুটিয়ে অন্য পথে চৈতন্য-শক্তিকে চালনা করতে পারবি কেন? সেটা যে অসম্ভব হবে, কেউ কোথাও কখনও তা পেরেছে কি? শালা বড় তালেবর হয়েছেন, স্থূল-সৃষ্টি বাড়াবেন না! কেন? সেটা কি ফেল্না

নাকি?

আমি: পুরুষার্থটা কি কিছুই নয়? আমার যদি তাতে ইচ্ছা না হয়?

তিনি: তাহলে বুঝব ধ্বজভঙ্গ হয়েছে,—তুই অপব্যবহার করে তোর ইন্দ্রিয়-শক্তি নষ্ট করেছিস্; তাকে ঢাকা দেবার জন্যে, লোকের চক্ষে ধূলো দেবার জন্যে ঢং করে সাধু সাজছিস। আ মোলো, এ শালা বলে কি? প্রকৃতির বিশাল শক্তি-সমুদ্রের মধ্যে কোথায় একটা নগণ্য বুদ্বুদের আবার পুরুষার্থ? ওরে শালা, তুই যে তারই অভিপ্রায় সিদ্ধ করতেই এসেছিস এটা কোন্ অহঙ্কারে ভুলে গেলি রে। স্থূল-সৃষ্টির বীজ থাকতে সংসার-আশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাস-আশ্রমে গিয়ে কত কত সন্ন্যাসী বাচ্ছা কাটতি করে গৃহীদের ঘাড়ে হাগচে দেখতে পাস্ নি? তুই শালা যে আকাশ থেকে পড়লি দেখতে পাচ্চি, অ্যাঁ—

আমি বলিলাম: প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আমরা তার বিরুদ্ধে যেতে পারি না, বা আমরা তার বিরুদ্ধে গিয়ে কিছুই করতে পারি না। আমি এই বলছি যে, যদি আমি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করতে যাই—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: তুই যেটুকু শক্তি নিয়ে এসেছিস আর সেই সঙ্গে তোর কর্ম্মসংস্কার অনুযায়ী সকল ব্যাপার যেখানে ফোট্‌বার সুবিধা হবে এমনি ক্ষেত্রে তিনি তোর জন্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের যোগাযোগ করে দিয়েছেন। তুই শিশুকালে মার কোলে যেমন মানুষ হয়েছিস, তোর অভাব অভিযোগ সকল ব্যাপার তোর মারই দেখবার ভার ছিল। তুই কি জানতিস্ কিসে কি হয়? ঠিক তেমনি বড় হয়ে গর্ভধারিণীর অধিকার ছাড়িয়ে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি নিয়ে যে তোর পথে চলেছিস্ বলে মনে করছিস্ সেটাও আর এক মার কোলে। শিশুকালের গর্ভধারিণী মা যেমন তোকে ধরা দিয়েছেন যে তিনিই তোর প্রতিপালনের কর্তা, তাঁর কাছ থেকেই তোর প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়েছিস্, যেন সহজ নিয়মে আপনা আপনি পেয়েছিস্, এখন বড় হয়ে, জ্ঞানবান হয়ে, তোর আত্মশক্তির উপর আস্থা বাড়াবার জন্যেই এই প্রকৃতি মা তোকে জানতে দিচ্ছেন না যে, তিনিই তোর সর্বকর্ম্ম ও বৃদ্ধির সহায়; তোর মনে হচ্ছে যেন তুই আপনিই নিজ শক্তিতে যাচ্ছিস্, কর্ম কচ্ছিস্, ভোগ কচ্ছিস্, কত বড় বড় কাজ কচ্ছিস্। ঠিক এই রকম জানবি সকলকার ঘটচে। না হলে এটা বুঝতে পারিস্ না, যদি তোরই সকল ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকবে তবে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে তোর এত বাধা আসে কেন, বা কোথা থেকে আসে সেই বাধা। প্রকৃতি জননীর কাজই হ'ল আড়ালে থেকে তোর স্বরূপটি তোকে জানিয়ে দেওয়া, তোকে তোর আত্মস্বরূপে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, মুক্তি দেওয়া।

আমি অনেকক্ষণ নির্বাক এবং স্থির হইয়াই রহিলাম, আর কোন কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইল না। তাঁর কথার মধ্যে আমার প্রকৃতিময় জীবনধারার স্বরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম। তত্ত্ব উপলব্ধির আনন্দ পাইলে আর কে প্রশ্ন করিয়া ব্যাঘাত

ঘটাইতে চায়? যিনি চান তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই, কারণ তখন আমার প্রশ্ন ত আসেই না। যেন সকল অভাবই পূর্ণ। মনে তখন ক্রমে ক্রমে এই ভয় আসে—যদি এই অবস্থা, এই অনুভূতি আবার কর্মক্ষেত্রে পড়িয়া হারাইয়া বসি।

তিনি কিছুক্ষণ পর বলিলেন: কিরে, তোর মুখ বন্ধ হয়ে গেল যে?

আমি তবুও চুপ করিয়া রহিলাম। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া তিনি উঠিয়া ভোজনে বসিলেন, বলিলেন: তুই তাহলে ঐ নিয়ে থাক, আমি এবার কিছু খেয়ে নি।

নর-কপাল-পাত্র হইতে সেই শবের মাথার ঘিয়ের সঙ্গে অন্ন পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট অন্নগুলি পাতা-সুদ্ধ বাহিরে কুকুরের মুখে ধরিয়া দিলেন। আহার তাঁর শরীরের অনুপাতে এতই অল্প, দেখিলে বিস্ময় লাগে।

তিনি আসিয়া বসিলে আমি বলিলাম: আপনার চেয়ে আমি অনেক বেশী খাই।

তিনি বলিলেন: আমার খাওয়া ত শেষ হয়ে এসেছে আর তোদের এখন কত খেতে হবে। কতক্ষণ চুপচাপ তার পর তিনি বলিলেন: আচ্ছা বল্ ত আমায়, তোর ল্যাঙট এঁটে ত ইন্দ্রিয় জয় হবে, আর রসনা জয় হবে কি করে? রসনার তৃপ্তি তোর কাম্য কি না?

এঁর কাছে ক্ষুদ্রতম ছিদ্রটুকু—কিছুই এড়ায় না। বলিলাম: আমি বুঝি যে কামেন্দ্রিয় জয়ের সঙ্গে রসনার অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু মনে হয়, মাঝে মাঝে রসনাকে একটু প্রশ্রয় দিলে বোধ হয় তত ক্ষতি হবে না। আমি ত নিজে ইচ্ছামত খাদ্য সংগ্রহ করি না,—যেমন জোটে তার মধ্যেই রসনার সম্বন্ধে ঐটুকু হিসাব রাখি।

তিনি: দেখ্ শালা,—তোর ইচ্ছে করে উল্টো রাস্তায় যাবার ফল। যেটা তোর কু-রাস্তা, যে পথে তোর যাবার কোনও দরকার নেই, পাঁচ জনের দেখাদেখি সে রাস্তায় গেলে ভিতরে কত রকমের আপোষের হিসেব কল্পনা করতে হয়—শালা জোচ্চোর।

আমি বলিলাম: আমি গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হবার জন্যে ত ঘর ছাড়িনি, সে উদ্দেশ্য কোন কালেই আমার নেই। কিন্তু সংযম যে আমার গার্হস্থ্য জীবনেও দরকার—

তিনি বলিলেন: দেখ তোর যতটা ক্ষুধা তোর খাবার প্রবৃত্তিও ততটাই হবে, আর ততটা খেলে তোর পুষ্টি হবে, উপকার হবে, শরীর নীরোগ থাকবে। কিন্তু লোভে পড়ে যদি রসনার সুখের হিসেবেই খাওয়াটা হয় তাহলে প্রকৃতির অবাধ্য হতে হ'লে—তার ফল রোগ। তোর যতটা প্রাণ-অগ্নি বা হজম শক্তি—তুই লোভের বশে তার অতিরিক্ত বোঝা চাপালে তোর স্বাস্থ্যভঙ্গ যদি না হয় ত আর কার হবে? এই এই সহজ বুদ্ধির ব্যাপারটায় এত গণ্ডগোল কেন জানিস?

—যদি তাই জানব তাহলে এত ভুলই বা হবে কেন! এত দণ্ড ভোগই বা কেন?

—দেখ্, যৌবন এমনই একটা মধুময় কাল, মধু বলতে মদও বুঝায় রে,—বেশ সর্বশক্তিমত্তার একটা নেশায় জীবকে বিভোর করে। আর সুখের চরম হ'ল মৈথুন,

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এক সঙ্গে ভোগ হয়। এর চেয়ে বড় পার্থিব সুখ ত তিনি আর কিছুতেই দেন নি। দুটি প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয় এক হয়ে যেন একটি সত্তা হয়ে যায়।

অন্যান্য যত কিছু সুখ, কোনটা শুধুই শব্দের, কোনটা স্পর্শের, কোনটা শুধু রূপ নিয়েই, কোনটা বা শুধুই রসে, কোনটি বা গন্ধে—কিন্তু কোনটাতে ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ সুখ নেই—এই এক মৈথুনেই সেটা আছে, আদি রস এই মৈথুন, সেটা সৃষ্টির মূল কারণ। জীব-সৃষ্টির প্রকৃষ্ট সময়ই হ'ল যৌবনে, কাজেই সৃষ্টির কাজে এই মৈথুন পরম সুখময়। জীব-সৃষ্টির নেশা কাটলে তখন উচ্চ উচ্চ ভাবের বিকাশ, ভাবসৃষ্টি ও নানা প্রকার রসসৃষ্টি আরম্ভ হয়। তখনই চৈতন্যের প্রসার। তিনি এমনই একটা উন্মাদনা এই যৌন-সম্পর্ক মধ্যে দিয়েছেন যাতে করে সন্তান-কামনা না করলেও এতে তাঁর সৃষ্টি-প্রসারের কাজ হয়ে যাবে। এড়াবার যো নেই। মানুষ বুদ্ধি করে যত রকমই ফিকির করুক তাঁর উদ্দেশ্য ঠিকই সিদ্ধ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: এই যে ইন্দ্রিয়-সুখের বিনিময়ে সৃষ্টির সহায়তার কথা বললেন, সে সুখটি ত শরীর আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোনও তত্ত্ব-অনুভূতির যে আনন্দ সে কি এই মৈথুনের চেয়ে উচ্চস্তরের নয়?

তিনি বলিলেন: তাতে ত কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপদ এইখানেই যে, মানুষের মধ্যে একদল, বেশ বড় একদল, আছে যারা ইন্দ্রিয়-সুখটাকেই মুখ্য বলে ধরে নিয়েছে। শুধু ধরে নেওয়া নয় একেবারে সংস্কারগত করে ফেলেছে—ধরেছে এমন করে যেন ঐ কাজের জন্যই বেঁচে থাকা,—

আমি বলিলাম: অবশ্য অত্যন্ত জড়বুদ্ধি মূর্খ প্রকৃতির—

বাধা দিয়ে, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন: ওরে শালা বোকারাম, তুই যে আকাশ থেকেই পড়লি!—তুই পাগলামী করিস্‌নে। তোদের ঐ সভ্য ভদ্দোর ইঞ্জিরি-পড়া, এডুকেটেড বিদ্বান বুদ্ধিমান সমাজের মানুষই বেশী বেশী এই দলের। যারা যথার্থ অসভ্য বা মূর্খ, খেটে খুটে খায়, তারা অনেক সংযত ভাবে ইন্দ্রিয় ভোগ করে, তারা এখনও প্রকৃতির বশে অনেকখানি চলে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ট, এটা কি তোরা জানিস না, অথচ সহরে থাকিস্! আচ্ছা বল্ দেখি, পুরুষত্বহীনতা, অজীর্ণ, হৃদ্‌রোগ, স্নায়ুরোগ, পক্ষাঘাত, বাত, মূত্ররোগ, যক্ষ্মা—এসব রোগ ভদ্দোর লোকের বেশী, না ছোটলোকের মধ্যে বেশী?

—সেটা সত্য,—ঐ সব রোগ ভদ্দোর লোকের মধ্যেই বেশী,—তা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে বুঝা যায়।

—তুই এটা বুঝিস্ না, বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে বেশী পরিচয় না হলে, বেশী সভ্য না হলে,—ইন্দ্রিয়-সুখের এত ব্যভিচার আসবে কোথা থেকে? সরলবুদ্ধি অসভ্য মূর্খেরা ওসব অবৈধ ইন্দ্রিয়-চালনা প্রবৃত্তি, সাহস পাবে কোথা থেকে?

এই শালা, তুই শয়তানের পরিচয় জানিস নি, সে যে বিদ্যাবুদ্ধিতে ভগবানের

দোসর, সে কি মুখ্যু অসভ্যের দল নিয়ে ব্যবসা করে?

আমি: আপনি কি বলেন যে কামেন্দ্রিয় এবং রসনাদির সংযম সংসার থেকে একটু পৃথক বা আলাদা হয়ে সাধন করবার দরকার নেই?

তিনি: কেন ঘরে থেকে সংযমে বাধাটা কোন্ খানে। ঘরে যদি বাধা থাকে বাইরেই বা বাধাহীন হবে কি করে? যেটা যথার্থ বাধা সেটা ত তোর সঙ্গেই আছে, থাকবেও। তন্ত্রমতে যে সাধন সেটি যে তোর গার্হস্থ্য ধর্মেরই অনুকূল,—আমি তোকে তা গ্রহণ করতে বলিনি, তবে তুই নাকি তন্ত্রমতের সাধনের উদ্দেশ্য জানতে চাস্ তাই বলছি।

আমি: বাস্তবিক ধর্মের নামে বা সাধনের জন্য পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান, যেটা রাজসিক ও তামসিক ভোগ এবং অধর্ম বলেই আমরা জানি, ধর্ম বলে সেই সব নিয়ে সাধনের যথার্থ উদ্দেশ্যই বা কি জানতে কৌতূহল হয় বৈকি।

এক ধর্মে যেগুলি ত্যাগ করবার উপদেশ, অন্য ধর্মে সেইসকল সাধনের অঙ্গ বলে উৎসাহ দেওয়া কেন হ'লো সেটা কি আলোচনার বিষয় নয়? এসব আমাদের সকলেরই ভালো করেই জানা দরকার,—আমার ত তাই মনে হয়।

তিনি বলিলেন: এটা ভালো বুদ্ধি,—কত বড় ভাগ্য-ফলে ধর্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ইচ্ছা হয়, তার পর ওসকল জানবার চেষ্টা মানুষের আসে—তাকে কি ফেলতে আছে? তুই দেখ না কেন, এমন সুন্দর ব্যবহারিক ধর্ম, এমন সহজ ও সত্য ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম আর কোথায় আছে? মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই তন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন, এতে কোনও অবান্তর, কোন বাজে আড়ম্বর নেই। দেখ না, মানুষের যৌবন এলেই সাধনের আরম্ভ,— সেই সাধনের এমন পুষ্টিকর স্বাভাবিক উপকরণ, মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সাধনের এই অনুষ্ঠান আর কোন ধর্মে নেই, প্রবৃত্তিমার্গেই তন্ত্রের সাধনা, যা নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই।

সব ধর্মের যে উদ্দেশ্য তন্ত্রের ধর্মেরও সেই উদ্দেশ্য,—মুক্তি, জীবের স্বরূপে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি। যখন পাশবদ্ধ[২] অবস্থায় থাকে তখন জীব, পাশমুক্ত হলেই শিব। এখন এই পাশ জোর করে ত মুক্ত হওয়া যায় না, এর একটি ক্রম আছে, সেই ক্রমে, সেই ধারায় চলতে পারলে পাশমুক্ত হওয়া সহজ হয়ে আসে। আর তাই হ'লো তন্ত্রের ধর্ম। যে চৈতন্যশক্তি এই জগৎ প্রপঞ্চ ভেদ করতে পারেন সেটি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রথমে সুপ্ত থাকে, অবিকশিত অবস্থায় থাকে। যেমন, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের জ্ঞান থাকে না, জাগ্রত হলে তবে 'আমি' জ্ঞান, জগৎ-বিষয় জ্ঞান আসে, সেই রকম এই কুণ্ডলিনী-শক্তি যখন সুপ্ত— আত্মচৈতন্য, এ সকল জগৎ প্রপঞ্চের কারণ জ্ঞানও তখন সুপ্ত, অবিকশিত অবস্থায় থাকে। এটি

২ অষ্টপাশের কথা বলা হচ্ছে। ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, পৈশূন্য — এই আট প্রকার বন্ধন বা পাশ। পৈশূন্য বলতে ক্রূরতা, খলতা, ধূর্ততা, দুর্জনতা। — *সম্পাদক*

বৈজ্ঞানিক সত্য। তন্ত্রধর্ম আসলে যোগশাস্ত্র অনুগত ধর্ম, এর মধ্যে নৈতিক আবর্জনার কচ্‌কচি নেই বলেই নীতি-ধর্মের গোঁড়ারা তন্ত্র-সাধনকে ঘৃণা করেন, হীন ভাবেন।

আমি: নীতিকে আবর্জনা বল্লেন? সকল ধর্মের প্রথম ধাপই হ'ল নীতি, নয় কি?

তিনি: ঐ নীতি শাস্তোরের শাসনেই ত সকল ধর্ম বিকৃত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যেখানে সেখানে নীতির প্রয়োজন বা উপযোগিতা কোথায়?—প্রত্যেক ধর্মেই ঐ নীতির বোঝা চাপানোর ফলেই না মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে আর তাতেই না এত ভণ্ডামো, মিথ্যাচার সমাজে নির্লজ্জ ভাবে চলে যাচ্ছে, যার প্রতিবাদের শক্তি পর্য্যন্ত মানুষের আজ নেই। তন্ত্রের সাধনে সেই জন্যে নীতির এত বাড়াবাড়ি নেই, কারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিয়েই এর আসল কাজ, আর তারই সঙ্গে সম্বন্ধ।

জীব-ধর্মে যৌবনে যে প্রবৃত্তিগুলি জেগে ওঠে তাই নিয়েই তান্ত্রিক-সাধন আরম্ভ। যৌবনে প্রথম আকাঙ্ক্ষার বস্তু কি? পুষ্টিকর খাদ্য। যে সময়ে যে সমাজে তন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল সে সময় মদ খাওয়া সাধারণের মধ্যে প্রচলন ছিল। শরীরে স্ফূর্তি বাড়াবার জন্যে এক সময় ঐ রকমের একটা না একটা নেশা বা মাদক জগতে সকল সমাজেই প্রচলন ছিল। ওটা দোষের ব্যাপার ছিল না। মদের দোষ আছে, সর্বকালেই আছে, সেটা কিন্তু যিনি খান পাত্রের সেই গুণেই ঘটে থাকে। যার যেমন প্রকৃতি বা গুণ মদ খেলে তার সেই ভাবেরই উদ্দীপন হয়। স্বাভাবিক শরীর, মনের স্ফূর্তির জন্যই ওটার ব্যবহার তখন ছিল, এখনও আছে। সেই জন্য মদটাকে প্রথমেই রেখেছিল যেটাতে স্ফূর্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তার পর মৎস্য, মাংস। পুষ্টির খাদ্য হিসাবে মৎস্য-মাংসের কথা কোন শাক্তকেই আর বেশী করে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

আমি: শাক্ত ছাড়া আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের—

তিনি: সকলেই শাক্ত,—যে শক্তি চায়, উপাসনা করুক না করুক প্রত্যেকে শাক্ত; আমি জানি তখনকার দিনেও যেমন এখনও তেমনি সব মানুষই অন্তরে শাক্ত। জীবের প্রথম প্রবণতা শক্তিমুখী, যে অস্বীকার করবে সে ভণ্ড, মিথ্যাচারী।

১৮

অঘোরীর বচন বড় কটু। অনেকগুলি লোকপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু, যাঁহারা সাধারণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সাধু বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা এখানকার তান্ত্রিক ভৈরব বা কাপালিকদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা নাই। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম—যে যে কারণে তাঁরা অশ্রদ্ধেয় তাহা আমার ভাষায় বলিতেছি।

তন্ত্রমতে সাধন-পথে অগ্রসর হইলে, ঠিক মত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন চলিতে থাকিলে, কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়। সেই সময়ের গুণে অনেকেরই অভিচার[৩] ক্রিয়ার উপর অত্যন্ত প্রবল অনুরাগ উপস্থিত হয়। মনের মধ্যে শক্তি-চালনার প্রবৃত্তি দেখা যায়। অবশ্য তাহা লোকের উপকারের জন্যই করা, এইরূপ একটা মনোভাব প্রথমে তাঁহাদের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু মানুষের স্বভাবে যত কিছু রাগদ্বেষ তাহা ত তাঁহাদের মধ্যে আছে সুতরাং তাঁহারা নিজের স্বার্থে ক্রমশ তাহা প্রয়োগ করিতে থাকেন। প্রধানত চারটি প্রবল শক্তির চালনা তাঁহারা করেন এবং নিজের সর্বনাশ করিয়া উৎসন্ন যান।[৪] মারণ, উচাটন, বশীকরণ ও স্তম্ভন। এ-ছাড়া অন্য যা কিছু তাও ভূতসিদ্ধির ফল। অনেকটা ম্যাজিক কিম্বা ভেল্কিবাজির মত,—তাহা দেখিয়া অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি মানুষেরা মোহিত হয়,—ইহাতে কর্মকর্তাদের সাধন-জীবনে কিছু ক্ষতি হয় বটে কিন্তু খুব বেশী হয় না। কিন্তু উচ্চ শক্তির চালনা যাঁরা করেন, আমাদের সকল মানুষের উপর শক্তি-প্রয়োগ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করেন,—তাঁহাদের আর দুর্গতির সীমা থাকে না। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের উপর হাত দিলেই তার ফল ভোগ করিতে হয়। সৃষ্টির মধ্যে সে নিয়ম তো অলঙ্ঘনীয়—জীবের পক্ষে কল্যাণকর। তাহাতে যে কল্যাণ দেখিতে পায় না তাহার বুদ্ধির উপর কতকটা শয়তানী প্রভাব আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। বাস্তব যাহা কিছু তাহার উপর নিরন্তর অভ্যাসের ফলে অহং শক্তিগত হয়—তাহাই শয়তানী।

তন্ত্রের মধ্যে আত্মজ্ঞান বা মুক্তির সাধনাই মুখ্য—অভিচারাদি গৌণ এবং অবান্তর। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের মধ্যে যেমন সাধনাদির উপায় এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের সুন্দর উপায় বলা আছে,—আবার বিভূতিবাদও আছে কিন্তু সেটা ত মুখ্য নয়। তন্ত্রের পথে রজ ও তমোগুণী কতকগুলি সাধক আসিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গোপনে অভিচারের পথে যায়। অহং শক্তিমান—এই পরিচয় পাইয়া শিষ্য-সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য, অর্থ, নানাপ্রকার ভোগ সুখের এবং প্রতিপত্তির লোভ তাহাদের জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠে। তখন কোথায় থাকে মোক্ষসাধন আর কোথায়ই বা থাকে ইষ্টলাভ। তখন রজ আর তমোগুণের মেলা অবাধে চলিতে থাকে। ফলে আয়ুষ্কাল

---

৩ ‘অন্যের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে কৃত তান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিশেষ; ইহা ছয় প্রকার, যথা — মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ’ (*সরল বাঙ্গালা অভিধান*, সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ: জুলাই ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ: জুন ১৯৯৮)। অভিধান-প্রণেতার তন্ত্রবিদ্বেষী মনোভাব লক্ষ্যণীয়। এই মনোভাব গোটা বৈদিক পরম্পরার সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য। — *সম্পাদক*

৪ তান্ত্রিক সাধুদের এ রকমভাবে নিজেদেরকে অধঃপতিত করার উদাহরণ বা কেসস্টাডির বিবরণ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ নামের এই* গ্রন্থের অন্যত্র আছে।

শেষ হইলে, তাহাদের যে দুর্গতি হয় সে আর বলিবার নয়।

সাধারণ মানুষে যে তাহাদের দেখিলে ভোলে, তাহার কারণ সাধন-অবস্থায় তাহাদের শরীরে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। মানুষ মাত্রেই, যাহাদের আত্ম-চৈত্যন্যের বিকাশ হয় নাই তাহারা রূপে সহজেই মজে। উজ্জ্বল চক্ষু, জটাজূট, শরীরের লাবণ্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, সেই রূপের প্রভাবে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়ে। কাজেই তাহাতে সাধনের অহংকার বাড়িয়া যায়। তার পর যাহা হয় তাহা লইয়া আলোচনায় ফল নাই।

আমি প্রশ্ন করিলাম: সাধকের ভৈরবী রাখার উদ্দেশ্য কি?

তিনি বলিলেন: উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষ-অভিমানী প্রকৃতি যাদের তাদের নারী-প্রকৃতির সংযোগের ফলে আত্মচৈতন্য উদ্বুদ্ধের কাজের সহায়তা করে, দুটি আত্মার মিলনে যে মহৎ ফল উৎপন্ন হয় তাতে দুটি জীবনই সার্থক হয়। যথার্থ সাধকের লাম্পট্য-দোষ থাকে না, তাঁরা একটিতেই কাজ শেষ করতে পারেন। নরক ঘাঁটা ত উদ্দেশ্য নয়,– উদ্দেশ্য আমার বাহ্য কামময় জীবনের পরিসমাপ্তি, আপ্তকাম হওয়া। এমন সাধন এই তন্ত্রের মধ্যে আছে যাতে ঊর্দ্ধরেতা হয়ে, বিনা ভৈরবীতে কোন স্ত্রীসঙ্গ না করে সিদ্ধিলাভ করা যায়। কিন্তু সে সব এখনকার দিনে ত কেউ চায় না, স্থূল ইন্দ্রিয়র এতটা মোহ যে তাদের মোটেই উঁচু পথে লক্ষ্য যাবেই না।

আমি: ইচ্ছা থাকলে কেউ কি ঊর্দ্ধরেতা হতে পারে?

তিনি: তা কি করে পারবে। যাদের কর্ম্মক্ষেত্রে জীব-সৃষ্টির অল্পবিস্তর যোগাযোগ রয়েছে–তাদের ঊর্দ্ধরেতা হবার সুযোগ ঘটবেই না। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম-প্রবণতা শেষ না হলে কেউ ঊর্দ্ধরেতা হতে পারবে না। আসলে ঊর্দ্ধরেতা হওয়াটাই উদ্দেশ্য নয় ত, উদ্দেশ্য হ'ল আমাদের আনন্দময় জীবন, দুঃখ থেকে নিবৃত্তি। যখন আমাদের যৌবনে নারী-আসক্তি সহজেই আসে তখন তা থেকে জোর করে মনকে ফেরাবার প্রবৃত্তি তন্ত্র-শাস্ত্রে অনুমোদিত নয়। অস্বাভাবিক রাস্তায় যাবার কোন দরকার নাই। তা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যাদের মস্তিষ্ক উর্বর তারা একটা নূতন কিছু করবার বা দেখবার জন্যেই একবার বেয়েচেয়ে দেখে–যদি টপ্ করে একবার ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। যদি পরিমিত নারী-সঙ্গ করা যায়, তার ব্যভিচার না হয়, তাহলে মানুষের অধ্যাত্মমার্গে প্রাপ্য যতটা উন্নতি সবটাই নির্ব্বিবাদে আসবে। তারা মানব-জীবনের ফল ষোল আনাই পায়। বাড়াবাড়িটা সকল সময়েই খারাপ। বেশীর ভাগ মানুষের ভোজনের ও ইন্দ্রিয়সুখের লোভ এতটা প্রবল থাকে যে জীবনের অন্যান্য কর্ম্ম গৌণ হয়ে থাকে–তারা ঐ দুটির জন্যই অন্যান্য কাজ করে। তার ফলভোগও কম করে না, প্রকৃতি তাকে দিয়ে বিস্তর জীব-সৃষ্টি করিয়ে নেন, প্রতিপালন করিয়ে নেন–আবার সেই সন্তানের দুর্ব্যবহার দ্বারা তাকে দণ্ডিত করেন। মোটকথা তারা ইন্দ্রিয়-সুখকে মুখ্য করে যে কষ্টভোগ করে তাতে সে-জীবনে তাদের চৈতন্য হয়ে যায় যে

ওটা যথার্থই সুখের ব্যাপার নয়। শাঁস বাদ দিয়ে ছোবড়াটাই খাওয়া হয়েছে, ফলের যেমন ছোবড়াটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় তার পর সেটিকে তফাৎ করে শাঁসের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে হয়—তেমনি, এমন কত কত জীবের জীবনে সুখ ঐ খোসা বা ছোবড়াটি দিয়েই মিটছে। ছোবড়া বা খোসার মধ্যেও ফলের স্বাদ কতকটা আছে কিন্তু সেটা ত খাদ্য নয়। আবার অনেক ফল আছে যার খোসা বাদ না দিয়ে খাওয়া চলে। এই রকম ফল এমনই মধুর যে এর খোসাটারও আকর্ষণ আছে। ফল খোসা-সুদ্ধ খেলেও ভিতরে তার আসলটা শরীরের কাজে লাগে, অসারটা আপনিই বেরিয়ে যায়। এই কাম-ফলও সেই রকম, খোসাসুদ্ধ খেলেও সময়ে তা আলাদা হয়ে যায়। তাদের কথা বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলচি,—যাদের জীবনে যৌবনের ক্ষুধা ভোজন ও ইন্দ্রিয়-সুখে পর্য্যবসিত নয়, যারা আরও কিছু উচ্চ উচ্চ জ্ঞান এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাদের ঊর্দ্ধরেতা হওয়া শক্ত নয়। পরিমিত যৌন-সম্বন্ধ থাকলেও তারা যত বেশী উচ্চ আদর্শের পানে এগিয়ে যায় ততই তাদের রেত ঊর্দ্ধগামী হতে থাকে—তার ফলে তাদের নানা তত্ত্ব উপলব্ধি হয়—আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়, জগতবাসীর সঙ্গে তারা প্রেমের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। স্থূল শরীরে যে মৈথুনের সুখ তার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। তারাই তখন সেটা বুঝতে পারে,—দেহাভিমানী মানুষে কি করে তা বুঝবে। তাদের তা বোঝাতে যাওয়া যে অন্যায়। যাদের চৈতন্য শরীরের গণ্ডী ছাড়ায় নি তাদের সঙ্গে ওসব প্রসঙ্গ চলে না। কাজেই, যত রকমের মানুষ এই সৃষ্টিতে আছে তাদের মধ্যে শরীরের ক্ষুধা ও রিরংসার কারবার যাদের জীবনে মুখ্য নয় তাদেরই ঊর্দ্ধরেতার ফলাফল ভোগ হয়। ঊর্দ্ধরেতা হয় বলে তাদের সঙ্গে নারী থাকলেও কসরৎ করবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্তিতাই তাদের উচ্চ উচ্চ শক্তি এবং জ্ঞানের অধিকারী করে দেয়। জগৎসমাজে তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়, অনেকেই তাদের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। তাদের মধ্যে পৌরুষ প্রবল হয়। এই পুরুষ ভাবই সাধারণের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। একটা মানুষের পিছনে, তাকে তুষ্ট করবার জন্য কত আগ্রহ, এটা যেখানেই দেখা যাবে সেইখানেই বুঝতে হবে এই একটি পুরুষ, এতগুলি লোকের আশ্রয় হয়ে আছেন। তা যেকোনো বিভাগেই হোক,—সেই ব্যক্তিকেই নায়ক বলা যায়।

—আচ্ছা তন্ত্রে বিবাহ আছে কি?

—আছে বৈকি! তবে সে বিবাহ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল। জাতি বংশ, গোত্র গাঁই এ সকলের অস্বাভাবিক বালাই নাই। শৈব-বিবাহ যথার্থ বিবাহ,—তার ফল কখনও এখনকার ভণ্ড আর্য্য বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের মত বিষময় হয় না।

আমি: বর্ণাশ্রমীদের ভণ্ড বলা যায় না, তারা মনে-প্রাণে যা বিশ্বাস করে সংস্কার-মত তাই করে আসছে ত?

তিনি: ভণ্ড ছাড়া আর কি বলব। ব্রাহ্মণ-বংশের কথাই ধর্ না রে শালা। তোরা

কতবড় ভণ্ড—বেদের মতও রাখিস্ আবার তান্ত্রিকমতও মানিস্। এক উপনয়নেই ত কর্মজীবনের সকল কাজ হতে পারে, সে পথের অনুসরণ না করে কুলগুরুর কাছে আবার তান্ত্রিক দীক্ষার কি প্রয়োজন? 'ওঁ'কার জপ করলে যে ফল পাওয়া যায় অন্যান্য বীজের ক্রিয়াতেও সেই ফল পাওয়া যায়। মন্ত্রকে জাগ্রত করা সাধকের নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তা যে মন্ত্র হোক না কেন। এই ত গেল ধর্মজীবনের ভণ্ডামো। তারপর—

আমি: আগে ত বৈদিক আচার প্রচলিত ছিল, কেন বলুন দেখি এর সঙ্গে আবার তান্ত্রিকতা এল?—

—আগে যখন শরীর মনের তেজ ছিল, পশ্চিম-দেশের জল-হাওয়ার গুণে তাদের সূর্য্য উপাসনা-প্রধান ঐ বৈদিক জীবনেই নিষ্ঠা ছিল। তার পর নড়তে নড়তে তন্ত্রপ্রধান এই বাঙ্গলায় এসে পড়তেই ছন্নমতি ধরবার সুযোগ এল। বাঙ্গলার তান্ত্রিকদের সঙ্গে ক্রমে পরিচয় হতে লাগল। তাদের সংসর্গের ফলে বেশীদিন থাকতে থাকতে তন্ত্রের ধর্মে বৈদিক ব্রাহ্মণের অনুরাগ দেখা দিতে লাগল। আগে ত তন্ত্রের পুঁথিই সংস্কৃত ভাষায় বা অক্ষরে লেখা ছিল না। ব্রাহ্মণেরা তাদের বিদ্যা প্রকাশ করলেন তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করে, আর সংস্কৃত ভাষায় তাকে পুঁথিতে লিখে। তখন শিব আর্য্যদের নূতন অর্থাৎ শেষের দেবতা। ঐ শিবের মুখ দিয়েই তন্ত্রের যা কিছু মাহাত্ম্য বলানো হ'ল—ব্রহ্মাকে শ্রোতা করে,—আবার পার্বতীকে দিয়ে কতক বলানো হ'ল। এই ভাবে আগম-নিগম-এর সৃষ্টি করে তন্ত্রসারে তার চূড়ান্ত করা হ'ল। অথচ বৈদিক আচার ছাড়বার নয়, ওটা প্রাচীন, জাতিগত সংস্কারের ধর্ম, পৈতৃক ধর্ম তখন সহজেই আপোষ হ'ল, গার্হস্থ্য-আশ্রমের পূর্ব পর্য্যন্ত বৈদিক দীক্ষার কাজ আর গৃহস্থ হয়ে দার-পরিগ্রহ করে তখন তন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে তান্ত্রিক মতে সাধন করতে বামুনেরা ব্রতী হলেন, নিয়ম করলেন। তার পর বৌদ্ধ-প্রভাব। বৌদ্ধেরা শেষের দিকে এই তন্ত্রমার্গকে প্রধান অবলম্বন করেছিল যে। এর আসল কথা হ'ল বৈদিক ব্রাহ্মণের দল ধর্মের কারবার চুটিয়ে করবার ব্যবস্থা করলেন এই তন্ত্রকে ধর্মাঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে। মন্ত্র হ'ল গুহ্য। ব্যাপার আরও চমৎকার হ'ল যখন ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম একত্র হ'ল, ক্রিয়াকর্ম বাড়ল। হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণদের উপজীবিকার সুবিধা এইভাবেই হয়ে গেল। তবে পূর্বের ব্রাহ্মণ যাঁরা তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন এর মধ্যে যথার্থই ধর্ম-জীবনের গোড়া থেকে আগা পর্য্যন্ত সবটাই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূল। কৃচ্ছ্র-সাধনের অসারতা সম্যক প্রতিপন্ন হয় এই তন্ত্রমার্গে। শঙ্কর আচার্য্য সেই জন্যই, প্রবাদ আছে যে তন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেন নি বা করেন নি। সূক্ষ্মভাবে তাঁরা বুঝেছিলেন ভোগ যোগ একত্রই ধর্ম। আর এই ক্রমই প্রকৃতির এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার স্বভাবের সঙ্গে মেলানো। জীবলীলার ক্রমবিকাশ এই তন্ত্রের আদর্শের মধ্যে ধরা আছে। তন্ত্রের

প্রতিপাদ্য সকল তত্ত্বই দৃঢ় অবিসংবাদিত নির্মল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আসলে বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণের ষ্ট্যান্ডার্ড খুব নীচু হয়ে গিয়েছিল বলেই তখন তন্ত্রের সঙ্গে আপোষ করা হ'ল। বৈদিক আচারবান আর্য্য ব্রাহ্মণ এদেশে এসে খুব বেশী দিন আর পিতৃ-পিতামহের আচার-জ্ঞান ও বীর্য্যে অধিকারী থাকতে পারলেন না। বাঙ্গলার মাটির এমনই গুণ। আবার বৌদ্ধধর্মের অধিকারে তন্ত্রের উন্নতি যতটা হয়েছিল অবনতিও কম হয়নি। অভিচারীর ক্রিয়াশক্তি এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেক কর্মে তার ব্যবহার হত। ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, রাগ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ, নারীকে অবলম্বন করে সমাজের মধ্যে যথেচ্ছাচার, এ সকল অভিচার সহায় করে একেবারে চরমে উঠেছিল। তখন নারীসমাজে সতীত্ব বলে কোন আদরণীয় বস্তু ছিল না। আদরণীয় ছিল ভ্রষ্টাচার। তাই ধর্ম, তাই কর্ম, তাই কাম্য, তাই সব। এ সকল বড় কম দিন চলেনি। এই তন্ত্রের ব্যভিচার শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা একটা ধাক্কা খেয়েছিল, তার পর দ্বিতীয় ধাক্কা এল চৈতন্যদেবের সময়ে। সেই ধাক্কায়ই—এটির গোড়া একেবারেই আলগা করে দিলে। বাঙ্গলায় তখন থেকে তন্ত্রের প্রভাব হীনবল হতে হতে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে যেমন এদিকে তন্ত্রের ধর্ম উঠে গেল তেমনি বৈষ্ণব-ধর্ম সতেজে গজাতে লাগল, আর তন্ত্রের অনেকগুলি আবিষ্কার,—গুহ্য একাঙ্গ মৈথুনতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রভৃতি আত্মসাৎ করে নিয়ে অঙ্গ বাড়াতে লাগল। সহজিয়া, আউল, বাউল আদি সম্প্রদায় ত তন্ত্রের ভাঙ্গা-হাটের মাল, বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর মহাজনদের গদিতে জমা হয়ে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা, তন্ত্রের সকল ব্যাপার এত গুহ্য কেন? তিনি: প্রথমে গুহ্য ছিল না, প্রথমে তন্ত্রের সাধন সহজ এবং সাধারণের উপযোগীই ছিল,—কিন্তু যখনই এই মৈথুনাদির প্রকরণ নানাপ্রকার এবং অদৃষ্টপূর্ব ফলাফল আবিষ্কার হতে লাগল, তখন থেকে এটা গোপন করবার নিয়ম হ'ল, কারণ অন্য সম্প্রদায়ের কাছে এসব ক্রিয়া ঘৃণার বস্তু বলে, অবজ্ঞার বিষয় বলে ধারণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। অল্প লোকেই এর মধ্যে থেকে সার বস্তু পেয়েছে, বেশীর ভাগই বিপথে গিয়েছে, ব্যভিচার করেছে। কামের যত কিছু বিকৃতভাবের অভিব্যক্তি হতে লাগল, গুহ্য রাখাতে এই দোষ হয়ে গেছে, গোটা কতক সঙ্কেত ছাড়া, এই কাম-রাজ্যের বিচিত্র রহস্য সাধারণের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। স্ত্রী-পুরুষে মিলে এই যে রমণ, এর মধ্যে শরীর-ধর্মেই সাধারণের প্রবৃত্তি। কিন্তু শরীর-ধর্ম-বর্জিত প্রেম বলে যে একটি স্বর্গীয় সুখ আছে তা সাধারণের কাছে গুপ্ত, অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত। সাধারণ মানুষের শরীরগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখের সংস্কার পুরুষানুক্রমে এতটাই প্রবল যে এই সব স্থূল শরীরের সম্পর্ক শূন্য হয়েও কত বড় একটি সুখের উপায় আমাদের আছে—তার কল্পনাও যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আজ এই তান্ত্রিকদের কিম্বা এই সহজিয়াদের সর্বনেশে কাম-সাধনের বিকৃতি দেখলে অবাক হতে হয়। যে ধর্মে

দু-একটি লোক সিদ্ধ হয়,—তার পর তার পদ্ধতি কতকটা বিকৃত হয়ে আসে, শেষে এই রকম শোচনীয় পরিণাম হয়—এ দেখে কি মনে হয় না যে এটা যাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁদেরই জন্য। এই কারণেই আরও গুহ্য রাখার ব্যবস্থা।

আমি বলিলাম: আমার মনে হয় এসব গুহ্য রাখা খুবই অন্যায়।

তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন: ওরে শালা, তখনকার দিনে কি এখনকার মত ছাপাখানা ছিল, না বিদ্যার এতটা প্রচার হয়েছিল যে সাধনের এ সকল গুহ্য রহস্যময় ব্যাপার সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছে যাবে। আর তাতে লাভই বা কী হত! হাজারে একটা মানুষ সাধনের পথে যায়, তা ছাড়া শরীরের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী, প্রাণশক্তির ক্রিয়া আর অনুভবের নানা স্তর, স্থূল সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বা বুঝানো যাবে কি করে। অনুভবের কি ভাষা আছে? তার উপর কাম-মার্গের ব্যাপার কতই না জটিল,—লিঙ্গ থেকে মস্তিষ্ক অবধি প্রাণমার্গে তার ক্রিয়া; রেত বা ধাতুক্ষরণের কত প্রকার ভেদ, অন্তঃক্ষরণ, বহিক্ষরণ, কেমনভাবে কোন্ কোন্ ক্রিয়ার ফলে, বর্হিগতি বন্ধ করে অন্তরমার্গে গতিমান করা যায়, এ সকল ব্যাপার প্রকৃতি যখন গুহ্য রেখে দিয়েছেন তখন কেন তাকে অত প্রচার করবার জন্যে মাথা-ব্যথা তোর বল্ দেখি! এই কামকলা, যা নিয়ে এই বিরাট সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ব্যাপার দিবারাত্র চলচে তার যত রহস্য, মানুষের শরীরের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা থেকে সুরু করে কামের উদ্দীপন, যে ভাবে দুজনের উপর দুজনের চৈতন্য থেকে আরম্ভ করে মনের ভিতর দিয়ে শরীরের উপর টান—তার পর মৈথুনে দুটি এক হয়ে যাওয়া, তার পর প্রাণশক্তির ঘন স্পন্দনের উদ্দামলীলা, শেষে উভয়ের স্খলন। যে ক্রমে প্রথম থেকে শরীরের নানা সূক্ষ্ম নাড়িগুলির ভিতরে যে যে ভাবের ক্রিয়া হয়—তার প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রত্যেক ফলটি কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? এ সকলই অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার,—পূর্ণ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূল তুচ্ছ বাস্তব প্রমাণ দিয়ে এসব লোক-সমাজে কি করে প্রকাশ করা যাবে? কামের প্রথম প্রেরণা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার তাই তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়; এ সকল কি করে সব মানুষকে ন'কড়া ছ'কড়ার হিসাবে বুঝোনো যাবে, তুই আমায় বল্ দিখি?

আমি: আচ্ছা, সহজ-বুদ্ধিতে মানুষের যৌবন এলে, নারী হলে পুরুষের উপর আর পুরুষ হলে নারীর উপর একটা আকর্ষণ হয় ত। সেটা কি শুধুই কামের ব্যবহার চরিতার্থ করবার জন্যে—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: অন্য কথা পরে শুন্‌চি, আগে একটা ভুল তোকে শোধরাতে হবে। তুই যে বললি নারী আর পুরুষ, ওটা হ'ল নারী-প্রকৃতি আর পুরুষ-প্রকৃতি, নারী ও নর এই কথা বলতে হবে।

আমি: ও আপনাদের কথার বাড়াবাড়ি—যে রকম বলেই হোক বুঝাতে পারলেই হ'ল।

তিনি: ফের শালা তুই না বুঝে পণ্ডিতি করছিস্! এ প্রকৃতির রাজ্যে পুরুষ কেউ আছে নাকি রে শালা। কথায় যাকে পুরুষ বলছিস সে ত প্রাকৃত জীব। লম্বা হাত খানেক করে লিঙ্গ থাকলেই কি পুরুষ হয়? অংশত পুরুষের যে গুণ তা নারীতেও ত আছে। দেখতে পাচ্ছিসনে এক ভগবানকে সকলেই চাইচে!– কেন চাইচে? সেই একমাত্র পূর্ণ পুরুষ বলেই চাইছে। যদি কেউ পুরুষ এখানে থাকত সকলেই তাকে চাইত। পুরুষের প্রথম এবং প্রধান গুণই হ'ল সে সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই তাকে চাই, না পেলে নয়। পুরুষ এক, পুরুষে দুই সহ্য করতে পারে না, বিশ্বাস করে না। প্রকৃতির কোলে আমরা যত জীব সবাই এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মেছি প্রকৃতি পুরুষের গুণের অতীব ক্ষুদ্র কণা-প্রমাণ অংশ নিয়ে। তারি ঠেলা এমনি যে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র পুরুষ বলে পরিচয় দিচ্চি। কি লজ্জা! এক সদাশিব পুরুষ, আর কেউ পুরুষ আছে নাকি রে? গুণ ধরে বিচার করলে এই প্রাকৃত পুরুষের নারীর সঙ্গে সম্বন্ধের বেলা মাত্র ঐ গুণটুকু দেখতে পাওয়া যায়,–নারী-সম্পর্কে তার অধিকার পূর্ণ রাখতে চায়–সেখানে আর কারো অধিকার সে জানে না। নারীরও ঠিক ঐ গুণটি আছে,– সেও তার ভর্ত্তার অন্য নারী-সঙ্গ, পতির উপর অন্য মেয়েমানুষের প্রভাব সহ্য করতে পারে না,– এই যে পুরুষের গুণ এ ত মেয়ে-মদ্দ দুয়ের মধ্যেই রয়েছে। একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রেই এটার পরিচয়। মিলনের জায়গায় দুটি একতন্ত্র। মানে বুঝে কথা বললে ত গায়ে লাগে না, এখন আসল পুরুষ আর প্রাকৃত পুরুষের তফাত বুঝেছিস?

আমি: এসব ত বৈষ্ণব-দর্শনের কথা বলেই আমার জানা আছে।

তিনি: সব দর্শনের মোদ্দা কথা এক যে রে শালা,–তত্ত্বে পৌঁছলে সবই এক রকম। পথের প্রকরণ, পদ্ধতি যা আলাদা। তাই না তুই তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি দেখতে এসেছিস্!

আমি: শরীর-তত্ত্বের সঙ্গে সাধনের ত বিশেষ সম্পর্ক আছে।

তিনি: সাধন ত শরীর নিয়েই, কাজেই সুস্থ শরীর সুস্থ মন না হলে সাধনের মানে হয় না। বিকৃত শরীরে সাধনের মানে শরীরের চিকিৎসা। কোবরেজী ওষুধের বদলে শরীরে ভিতরকার নিয়মের, বায়ুর গতি স্থির করে তাকে স্বাস্থ্যের তালে চালানো। সাধন-বস্তুটি এমনই কল্যাণকর যে, তাতে আর কিছু হোক বা না হোক শরীরে স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় আসবেই আসবে। সাধন করছে অথচ শরীর খারাপ, বুঝতে হবে মরণের সাধন হচ্ছে, জীবনের নয়। সাধনের প্রথম প্রত্যক্ষ ফল হ'ল স্বাস্থ্য,– আনন্দময় মানসিক অবস্থা। সকল বিষয়েই আনন্দে পরিসমাপ্তি। মহা দুঃখের ব্যাপার হলেও সাধকের প্রাণে সেই দুঃখের কারণ-জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়–তার ফল আনন্দ। এই দুটি হ'ল স্পষ্ট লক্ষণ।

…

১৯

...

একদিন প্রাতে, প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া অঘোরীর সন্ধানের বাহির হইলাম, দেখিব, সকালের দিকে কি ভাবে থাকেন, কি করেন ইত্যাদি। নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখিব যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারিব। কুটীরে গিয়া দেখিলাম শূন্য কুটীর, দ্বার ত খোলাই থাকে, কখনও বন্ধ দেখিলাম না। বাহিরের পানে এদিক-ওদিক চাহিতে দেখিতে পাইলাম—ভুলো ডোম, ঐদিক হইতে আসিতেছে, ইহাকে হামেশাই এখানে দেখা যাইত। অঘোরীর একজন অতি অনুগত ভক্ত। শ্মশানের কাজকর্ম করিত, দু'চার আনা পাইত আবার কারণ প্রসাদও পাইত। সে ছাড়া অঘোরী বাবাজীর সন্ধান আর কেহ তেমন করিয়া রাখিত না, কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: কোথায় তিনি?

সে বলিল: হোই দেখেন গা, কাল হতে পড়ে রইচেন শ্মশানে যেঁয়েঁ। আমি পুনরায় বলিলাম: কাল রাত্রে সেইখানেই ঘুমিয়েছিলেন নাকি?— সে বলিল: ওঁয়ার কি ঘুম আছে নাকি, ওমনিই পড়ে রইছেন।

আমাদের কলিকাতা মহানগরীর সভ্য অধিবাসবৃন্দ যাহাদের পল্লীগ্রামের শ্মশানের অভিজ্ঞতা নাই,—নিমতলা, কেওড়াতলা, কাশীমিত্র অথবা কাশীপুরের শ্মশান ছাড়াইয়া যাহাদের অভিজ্ঞতা অধিক দূরে যায় নাই—রাত্রের কথা থাক, দ্বিপ্রহর দিবালোকে পল্লীশ্মশান যে কি রূপ ধারণ করে তাহা তাঁহাদের বুঝানো সহজ নয়। বিশেষত এই বীরভূমের শ্মশান। এমন ভয়ঙ্কর শ্মশানের দৃশ্য বোধ করি অন্যস্থানে নাই। যাঁহারা বীরভূমের শ্মশান দেখেন নাই তাঁহাদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, বীরাচারের প্রত্যেক স্থান তান্ত্রিক সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিয়া প্রত্যেক মহাপীঠস্থান শ্মশান-সংশ্লিষ্ট।

আশপাশে জঙ্গল, নদীতীর অবধি বিস্তৃত। অস্থি, নরকপাল, দগ্ধ অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে। কাক, চিল, শকুন, শৃগাল, কুকুরের অবাধ গতাগতি। ছোট ছোট শিশু বা বালক-শব এখানে অনেকেই দাহ করে না, গর্ত খুঁড়িয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে, তার পর চলিয়া যায়। শৃগাল কুকুরেরা সন্ধানী জীব, শ্মশান জনশূন্য হইবার পর-মুহূর্তেই মাটি আঁচড়াইয়া দেহটি বাহির করিয়া তাহারা ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলে। কেবল অস্থিগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। ছোট ছোট গাছপালা চারিদিকেই, তাহার আড়ালেই ইহারা আপনার কাজ সারিয়া লয়। কোথাও কতকটা চুলির গর্ত কাটা, তাহার উপর আধপোড়া কাঠকয়লা ছড়ানো। কাঁথা, ছেঁড়া কাপড়, কানাভাঙ্গা কলসীর ছড়াছড়ি। এমনই স্থান এখানকার শ্মশান।

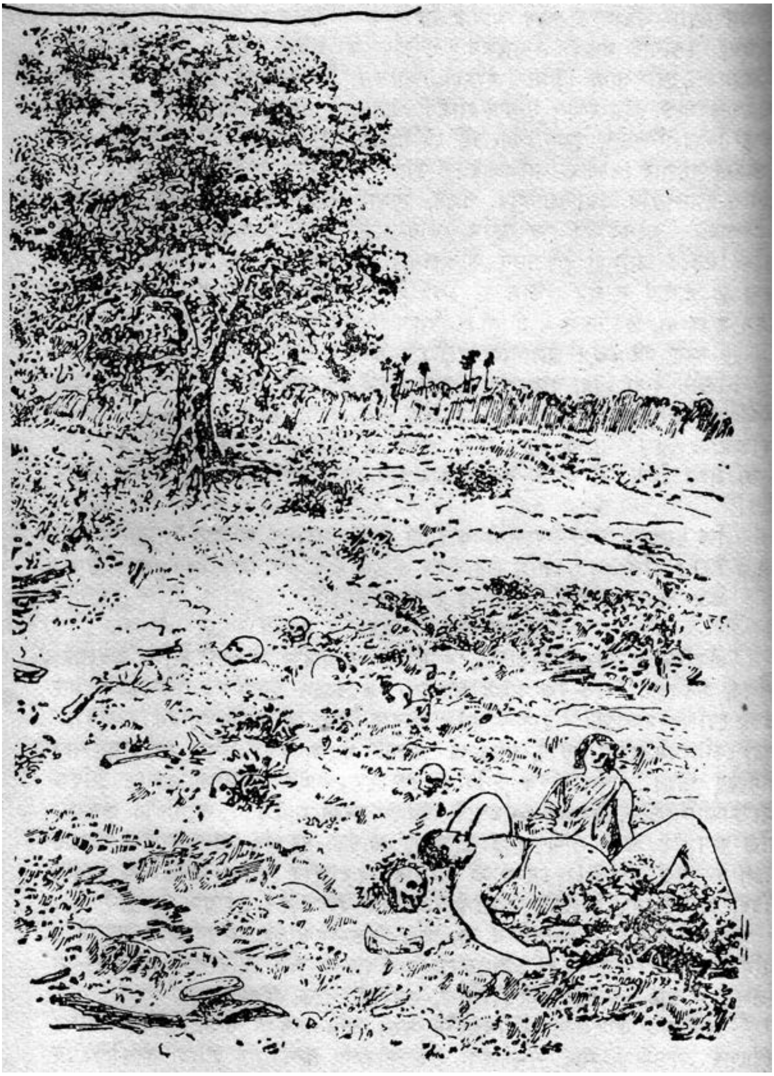

অঘোরীর কুটীর হইতে কতকটা গিয়া দেখি তিনি কয়েকটি ছোট ছোট গাছের পাশে শবাসনে শুইয়া আছেন। একটি হাত মাথায়, উপাধানের কাজ করিতেছে। দেখিবামাত্র আমার মনে হইল যোগীশ্বর মহাদেব কি এইভাবেই শ্মশানে শুইয়া থাকিতেন? আপন ধ্যানে আপনি বিভোর হইয়া জগৎ প্রপঞ্চর কথা ভুলিতেন। এমনই অবস্থায় কি জগদম্বা আপন দক্ষিণ চরণ তাঁহার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া-ছিলেন?– ভাবিতেছিলাম, কি ধাতুতে এসব মানুষ গড়া! বুঝিতে পারি না, কেমন

করিয়া আমাদেরই মত একজনের এমন অবস্থা হয়! কেন বুঝিতে পারি না—বুঝতে বাধা কি? বাধা সেইখানেই যেখানে আমরা আত্মদোষ নির্দ্ধারণে উদাসীন, পরদোষ অনুসন্ধানে উদ্দাম এবং অতি তৎপর। তাহার উপর যেখানে আমরা ভণ্ড, কাপুরুষ, প্রেমহীন, অতীব স্বার্থদুষ্ট মন লইয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ থাকি। কেমন করিয়া এ তথ্য সমাধান করিতে পারিব? এ তথ্য সমাধান না হইলেও কিন্তু ইহার আকর্ষণ কিছু কম অনুভব করি না। ভাবিতেও আনন্দ, প্রত্যক্ষ করিতেও আনন্দ, পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রকাশ করিতেও আনন্দ। যদিও জীবনে একবার, কয়েক-দিনের জন্য ইঁহার সঙ্গ পাইয়াছিলাম, তথাপি তাহার ফল জীবনের স্মৃতির মধ্যে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

আস্তে আস্তে তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়াইলাম—কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি জানিতে পারিলেন কি না তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তার পর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গিয়া তাঁহার পাশে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে তিনি চাহিলেন, আমায় দেখিলেন বটে কিন্তু কোন কথাই নাই। আমারও কিছু বলিবার মত কথা ছিল না। বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণই কাটিল, এইবার তিনি নড়িলেন, একদিকের পা মুড়িলেন। আমার ধৈর্য্য কতটা তাহারই যেন পরীক্ষা চলিতেছে।

ব্যাপারটি যা মনে হয় হয়ত তা ঠিক নয়। বসিয়া বসিয়া কত ভাবিতেছিলাম, অবশ্য এই অঘোরীরই কথা। তাঁর সংসর্গে মূলে কিছু সৎভাবের প্রেরণা অথবা সাধন-পথে কিছু আলো পাইলাম কি না, কতটুকু স্থূল এবং অসৎ-এর মোহ কাটাইতে পারিয়াছি। তাহার উপর আত্মপ্রসাদ কোন্ উপলক্ষে কেমন করিয়া আসে, তাহারও লক্ষ্য করিতেছিলাম, সম্মুখের ওই আদর্শটিকে কেন্দ্র করিয়া আমার চৈতন্য ক্রমে কেন্দ্রস্থ হইতে লাগিল, বেশ বুঝিতে পারিতেছি, 'আমি' এই বোধটি মাথার মধ্যে কোন স্থানে অনুভব হইতেছে। চকিতের মধ্যে যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কি নিধিই হারাইলাম। হায়!

সম্মুখে অঘোরী তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন,—আমার দৃষ্টির উপর তাঁর দৃষ্টি পড়িবামাত্রই আবার আনন্দে আকুল করিয়া তুলিল।

এমনই সময় সৎকারার্থে শব লইয়া একদল লোক আসিয়া একেবারে আমাদের অতি নিকটেই খাটিয়াখানি নামাইল। আমার অন্তরের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন,—পরে তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: বেরো শালা তুই এখান থেকে। কেন এখানে এলি তুই, যা চলে যা এখান থেকে, আমি এদের সঙ্গে ভালো থাক্‌ব,—তোর মত এরা মনে মনে অত শত হিসেব করে না। আমার এদের সঙ্গ ভালো লাগে। বেরো শালা, যা বলছি, তুই এখনই যা।

এমনই 'যা' 'যা' বার কতক বলিলেন যে আমায় উঠিতেই হইল, জোর করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিছুতেই আমার ওখানে বসা আর সম্ভব হইল না। ইহা লইয়া

মনে একটু দুঃখ হইল বটে, কিন্তু আসনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সকল রহস্য ভেদ হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম কেন তিনি আমায় ঐ সময় উঠাইয়া দিলেন।

আসিয়া দেখি মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা হাতে একটি লাঠি, এক বাউল মূর্তি নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ আবার কি ভাব!—মনটি বিরস ছিল, সদ্য সদ্য অঘোরীর তাড়া খাইয়া মনের বেদনা মুখে বেশ ভালো রকমই প্রকট ছিল।

—এ কি, আবার গোমরা মুখ কেন,—সাধু মানুষের হ'ল কি?

আমি বলিলাম: এমন কিছু না, আপনি এখানে কোথায় এসেছেন, জানতে পারি?

তিনি বলিলেন: আমাকে ভাগাবার চেষ্টায় আছ কেন বাবা, আমি কি অপরাধ করেছি?

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম: বসুন না, আমার সে অভিপ্রায় নয়। এমনিই আমি মনে করেছিলাম হয়ত অন্য কোথাও এসেছেন, কোনও পরিচিত—

তিনি হাসিয়া বলিলেন: তা বাবা, আমার পরিচিত ত কেউ নেই এখানে, তার জন্য তোমার ভাবনা নেই। অপরিচিত হলেও আমি বেশ সকলের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি, এখানে শুনলাম যে দুই-একজন আছেন, তাই না আলাপ করতে আসা!

জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ের—জিজ্ঞাসা করতে পারি?—হাঁ, তা পারবে না কেন, আমরা সহজ মানুষ, আমাদের সম্প্রদায় এখন মরে গেছে বাবা।

আমার মনে হইল,—এই মানুষটির সঙ্গে আলাপের জন্যই অঘোরী আমায় এত জোর করিয়া উঠাইয়া দিলেন। আরও মনে হইল, এঁর সঙ্গ আমার শুধুই অভিপ্রেত নয়, অন্তরের কাম্য। চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িয়া সহজিয়াদের কথা এক সময় কতই না ভাবিয়াছি।—এই সব ভাবিতেছি, বাউল একটি গান ধরিলেন,—

> ডুবতে কি সবাই পারে,
> রূপসাগরে তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে।

এই গানের এক লাইন শুনিতে শুনিতে সংজ্ঞা লোপের উপক্রম হইল।

আনন্দের প্রবাহ চলিতে লাগিল। সত্যই আমি ডুবিয়া গেলাম।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বাবাজী আসিয়া আমার আসনের নিকটেই বসিলেন। বলিলেন: আপনি যে আমাদের আপনার জন দেখেই আমরা চিনতে পারি।

—আপনি কি জ্যোতিষ জানেন?

—আরে বাবাজী, জ্যোতিষ শাস্তোর কি এতবড় জিনিস, একজনের পরিচয় জানতে হলে শাস্তোর ঘাঁটতে হবে। আমাদের ওসব বালাই নেই। প্রেমের ঠাকুর হৃদয়ে সব সময়ে হানা দিচ্ছেন, কে কোন্ দলের মানুষ তা তিনিই জানিয়ে দেন।

আমি বলিলাম: এখানে তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি দেখব, সাধকদের সঙ্গে মিশব বলেই এসেছি। এখন এমন এক সাধুর পাল্লায় পড়েছি—

—ওসব কেন বাবা, যে যে-রাজ্যের লোক নয় তার সেই রাজ্যে ঠোকর মারবার দরকার কি?

—জানতে ইচ্ছা হয় ত? আমি বলিলাম: জানলেই বা দোষ কি?

—দোষ এই যে খানিকটা ঘূর্ণি পথে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে। আরও জেনে রাখ বাবা, তোমার সংসার বেশ ভালো রকমই

আছে।

আমি বলিলাম: সে কি? আমার ইচ্ছা, এইভাবে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে জীবনের দিন কাটিয়ে দেব।

—মনে ত হয় বাবা, কিন্তু তা হতে দেয় কৈ! তোমার সত্ত্ব আর কিছু রাখবে না বাবা, সবটাই নিঙড়ে বার করে নেবে, তবে ছাড়বে।

—খুলে বলুন, আমি ভালো রকম জানতে চাই।

—আরে বাবাজী, তোমার এত কষ্টের, এত যত্নের বেহ্মোচোয্যো, কোথায় থাকবে এসব বাবা, যখন তিনি ঘানিগাছে জুড়ে পিষিয়ে তেল বার করে নেবেন। হাঃ হাঃ হাঃ।

লোকটা বলে কি, আমার এত যত্নের তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইবে?

—আরে বাবা, যত্নটা যে আসলে প্রবাহকে বেঁধে রাখবার কাজেই রয়েছে, যেটা একেবারেই অসার—যার কোনও দরকার ছিল না। তা যখন এটা হয়েছে ভালোই হয়েছে—এতে তাঁর একটা অভিপ্রায় রয়েছে যে। তা বাবা, জেনে রাখো, তোমায় ঘরে ফিরে অনেক পাড়ি দিতে হবে, সংসার ঘাড়ে করে।

এখন এ সব কথা আমার কানে ভালো লাগিতেছিল না, বরং বিসদৃশই লাগিতেছিল। তিনি সেটি বুঝিয়া ফেলিলেন: বলিলেন, চল বাবা, এখান থেকে একটু উঠে পড়ি, চল মন্দিরের আঙ্গিনায় যাই,—ফাঁকা আছে।

যন্ত্র-চালিতের মতই চলিলাম। তিনি বলিলেন: ঐ গাছতলায় জঙ্গলের মধ্যে একটি ভাঙ্গা বিগ্রহ আছে, দেখেছ কি বাবা,—

—আমি ত দেখি নাই, কোন্ খানে চলুন যাই,—

কুণ্ডের ধারে ধ্বংসোন্মুখী উঁচু ইষ্টক-নির্ম্মিত অলিন্দের সারি, তাহার উপর অসংখ্য গাছপালা শিকড় গড়িয়াছে, তাহার পাশেই জঙ্গল। সেই জঙ্গলে অনেকগুলি শৃগাল বাস করিয়া থাকে। তাহার পরেই কতকটা বনপথ।

আমরা সেই বনপথ ধরিয়া চলিলাম—পথে আমার আর কথা কহিতে ইচ্ছাই হইল না। ভবিষ্যতে আবার সংসারের আবর্ত্তে পড়িতে হইবে শুনিয়া অবধি প্রাণে আর আনন্দ নাই। সঙ্গী বাবাজী আমার দুঃখটি অনুভব করিয়াছেন বুঝিয়াছি। যখন তিনি দাঁড়াইলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: এইখানেই নাকি?

হাঁ, আর একটু এগিয়ে আসতে হবে। এই দেখ বাবা,—

দেখিলাম সত্যই একটি অতি প্রাচীন পুরুষ-মূর্ত্তি ভগ্ন এবং স্থানচ্যুত। নীচের দিকে পদ্মাসনের কতকটা আড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলি গাছ শিকড় গাড়িয়াছে, তাহার চারিদিকেই টুকরো টুকরো অনেকগুলি পাথর। বেদী যেখানে ছিল

সেখানে একটি উঁচু ঢিপি ছাড়া আর কিছুই নাই। খুব সম্ভব এখানে একটি মন্দির ছিল। কোন সময় হয়ত এই বিগ্রহের পূজা হইত। তারপর ধ্বংসের বন্যা আসিয়া সব শেষ করিয়া দিয়াছে। তিনি একখানি পাথরের উপর বসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন: এস ভাই, বসা যাক,—আজ তোমায় বড় দুঃখ দিয়েছি ছেলেমানুষ কিনা সংসার এখন রহস্যই হয়ে আছে কিনা, তাই ত এ কথায় এতটা বেদনাবোধ হয়েছে।

আসলে কিছু নয় দাদা, সবই চমৎকার, যেমন এপিঠ তেমনি ওপিঠ।

২০

বাউল বাবাজীর গলাটি মিষ্ট, তাহার উপর ভাব-রসে তাঁর প্রাণটি পূর্ণ, সেইজন্য তাঁর গান শুনিলে চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। আমার সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ উক্তি শুনিয়া মনটি যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহা যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন নাচিয়া নাচিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া একটি গান ধরিলেন।

সহজ পথে উছ্ট্ লাগে ওরে মন কানা;
(ও) তুই আপনি সহজ না হইলে সহজের পথ পাবি না।

এই গানটি সত্য সত্যই মন্ত্রের কাজ করিল। আনন্দের প্রবাহ চলিতে লাগিল, সেই সঙ্গে মনের অবসাদ, বক্রগতি এবং জড়তা সব কিছু স্থির, সহজ হইয়া গেল। কেমন করিয়া সহজ ব্যাপারকে জটিল করিয়া আমরা মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করি তাহা বুঝিয়া বিমল আনন্দে প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দিল। অন্তরে নিজের গলদ ধরা পড়িলে এমনই হয়। আমরা নিজের কাছে কতটা যে অহেতুক অপরাধী, যদি একবার স্থির অবস্থায় অনুসন্ধান করি তাহা হইলে অন্তরে সবটাই পরিষ্কার দেখিতে পাই, যাহার ফলে অনেক অহেতুক দুঃখ এবং অবসাদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। আমার নিজের বেদনা ত এড়াইতে পারি, আবার অপরের বেদনা এবং দুঃখ অনেকটুকুই মোচন করিতে পারি। তার আরও সর্বোৎকৃষ্ট নিশ্চিত ফল এই লাভ হয় যে, আমাদের ব্যবহার অপরকে মনঃপীড়া দিতে পারে না। কিন্তু এমনই আমাদের সংসর্গজ সংস্কার, আমাদের 'অহম্' এমনই দুষ্ট ভাবের আবরণে কঠিন যে, তাহা সহজে ঘটে না। আমার গতির সঙ্গে বাহ্য বিষয়ের আপোষ করিতে মনকে লইয়া আমি এমনই ব্যস্ত এবং সমাহিত যে সে কঠিন আবরণ মুক্ত করা আরও কঠিন হইয়া পড়ে।

দুইটি পঙ্ক্তি গান করিয়া থামিলেন। আমি বলিলাম: চলুক না, থামিলেন কেন? তিনি বলিলেন: ঐটুকুই যথেষ্ট, আর বেশীতে কাজ কি? তখন আমি বলিলাম: কেন বলুন দেখি আপনি দু'লাইনের বেশী গান করেন না? এই একটু আগে কেমন সুন্দর একটি গান ধরলেন, কি চমৎকার তার ভাব, কিন্তু ঐ দু'লাইন—তার পর চুপচাপ। কেন? সবটা গাইলে ক্ষতি কি?

তিনি একটু হাসিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন: আসল গান ত ঐটুকুই। গানের আসল কথাটা ত ঐ দুটি পঙ্ক্তিতেই বলা হয়ে গেছে, তার পর যা, তা ত কেবল কথার ঝুড়ি, কবির রচনা আর বুদ্ধির কারিগরী। কথার গাঁথুনী বা বাঁধুনী দিয়ে আসল ঐ দু'লাইনের ব্যাপারকেই ফলাও ব্যাখ্যা করা হয়েচে ভাবের

সামঞ্জস্য বজায় রেখে—সেগুলো না থাকলেও হত—কোন ক্ষতি ছিল না। ভেবে দেখ না দাদা, ঠিক কি না। কেবল,—

আমি বলিলাম: তা বোধ হয় অনেক সময়েই ঠিক বটে, তবে প্রথম দু'লাইনেই ত আসল ভাবের সবটুকু প্রকাশ হয় না, কাজেই পরবর্তী কথায় সেইটা—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন: আরে দাদা ভাই—ও টেনে বাড়ানো হয় মাত্র,—আমার মনে হয় বাড়াতে গিয়ে ফল ভালো হয় না যদিও পোঁ ধরা হয়। আত্মচৈতন্যের প্রেরণা যেটি তা প্রথমটুকুতেই থাকে, তার পর কবির যেমন শক্তি আছে আবার সেই শক্তির ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারও ত আছে। আত্মার মধ্যে থেকে যে একটি ভাবরসের প্রকাশ হয়, বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষণস্থির প্রকাশ তাই হয় প্রেরণা বুদ্ধির ক্ষেত্রে পড়লে। প্রথমে যখন সেই প্রেরণা বুদ্ধির ক্ষেত্রে পড়েই একটি রূপ পায়, কবি তখন সেই অনুভূতি তাঁর সংস্কারগত বুদ্ধি দিয়েই ধরতে যান। সংস্কারের যে পুঁজি, তার অভিব্যক্তিই ভাষা, আর ভাষার উপর কবির আধিপত্যই সকলের চেয়ে বেশী। তখন কবি ভাষাকে ধরেই তাঁর প্রেরণাকে ব্যক্ত করতে যান। সত্যের পরশ টাট্‌কা টাট্‌কা ভাষার প্রথম উদ্যমকে ধরেই ধরেই যেটুকু ব্যক্ত হ'ল, তার ভাবরস হয় গাঢ়; তারপর মূলে যে চৈতন্যের জ্যোতি তা ক্রমে ভাষার ছাঁচে যেমন ম্লান হয়ে আসে অমনি কবি তার সংস্কারগত বুদ্ধির তাপ দিয়ে তাকে অনেকটা সতেজ রাখবার চেষ্টা করেন, তাই সেগুলি পরবর্তী লাইনের মধ্যে থেকে বিস্তৃত হয় বটে কিন্তু তাতে আর সে গভীর ভাব থাকে না। কারিগরী, ভাষার বাঁধুনী, নীতি কথা, তত্ত্বজ্ঞান এ সব পাওয়া যায় প্রচুর কিন্তু আসলটা ফুরিয়ে যায়, বড় জোর সুরকে ভাষার সঙ্গে জোড়া হয় বলে কতকটা রেশ যেন থাকে মনে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে দু'লাইনই যথেষ্ট। ভাই, কেমন? কথাগুলো মনোমত হ'ল না বুঝি?

আমি হাসিয়া বলিলাম: হবে না কেন, কথা হয়ত ঐ বটে, তবে গানকে এত বড় করা এত বড় হ'ল কেন? তারও ত একটা উদ্দেশ্য আছে?

তিনি বলিলেন: হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ত আছেই। অনেকক্ষণ ধরে সুরের সঙ্গে বাক্য বা শব্দ-চাতুরী ভোগ করাও ত অনেকের উদ্দেশ্য থাকে কিনা? আরে ভাই, দেখতে পাও না, যারা যে জিনিষটা ভালোবাসে, তার কথা সে বেশী করে বলতে চায়, কেউ শুনুক বা না শুনুক। একটু সত্যের স্পর্শ বা আভাষ যে পেয়েছে তাকে যথাশক্তি প্রকাশ করেই তার সুখ। ভাষা দিয়ে তাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে যতটা বাড়াতে পারে সে চেষ্টার ত্রুটি হয় না। দুনিয়ার মানুষে বড় বেশী কথা কইতে ভালোবাসে, নয় কি? কোন একটি ভাবকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করতেই ত আমাদের জীবের মরণ ঘনিয়ে আসে। সময় কাটে কিসে, কি নিয়ে থাকা যায়, বল ত ভাই, হাঃ হাঃ—

এ এক প্রকার অদ্ভুত পাগল দেখিতেছি—

আমাদের কথা বেশ চলিতেছিল—এমন সময় দেখি পথের দিকে এক অপরূপ

ভৈরবী মূর্ত্তি; প্রৌঢ়া, রক্তাম্বরধরা ধীরে ধীরে আসিতেছেন। বাউল আমার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন; তাঁহার পিছনেই পথ, তার পরেই অনেকটা উঁচুনীচু জমি, গাছপালায়

পূর্ণ। তিনি দেখিতে পাইলেন না, যিনি আসিলেন তিনি একেবারেই বাউলের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অপূর্ব মূর্তিটি—দেখিলে আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিশেষত তাঁহার চক্ষু দুটি—এমন করুণা-মাখানো, চক্ষু আমি দেখি নাই। পথশ্রমে রক্তাভ মুখমণ্ডল, তাহাতে যেন জ্যোতির্ময়ী। সে মূর্তি মহাপাপিষ্ঠের প্রাণেও শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। আমি তাঁহার দিকে অবাক হইয়া চাহিলাম, বাউল বাবাজী আমার দৃষ্টির

অনুসরণ করিয়া পিছনে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলেন।

আঃ—মহেশ্বরী মায়ী! বলিয়া বাউল, বিস্ময়-আবেগে চীৎকার করিয়া পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। আমারও প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা হইয়াছিল, তার পর যেন ভক্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল, কিন্তু তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না। এখানে ঐটুকুই আমার গলদ হইয়া গেল। ভিতরে প্রশ্ন উঠিতে বিলম্ব হইল না যে, কেন আমি প্রণাম করিতে পারিলাম না।

তাহার উত্তর এই যে, ভৈরবী-সম্বন্ধে আমি যে ধারণা এতাবৎকাল পোষণ করিতেছিলাম তাহা মোটেই ভক্তির অনুকূল নয়। তান্ত্রিক সাধক এবং ভৈরবীদের উচ্চ স্তরের জীবন পবিত্র বলিয়া ধারণা এখনও আমার হয় নাই। আরও একটি গুহ্য ধারণা আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল যে, ভৈরবীরা এক শ্রেণীর ভ্রষ্টা নারী, সমাজে পতিতা, তান্ত্রিক সাধক ছাড়া আর কোনও সমাজে তাহাদের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। এ পর্য্যন্ত কোন ভৈরবীই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নাই। সেই কারণেই এই ভৈরবী আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না। তবে এই ভৈরবী হইতেই আমার পূর্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিতেছি।

দীর্ঘ প্রণামান্তে বাউল বাবাজী যখন উঠিলেন তখন ভৈরবী তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার কথায় যেন পূর্ববঙ্গের একটা টান ছিল যাহাতে বুঝিলাম তিনি সম্ভবত ও-দেশেরই মানুষ হইবেন। আমার দিকে লক্ষ্যও করিলেন না। তাঁহার গলার আওয়াজ কোমল বটে কিন্তু ক্ষীণ নারীসুলভ দুর্বল কণ্ঠ নয়। প্রত্যেক শব্দগুলি দৃঢ়, স্পষ্ট এবং পরিমিত। আমার জীবনে যত নারী দেখিয়াছি, দেশে-বিদেশে কোথাও এরূপ মাধুর্য্য এবং তেজস্বিতার একত্র সমাবেশ দেখি নাই। বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ভৈরবী সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করিতেছিলাম, অন্তরের মধ্যে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি কথা কহিতে কহিতে বক্রেশ্বর মন্দিরের দিকে চলিতে লাগিলেন, আর বোধ করি বাউলকেও তাঁহার মনের অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া চলিলেন। আমার মধ্যেও তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণের একটা আকর্ষণ অনুভব করিলাম কিন্তু আপাতত সেই ইচ্ছা দমন করিলাম। বাউল একবারও আমার অস্তিত্বের কথা বোধ হয় স্মরণে আনিতেও পারিলেন না। ক্ষণেক পূর্বে কত মতে কত আনন্দের কথা আমার সঙ্গে তাঁহার হইতেছিল, আমার সঙ্গে যেন তাঁহার সম্বন্ধ অনেকটা ঘণীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল,—সে সম্বন্ধে আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। ত্যাগী মানুষ যাঁরা, তাঁদের ত এ রকম সামাজিকতা, বাহ্য সৌজন্যের বন্ধন নাই, যা না হইলে আমাদের সভ্য-সমাজে চলে না। আমি কি মনে করিয়া বা কোন্ অধিকারে তাঁহার নিকট এটা দাবী করিতেছি তাহা নিজেও বুঝিতে পারিলাম না। একটু অভিমানের ধোঁয়া উঠিয়া আমাকে যেন বেশ কতকটা পীড়িত করিল। বাঃ, এ ত বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার, আমার জড়তা ত কম নয়, উহা এতটাই আমায় পাইয়া

বসিয়াছে যে প্রবাসে সাধুসঙ্গ করিতে আসিয়াও আমার তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই। মনের গোলমাল ক্রমে যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বাউল ও নবাগতা মহেশ্বরী ভৈরবী চোখের আড়াল হইবার পর উঠিব কি বসিব ভাবিতেছি,— এখন মন অনেকটা গ্লানিশূন্য বোধ হইতেছিল। পথের দিকে লক্ষ্য করিতে দেখি, আবার একজন আসিতেছেন। তিনি ভৈরব, লাল কাপড় তাঁরও, হাতে সরু ত্রিশূল আর একটি লাল কাপড়ের বুঁচকি। হন্ হন্ করিয়া সম্মুখেই আসিয়া পড়িলেন। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতেই তাঁহার মুখের দিকে দেখিতেছিলাম,—তিনিও আমার মুখের দিকে চাহিয়া তার পর একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন: মহেশ্বরী মা এদিকে গেছেন, আপনি দেখেছেন কি?

—হাঁ,—মন্দিরের দিকেই গেছেন, এইমাত্র দেখেছি।— শুনিয়া তিনিও সেই দিকে চলিয়া গেলেন।

আমারও আর বসিয়া থাকিতে হইল না। অল্পক্ষণ থাকিয়া উঠিলাম। সেখান হইতে বক্রেশ্বর মন্দিরে আসিতে পথে বাঁকের মুখে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ নজরে পড়ে। দেখিলাম, তাহার তলে ছায়ায় তিনটি মূর্তি। বুঝিলাম— বাউল আছেন, মহেশ্বরী আছেন আর এই মাত্র যিনি আসিলেন তিনিও আছেন। তাঁহাদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাশ কাটাইয়া মন্দিরের রাস্তা ধরিলাম।

একেবারে আপন আসনে আসিয়া পৌঁছিব এই ছিল অভিপ্রায়, কিন্তু যখন তাঁহাদের অতিক্রম করিতেছি প্রথমে মহেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তার পর তিনি বাউলের দিকে ফিরিয়া কি বলিলেন। তখন বাউল উঠিয়া আমার দিকে আসিতে আসিতে

গলা উচ্চ করিয়া বলিলেন: এই যে, এদিকে আসতে হবে যে একবার,—ও ভাই! তখন ঐদিকেই ফিরিতে হইল।

গিয়া দাঁড়াইতেই মহেশ্বরী ভৈরবী বলিলেন: এইমাত্র বাউলের কাছে তোমার কথা শুনলাম, যদি বিশেষ কিছু কাজ না থাকে ত আমাদের সঙ্গে একটু বসলে ক্ষতি কি? এখানে খণ্ড ভৈরব এসেছেন, এঁকে দেখলেও পূণ্য আছে। বলিয়া সেই নবাগত ভৈরবের দিকে দেখাইয়া দিলেন। পরিহাসের ভাবে যে কথাগুলি বলিলেন তা নয়, গম্ভীর ভাবেই বলিলেন। কিন্তু খণ্ড ভৈরব তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথাটা এই বলিয়া শেষ করিলেন যে, যদি দর্শনেই পূণ্য সঞ্চয় করতে চান, তাহলে এই মহেশ্বরী মাকে দেখলেই তা হবে; বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।

এখন এতটাই অপ্রস্তুত ছিলাম যে এ ক্ষেত্রে কি বলিব আর কি করিব কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ভৈরবীর দিকে জোড় হাতে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া একধারে বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরে ভৈরবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন: পূর্বাশ্রমের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে দোষ হবে কি?

বলিলাম: আমার পূর্বাপর একই আশ্রম, গৃহত্যাগও করিনি, সন্ন্যাসও গ্রহণ করিনি। আপনি যা খুসী জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

শুনিয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য হইলেন, পরে বলিলেন: তবে? এরকম করে তোমার ফকিরের মত থাকবার উদ্দেশ্য কি? বলিলাম: সাধুসঙ্গলাভ আর কি?

তিনি সহজে ছাড়িলেন না, বলিলেন: লাছমনঝোলা, হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ, নাসিক এসব বড় বড় সাধুসঙ্গের জায়গা ছেড়ে এখানে, এ রাজ্যে কেন?

তখন তন্ত্রমতের সাধুসঙ্গের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তাতে লাভ? উত্তরে বলিলাম: লোকসানের কথা আগেই খতিয়ে দেখে কি কেউ কারবার করে? লাভের কথাটা যে আগেই লোকে ধরে নেয়,—না? তার পর যা হয় তা শেষে বোঝা যায়। অন্তত এতে কিছু লোকসান হতে পারে আগে থেকে হিসেব করিনি!

তিনি বলিলেন: সেইটিই ত কাঁচা কাজ হয়েছে। পাকা বুদ্ধি যাদের তারা গোড়াতেই লাভ লোকসানটা ভালো রকম করেই খতিয়ে দেখে তবে কাজে নাবে।

—আমি ত বলেছি যে এ কাজে কোন প্রকার লোকসানের সম্ভাবনা থাকতে পারে সে ধারণা এখনও হয়নি।

তিনি: ঐটে না হওয়াতেই ত আমার বেশী ভয় হচ্চে, হয়ত লোকসানটা গুরুতর হতে পারে। অঘোরীর কাছে গিয়েছিলে ত শুনলুম,—না? স্বীকার করিয়া মাথা নাড়িলাম।

ভৈরবী বলিলেন: তিনি তোমায় এ বিষয়ে কিছু বলেন নি? তাঁর সাড়া পাওনি বুঝি?

—সাড়া হয় ত একটুখানি পেয়েছিলাম, তবে তাঁকে ত ইচ্ছামত পাওয়া যায় না, তাঁর নাগাল পাওয়া মুস্কিল।

ভৈরবী বলিলেন: তা হোলেই হবে, তাঁর কাছে যাওয়াটা রেখ, তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। ভয় পেয়ে যেন ছেড়ে দিও না,—ছেলেমানুষ কিনা তাই সাবধান করে দিচ্ছি।

—অবশ্য ভয় মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু তবুও যাই, কিন্তু গেলেই তাঁর কাছে বেশীক্ষণ থাকতে দেন না। ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেন। শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন: তাঁর ধমক খাওয়া আমাদের অদৃষ্টেও খুবই ঘটে,—আমরা খুব ভালোই জানি,—বলিয়া বাউল এবং খণ্ড ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া যেন জিজ্ঞাসুভাবে একটু হাসিলেন, তাঁহারাও হাসিয়া সায় দিলেন। ভৈরবী তার পর বলিলেন: উনি ইচ্ছে না করলে কেউ ওঁর কাছে বসতে পারবে না। উনি ইচ্ছাময় মহাশক্তিমান মানুষ। তবে ওঁর তাড়ানোর মধ্যেও একটি উদ্দেশ্য থাকে। ওঁর তাড়া খেলেও লাভ আছে।

বুঝিলাম,—আজই তাড়া খাইয়া মহৎ কিছু লাভ হইয়াছে। যাহা হউক শেষে তিনি বলিলেন: এই দেখ, ওঁর জন্যেই এত কষ্ট করে আমাদের আসা।

খণ্ড ভৈরব বলিলেন: ওঁর টান কারো সামলাবার সাধ্য নাই, এই দেখুন না—ওঁর টানেই আমরা কোথায় ছিলাম আর কোথায় এসে পড়েছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

খণ্ড ভৈরব বলিলেন: আমরা পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরেই ছিলাম, যেখানে মায়ের একটি আশ্রম আছে; সেইখান থেকেই আপাতত আসা হচ্চে।

তার পর খণ্ড ভৈরবের কথা,—এই লোকটির সংসর্গে আসিয়া একটি মহৎ লাভ হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহার কথা আরও একটু বলিব। ঐখানে বসিয়াই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন যে এখানে কতদিন থাকিব। জানাইলাম: তার ঠিক নাই, মন উঠিলেই চলিয়া যাইব। তাহাতে তিনি বলিলেন: আমরা এখানে চার দিন থাকব। অঘোরীর সঙ্গে দেখা হলে স্থির হবে—আরও আগে যাব কি না। এখান হতে আমরা কামরূপের কামাখ্যাপীঠে যাব,—সেখানে মহেশ্বরী মার কন্যার অভিষেক হবে। আমায় আরও বলিলেন: বক্রেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে আজ রাত্রে আমাদের চক্র বসবে। আপনি ত মন্দিরেই থাকেন? যদি আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাহলে সন্ধ্যার পর একবার অঘোরীর কাছে যাবেন, অনেক কিছুই দেখতে পাবেন। আপনার এ বিষয়ে

কৌতূহল আছে জেনেই বলছি।

মহেশ্বরী মাতা বলিলেন: ওঁর কি সে সব ভালো লাগবে? হয়ত বিপরীত ধর্ম, অনাচার, এ সব মনে হতে পারে।

বলিলাম: আমি ঐ সকল সাধনের উদ্দেশ্য জানতে ও দেখতেই ত এসেছি—যদি তন্ত্রোক্ত সাধনের প্রক্রিয়া আচার অনুষ্ঠান না দেখতে পাই তা হোলে এখানে আসা বৃথা হয়েছে বলেই মনে করব জানবেন।

হাসিয়া খণ্ড ভৈরব বলিলেন: সেসব আপনি সহজে দেখতে পাবেন না, তবে অঘোরীর কাছে যা দেখবেন তার কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁর কোন গুহ্য নাই, তিনি সিদ্ধযোগী।

২১

আশার চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সঙ্গে মনের মধ্যে একটু ভয়ও ছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই কেবলি নিজ স্থান হইতে বাহির হইতেছি—ইচ্ছা, এখনই চলিয়া যাই কিন্তু এতটা আগে যাইয়া কিছুই লাভ নাই ভাবিয়া আবার ভিতরে যাইয়া বসিতেছি। আসনে কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। আকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন; বাতাসও মাঝে মাঝে জোর চলিতেছে। যেন ঝড় বহিতেছে। এইরূপ জোর বাতাসের জন্যই বোধহয় বৃষ্টি নামিতে পারিতেছে না, না হইলে পৃথিবী ভাসাইত এমনই মেঘাড়ম্বর। মাঝে মাঝে বিজলী চমকাইতেছে। এসব দেখিয়া মনে আমার উদ্বেগের সীমা নাই। বুঝি আজ বাদল নামিয়া আমার উপর বাদ সাধে!

রাত্রি প্রথম প্রহর কোন রকমে শেষ হইবার পরেই আসন ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আর থাকা যায় না। এই আসনের রহস্য এখানে একটু বলিয়া রাখি।

যেকোনো ভাবের সাধন অবস্থায় আসনের তুল্য সহায় এবং মহাবন্ধু আর নাই। যে আসনে তোমার চিত্ত স্থির হইয়া, কোনও তত্ত্বে গভীর অভিনিবেশে সহায়তা করে, তত্ত্বদর্শন যে অবস্থায় সহজ হয়, সেই আসনের গুরুত্ব কতটা তাহা কাহাকেও বুঝাইতে কষ্ট হয় না। আসন একটি জীবন্ত সহায়, তোমার প্রাণের স্পর্শেই উহা জীবন্ত, যেন পৃথকভাবেই উহার শক্তি জাগ্রত হয়। যে আসনে বসিয়া তুমি দীর্ঘকাল কোনও ব্যাপারে সংযম অভ্যাস ধ্যান এবং ধারণা করিয়া থাক,—তোমার চৈতন্যের সঙ্গে তাহার ওতপ্রোত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া যায়। তাহার সংসর্গে আসিলেই তোমার চিত্তক্ষেত্র সহজেই স্থির ও সমাহিত হইয়া, লক্ষ্যে একাগ্র হইয়া ধ্যানের পথে প্রসারিত হয়। এমনই যে আসনের গুণ তাহার গৌরব এবং পবিত্রতার কথা আর বেশী কি বলিব, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসনই সাধকের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু। এই আসন হইতে তাহার সিদ্ধি, ঋদ্ধি, কেবল আনন্দ লাভের অবস্থা

হয়। মোট কথা, সাধকের যাহা কিছু উচ্চ অবস্থা সবই এই আসনের গুণে হয়। যদি কোন বিশেষ স্থলে, বাহ্যভাবের তরঙ্গে অন্তর ক্ষেত্র চঞ্চল থাকে তবে আসনে বসিলে উহা স্থির হয়, শান্ত হয়, আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এই জাগ্রত আসনের আর একটি বিশেষত্ব আছে। সেটি বলিবার জন্যই এতটা কথা প্রথমে বলা,—সেটি এই যে, যদি কোনও উৎকট আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে থাকে, যাহা কর্ম ব্যতীত কখনই শান্ত হইবার নয়, তবে, সেই অবস্থায় তোমার আসন কিছুতেই তোমায় তাহার উপর স্থির হইতে দিবে না, অর্থাৎ তোমার আত্ম-চৈতন্য সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য মনকে নিরন্তর স্থানান্তরে, কর্মান্তরে যাইতে প্রবুদ্ধ করিবে। যতক্ষণ না তাহার শেষ হয় ততক্ষণ কিছুতেই তুমি আর আসনে বসিয়া শান্ত হইতে পারিবে না। ঠিক এই কারণেই আজ আমি আসনে স্থির হইতে পারিতেছিলাম না, কেবলই শ্মশানক্ষেত্রে ভৈরবীচক্র দেখিতে প্রাণ ছুটিতেছে। আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। যতবার মনকে বাহ্য বিষয় হইতে কুড়াইয়া নিজ ভাবে আনিবার চেষ্টা করিতেছি ততবারই তাহা নিষ্ফল হইতেছে, কাজেই এখন প্রবৃত্তির গতি ধরিয়াই চলিতে হইল, নিরুপায় হইয়াই বাহির হইলাম।

আন্দাজ রাত্র প্রথম প্রহর এখন সবে উত্তীর্ণ হইয়াছে বা হয় নাই, ভাবিলাম এখন শ্মশানে ত যাইব না, কালীবাড়িতে পুণ্ডরীকের কাছে গিয়া কতক্ষণ কাটাইয়া দিব, পরে গুটি-গুটি শ্মশানের দিকে যাওয়া যাইবে।

শ্মশানের দিকে চাহিতে-চাহিতে কালীবাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছি, দেখিলাম সেথায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই, চারিদিকেই ঘোর অন্ধকার। দূরে অঘোরীর কুটীরও অন্ধকারে মিশিয়া রহিয়াছে, কোথাও আলোর ফোঁটাটি মাত্র নাই। দেখিতে দেখিতে কালীবড়িতে ঢুকিয়া পড়িলাম। পুণ্ডরীক একটি হ্যারিকেনের সম্মুখে খাতা পত্র লইয়া বসিয়া আছে, হাতে নস্যাধার একটি শামুক। আমাকে দেখিয়া নস্যদানীটি আগাইয়া দিয়া বলিল: আজ এত রাত্রে এখানে কি মনে করে,—হঠাৎ এমন ভাবে আবির্ভাবের কারণটা কি, জানতে পারি?

আমি বলিলাম: এত রাত্রি কোথায়? এখনও যে প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়নি,—আচ্ছা, আজ তোমাদের শ্মশানে কোন সাড়া শব্দ নাই কেন বল দেখি?

পুণ্ডরীক আপন কাজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল: আজ যে সেখানে খুব ধুম লেগেছে,—খানিক আগে সিদ্ধ করালী তাঁর ভৈরবী নিয়ে গেলেন,—বিকালে মহেশ্বরী মা এসেছেন, খণ্ড ভৈরব এসেছেন, আরও কে কে এসেছেন—সকলকে ত জানি না। আজ যে অঘোরী বাবার দরবারে চক্র বসেছে।—মহা উৎসবের ব্যাপার!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: উৎসবে এত অন্ধকার কেন?

পুণ্ডরীক: জানেন ত, তান্ত্রিকদের ইষ্টগোষ্ঠী অন্ধকারেই হয়ে থাকে। ওদের সবই ত গুহ্য ব্যাপার।

আরও একটু জিজ্ঞাসা করিলাম: আচ্ছা তুমি কি কখনও কোন চক্রে উপস্থিত ছিলে?

পুণ্ডরীক: না, বাইরে থেকেই যা কিছু শুনেছি, চক্রের মধ্যে কখনও ঢুকি নি। আমার ভালোই লাগে না ওসব। ওদের ভণ্ডামো, যথেচ্ছাচার আমার ভালো লাগে না। ওরা আবার কি ক'রে যে ওই সব কর্ম্মগুলোকে ধর্ম্ম বলে তা বুঝতে পারি না। ওদের সবই বজ্জাতি। মেয়েমানুষ নিয়ে আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনা। ছি–

–আচ্ছা, অঘোরীকে কি মনে হয় তোমার?

–ঐ লোকটার কথা আলাদা।

–অঘোরীর আবার তন্ত্রের মধ্যে যাওয়া কেন বল দেখি? আমি ত বুঝতে পারি না কেন তিনি তান্ত্রিকদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা রাখেন।

–আমি শুনেছি যে উনি তন্ত্রের সাধনেই সিদ্ধ হয়েছেন। এখন উনি কোন একটি বিশেষ ভাবের সাধনে বদ্ধ নন। ওঁর অবস্থা এখন খুবই উচ্চ একথা ত সকলেই বলে। আমি মোটে এই ত এখানে মাস দুয়েক এসেছি, এক ভাবেই ওঁকে দেখছি। কিন্তু কখনও ওঁর কাছে গিয়ে সাহস করে বসতে পারলুম না।

–কেন বল দেখি?

–কেমন একটা ভয় আসে। একবার প্রথম-প্রথম একটু ভরসা করে এগিয়ে গিয়েছিলাম। একখানা কাঠ নিয়ে এমন তাড়া করলেন,–দে ছুট্। আর সেই থেকে কাছে যাবার চেষ্টা করি নি, দূর থেকেই নমস্কার করি। তবে আমাদের বোদে পাগলা (বৈদ্যনাথ) ওঁর খুব ভক্ত। তার কাছ থেকেই ওঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই।

এখানেও আর কতক্ষণ থাকা যায়?–আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। সুতরাং পুণ্ডরীকাক্ষ যখন বলিল,–আপনি এখন এইখানেই থাকবেন কি?–ঘুমে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে–তখন আমি সুযোগ বুঝিয়া সেখান হইতে উঠিলাম। পুণ্ডরীকাক্ষ তৎক্ষণাৎ মশারী খাটাইল।

বাহিরে আসিয়া আমি শ্মশানের পথ ধরিলাম। গাঢ় অন্ধকার, কোলের মানুষও বুঝি দেখা যায় না। মাঝে মাঝে চিক্কুর হানিতেছে,–একে রাত্রি তাহাতে আকাশ কালো, একটিও তারা নাই। পাপহরা পার হইয়া শ্মশানে যখন পা দিলাম তখন গা-টা ছম্ছম্ করিয়া উঠিল। ভিতরে একটু ভয় যে হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। চলিতে লাগিলাম,–অঘোরীর ঘর পানেই যাইতেছি,–দূরে যেন মৃদু-মৃদু মানুষের গলার আওয়াজ পাইলাম। অঘোরীর ঘর অবধিও যাইতে হইল না, মধ্যপথে দেখিলাম,–কতকটা জমি জুড়িয়া সারি-সারি কয়েকটি মূর্তি বসিয়া আছে। ছয় সাত জন হইবে। কাহাকেও ত চিনিবার জো নাই, তবে তাঁহারা যে চক্রাকারে বসিয়া আছেন তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। মানুষ দেখিয়া অন্তরের সঙ্কোচ বা ভয় আর কিছুমাত্র রহিল না। তাহার পরিবর্তে সাহস এবং হৃদয়ে বল আসিয়া আমাকে

শক্তিমান করিয়া দিল। এখন, আমি কি ভাবে এখানে স্থান করিয়া লইব তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। আমি যে সেখানে একজন বাহিরের লোক, গোপনে, আসিয়াছি,—তাহা ত ভুলিবার নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, যাঁহারা বসিয়াছিলেন, আমার উপস্থিতির ব্যাপারটি তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিলেন কি না তাহা বুঝিতে পারিলাম না, বা তাঁহারাও লক্ষণে কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখাইলেন না। আমি তাহাতে প্রথমে একটু বিমনা হইলেও শেষে সাহস পাইলাম। কিন্তু কোথায় যে আমার স্থান করিয়া লইব সেটা ভাবিতেও কতকটা সময় গেল। আমি বুঝিলাম, এই নির্বাক সাধকের দলে আমি কোন বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করি নাই। তাঁহাদের চক্র হইতে সাত আট হাত দূরে একটু উচ্চ স্থান দেখিয়া ছোট-ছোট কতকগুলি গাছের ধারে নিজ স্থান ঠিক করিয়া লইলাম এবং নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। যখন আমি বসিলাম—দেখিলাম, অঘোরীর ঘরের দিক হইতে একটি ভারি জিনিস দুই হাতে ধরিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখানে আসিয়া স্থির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকাইল, তাহাতে সে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে এক স্থানে তাহার হস্তধৃত ভারি সামগ্রীটি নামাইয়া রাখিল। সেই ক্ষণপ্রভার আলোতে দেখিলাম চক্রের স্থানটি পরিষ্কৃত, যেন কেহ পূর্বেই উহা সযত্নে মার্জিত করিয়া রাখিয়াছে। একটা ধুনুচিতে ধুনো পুড়িতেছে। ধূপ ও ধুনার গন্ধ বাহির হইতেছে। চক্রের মধ্যে অঘোরী বাবা নাই। যিনি অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সে ব্যক্তি অপর কেহ নয় আমাদের ভুলো ডোম, মদের কলস অর্থাৎ কারণপাত্র আনিয়াছে। সে এই বিদ্যুতের আলোকে একটি স্থান ঠিক করিয়া উহা নামাইয়া রাখিল এবং কিছু দূরে গিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া পড়িল।

এই বিদ্যুৎ-জ্যোতির সুযোগে আমি যেমন উপস্থিত এখানকার সকলকে অস্পষ্ট -ভাবে দেখিলাম, তাঁরাও আমার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেন কি না তাহা কিন্তু বুঝা গেল না। সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস চালাইতেছে, তাহার গোঁ গোঁ শব্দ এই শ্মশানক্ষেত্রের সঙ্গে খুব সুন্দর খাপ খাইয়া স্থান-মাহাত্ম্য বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে।

যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা যে অলসভাবেই বসিয়া আছেন তাহা ঠিক নয়,—আমার বোধ হইল তাঁহারা স্থির আসনে কোনও কর্মে রত আছেন। সে কর্মটি জপ। অনুমান করিলাম যে, আসনে কর্ম আরম্ভ এই মাত্র হইয়াছে। অঘোরী বাবারই অভাব, তিনি কোথায়? এখানে সকলেই কর্মী, কেবলমাত্র আমিই দ্রষ্টা।

অন্ধকারে ক্রমশ একটু একটু নজর হইতে লাগিল, অবশ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার ছাড়া মোটামুটি এক রকম দেখা যাইতেছে। দেখিতেছি—আমার সম্মুখে, অবশ্য প্রায় দশ বারো হাত দূরে—খণ্ড ভৈরব, বামে মহেশ্বরী মাতা ভৈরবী, তাঁর পাশে সহজিয়া বাবাজী কতকটা তফাতে বসিয়াছেন। প্রায় দুই তিন হাত পরে সিদ্ধ করালীর আসন,

বামে তাঁর নবীনা ভৈরবী, তাঁর পাশে অনেক কিছু উপকরণ সম্ভার, তাহার মধ্যে ভুলোর আনীত কারণ-কলসটিও রাখা আছে। তার পর কতকটা স্থান ফাঁকা, আসন পাতা আছে বটে কিন্তু শূন্য। তার পর একজন অপরিচিত ভৈরব ও তাঁহার ভৈরবী,—তার পর একটু তফাতে ভুলো বসিয়াছে। উবু হইয়া হাত দুটি ধরা। এই ভাবে চক্র বসিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে এক একটি কপালমাত্র এবং এক একটি তাম্রকুণ্ড রাখা আছে বোধ হইল।

আমি আসিবার পর প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে। এই সময়টুকুতে স্থান-মাহাত্ম্যের অনুভূতি বেশ স্পষ্টতর হইতেছে। বিশেষত যখন বাতাসের বেগ একটু কম হইতেছে অথবা একেবারেই বন্ধ হইতেছে, পালে-পালে মশা আসিয়া সর্বাঙ্গে আক্রমণ করিতেছে, তখনই এটি বিশেষভাবেই জানাইয়া দিতেছে। কি জানি কেমন করিয়া ইঁহারা স্থির আছেন। যাহা হউক ক্রমে দেখিলাম একদিক হইতে একটি বিরাট মূর্তি আসিয়া তখন ভুলোর কাছে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভুলোও দাঁড়াইল। আসনস্থ ভৈরব ভৈরবীগণ নিজ নিজ স্থান হইতে মস্তক নত করিলেন। ভুলো দণ্ডবৎ হইল। আমার বুকটি ধুক্-ধুক্ করিয়া উঠিল। অঘোরী বাবা আসিলেন,—আমার উপস্থিতি তাঁহার নিকট কি ভাবে গৃহীত হইবে! আমায় রাখিবেন কিম্বা তাড়াইবেন, সেই ভয়ে ও উদ্বেগে মরিতে লগিলাম। কেমন করিয়া এখানে শেষ অবধি স্থান পাইব বা সব কিছু দেখিতে পাইব। ভয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার ইচ্ছায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম,—এমনই সময়ে আবার বিজলী হানিল। আমার সম্মুখে প্রায় বুক অবধি একটি ছোট ঝোপ, বুঝিতে পারিলাম না ঠিক আমায় তিনি দেখিলেন কি না! কিন্তু আমি তাঁহার যে মূর্তি দেখিলাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। শরীরটি তাঁর মুক্ত, উলঙ্গ, সম্পূর্ণই দিগম্বর। মুখমণ্ডল শান্ত, অপলক নেত্র। একখানা গুলবাঘের ছাল সেই শূন্য আসনে পাতা ছিল, বাউল বাবাজী উঠিয়া তাঁহার হাতটি ধরিয়া সেই দিকে ধীরে ধীরে লইয়া গেলেন এবং আসনে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তখন আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। পূর্বে বিশেষ লক্ষ্য করি নাই, এখন দেখিলাম, সকলের গায়েই একখানি রক্তাম্বর জড়ানো, বোধ হয় মশার জন্যই,—না হইলে বাকী সকলেই উলঙ্গ।

অঘোরী যখন আসনে দাঁড়াইলেন তখন মহেশ্বরী মাতা গায়ের বস্ত্রখানি ত্যাগ করিয়া হাতে উপকরণপূর্ণ একটি পাত্র লইয়া অঘোরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে পাত্রটি নীচে রাখিয়া প্রথমে প্রণাম এবং তার পর পাত্র কিছু উপকরণ তুলিয়া পাদপূজা করিলেন। অনুমানেই এসব বুঝিলাম, উপকরণ প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। বরণের মতই একটি অনুষ্ঠান হইল এটুকু মাত্র বুঝা গেল। যাঁহাকে বরণ করা হইল তিনি অচলের মতই স্থির নির্বিকার। চারিদিক নিস্তব্ধ, অনির্বচনীয় গাম্ভীর্য্য সেথায় বিরাজিত। যাহা হউক বরণের কাজটি হইয়া গেলে অস্ফুট স্বরে

ভৈরবী কি একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহার মধ্যে পিতৃ-সম্বোধনটি মাত্র শুনিলাম। তাহাতে অঘোরী আসনেই বসিলেন। তার পর, এইবার ভৈরবী অঘোরীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, স্থির পুত্তলিকার মতই অপূর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি এখন অনেকটাই নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয় আছে যদি হঠাৎ অন্য কারণ উপস্থিত হয় যাহাতে আমাকে তাড়িত হইতে হয়। যেহেতু আমি তাঁহার ঠিক পশ্চাতেই রহিয়াছি—মধ্যে কতটা ব্যবধান।

যাহা হউক আমি দেখিতে লাগিলাম,—অঘোরী পাত্র-মধ্য হইতে উপকরণ লইয়া প্রথমে ভৈরবীর চরণপূজা করিলেন, তার পর মধ্যদেশে, তার পর বক্ষে, পরে কণ্ঠে, ললাটে স্পর্শ করিয়া পূজা চলিতে লাগিল। ভৈরবী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, অঘোরী তাঁহাকে পূজা করিলেন। তারপর (এমন সময় আর একবার বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল) দেখিলাম, তিনি পার্শ্বস্থ আধার হইতে, খুব সম্ভব চন্দন হইবে,—হস্তে লইলেন এবং প্রথমে চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যদেশে, পরে হৃদয়ে, শেষে ললাট পর্য্যন্ত অনুলেপন করিলেন। তার পর তিনি স্থির হইয়া নিজ আসনে কতক্ষণ ধ্যানস্থ রহিলেন।

যতক্ষণ তিনি স্থির রহিলেন ততক্ষণ আর কাহারও কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখা গেল না, সকলেই এই ভাবেই স্থির হইয়া রহিলেন—এই ভাবে অনেকক্ষণ গেল। আশ্চর্য্য এইটুকু দেখিলাম, গায়ে চাদর থাকা সত্ত্বেও মশক-দংশনে মধ্যে মধ্যে আমাকে নিতান্তই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, অঘোরী বা মহেশ্বরী ইঁহারা ত সম্পূর্ণই উলঙ্গ ছিলেন, কিন্তু শ্মশানের এই ভয়ঙ্কর মশক-দংশনের জ্বালা যে তাঁহারা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হইল না। আমার গায়ে মশা, যেটুকু ফাঁক পাইতেছে তাহার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে জ্বালাইয়া মারিতেছে। কিন্তু আমার সম্মুখেই দুটি মূর্তি রহিয়াছে, তাহাদের কোরও প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। দুটি প্রস্তর মূর্তির মতই ইঁহারা স্থির হইয়া আছেন। অল্পক্ষণ নয়, অনেকক্ষণই নিজ ভাবে সমাহিত। ইহা কি বাস্তবিকই অদ্ভুত ব্যাপার নয়? ইহা সত্য যে মুক্ত স্থানে সাধনের এই মহা বিঘ্ন, এই মশকের দৌরাত্ম্যে আমার ওখানে বসাই অসম্ভব হইত যদি-না পবনদেব মধ্যে মধ্যে প্রবল ভাবে তাহাদের তাড়না না করিতেন। প্রথম শত্রু মশা, তার পর শেষের দিকে পিপীলিকার উৎপাতও কম হয় নাই। তাহারা বাহির হইতে কাপড়ের উপর আবার কেহ ভিতরে প্রবেশ করিয়া কামড়ের উপর কামড়ে জর্জরিত করিতে লাগিল। আমায় অম্লানবদনে সব-কিছুই সহ্য করিতে হইল, যতক্ষণ না আমি সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিলাম। যাহা হউক অনেকক্ষণ পর কিন্তু আমি ক্রমশ শরীরের অনুভূতি হারাইতে লাগিলাম। যদিও আমার কোনও আসন ছিল না তথাপি আমি অল্প-পরিসর তৃণ-আচ্ছাদিত সমতল স্থান পাইয়াছিলাম।

এইবার বুঝিতে পারিলাম কেমন করিয়া সাধকেরা এই সব মশা-কামড়ের

অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সফল করেন। তোমার চৈতন্য যতক্ষণ দেহগত ততক্ষণই দেহের দুঃখ ও সুখের বোধ স্পষ্ট, জীবন্ত থাকিবে, যদি ঐ চৈতন্যকে কোনও একটি দেহাতিরিক্ত বিষয়ে সমাহিত করিতে পার তাহা হইলেই দেহের সকল আপদ চুকিবে; দেহের কোন প্রকার অস্বস্তি অনুভব হইবে না।

ঐখানকার ব্যাপারে অঘোরীর তন্ময়তার উপর আমার ঐকান্তিক লক্ষ্য থাকায়, তাঁর অনুগ্রহেই খুব সম্ভব আমার দেহবোধ আর রহিল না, অনেক কিছুই হজম করিবার শক্তি লাভ করিলাম।

যাহা হউক আমি এখন নির্বিঘ্নে দেখিতে লাগিলাম। অঘোরী অনেকক্ষণ পর দু'বাহু প্রসারিত করিলেন এবং ভৈরবীকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কোলে বসাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। দৃশ্যটি হইল ঠিক হরপার্বতী ছবির মত—অপূর্ব। এই অন্ধকারের মধ্যে পবিত্র এবং মধুর ভাব-রসের এই চিত্রটি সকলের প্রাণে একটি নিষ্কাম, শুদ্ধ এবং স্থির সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাব বিস্তার করিল। তার পর অঘোরী এবং ভৈরবী ব্যতীত সকলেই সমস্বরে কয় ছত্র মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। তার পর খণ্ড ভৈরব যেখানে ভুলো বসিয়াছিল তাহার দিকে ফিরিয়া তাহাকে কিছু বলিলেন। সে ব্যক্তি উঠিয়া সেই কারণের কলসটি আনিয়া অঘোরীর সম্মুখে রক্ষা করিল। কিন্ত তাঁহার বাহ্য চৈতন্যের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কোলে ভৈরবীকে লওয়া অবধি আমি একলক্ষ্যে তাঁহার দিকেই চাহিয়াছিলাম, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার কোন প্রকার চাঞ্চল্য দেখিতে পাইলাম না, ভৈরবীরও সেই অবস্থা।

কিন্তু আর ত কাহারও সে অবস্থা নয়। কাজেই তাঁহারা অনেকক্ষণই অপেক্ষা করিলেন, তার পর খণ্ড ভৈরব আর-আর সকলের অনুমতি লইয়া যন্ত্রের মধ্যেই কারণ শোধন করিয়া ভৈরবী ও অঘোরীর প্রতি উৎসর্গ করিলেন। আশ্চর্য্য, এই চক্রের অন্যান্য সাধকবৃন্দ তখন কপালপাত্রস্থ কারণ অঘোরীর মুখের কাছে ধরিলেন। অল্প কিছুক্ষণ ধরিয়াও তাঁহার বাহ্য জ্ঞানের কোন চিহ্ন না দেখিয়া মৃদুস্বরে কানের কাছে কিছু বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন। আমি ইহা দূষ্য মনে করিলাম। আমার ধারণা এইরূপ তিনি যে-আনন্দ উপভোগ করিতেছেন অন্তরক্ষেত্রে, এই কারণ তাহার কাছে কিছুই নয়, সুতরাং এইরূপ আনন্দময় অবস্থায় তাঁহাকে উপাসনার মাত্র বাহ্য নিয়ম রক্ষার জন্য বিরক্ত করা কি ন্যায়ানুগ কর্ম?—কিন্তু চক্রমধ্যে আর কাহারও ত সে অবস্থা হয় নাই, তাঁহাদের মধ্যে মদের নেশার আকর্ষণটি কিছু বেশী, এমন কি অধৈর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। বাউল বাবাজী কেবল ইঁহাদের মধ্যে অচঞ্চল আছেন।

যাহা হউক ক্রমে অঘোরীর বাহ্য চৈতন্যের লক্ষণ দেখা গেল। তিনি নিজ হস্তে পাত্র লইলেন, ভৈরবীর মুখের নিকট ধরিলেন, তার পর নিজে পান করিলেন। এটি হইল নিয়ম-রক্ষা।

এইবার সিদ্ধ করালী ভৈরবের পালা। তাঁহার ভৈরবীও গায়ের আচ্ছাদন ত্যাগ

করিয়া তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রথমে করালী ভৈরব তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা, গন্ধানুলেপন শেষ হইলে সেইমত ধ্যান চলিল প্রায় আধ ঘণ্টা। কেন বলিতে পারি না, সম্ভবত মশার তাড়নায় হইবে– ভৈরবী মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। তার পর ধ্যানশেষে ভৈরব ভৈরবীকে কোলে লইয়া বসিলেন। কারণ-পাত্র পূর্ণ করিয়া ভৈরবীকে কতকটা পান করাইয়া নিজে অবশিষ্টাংশ পান করিলেন। আমার পরিচিতের মধ্যে বাউল বাবাজী দেখিলাম কারণ-পাত্র হইতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ললাটে ধারণ করিরেন। পান করিলেন না বা তাঁহার পৃথক পাত্রও ছিল না। তার পর অপরিচিত ভৈরব ভৈরবীর সেইমত পূজা, ধ্যান, গন্ধানুলেপন, শেষে কারণ পান চলিল। শেষে ভুলো হাত বাড়াইয়া কারণ-প্রসাদ গ্রহণ করিল তাহাও দেখিলাম। তিন তিনবার কারণ-পাত্র সেই চক্র প্রদক্ষিণ করিল। শেষে কলসটি অঘোরীর সম্মুখে ধরা হইল। তখন তিনি উহার কানা এক হস্তে ধারণ করিয়া গলায় ঢালিতে সুরু করিলেন, এবং সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইলে তখন রাখিয়া দিলেন।

তার পর অন্য পাত্র আসিল। খুব সম্ভব মৎস্য মাংসাদি আহার চলিল। ভোজনের পদ্ধতি অপূর্ব। প্রত্যেক ভৈরব ভৈরবীর মুখে প্রথমে আহার তুলিয়া দিলেন, তার পর ভৈরবী আবার ভৈরবের মুখে তুলিয়া দিলেন; সেই ক্ষেত্রে খাওয়ার ব্যাপারে যে আনন্দ চলিতে লাগিল তাহা আর বলিবার নয়। আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

২২

একটা মত্ততা আসিয়া সকলকেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে দেখিতেছি। এই মত্ত অবস্থাতেই মুদ্রার প্রক্রিয়া চলিতেছে। কেবল নড়াচড়াটুকুই দেখিতে পাইতেছি, বিশেষ কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। কেবল বাউল বাবাজী, অঘোরী ও মহেশ্বরী ভৈরবীর স্বতন্ত্র অবস্থা। কারণ-পূজার পর হইতেই সেই যে ভৈরবী অঘোরীর কোলে বসিয়া আছে,– তার পর মৎস মাংসাদি গ্রহণ, ভোজন পূর্ণমাত্রায় চক্রের মধ্যে চলিয়াছে, স্ফূর্তির মধ্যে ক্রমে চাঞ্চল্য, একটি উম্মাদনার ভাব অন্যান্য সকলের মধ্যে দেখা যাইতেছে, কিন্তু এ সকলের মধ্যে তাঁহারা উভয়েই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তাঁরা সুসংযত, নির্বিকার, স্থির এবং আত্মস্থ। যেন একটি প্রস্তরনির্মিত হর-পার্বতী,–এই বিগ্রহের সম্মুখে, আসবপানে উন্মত্ত কয়েকজন মানুষ ভোগের বিষয় লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। কাহারও সেই অপূর্ব সমাহিত মূর্তির দিকে লক্ষ্য নাই, নিজ নিজ বিষয় লইয়াই সকলে উন্মত্ত। এমন সময় হঠাৎ একবার চিক্কুরের চিকিমিকির আবির্ভাব হইল। সেই ক্ষণেকের জ্যোতিই, একীভূত ঐ দেবমূর্তি দুটিকে যেন বিশেষরূপেই প্রকট করিয়া দিল, সকলের দৃষ্টির সম্মুখে উহা জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাহার ফলও হইল

অপ্রত্যাশিত রূপে চমৎকার। উলঙ্গ ভৈরব ভৈরবীগণের পান ভোজনের উল্লাস, কে জানে উহার গতি কোন্ দিকে ছিল,—ঐ পবিত্র যুক্ত মূর্তির প্রতি লক্ষ্যমাত্রেই সঙ্গে সঙ্গে সকলের চাঞ্চল্য কোথায় মিলাইয়া গেল এবং সকলের দৃষ্টি ঐ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইয়া রহিল। ফলে তাঁহাদের দেহও যেন স্পন্দনরহিত, এরূপ বোধ হইল। আসরের স্ফূর্তি, উত্তেজনা ত সকলের অন্তর হইতে নিভিয়া গেলই পরন্তু সকলেই যেন প্রস্তর মূর্তির অবস্থা পাইলেন। স্থির, শান্ত এবং সমাহিত।

কি অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়া গেল এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে। তবে উহা বহুক্ষণ রহিল না। ক্রমে দেখিলাম, অঘোরীর বাহ্যজ্ঞান হইল, তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তটি ভৈরবীর দেহ হইতে সরাইয়া প্রথমে মাটিতে, পরে আবার নিজ জানুতে রাখিলেন—মহেশ্বরী তখনও স্থির। তার পর তিনি আবার কিছুক্ষণের জন্য স্থির রহিলেন। এদিকে চক্রের অন্যান্য সকলে এতক্ষণ তাঁহাদের দিকে বোধ হয় স্থির অপলক দৃষ্টিতেই চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার এই হাতটি নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই যেন বাহ্যজ্ঞান হইল। তাঁহাদের মধ্যে যেন সাড়া দেখিলাম।

বাউল বাবাজীর কথা একটু বলিব। তিনি ত মদ্য স্পর্শমাত্র করিলেন,—কিন্তু মাংস মৎস্যাদি যে কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে যখন সকলকে চঞ্চল, মদ্য পানের ফলে মত্ত ও বিহ্বল দেখিয়াছি তখন তিনি স্থির শান্তই ছিলেন। তিনি ভিন্ন মার্গের সাধক, কেন যে এ দলে যোগ দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে কথা পরেই বলিব।

এখানের তিনি আর ভুলো এই দু'জন মাত্র ভৈরবী-বিহীন,—আর ত সকলের পাশেই ভৈরবী দেখিতেছি। প্রসাদ, সকল রকমই ভুলো পাইল, সকলের সঙ্গে সমান ভাবেই নিজ অংশ গ্রহণ করিল, এ হিসাবে তান্ত্রিকদের কস্‌মোলিট্ বলা যাইতে পারে। উদার ভাবেই তাঁরা সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেন। শিবের সংস্পর্শে যত কিছু কর্মের উদ্ভব হইয়াছে সকলগুলিই উদার, সর্বপ্রকার জাতি ও সমাজগত সঙ্কীর্ণতা-শূন্য। এ ব্যাপারটা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্থানান্তরে উহার আলোচনা করিব।

এখন এই বাবাজীর কথা যাহা বলিতেছিলাম,—এদিকে যখন সকলে কারণ-প্রভাবে সুখোল্লাসে উন্মত্ত, তখন আমি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিতেছিলাম, বাউল বাবাজী নিজ আসনে স্থির হইয়াই বসিয়াছিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে বামে ও দক্ষিণে একটু হেলিতে লাগিলেন, তার পর রীতিমত বড় ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দুই পার্শ্বে দুলিতে লাগিলেন। আর কোনও ভাব নাই, কেবল তাহাই চলিতে লাগিল যতক্ষণ না উপরি উক্ত ব্যাপারটি সম্পন্ন হইল। যখন অঘোরী মহেশ্বরীকে কোলে লইয়া স্থিরসুখাসনে আসীন, অন্যান্য ভৈরব ভৈরবী মৎস্য মাংসাদি ভোজনের পর মুদ্রা প্রক্রিয়ায় মত্ত, তখনও সারাক্ষণ বাউল বাবাজী সুখাসনে ঐরূপ দুলিতেছিলেন, তার

পর বিদ্যুৎ চমকের ফলে সকলের অঘোরীকে লক্ষ্য এবং স্থির হইয়া কতক্ষণের জন্য তন্ময় ভাবে স্থিতি, তার পর বিচ্যুতি পর্য্যন্ত বাউল বাবাজীর দোল খাওয়া চলিতেছিল, শেষে এখন তিনি একেবারে স্থির হইয়া গেলেন, আর নড়াচড়া নাই। যেন সমাধিস্থ যোগী,—কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান নাই। মেরুদণ্ড একেবারেই সোজা, নিস্পন্দ শরীর, তিনি এইভাবে অনেকক্ষণ ছিলেন।

আমার মনের অবস্থাও পরিবর্তন হইয়াছে। আমি যে তান্ত্রিকদের সাধন দেখিতে আসিয়াছি তাহা আর আমার মনে নাই। আমি কি দেখিতেছি বোধ হয় আমার সে জ্ঞানও এক একবার লোপ পাইতে লাগিত। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনার ফলেই কেমন যেমন স্মৃতি লোপ পাইতে লাগিল। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনার ফলেই কেমন যেন স্মৃতি লোপ পাইতে লাগিল। মনে কর ঘোর অন্ধকার, মেঘাবৃত আকাশে একটিও তারার বিন্দু দেখা যাইতেছে না, কোন প্রকার আলোকের সংশ্রব নাই, তথাপি আমি মানুষগুলির নড়া-চড়া দেখিতে পাইতেছি। দুটি চক্ষুর কতটা শক্তি অতিরিক্ত অপচয় হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চমকের সঙ্গে সঙ্গে যদিও কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম তাহারও ফল এমন কিছু হয় নাই। দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ অন্ধকার করিয়া আরও খানিকক্ষণ অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়। তার পর আবার সেই অন্ধকারের প্রভা চক্ষুতে অভ্যস্ত হইতে আরও কতক্ষণ চলিয়া যায়। যাহা হউক, এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। প্রথম হইতে আমি এ চক্রের মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা অবধি দেখিলাম। মুদ্রার মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারি নাই। কিন্তু বাহ্য কর্মেন্দ্রিয়াদির প্রেরণা দেখিয়া আমার ধারণা হইল, মুদ্রা প্রকরণ মৈথুনের পূর্বাবস্থা। নানা ভঙ্গিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা। তাহার মধ্যে প্রথমে শিবপূজায় ব্যবহৃত কতকগুলি পরিচিত মুদ্রাও আছে। আমার তখনকার মনের অবস্থায়, সেগুলির খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য করিতেও পারি নাই বা বিশেষ আকর্ষণও অনুভব করি নাই। সে বিষয়ে আমার মনোযোগী না হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে, চক্রমধ্যে যখন মুদ্রা-প্রকরণ অনুষ্ঠিত হইতেছিল আমার মন তখন অধিকাংশ কালই অঘোরীর প্রতি নিবিষ্ট ছিল। তবে তাহার মধ্যেও যেটুকু দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

সুস্থ শরীর, সুস্থ মন যেমন পূর্ণ যৌবনের স্বাভাবিক পরিণতি, এই মুদ্রা-প্রকরণও সেইরূপ যৌন-ক্রিয়ার সহজাত পূর্ব সংস্কার। মদ্য, মাংস, মৎস ইত্যাদির পঞ্চ-মকার সাধনের পূর্ণ পরিণত অবস্থাই মুদ্রা সাধনের অবস্থা। স্ত্রী-পুরুষের সান্নিধ্য বশত উভয়েরই শরীর মন স্ফূর্তিতে যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠে তখনই মুদ্রার অবস্থা। এই মুদ্রার মধ্যে অশেষ সংযমের মধ্য দিয়া মৈথুনের সঙ্কেত বর্তমান। মদ্য মাংসাদির প্রভাবে শরীরের স্ফূর্তিপূর্ণ অনুভূতি হইলেই যে তখনই মৈথুনের ইচ্ছায় কর্মে নিবিষ্ট হইতে হইবে তাহা নয়। ঐ মুদ্রাপথেই সংযমের দৃঢ় অনুষ্ঠানের সঙ্গে—শেষে মৈথুনের

প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নির্দ্দেশ।

যাহা হউক, অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ফলেই বোধ হয় এক্ষেত্রে সংজ্ঞা লোপ পাইতে লাগিল। আলস্যের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই, বা ইহা নিদ্রার পূর্বাভাষও নয়, তন্দ্রাও নয়। তখনকার দিনে রাত্র জাগরণ আমার পক্ষে সহজ ছিল। কাজেই এখনকার এই ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন অবস্থা, তার অন্য কারণ থাকিতে পারে, অন্তত ইহাই তখন মনে হইতেছিল। কিছুতেই আর চৈতন্যকে জাগ্রত রাখিতে পারিতেছি না। এ কি হইল আমার! নিজ স্থানেই ঠিক বসিয়া আছি, শরীর স্থির অবিচলিত রহিয়াছে। এমনই সময়ে ঠিক মনে আছে, একবার একটা খুব জোর বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলোর সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতি, সংজ্ঞা লোপ পাইল।

অবশ্য সেই আলোকে একটা কিছু দেখিতে পাইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে পারিব না। তবে কতকটা এইরূপ, যেন জ্যোতির্ময় একটি ক্ষেত্র, উজ্জ্বল-শরীর, নিঃসঙ্কোচ কতকগুলি উলঙ্গ দেবদেবীর মূর্ত্তি লীলাবেশে চঞ্চল; তাঁহাদের মধ্যে অপূর্ব বিরাট এক হরগৌরীর মূর্ত্তি, হিমালয়ের মতই স্থির, ধীর এবং গম্ভীর, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সুখাসনে আসীন রহিয়াছেন।

কতক্ষণ যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না, তবে ভোরের ক্ষীণ আলোকে পূর্বদিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে দেখিতে দেখিতে চক্ষু-রুন্মীলন করিলাম। পূর্বস্মৃতি চিত্তক্ষেত্রে চমকিত হইতে না হইতেই আমি চারিদিকে একবার দেখিয়া আবার কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদিলাম। মাথাটি ভার হইয়াছে, শরীরে যেন জ্বর-ভাব অনুভব করিতে করিতে আবার যখন জাগিলাম তখন পূর্বাকাশ আরও কতটা ফরসা হইয়াছে, সম্মুখে কতকগুলি কাক সশব্দে পরস্পর কাড়াকাড়ি করিতেছে, অপর কেহ সেখানে নাই। গত রাত্রির সকল কথা স্মৃতিতে উদয় মাত্র চারিপাশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ভুক্তাবশিষ্ট কিছু উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ ইতস্তত পড়িয়া আছে মাত্র, আর কোন চিহ্নই নাই।

শরীরটি এত ভার হইয়াছে, প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরও গুরু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আনন্দ মোটেই ছিল না, একটা দুর্বলতা-জড়িত অবসাদে শরীর মন যেন অবসন্ন। তখনও উঠি নাই, বসিয়া বসিয়া গত রাত্রির সকল দৃশ্য যাহা আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিয়াছে দেখিয়াছি তাহাই ভাবিতেছিলাম।

দেখি সম্মুখে কতকটা দূরে ভুলো ডোম আসিতেছে, মাথায় গামছা-বাঁধা, খালি গা, কৌপিন-পরা নিম্নাঙ্গ। ক্রমে নিকটে আমার দিকেই আসিতেছে এরূপ বোধ হইল। আরও নিকটে আসিলে দেখিলাম তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি জবা ফুলের মতই লাল, কাঁচাপাকা গোঁফ জোড়াটি বিশৃঙ্খল। হাতে তাহার বাঁশের লাঠিটি ঠিক আছে। আমার সম্মুখে আসিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে অশেষ ভক্তিপূর্ণ ভাবে প্রণামের অভিনয় করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল: ঠাকুদ্দা, বাবা বোলছেন যে—

জিজ্ঞাসা করিলাম: কি বলছেন বাবা?

সে বলিল: বাবার কথা কি আমরা বুঝিতে পারি!

বেটা মাতাল হইয়াছে, কিছু জ্ঞানগম্য নাই, বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম: তিনি এখন কোথায় আছেন? সে বলিল: হোই ঘরকে আছেন বটে–বোলছেন, দেখ্যা আয়গা যা, হোথাকে আপুনি আছেন বটে।

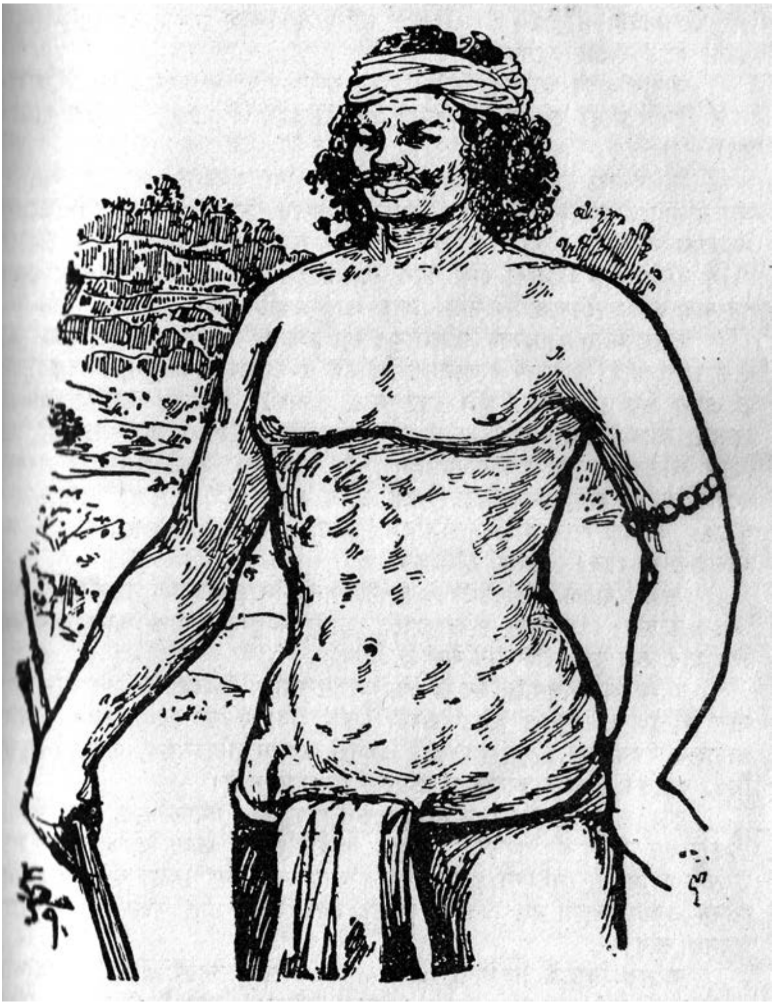

আমি উঠিয়া পড়িলাম, বলিলাম: চল, যাই তাঁর কাছে।

সে বলিল: না না, তা হবেক নাই, তিনি বাবা তা ত বলেন নাই।

আমি বলিলাম: তবে তিনি কি বললেন? সে বলিল: ওই ত বোললাম না?

বৃথা তার সঙ্গে কথা কওয়া, এ অবস্থায় তাহার কাছে কিছু পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া আমি অঘোরীর কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ভুলো আমায় যাইতে দিবে না, সে আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল: এখন সেখানে যাওয়া হবেক না, ওখানে মা আছেন যে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: মা! কে মা? সে বলিল: মইসারী ভৈরবী মা। বুঝিলাম, মহেশ্বরী, তিনি এখনও সেখানেই আছেন। বলিলাম: তা থাকলেই-বা, আমি যাব।

সে বলিল: তা হবেক না বাবা, এক্ষণ তাঁরা নাংগা রইচেন যে, তুমি যাবেক কেনে সেথা, তাঁরা পূজা করছেন, আর করছেন।

তখন আমি নিরস্ত হইলাম। এখন যাওয়া সঙ্গত নয়।

ভাবিলাম, এখন আর ওখানে না গিয়া নিজস্থান যাওয়াই ভালো; পরে সময়মত একবার বৈকালে অঘোরীর কাছে যাইব, গিয়া জানিয়া লইব ব্যাপারে কি! এই মনে করিয়া ফিরিয়া নিজ স্থানে যাওয়াই ভালো; পরে সময়মত একবার বৈকালে অঘোরীর কাছে যাইব, গিয়া জানিয়া লইব ব্যাপার কি! এই মনে করিয়া ফিরিয়া নিজ স্থানে চলিলাম। তখন আবার ভুলো পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। বলিল: তা হবেক নাই ঠাকুর মশায়,—আপনার এখান হতে যাওয়া হবেক নাই।

আমার হাসি আসিল,—ভালো আপদ দেখিতেছি, এ আমায় লইয়া করিবে কি? বেটা মদের নেশায় একেবারেই বেহেড হইয়া গিয়াছে। আমায় যাইতে দিবে না।

কি করিব তাহাই ভাবিতেছি। এমন বিপদে বাউল বাবাজী আসিয়া আমার সহায় হইলেন। তিনি অঘোরীর ঘরের দিক হইতেই আসিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন: ব্যাপার কি? আমি সকল কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন: অঘোরী বাবা ওকে বলেছিলেন দেখে আসতে শ্মশানে কোন শব দাহ করতে এসেছে কি না। আজ তাঁর একটি শবের প্রয়োজন আছে।

তখন আমি বুঝিলাম, বলিলাম: ভাগ্যে আপনি এলেন, না হলে মুস্কিল হতো। বৈরাগী বাবাজী বলিলেন; তিনি তো আমায় পাঠালেন,— কারণ ভুলো তো এখন প্রকৃতিস্থ নাই, কাল রাত্রে তার প্রসাদটা গুরুতর রকমই পাওয়া হয়েছে, কাজেই কোন কাজে তো এখন ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না, তাই তিনি আবার আমায় দেখতে বললেন; তিনি এমনই একটা কিছু আশঙ্কাই করেছিলেন। যাই এখন ফিরে গিয়ে তাঁকে সব বলিগে। চল্ ভুলো,—কাজ আছে। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন: আচ্ছা দাদা, এখন এখানে কাজ আছে, আবার দেখা হবে। বলিয়া চলিলেন।

ভুলো বেচারা অপ্রতিভের একশেষ,—সুড়্ সুড়্ করিয়া বাবাজীর পিছন পিছন চলিল। কতকটা দূরে গেলে ভুলো কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিল, তার হাব ভাব দেখিয়াই অনুমান করিলাম।

আমি আর সেখানে কি করিব, আপন স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। মনে মনে বুঝিলাম, আজও হয়ত একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে। শবের প্রয়োজন যখন, তা ছাড়া মহেশ্বরী এখনও ওখানে রহিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু আছে। কিন্তু আমার ত ইহাতে অধিকার নাই।

কাল রাত্রে চক্র-সন্নিধানে আমার উপস্থিত এবং সমস্ত দৃশ্য যাহা আমার চৈতন্যলোপের পূর্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা একে একে মনে উঠিতে লাগিল। সেইদিন প্রাতে আমার নিজ কর্ম কিছু করা হইল না। কেমন একটা নেশার মত অবস্থা, তাহার উপর মাথা ভার, গরম নিশ্বাস—যেন অবসন্ন ভাব।

অনেক কিছুই জিজ্ঞাস্য ছিল, যদি একবার অঘোরী বাবাকে নিরিবিলি পাইতাম। জানি না কবে, কখন সুযোগ হইবে। তবে নিজের মধ্যে তখন একটা মীমাংসার প্রবাহ স্বতই চলিতে লাগিল, তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি।

প্রথম কথা এই যে,—তন্ত্রের মধ্যে এই যে পঞ্চ-মকারের সাধনা তাহা সেই সময়ের জন্য, যে সময়ে সাধারণের মধ্যে মদ্য মাংস প্রভূত পরিমাণে চলিত ছিল। মদ্য, মাংস ব্যতীত তখনকার লোকের আনন্দে জীবন-যাপনের ধারণাই ছিল না। তখন জন-সাধারণের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতির এবং সংযত বুদ্ধির অভাব ছিল। তখনকার সমাজে মদ্য মাংস নিন্দনীয় ছিল না।

দ্বিতীয় কথা,—মদ্য, মাংসের সঙ্গে স্ত্রী-সম্ভোগ একান্ত সুখের বিষয় বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল। উহা ব্যতীত স্ত্রী-সম্ভোগ সম্পূর্ণ নহে, এ ধারণাও তখনকার দিনে বদ্ধমূল ছিল।

তৃতীয় কথা,—সাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম ধর্মের অথবার ঈশ্বর উপাসনার অভাব বোধ করিয়া যিনি প্রথম তন্ত্রোক্ত উপাসনা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তিনি জনসাধারণকে ধর্মে লইবার জন্যই অর্থাৎ ধর্মপথে প্রলোভিত করার জন্যই ইহাতে পঞ্চ-মকার সাধন যোগ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক মহৎ উপকার এই হইয়াছে যে আধ্যাত্ম ধর্ম এবং উপাসনা আমাদের দৈনন্দিন জীবন হইতে স্বতন্ত্র একটা কিছু নয়, পরন্তু আমাদের প্রতিদিনের সহজ জীবন-যাপনের মতই প্রয়োজনীয়, এই বোধেই তখনকার সমাজ ইহাতে আকৃষ্ট এবং অনুরক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ,—স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইয়ের তুল্যাধিকার তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট্য। নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এই বুদ্ধির প্রতিবাদেই তন্ত্রধর্মের যত কিছু কর্মের নির্দেশ। নর অথবা নারী একা-একা কাহারও মুক্তি সম্ভব নহে। সাধন হইতে সিদ্ধির অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ যুক্ত হইয়া প্রত্যেকটি কর্ম করিবে,—ইহাই ঈশ্বরের নির্দেশ এবং ইহাই ধর্ম। ইহাতেই কল্যাণ, শুভ এবং সিদ্ধি,—অন্যথায় ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম।

পঞ্চম,—স্ত্রী এবং পুরুষ ব্যতীত মানুষের মধ্যে অপর কোন জাতির অস্তিত্ব তন্ত্রধর্মে নাই। সেই হিসাবে ইহা বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিবাদ। কর্ম-সংস্কার

হিসাবে অর্থাৎ গুণ এবং কর্ম হিসাবে জাতির কথা, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, উচ্চ ও নীচের কথা তন্ত্রোক্তধর্মে পৃথক ভাবে বা অর্থে গৃহীত। সাধন-জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষ হিসাবেই তন্ত্রশাস্ত্রের ছোট বড় ভাব। তন্ত্রে মনুষ্য-সাধারণই পশু, ধর্মজীবনে উৎকর্ষ হইলে শক্তিমান হইয়া বীর আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তার পর দিব্যভাবের উৎকর্ষে দেব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সাধক-জীবনের চরমোৎকর্ষই দেবভাব। এই অবস্থার জীবই ব্রাহ্মণ, নচেৎ ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণ হইবে এ ভাবের বংশগত প্রাধান্যের কথা তন্ত্রের অনুমোদিত নয়।

২৩

মূল তন্ত্রধর্মের মধ্যে শুধুই যে নর-নারীর সমান অধিকার তাহা নহে, ইহার মূলে নারীর কর্তৃত্ব দৈবানূকূল বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। নারীকে শক্তির প্রতীক বলিয়াই বলা হয়, যাহার অভাবে লোক এবং সমাজের প্রগতি অচল। তার পর তন্ত্রের সাধন, নারী ব্যতীত হইবার নয়। এই যে নারী, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধই মানুষের সাধন জীবনে অগ্রগতির প্রথম ধাপ। তন্ত্রমতে উভয়ের ইচ্ছার অভাব ব্যতীত বিবাহের অপর কোন বাধা নাই। জাতি-বিজাতি, গোত্র, গাঁই-মেল, কুলিন, বংশজ, দান, পণ, অলঙ্কার ইত্যাদির মনুষ্যকৃত কৃত্রিম বাধা বালাই নাই। যেহেতু আসল তন্ত্রমতে সদাশিবই একমাত্র পুরুষ এবং আদ্যাশক্তি ভগবতী পার্বতী বা কালীই তাঁহার একমাত্র শক্তি ও আধার। সৃষ্টির মূলে সমষ্টিরূপে পূর্ণ একাই এই দুই দেবতা, উপাস্য, গুরু যাহা কিছু সব। উপাসক জীব, শিব ও শক্তির ব্যষ্টিরূপ। প্রথম অবস্থায় জীব যখন বিষয়মুখী তখন পশু, সেই জন্য শিব পশুপতি। উপাসনার আসল কথা জীবের পাশমুক্তির অবস্থায় আত্মার মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শিবরূপ সত্তার উপলব্ধি। কারণ, তাহাই জীবের স্বরূপ। শরীর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে জগৎ-সৃষ্টি বর্তমান, তাই জীব সৃষ্টিবৃদ্ধি এবং সৃষ্টিরক্ষার সহায়তা করিতে পারে।

অঘোরী বলেন যে, এই যে জীব-রূপী সামাজিক পুরুষ, তাহার সঙ্গে যে নারীর প্রণয় হইবে তিনি হইবেন তাঁহার স্ত্রী, সহধর্মিণী, উত্তর সাধিকা, ভৈরবী, যাহা কিছু সব। পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে উভয়কে গ্রহণের তাৎপর্য্য হইল উভয়ের জীবনগতি এক হইয়া যাওয়া, পুরুষের শক্তিমান হওয়া, নারীর শক্তিস্বরূপা হওয়া। উভয় জীবনেই সম্পূর্ণতার গতি প্রাপ্তি, চরম গতিমার্গের উপযুক্ত হওয়া, কর্মজগতে উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি ইত্যাদি। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার যে উদ্দেশ্য আছে, যে মহান্ ইচ্ছার নির্দেশ আছে, যুক্তভাবে স্ত্রী-পুরুষ উপাসনা দ্বারা সেই ইচ্ছার গতিতে মিলিত হওয়া এবং মনুষ্য জীবনটি সার্থক করা। সেই জন্য বিবাহের পর গার্হস্থ্য জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার রীতি এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। তন্ত্রমতের ধর্মজীবন দৈনন্দিন

জীবনের সবটা লইয়াই। ধর্ম বা অধ্যাত্ম কর্ম পৃথক ব্যবহারের ব্যাপার নয়। ধর্ম জীবনময়, ইহাই তন্ত্রমতের প্রকৃষ্ট অন্তর্নিহিত সত্য।

...

অন্যান্য বিধি-নিষেধ ছাড়িয়া যদি শুধু নরনারীর মিলন বা বিবাহ-বিধিটুকু মাত্র লইয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ইহার তুল্য উদার, স্বাভাবিক (অর্থাৎ প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুকূল) সঙ্কীর্ণতাশূন্য বিবাহ-পদ্ধতি জগতে আর কোথাও বিধিবদ্ধ হয় নাই। ... নরনারীর স্বাভাবিক অধিকার এবং কল্যাণময় তন্ত্র মতের বিবাহ -বিধি আজ কত শত যুগ পূর্বে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিদ্বান শিক্ষিত সমাজের মানুষ আধুনিক পদ্ধতিতে তন্ত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেহই করেন নাই। দুই চারি জন ইউরোপীয় পণ্ডিত যাহা করিয়াছেন তাহার মূল অন্য দিক দিয়াই নিরূপণ করিতে হয়, ভারতবাসী কেহ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তন্ত্র-সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও অনুসন্ধান করেন নাই বলিয়াই জানি। এখনও যাহা হয় নাই কখনও যে তাহা হইবে না তাহাও ত বলা যায় না। তবে আশায় থাকা ভাল।

যাহা হউক, এখন এই যে তখনকার দিনের (যখন তন্ত্রের প্রভাব পূর্ণরূপেই এদেশে বর্তমান ছিল) তন্ত্র-সমাজে প্রচলিত বিধি মনোভঙ্গে বিবাহ- বা সম্বন্ধ-ভঙ্গ, – এখনকার এই দাসত্ব ধর্ম জর্জরিত ক্লিষ্ট হিন্দু সমাজের বিবাহ-বিধির সঙ্গে তুলনা করিলে অনুমান করা শক্ত নয় যে তখনকার রাষ্ট্র বা সমাজ কতটা স্বাধীন এবং শক্তিশালী ছিল। পূর্ণ স্বাধীন এবং শক্তিমান সমাজ না হইলে তন্ত্রের মত ধর্মের জন্মলাভ সম্ভব নয়।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,– যখন উভয়েই দেখিবেন পরস্পরেরে মধ্যে প্রীতি এবং আকর্ষণের অভাব, কেহ কাহাকেও দেখিতে ইচছা করেন না, পরস্পরের সংসর্গ বীতরাগ, তখন বুঝিতে হইবে উভয়ের ব্যবহারিক সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছে। তখন উভয়েই পুনরায় মনোমত পাত্র ও পাত্রী সন্ধান করিয়া লইবেন। এক ভৈরব বা সাধক, সাধন-জীবনে একাধিক বহু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজ সাধন পূর্ণ করিয়াছেন, এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে। নারীর পক্ষেও তাই, ইহাই তন্ত্রের সত্যবিধি।

তন্ত্রের এই উদার বিবাহ-পদ্ধতি আর্য্য ব্রাহ্মণ করেন নাই, ওটি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

শুধু বিবাহ পদ্ধতি নয়, তন্ত্রের জাতিহীনতা, অতিরিক্ত বাহ্য শৌচাচারের নিষ্প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি ছাঁটিয়া, কেবল নিজেদের বৈদিক সংস্কারগুলির সঙ্গে যেগুলি খাপ খায়, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া সেইগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তন্ত্রের পূর্ণ প্রভাব বা পূর্ণ রূপটি বৌদ্ধ-যুগের পরে আর দেখিতে পাই না। যেগুলি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে মিলে নাই সেগুলি বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে অতি সুন্দররূপে মিলিয়াছিল। তাই বৌদ্ধ-ধর্ম যতটা তন্ত্রকে আত্মসাৎ করিয়াছে

অতটা কোথাও হয় নাই। আর্য্য হিন্দুগণ প্রথম হইতেই তন্ত্রের আংশিক অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নিজ ধর্মের মধ্যেও জাতির একটা পূর্ণরূপ দিতে পারেন নাই। বৌদ্ধযুগের পর তাঁহারা তন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুর ধর্মের সঙ্গে তাঁহাদের গৃহীত তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। সেই কারণেই একটি সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ শক্তিসম্পন্ন জাতির পরিবর্তে এক অভিশপ্ত সঙ্ঘশক্তি-হীন ভণ্ড রাষ্ট্রপরিচালনায় দুর্বল জাতিই গড়িয়া গিয়াছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ জাতির চতুর্বর্ণ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব আচার অনুষ্ঠান এবং সংস্কারের গভীর প্রভাব মূলে থাকায়, তন্ত্রোক্ত ধর্ম গ্রহণকালে তাঁহারা সবটুকু লইতে পারেন নাই, পাছে তাহাদের সমাজ ইহার উদার প্রভাবে ব্যভিচারদুষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব হারাইয়া ফেলে বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অধঃপতিত হয়। কিন্তু হায় দূর্দৈব,– তাঁহাদের প্রকৃতিগত সংকোচ এবং ক্ষুদ্রতাই তখনকার সমাজে প্রতিফলিত হইয়া এখানকার সমাজকে কতদিকে না উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারদুষ্ট, জগতের চক্ষে হীন করিয়া ফেলিয়াছে, এখন ইহা চক্ষে পড়িলে কষ্টের কারণ হয় না কি?

অঘোরীর মুখে শুনিয়াছি, প্রাচীন বা মূল তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে তখনকার সমাজে নর-নারীর উদার ব্যবহারের যে সকল স্বাভাবিক সুন্দর রীতি-নীতির কথা বর্ণিত আছে ব্রাহ্মণেরা সে সকলের আমূল পরিবর্তন করিয়া নিজ ধর্মের, জাতীয় সংস্কার যথা– ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি ঢুকাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা শিবের মুখ দিয়া বলাইয়া যাহাতে ব্রাহ্মণের প্রভাব তন্ত্রের মধ্যে বরাবর থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন– যাহা কষ্মিনকালেও তন্ত্রের মধ্যে ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের জাতিগত সংস্কারকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই তন্ত্রোক্ত আসল ধর্ম এই বঙ্গে তথা ভারতে আর স্বাধীনভাবে মাথা তুলিতে পারে নাই। ফলে দুইটি ধর্মই নষ্ট হইয়াছে, তন্ত্রও গিয়াছে, বৈদিক আর্য্য হিন্দুধর্মও গিয়াছে। এখন যেটা আমাদের দেশে আছে তাহাকে তন্ত্রও বলা যায় না, বৈদিক ধর্মও বলা যায় না। তাই আমাদের এ সমাজে শক্তিও নাই, দৃঢ় ভিত্তিও নাই, নিজেদের কাছেও গ্রহণ করিবার মত কিছুই নাই, অপরের কাছে পরিচয় দিবার মতও কিছুই নাই।

অঘোরী বলেন, তন্ত্রের ভাব, ভাষা এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে, পূর্ণ প্রাণে পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধিৎসা দরকার। যিনি প্রথম হইতেই মনের মধ্যে ঘৃণা, সঙ্কোচ, উপেক্ষা রাখিয়া অথবা বিদ্বেষদুষ্ট মনে উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা না করিতে পারিবেন, এই অপূর্ব ধর্মশাস্ত্র মধ্যে তাঁহার প্রবেশ অসম্ভব হইবে। অঘোরী দেখিয়াছি, অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকের উপর ততটা নয়, যতটা দেশের বিদ্বান পণ্ডিতের উপর নারাজ। আগে পরিচয় পাইলে কখনও তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না, কাছে বসিতে দিবেন না। বলিবেন, তাহারাই দেশে ধর্মকে নষ্ট করিয়াছে। একদিন এই বীরভূমেরই এক পণ্ডিতকে কাঠ লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন। কেন যে তাঁর এতটা

ক্রোধ সাধারণে কেহ বুঝিতে পারে নাই, পরে বলিয়াছিলেন– পণ্ডিত পরিচয় দিয়া তিনি আসিয়াছিলেন তন্ত্র-সম্বন্ধে তর্ক করিতে। যাহা হউক্, অঘোরীর কথাগুলি একটা কিছু বাদ না দিয়া, তিলমাত্র বিকৃত না করিয়া বিশেষ সাবধানেই আমি যথাসাধ্য সাধারণের কাছে ধরিতেছি। ইহা হইতে আসল তন্ত্রশাস্ত্রের কথা ধরিতে, বুঝিতে পারিবেন, যাহার সঙ্গে এখনকার প্রচলিত পুঁথি পুস্তকের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। তিনি বলেন, তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে ছাপানো পুঁথি পুস্তকের মধ্যে মোটে আসল ব্যাপার স্থান পায় নাই, কাজেই তাহার ভিতর হইতে সাধারণের সত্য উদ্ধার করিবার সাধ্য নাই। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি হইতে যে সকল কর্ম উদ্ভূত হইয়াছে সেই সকল কর্ম অবলম্বন করিয়াই তন্ত্রের সাধন শুরু হইয়াছে, পরে প্রকৃতির নিয়মেই তাহা হইতে নিবৃত্তিমূলক সাধন, শেষে সিদ্ধি; তাহাও সহজ নিয়মের মধ্য দিয়া। সংস্কারান্ধ মানুষের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা থাকে না, ভোঁতা বুদ্ধি থাকার জন্যই, তন্ত্রের প্রত্যেক ক্রিয়াটি যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে তাহাদের মাথা খারাপ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া তন্ত্রের সকল ব্যাপার গুহ্য বলিয়াই কোনও ছাপানো বইয়ে আসল কথা খুলিয়া লেখা হয় নাই, সঙ্কেতও বিশেষ কিছু নাই; হাজার পণ্ডিত বিদ্বান হোক, বুঝিবে কি প্রকারে? গুরু বা আচার্য্য কৌল না হইলে, আর অনুগত শিষ্য না হইলে, দীক্ষা না হইলে কিছুই পাইবার যো নাই। এ পর্য্যন্ত তান্ত্রিক বলিয়া কারণের যন্ত্র বা মদের বোতল হাতে যাহাদের দেখা যায় তাহারা মদের জন্যই তান্ত্রিক, সাধক নয়, যথাশাস্ত্র তান্ত্রিক সাধন একরকম লোপ পাইতে বসিয়াছে।

অঘোরী বলেন, তন্ত্রের জগতে বা অধিকারের মধ্যে ঘৃণার বস্তু বলিয়া কিছুই নাই, মানুষের মধ্যেও কেহ অস্পৃশ্য নাই,– জাতির বেলা পুরুষ ও নারী এই দুই জাতি ছাড়া মানব-সমাজের মধ্যে আর কোন জাতি নাই। একথা এখনকার ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিকরাও বুঝে কি না সন্দেহ। তার পর শবসাধন, পঞ্চমুণ্ডি আসন, মদ্য মৎস্য মাংসের ব্যবহার এ সব ত আর্য্য ব্রাহ্মণদের ধারণায় ভ্রষ্টাচার। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে শুদ্ধাচারের বড়াই দেখিয়াও কি সহজে বোধ হয় না যে, এসকল পৃথক একটি ধর্মের সাধন বা অনুষ্ঠান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। শুদ্ধাচারী আর্য্যরো যতদিন বাঙ্গলায় আসেন নাই, ততদিন তাঁহাদের, এ ভাবের যে একটি ধর্ম-সাধন আছে, আর সেই ধর্মের সাধন-প্রকরণ তাঁহাদেরই একদল গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে আর একটি ধর্ম গড়িয়া তুলিবেন, একথা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। বাঙ্গলাদেশ ত চিরকালই পশ্চিম দেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদের কাছে হেয়, ঘৃণ্য হইয়া ছিল, এখনও তাহার জের আছে। তারপর বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণেরা বসবাস করিয়া যখন স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িলেন তখন হইতে ত তাঁহারা পশ্চিমী জ্ঞাতি-ভাইদের কাছে একঘরে হইয়াই ছিলেন। তার পর তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অনার্য্যই হইয়া পড়িলেন,– তাঁহাদের বৈদিক ধর্মের গুমোর আর কি রহিল। তাঁহাদের বাহিরের সকল

কর্ম, দশবিধ সংস্কারগুলিতে বজায় রহিল বৈদিক ব্রাহ্মণত্ব, আর বিবাহের পর তান্ত্রিক কুলগুরুর কান-ফুকের মধ্যে রহিল তান্ত্রিকত্ব। এই ত বাঙ্গলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের বংশের তান্ত্রিক ধর্ম, তাহার মধ্যে কেহ কেহ বংশ হইতে বাহির হইয়া তান্ত্রিক কৌল গুরুর শিষ্য হইয়া ভৈরবী লইয়া সাধন-জীবন আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে বড় একটা ঘটে না, বৈদান্তিক ধর্ম মাথা তুলিয়াছে।

তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রবাদ এরূপ যে বেদের প্রাচীনতা তন্ত্রের হিসাবে অনেক কম। এঁরা বলেন– বেদের উৎপত্তির বহু সহস্রাব্দী পূর্বে তন্ত্রের উৎপত্তি। আমরা যে দরের মানুষ তাহাতে এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার কল্পনাও বড় অখ্যাতির কথা, যদিও মনের মধ্যে একটা ছট্‌ফটানী থাকে ইহার সুমীমাংসার জন্য। অঘোরী বলেন, বেদ পুরানো কি তন্ত্র পুরানো একথায় সাধকের ত কোনই দরকার নাই। কিন্তু আমি তবুও এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছু নিজমত আছে কি না, বড়ই আগ্রহ দেখাইয়া শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন যে, বেদ আগে কি তন্ত্র আগে তা আমি জানতে কখনও চাই নি– আমার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কও নাই, তবে এটি ঠিক জানি না বেদাচারী ব্রাহ্মণরাই এদেশে এলে পর ক্রমে ক্রমে পরিচয় পেয়ে তন্ত্র ধর্ম গ্রহণ করে তন্ত্রের বিস্তার ব্যাভিচার করে আসল তন্ত্রের মাথা খেয়ে কেবল ছোবড়াটা ফেলে রেখেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: কি ভাবে?

তিনি: এই ভাবে যে, যেটুকু তাঁরা হজম করতে পারেন মাত্র সেটুকু নিয়ে তার উপর নিজেদের বৈদিক আচার, সংস্কার চাপিয়ে, কতক এভাবে কতক ওভাবে করে জগা-খিচুড়ী পাকিয়েছেন। এ ত আগেই বলেছি।

আমি: আপনার মত কি বৌদ্ধধর্মের পতনের পর তবে ব্রাহ্মণেরা তন্ত্র-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

তিনি: তাই ত বলি, বলি কেন, তাই যে ঘটেছিল তার অনেক প্রমাণই আধুনিক অনেক তন্ত্রের বইয়ের মধ্যেই আছে। প্রথমেই দেখ না, তন্ত্রশাস্ত্রে জাতি বলতে নর-নারী, পশু পক্ষী, জলচর ভূচর খেচর এই সব, গোঁড়া ভণ্ড জাতির গুমুরে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা ওর মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র জাত ঢুকিয়ে নিজেদের বৈদিক ছাঁচে তন্ত্রকে গড়ে নিয়ে আসল বা মূল তন্ত্র-ধর্মের উচ্ছেদ করে বসেছেন। এখন তন্ত্রশাস্ত্র খুঁজতে গেলে বৌদ্ধ-ধর্মের পুঁথি খুঁজতে হবে,– সংস্কৃত ভাষায় আগম, নিগম, তন্ত্রসার তারপর তিনশো পঁয়ষট্টিটা তন্ত্রের যে বই, সে সব ঐ বেদাচারের ছাঁচে গড়া ব্যভিচারী ব্রাহ্মণদের সুবিধামত শিষ্য যজাবার জন্য তৈরী। ভাষা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে কত হাল্কা বাংলার ছাঁচে, আসলে সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষদ, বেদান্তের ভাব সব হুবহু নকল ছাড়া আর কিছু নাই। শিব আর পার্বতী বা ঈশ্বর বা ঈশ্বরী, বক্তা বা শ্রোতা, ঠিক যেন মহাভারত লেখার ছাঁচ নয় কি? মহাভারতের পর

আর বৈদিক ব্রাহ্মণদের গুমোর করবার মত ধর্ম-সংক্রান্ত একখানিও বই রচিত হয়েছে কি? যা কিছু হয়েছে সব ঐ ছাঁচ বা নকল মাত্র।

ইনি বলেন যা, তা বড়ই অদ্ভুত লাগে, এখনকার তন্ত্রের সকল গ্রন্থই আসল তন্ত্রধর্মের পরিপন্থী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করবার পূর্বে তন্ত্রের ভাষা কিরূপ ছিল? কি ভাষায় তার প্রচার হ'ত?— আপনার কি ধারণা?

তিনি: অনার্য্য বলে আর্য্যরা যাঁদের ঘৃণা করতেন, তাদের ভাষা দ্রাবিড়, সেই ভাষায় তন্ত্রের যা কিছু ব্যবহার ছিল। পুঁথি পুস্তক ত ছিল না, বেদের মতোই লোকপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচার ছিল। সাধকদের স্মৃতির ভিতরেই বন্ধ ছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির নাম-গন্ধও ছিল না, কারণ তন্ত্রের কারবার যে সব মানুষকে নিয়ে তার মধ্যে জাত কোথায়? সাধারণ মানুষের ধর্মকর্ম নিয়েই ত তন্ত্রের সাধন।

তখন আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: মন্ত্র ছিল ত? সে মন্ত্রের ভাষা কি ছিল?

অঘোরী বলিলেন: কিছু মন্ত্র ছিল বোধ হয়, সে সব হয় ত তাদের চলিত ভাষাতেই ছিল। তারপর বৌদ্ধেরা সে সব মন্ত্রের অর্থ, শব্দ পালিতে করলেন, ব্রাহ্মণেরা আবার তাই থেকে কতক সংস্কৃত ভাষায় করে নিলেন।

আমি: আচ্ছা, তন্ত্র নামটাই সংস্কৃত নয় কি?

তিনি: কত কত ভিন্ন ভাষার শব্দ সংস্কৃতের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ঢুকিয়েছে তার ঠিক আছে কি? ঐ রকমই একটি ব্যাপার এই নামের মধ্যেও ঘটে থাকবে।

আমি: মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ, এ সকলই ত সংস্কৃত শব্দ।

তিনি: হ্যাঁ হ্যাঁ, আসল শব্দগুলির সংস্কৃত ভাবানুবাদ।

আমি শেষে বলিলাম: যদি তন্ত্রের মধ্যে যত মন্ত্র আছে সব মূলত সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত শব্দেরই হয় তা হোলে স্পষ্ট এটি বুঝা যাবে যে তন্ত্রধর্ম ব্রাহ্মণদেরই সৃষ্টি?

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: আসলে তন্ত্র ত মন্ত্রমূলক নয়, ক্রিয়ামূলক। কাজেই নাম থেকেই বুঝা যাবে যে, তন্ত্র যেটি সেটি মন্ত্র নয়, তাকে মন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে অনেক পরে। আর্য্য ব্রাহ্মণদের খপ্পরে আসবার পরেই না তার মধ্যে চতুর্বর্ণ আর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইত্যাদির কথা ঢোকানো হয়েছে বলেছি। নানা প্রকার অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, নিকৃষ্ট প্রভৃতি অধিকারীর কথাও তার মধ্যে চালানো হয়েছে, আসলে ও-ধর্মে অধিকারী ভেদ নেই, ধর্ম সকলকার জন্যই।

আমি: এ বড় অদ্ভুত কথা আপনি বলেছেন, এ সব কথা পণ্ডিতেরা, বিশেষত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের শিষ্য যাঁরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, প্রমাণের মধ্যে একমাত্র প্রত্যক্ষকেই মূল করে যাঁরা সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁরা আপনার এসব মতামত হেয় বা উপেক্ষণীয় মনে করেন।

তিনি: তা আমি কি করব– এ কতকালের কথা, এখন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায় পাব,– আমরা গুরু পরম্পরায় যা শুনে আসছি আর আমরা আলোচনা করে যা সত্য বলে ধরতে পেরেছি তাই তো বলছি। ব্রাহ্মণেরা কত কত বাইরের জিনিস আত্মসাৎ করে নিজেদের সমাজে, আর ভাষার মধ্যে পুরে নিয়ে বড় হয়েছেন তার খবর কে রাখতে যাচ্চে। তন্ত্র, ভারতের ধর্ম বটে কিন্তু ব্রাহ্মণদের নয়, এটা যেন মনে থাকে।

আমি আরও একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ছট্ফট্ করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন: যাই-ই বলিস্ না কেন, তোর তন্ত্রের কাল আর নেই। যদি কখনও আসল তন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তার যেটুকু ব্রাহ্মণেরা নিয়ে তন্ত্র বলে চালাচ্চেন সেটুকু বাদে যে অংশটি ব্রাহ্মণেরা নেন নি,– তিব্বতে, চীনে, বৌদ্ধ-ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিশে আছে– যদি উদ্ধার করা যায়, একটি দুটি জীবের জীবনব্যাপী সাধনা দরকার, তাহলে জগতের লোকে এক কালে বুঝতে পারবে তন্ত্রধর্ম কি বিরাট ধর্ম। শিব কি উদার, সর্বজনীন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ এক ধর্ম থেকেই জগতের সকল জীবেরই যোগ, ভোগ শেষ করে মহা শক্তিশালী হয়ে আনন্দময় শিবই হয়ে যেত।

আমি বলিলাম: আচ্ছা, একই সময়ে সকল ব্রাহ্মণেই ত আর তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করে নাই, বাকি–

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন: বাকি-টাকি নেই, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সমাজ এক সময় কৌলদের মুঠার মধ্যেই ছিল। যাঁরা বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁরাও তন্ত্রকে হাল্কা ডোজে নিজেদের মধ্যে মানিয়ে নিয়েছেন। সেটি হ'ল নিরিমিষ্যি তন্ত্র। গোপনীয় ব্যাপার বলতে নেই, আয় তোর কানে কানে বলি,– বড় গোঁসাইরাও তন্ত্রমতে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। অন্তঃশাক্তং বহিঃ শৈবং সভায়াং বৈষ্ণবং মতং– এই হ'ল বাংলার ভণ্ড সমাজের ধর্ম। এই থেকেই বুঝে দেখ্না কেন সংঘশক্তি এদের কোথা থেকে আসবে, দাসত্বই বা ঘুচে যাবে কি করে। যারা পরের কাছে দাসত্ব করে তাদের মুক্তি কোনকালে বা হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যারা নিজেদের মধ্যে ভণ্ডামীর দাস তাদের মুক্তি কোনকালে হবার যো কোথায়?

তন্ত্র বলিতেই শিবতন্ত্র বুঝিতে হইবে অর্থাৎ শিব যে ধর্ম কর্ম সঙ্ঘের প্রবর্তক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: এ শিব কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই মহেশ্বরই ত শিব?

তিনি: শিবকে ত প্রথমে বৈদিক আর্য্য ব্রাহ্মণেরা পায়নি, স্বীকারই করেনি ভগবান বলে, ইনি অনার্য্যদের নায়ক, দেবতা ছিলেন, আর্য্যদের হিসাবে শিবের দল ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত। বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে তুলনায় শিব আচার ভ্রষ্ট, অনার্য্য– যেখানে সেখানে থাকেন, যা-তা খান, কোনও নিয়ম নাই, শ্মশান তাঁর বড়ই প্রিয় স্থান, বস্ত্র পরেন না, একটা বাঘের ছাল জড়িয়ে আসেন যখন লোকালয়ে যান তা নয় ত উলঙ্গ। এমনই উদার স্বভাব, যার-তার ঘরে বিনা আহ্বানে উপস্থিত হয়ে দুঃখ

বা পীড়িত যারা তাদের সেবা করে, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে, নিজের ব্যক্তিগত যত্নে তাকে আরোগ্য দিয়ে তবে স্থান ত্যাগ করতেন। তাঁর অদ্ভুত যোগসিদ্ধির কথা যখন আর্য্যরো শুনলেন, কী শীত কী গ্রীষ্মে কোনও বস্ত্র বা আচ্ছাদন অঙ্গে ধারণ করেন না, যথা ইচ্ছা তথা যান, দুমাসের পথ অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করেন, মাদক সেবন করেন, নেশায় সব সময়েই চুরচুর— অনার্য্যরো তাঁকে বলে ভগবান। সম্বৎসরের অর্দ্ধেক, যখন গ্রীষ্মে, বর্ষা, শরৎ ঋতু তিনি থাকতেন কৈলাসে, ও-দেশের লোকেরা তাকে ঐ সময়েই কাছে পেত; হিমালয়ে তিনি থাকতেন না, কারণ হিমালয় ছিল আর্য্যদের স্বর্গ, তাদেরই অধিকার। তবে এই হিমালয়ের এক মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন, আর্য্যদলের এক প্রজাপতির মেয়ে, তাঁর গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁর গলায় মালা দেবার জন্য অনেক তপস্যা করেছিলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যখন তিনি কৈলাসে থাকতেন তখনও উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর পূর্ব অর্থাৎ বাঙ্গলা বিহারেরও বহুতর ভক্ত হিমালয় পেরিয়ে তাঁর কাছে আসবার জন্য তীর্থযাত্রা করে বেরুত। আর্য্যরা এমন অদ্ভুত মানুষ পূর্বে দেখেননি। তাঁদের নিজেদের দলের দেবতা আর নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের গুমরেই মরেন,— এ একটা অনার্য্য মুখ্যু, অশিক্ষিত মানুষ— আচার মানে না, বেদ মানে না, পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ তার কোন অনুষ্ঠানই নেই এমন একটা লোককে আর্য্যদের চোজ্‌ন্ পিপ্‌ল অফ্ গড— অর্থাৎ ঈশ্বর-নির্বাচিত মানুষ কি করে মানতে বা শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করতে পারেন? তারপর উমার যখন বিবাহ হ'ল শিবের সঙ্গে, আর্য্যদেবতারা ত চটে খুন।— কী? এতবড় স্পর্দ্ধা শিবের, আর্য্য প্রজাপতির মেয়েকে বিবাহ করে! সমুচিত দণ্ড দেবার বা শক্তি পরীক্ষার এই তো সুযোগ! তাতেই দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার ঘটল, শিবের ঐশ্বরিক মহাশক্তির পরিচয় আর্য্যরো যখন পেলেন তখন গরব আর রইল না, শিবের কাছে মাথা হেঁট করতে হ'ল, শিব তখন মহেশ্বর হলেন। যজ্ঞের বাগ তখন থেকেই শিবের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল।

আমি বলিলাম: সে কত দিনের কথা? তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন: পাঁজি-পুথি নিয়ে কি আমরা সে সময়ে বসেছিলুম রে শালা? ফের ওসব বাজে কথা কইবি না, তা হোলে আর কিছু শুনতে পাবি না,—

আমি তখন— না না, অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন— বলিয়া জোড়হাত করিলাম; তাহাতে তিনি যেন আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন: ফের শালা তুই আমার কাছে বাহ্য শিষ্টাচারের ভান করছিস্?

আমি বলিলাম: আমাদের ওটা কেমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আর ওসব কথা বলব না। এখন আপনি তার পর বলুন। ...

বর্তমান রচনাংশগুলো প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ* গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

কলিম খান

যোজনগন্ধবিকার: 'সিস্টেম ডিজাইনিং'-এর একটি সমস্যা

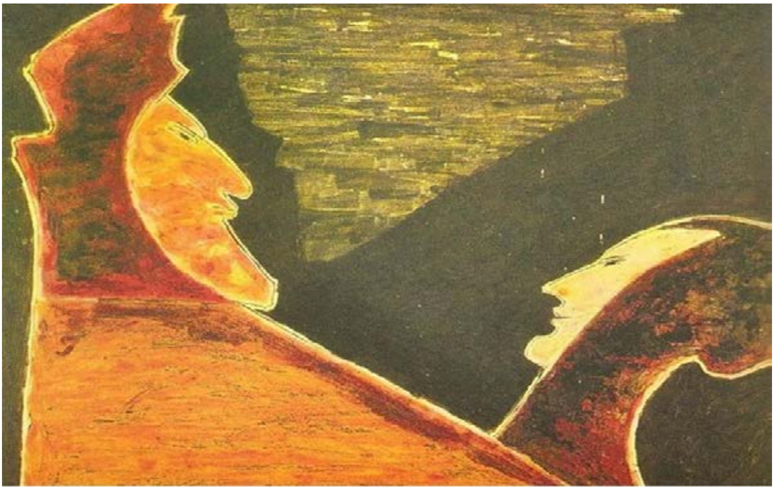

Rabindranath Tagore

শ্রী ভগবান কহিলেন ... হে ভারত। মহৎ ব্রহ্মই আমার যোনি। তাহাতেই আমি গর্ভ নিক্ষেপ করি। তাহা হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। – গীতা ১৪: ৩

There are other pitfalls, including the widespread practice of manipulating information. Public relations people, for example, often put out press releases which are little more than sales promotion. – William Davis in 'Great Myths of Business.'

অমৃতলিঙ্গম ও ব্রহ্মযোনি-কথা

The Story of Software & Hardware

'লিঙ্গ' শব্দের প্রথম অর্থ 'জ্ঞানসাধন'। অর্থাৎ যার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়, তাকে

লিঙ্গ বলে।[1] আজকের সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির কাছে কথাটা বেশ অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতেরা জানেন কথাটা শতকরা একশ ভাগ নির্ভুল। বহু প্রাচীনকাল থেকেই লিঙ্গ শব্দের ঐরূপ অর্থ প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রায় সমস্ত পুরনো অভিধান ও শব্দার্থকোষে ঐরকমই উল্লেখ রয়েছে। তাহলে কেন সেকথা ভাষাবিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের শেখালেন না। কেন আজকের শিক্ষিত বাঙালি ছেলেমেয়েরা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মায়েরাও, 'লিঙ্গ' শব্দের কেবল gender ও penis এই দুটি অর্থই জানলেন? – এর অনেকগুলি কারণ আছে। একটি কারণ হল, কেন যে 'লিঙ্গ'কে 'জ্ঞানসাধন' বলা হত, কিংবা 'জ্ঞানসাধন'কে 'লিঙ্গ' বলা হত, সেকথা তথাকথিত ভাষাবিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা নিজেরাই জানেন না। আর যা জানা নেই, অভিধানে লেখা আছে বলেই সেকথা শেখাতে যাওয়া বেশ বিপজ্জনক। তার চেয়ে বরং ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই মঙ্গল। সেইজন্য এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা সমীচীন মনে করেননি তাঁরা। কিন্তু একটি শব্দের দশটি অর্থের ভিতর মাত্র দুটিকে, এইভাবে, উত্তরসূরিদের শেখানোর ফলে বাংলা ভাষার শতকরা আশি ভাগই যে বাদ পড়ে যেতে পারে, সেকথা তাঁরা খেয়াল করেননি।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, বাংলা ভাষায় ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলে পর, বাংলা শব্দের 'আত্মাবদল'[2] সাঙ্গ হয় এবং তার ফলে লিঙ্গ যোনি প্রভৃতি শব্দগুলির ভিতর থেকে তাদের পুরনো ও বহুকালক্রমাগত অর্থগুলিকে বের করে ফেলে দিয়ে কেবল একটি (বা কদাচিৎ দুটি) করে অর্থকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যেমন লিঙ্গ শব্দের ভিতরে penis এবং যোনি শব্দের ভিতরে vagina প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। যেহেতু প্রভু ইংরেজের ভাষায় একটি শব্দে একটি বিষয় বা বস্তুকে বোঝানোর একরৈখিক নিয়ম, বাংলা ভাষার ভিতরেও সেই নিয়ম প্রচলিত হয়ে যায়। আক্ষেপের কথা এই যে, রাজনৈতিকভাবে আজ ব্রিটিশ চলে গেছে বটে, কিন্তু বাংলা ভাষার ভিতরে সে আজও উপনিবেশ চালিয়ে যাচ্ছে বহাল তবিয়তে। তাই বহুরৈখিক বাংলা ভাষার পুনর্নবীকরণ করা যায়নি, আজও। আর সে কাজে প্রধান বাধা তথাকথিত ভাষা-বিশেষজ্ঞরাই।

যাই হোক, লিঙ্গ যোনি প্রভৃতি শব্দগুলিকে তাদের বহু অর্থসম্পদ থেকে

---

১ দ্রষ্টব্য: শ্রীহরিচরণ বন্দোপাধ্যায় বিরচিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। এই নিবন্ধের বেশিরভাগ শব্দার্থ ঐ শব্দকোষ থেকেই নেওয়া হচ্ছে। পরে আর সেকথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে না। এক্ষেত্রে লিঙ্গ শব্দের তিনি অর্থ দিয়েছেন – জ্ঞানসাধন, সাধ্যের সাধন, চিহ্ন, লক্ষণ, পুংশ্চিহ্ন, স্ত্রঅচিহ্ন, শিশ্ন, gender, মূর্তি, হেতু, সূক্ষ্মশরীর, অর্থ প্রকাশন সামর্থ ইত্যাদি।

২ দ্রষ্টব্য: 'ভাষায় ঔপনিবেশিকতা'। এই গ্রন্থের [কলিম খানের *দিশা থেকে বিদিশা* গ্রন্থের] ৮ম প্রবন্ধ।

বিচ্ছিন্ন-বঞ্চিত করে একার্থবাচক (বা একার্থের শৃঙ্খলসম্বল প্রলেতারিয়েত) শব্দে পরিণত করবার পর থেকে আমরা বাংলা ভাষাভাষিগণ ঐ শব্দদুটির সাহায্যে মানব শরীরের দুটি অঙ্গ মাত্রকেই বুঝে থাকি। এর ফলে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের শাস্ত্রগুলিতে, লিঙ্গপুরাণ, যোনিতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে, মহাভারত থেকে শুরু করে সকল প্রকার পৌরাণিক, প্রাকৃত ও প্রাচীন বাংলা ভাষার গ্রন্থগুলিতে, লিঙ্গ ও যোনি বিষয়ে যে শত শত পৃষ্ঠা লিখে রেখে গেছেন, সেগুলি আজ আর আমরা বুঝতে পারি না। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে যে শত শত লিঙ্গ-মন্দির, লিঙ্গমূর্তি, যোনিমূর্তি, লিঙ্গপূজা-যোনিপূজা ও তৎসংক্রান্ত আচার-আচরণ, জল-ঢালা, দুধ-ঢালা ইত্যাদি ইত্যাদি – এসব কিছুই আজ আমরা বুঝতে পারি না। যে জাতি শূন্যের আবিষ্কারক, সংস্কৃতের মতো ভাষার স্রষ্টা, যার সঙ্গীত ও নৃত্য উচ্চ কোটির মস্তিস্কের সাক্ষ্য দেয়, যে বস্ত্র থেকে চিনি পর্যন্ত বহু পণ্যের আবিষ্কর্তা, সে ঐ সমসময়ে হঠাৎ লিঙ্গ ও যোনিপূজা করতে গেল কেন – এমন প্রশ্ন আমরা করি না। 'নিম্ন অধিকারী'[৩]র penis ও vagina পূজাকে ভারতীয় মনীষার লিঙ্গ-যোনিপূজা ভেবে গ্লানিতে ভুগি বা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। প্রায় চোখের উপর গান্ধী-মার্কসের মহানতা ও বিশালতা আমরা দেখেছি, আবার তাঁদের জন্মদিনে পাড়ার দুর্বৃত্তকে তাঁদের ফটোতে মালা দিতেও আমরা দেখি, এবং এক্ষেত্রে যদিও প্রকৃত গান্ধী-মার্কসের সঙ্গে দুর্বৃত্তের গান্ধী-মার্কসের যে আসমান জমিন ফারাক তা আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু পৌরাণিক লিঙ্গ-যোনিতত্ত্ব এবং প্রাচীন ভারতীয় মনীষার দূরতর-নিম্ন অধিকারী উত্তরসূরিদের লিঙ্গ-যোনিপূজার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য তা আমরা দেখতে পাই না। ভাবি সবই এক, বর্বরদের কীর্তি। তারপর আবার ব্রিটিশের মতো করে ঐগুলিকে ঘৃণার চোখে দেখি, দেখতে শিখি। প্রভু ব্রিটিশের শিক্ষায় শিক্ষিত হই, তাদের ভালোমন্দ বোধ দ্বারা 'আলোকপ্রাপ্ত' ও কলুষিত হই, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ভালোমন্দ বোধ থেকে, আমরা শিক্ষিত বাঙালিরা, একসময় সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে যাই। একদিকে পুরুষানুক্রমে আগত বৈদিক অচলায়তন ও অপরদিকে নিম্ন-অধিকারীদের নানা প্রকার আচারসর্বস্বতা, লিঙ্গপূজা, যোনিপূজা, অনাচার ইত্যাদি এই দুই বিপরীত মেরুর মৌলবাদিতা আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যের হাত থেকে ছাড়ান পেতে প্ররোচিত করে। সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ আমাদেরকে আমাদের অতীত থেকে এমনভাবে উৎপাটিত করে দিয়েছে যে আমরা আমাদের মাটি থেকে পৃথক হয়ে গেছি। আজ আমরা আমাদের

৩ ভারতীয় শাস্ত্রালোচনায় অধিকারীভেদ ছিল। একই বর্ণনার উত্তম ও নিম্ন-অর্থ ছিল এবং উত্তম অর্থের সূত্রগুলি সবাইকে দেওয়া হতো না, সবাই সে অর্থ ধারণেও সক্ষম ছিল না। অধিকারীগণ তাই 'উত্তম অধিকারী' ও 'নিম্ন-অধিকারী' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।

নিজস্ব মাটিকেই না চেনার চেষ্টা করি, ঘৃণা করি। কারণ আমাদের প্রভু ইংরেজ ঐ মাটিকে ঘৃণা করত, করতে শেখাত। এভাবেই আমরা আমাদের অতীতকে অস্বীকার করতে শিখে গেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে আমাদের কত ক্ষতি করেছে, করছে, তা আর বলে শেষ করা যাবে না। নিজেদের অতীতকে ঘৃণা করতে শিখে, আমরা শিক্ষিত বাঙালিরা, ক্রমে একদিন মানসিকভাবে অনাথ হয়ে যাই।

এই দুরবস্থা ও দুর্বিপাকের সুযোগে শেষ মার মারেন লঙ সাহেব। এমনিতেই আমাদের বর্ণাশ্রমবাদীরা বঙ্গীয় শব্দসমাজেও গুরুচণ্ডাল ভেদ তো চালু করেই রেখেছিলেন – মড়ার সঙ্গে দাহের এবং শবের সঙ্গে পোড়ার বিবাহবন্ধন মেলামেলি নিষেধ করে রেখেছিলেন, তার উপর লঙ সাহেব দিলেন অস্পৃশ্যতার হুকুম, বিধান। লিঙ্গ, যোনি থেকে শুরু করে ভগ, –, –, ... ইত্যাদি ইত্যাদি বহু বহু শব্দই অচ্ছুৎ, অন্ত্যজ, ইতর শব্দরূপে ঘোষিত হয়ে গেল; ভদ্রলোকের এলাকায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বলা হল, অমুক শব্দ শ্লীল, তমুক শব্দ অশ্লীল। শব্দসমাজেও যে সুজাত, অজাত-কুজাত ও বজ্জাত প্রভৃতি উচ্চনীচভেদ হয়, এমন ধারণার সঙ্গে বাঙালির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। ক্রমে একদিন ভাষাজগতে চালু হল লাইসেন্স-পারমিট-গেটপাস-আইডেনটিটি কার্ডের প্রথা; দেখা দিল শব্দেরও আইডেনটিটি ক্রাইসিস। ‘ভগ’ শব্দের মতো যে সকল শব্দের ‘ভগ’বান জাতীয় হাই ক্যাচ ছিল, তারা কোনওমতে পার পেয়ে গেল বটে, কিন্তু বেশিরভাগ অচ্ছুৎ শব্দের ভাগ্যে পাঠশালায় (অ্যাকাডেমিতে) প্রবেশ করবার অনুমতি মিলল না। অগত্যা তাদের থেকে যেতে হল কামারশালায়, কুমারশালায়, কর্মজগতে, ক্ষেত-খামারে; চাষাবাঙালি দরিদ্রবাঙালি মূর্খবাঙালির এক্তিয়ারে। ভদ্রলোকদের লোকালয়ে প্রবেশ করবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্লীলতার গেটপাস তারা পেল না। আর সেই সকল গেটপাস পাওয়ার অযোগ্য শব্দগুলিকে স্থান দেবার অভিযোগ থেকে পুরাণাদি গ্রন্থগুলিকে[৪] নিষ্কৃতি দেওয়া হল সম্ভবত বর্বর ভারতীয়দের বর্বর যুগের কীর্তি বলে। ‘অমৃতলিঙ্গম’ পদবিধারী মানুষদের নিষ্কৃতি জুটল, খানিকটা অমৃতের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে, খানিকটা ঐ অজুহাতে যে নামবাচক বিশেষ্যমাত্রেই অর্থহীন। মোট কথা, নেটিভ্ ও কালো মানুষদের যে দুরবস্থা ব্রিটিশরা করেছিল, এই সকল ‘ব্ল্যাক-লিস্টেড্’

৪ পুরাণাদিতে যে সকল ‘অশ্লীল’ শব্দের প্রয়োগ আছে, তা শুনলে, কর্ণ-কদমগাছ (চক্ষু-চড়কগাছের বদলে) হয়ে যাবে। তবে সেই পুরাণ রচয়িতারা কতখানি বর্বব ছিলেন তা ইংরেজরা কিন্তু জেনে গিয়েছিলেন; ‘Indians were people for ages, cultivated by all the arts of polished life whilst we were yet in the woods’. অর্থাৎ ভারতীয়দের তুলনায় আমরা ইউরোপীয়রা জংলি – কট্টর ভারতবিরোধী এডমন্ড বার্ক ভারততত্ত্ববিদ উইলিয়াম জোন্স্কে। দ্রষ্টব্য: India and the Romantic Imagination – by John Drew.

শব্দসমূহের একই অবস্থা করে ছাড়ল তারা। তারপর একদিন ব্রিটিশরা চলে গেল। শোনা গেল অবহেলিত অচ্ছুৎ অন্ত্যজ দলিত নিপীড়িতরা এবার সামাজিক ন্যায়বিচার বা 'সোস্যাল জাস্টিস' পাবে। কিন্তু সোস্যাল-জাস্টিসের সংবিধানের পাতা থেকে বেরিয়ে সমাজের দিকে যাওয়ার তোড়জোড় করতেই পঞ্চাশ বছর খরচ হয়ে গেল। ভারতসমাজে ও ভারতীয়দের শব্দসমাজে নিপীড়িত অবহেলিত অস্পৃশ্য দলিতদের আজও এই একই হাল।[৫]

তা সে যাই হোক, আজ যখন সারা দুনিয়া জুড়ে মানবসমাজে বড় ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অন্ত্যজ অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় দলিত নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীগুলি তাঁদের মর্যাদার দাবি নিয়ে উঠে আসছেন, নিষিদ্ধ অবহেলিত অস্পৃশ্য শব্দেরাও আপন মর্যাদার দাবি নিয়ে যে উঠে আসবেই, তাতে সন্দেহ নেই। কেবল তাই নয়, মানবসমাজের ঐ আগুয়ান গোষ্ঠীগুলি যেমন ইতিহাস খুঁড়ে আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করে নিজেদের আইডেনটিটি গড়ে নিচ্ছে, শব্দসমাজের নিষিদ্ধেরাও খুঁজে ফিরছে নিজেদের যথার্থ পরিচয়। সেই খোঁজই বহু দূর থেকে লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদককেও প্ররোচিত করছে নিষিদ্ধদের নিয়ে কথা বলতে। ছন্নছাড়ারা তাই ছন্নছাড়াদের কথা বলতে চেষ্টা করছে। মানবসমাজে ও শব্দসমাজে নিষিদ্ধদের এ এক নিঃশব্দ সংগ্রাম। এবার তাহলে যাওয়া যাক, চলুন, আমরাও ঐ সংগ্রামে সামিল হয়ে পড়ি।

যার দ্বারা কর্ম সাধিত হয়, সেই 'কর্মসাধন'কে সাধারণভাবে হাতিয়ার বলা হয়ে থাকে। মার্কসীয় টারমিনোলজি অনুসারে একে বলা হয় 'মিনস অব প্রোডাক্‌শন্‌' বা 'উৎপাদনের উপায়'। হাতের সাহায্যকারী বন্ধু বা ইয়ার বলেই কর্মসাধনের নাম হয়েছে হাত-ইয়ার বা হাতিয়ার। কিন্তু শুধুমাত্র হাতিয়ার নিয়েই তো মানুষ কোনও কর্মে লিপ্ত হয় না। শরীরের অন্যান্য অঙ্গকেও, যথা চোখ কান ইত্যাদি এবং সর্বোপরি মনকেও মানুষ একই সঙ্গে কর্মে নিয়োগ করে। অর্থাৎ কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সময় মানুষ তার দেহ ও মন দুটিকেই নিয়োগ করে থাকে। দেহের দ্বারা যাকে মানুষ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে তার সাধারণ নাম হাতিয়ার, সন্দেহ নেই; কিন্তু মন দিয়ে যাকে

---

৫ সম্প্রতি এক সেমিনারে বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল লেখক জানালেন যে, পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত লিঙ্গ যোনী শব্দ দুটির সাহিত্যসভায় (পড়ুন – ভদ্রলোকদের সাহিত্যসভায়) প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় শব্দ দুটি এখন ছাপার অক্ষরে লেখা যাচ্ছে। এ যেন শব্দসমাজে ভারতসমাজের সেই ঘটনার প্রতিচ্ছবি, যে ঘটনার মাধ্যমে ভারত সরকার জাকির হুসেন, জৈল সিং, কে. আর. নারায়ণ প্রমুখকে 'শো-পিস' করে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে মর্যাদা দেওয়া গেছে বলে দাবি করেন কিংবা সিকন্দর বখ্‌ত্‌কে একই উদ্দেশ্যে 'শো-পিস্‌' বানায় বিজেপি।

পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম কী? প্রশ্নটিকে অন্যভাবেও উপস্থাপন করা যায়; হাতের যেমন 'হাত-ইয়ার' আছে, তেমনি মনের কি কোনও 'মন-ইয়ার' আছে? থাকলে সে মনিয়ারের নাম কী?

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপ প্রশ্নটিকে আজও ঠিক এইভাবে উত্থাপন করে উঠতে পারেনি। বস্তুত পাশ্চাত্য জ্ঞানজগতে বিশেষত তাদের অ্যাকাডেমিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, এইভাবে এই প্রশ্ন কখনও ওঠেনি, ফলে উত্তরটিও তাঁদের সরাসরি জানা নেই। (তারা জানেন অন্যভাবে, এবং সে জানাও কম মহত্ত্বপূর্ণ নয়, তবে সে বিষয়ে আমরা পরে আসব।) কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসী কেবল যে প্রশ্নটি ঐভাবে উত্থাপন করতেই সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, তার উত্তরটি তাঁরা উপলব্ধি করে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেহের সাহায্যকারী হাতিয়ারের পাশাপাশি মনের হাতিয়ারটিকেও তাঁরা শনাক্ত করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন 'লিঙ্গ'। প্রাচীন ভারতীয় পণ্যের কাঁধে চেপে প্রাচীন ভারতীয় শব্দের বিদেশভ্রমণ ও যস্মিন্ দেশে যদাচার গ্রহণের নীতি মান্য করে ঐ 'লিঙ্গ' শব্দই Lingo, Lingual, Linguist, Linguistic, Language[৬] ('অর্থপ্রকাশন সামর্থ' / দ্র.পাদটীকা ১) প্রভৃতি অনাবাসী ভারতীয় উত্তরসূরিদের জন্ম দিয়েছে, সে কথা নিঃসন্দেহে এখন বলে দেওয়া যায়। আর Language যে মনের হাতিয়ারগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, সেকথা পোস্টমডার্ন সমাজতত্ত্ববিদগণ এখন খুব ভালোই জানেন।[৭]

এই মুহূর্তে কমপক্ষে চারখানি প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। (ক) তাই যদি হয়, প্রাচীন শব্দকারগণ মানসিক হাতিয়ারকে 'লিঙ্গ' শব্দে প্রকাশ করতে গেলেন কেন? (খ) লিঙ্গ শব্দের যদি এইরকম অর্থ হয়, তবে যোনি শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? (গ) সেই লিঙ্গ যোনি শব্দ শেষমেশ penis ও vagina-তে পরিণত হল কী করে? (ঘ) প্রাচীন রচনাগুলিতে শব্দ দুটি কি কখনও মানব শরীরের ঐ অঙ্গদ্বয়ের অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি?

বিষয়টিকে যথাসম্ভব সরলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা যাক। কর্মে রত হওয়াকে রতি বলে। সেই রতিক্রিয়ার (রতিক্রীড়ার নয়) বিস্তারিত উপলব্ধি থেকে

---

৬ প্রাচীন সংস্কৃত শব্দই যে বিদেশে গিয়ে সব মুখ্য ভাষাগুলির জন্ম দিয়েছে, সেকথা প্রমাণ করার চেষ্টা অনেকে ইতিপূর্বেই করেছেন। তবে ব্যাপারটি বিশ্বশাসকের মনঃপূত নয় বলে, ব্যাপারটিকে আজও তেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে শ্রীমদনমোহন সিংহানিয়া একজন একনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকারী বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব বলে শুনেছি।

৭ আগে ছিল সৈন্য, পরে হল পণ্য, এখন হয়েছে শব্দ (word)। এককালে যার সৈন্য বা পণ্য যত পরাক্রমী ছিল সে ছিল তত বড় শাসক। এখন যার ভাষা যত বেশি সর্বত্রগামী, সে তত শক্তিশালী শাসক। এটি ইদানিন্তন উপলব্ধি।

বিষয়টি অনেক সহজবোধ্য হয়ে যাবে। ধরা যাক আপনি একটি টেবিল তৈরি করবেন বলে ঠিক করেছেন। এই কর্মে রত হতে গেলে সর্বাগ্রে চাই একটা টেবিলের কল্পনা, ছক বা নক্সা, যা থাকবে আপনার মনে। সেই অনুযায়ী আপনি তক্তা বাটাম ইত্যাদি সংগ্রহ করবেন এবং সেগুলিকে মনের ছকটির মতো করে কেটে কুটে জুড়ে যাতে বানিয়ে ফেলা যায় সেই রকম হাতিয়ার অর্থাৎ হাতুড়ি, বাটালি, করাত ইত্যাদি শুরুতেই আপনি সংগ্রহ করবেন। এরপর ছক ও হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়ে আপনার দেহমন ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে রাখা তক্তা ও বাটামগুলির উপর। কখন কোন হাতিয়ার চালাবেন এবং কেমন করে তাদের জুড়বেন, সেটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করছে আপনার মনের ছকটা। ক্রমে আপনার ঐ ছকটা বাস্তব দেহ পাচ্ছে, আর আপনার মন রেকর্ড করছে ছক অনুসারে, কাঠ ও হাতিয়ারের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে কোথায়-কোথায় কী-কী অসুবিধা হচ্ছে। অর্থাৎ আপনি কাজটি করতে করতে বুঝে গেলেন, কল্পিত ছকটি কেমন হলে আরও ভালো হত। এটা একটা অভিজ্ঞতা হল। টেবিলটাও তৈরি হয়ে গেল – প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় ‘পুত্র’ লাভ হল। ... এই যে সমগ্র ঘটনাটি আপনি ঘটালেন, দেখা যাচ্ছে এতে দেহের দ্বারা ব্যবহৃত হাতিয়ারের সাহায্যে পাওয়া গেল কর্মফল রূপে টেবিলটা, আর মানসিক ছকটির সাহায্যে পাওয়া গেল অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান। মনের মধ্যে ঐ যে ছক, নক্সা বা পরিকল্পনা, সেটাই সমগ্র ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক এবং অন্তিমে অভিজ্ঞতা-অর্জনকারী। মানসিক নিয়োগের ফলটা পেল দেহ, কর্মফল রূপে, দৈহিক নিয়োগের ফলটা পেল মন, জ্ঞানফল রূপে। অর্থাৎ লিঙ্গ যদি কর্মরত না হত ঐ জ্ঞান তার ভাগে জুটত না। তাই ঐ ছকই মন-ইয়ার। তাই মন-ইয়ারই জ্ঞানসাধন। জ্ঞানসাধনই লিঙ্গ।

মার্কসীয় ভাষায় এই মন-ইয়ারকে বলে ‘বিশেষ-উদ্দেশ্য’। বানর ফল পেড়ে খায়, সেটি মার্কসীয় ভাষায় ‘শ্রম’ নয়। যদি সে ‘বিশেষ উদ্দেশ্যে’ একটি গাছের ডাল ভেঙে হাতে নিয়ে অর্থাৎ ভাঙা ডালটিকে হাতিয়ার বানিয়ে তার সাহায্যে ঐ ‘বিশেষ উদ্দেশ্য’ সফল করে অর্থাৎ ফলটি পাড়ে, তবেই সেটিকে বলা হবে ‘শ্রম’। তার মানে, মনে থাকবে বিশেষ উদ্দেশ্য বা ছক, হাতে থাকবে হাতিয়ার, সামনে থাকবে ঐ ছক ও হাতিয়ারের যুগপৎ নিযুক্ত হবার ক্ষেত্র – তবে হবে ‘শ্রম’। ঐ মানসিক-পরিকল্পনা বা ছক বা ‘বিশেষ উদ্দেশ্য’কেই প্রাচীন ভারতীয়রা বলতেন লিঙ্গ। ‘বানর থেকে মানুষে উত্তরণে শ্রমের ভূমিকা’র বর্ণনায় এঙ্গেলস ঐ ‘উদ্দেশ্য-প্রণোদিত’ শ্রমের কথা বিস্তারিত বলেছেন। বস্তুত আজকের যুগের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ও বিপুল পণ্যসম্ভার ঐ ‘উদ্দেশ্যে’র বা লিঙ্গের সৃষ্টি। প্রাচীন ভারতীয়রা তাই লিঙ্গদেবকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে ঘোষণা করেছেন।

কেন ঐ মন-ইয়ারকে লিঙ্গ নাম দেওয়া হয়েছিল? ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থ-বিধি[৮]

---

৮ একমাত্র সংস্কৃত বা তার কন্যাস্বরূপা ভাষাগুলির ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে

অনুসারে 'লীন হবার জন্য যে গমন করে' তাকে লিঙ্গ বলে। এই সুবাদে বিশ্বে যা কিছু লীন হবার জন্য যায় তারা প্রত্যেকেই লিঙ্গ পদবাচ্য। হতে পারে সে টেবিলের হুক, হতে পারে নতুন কৃষি পরিকল্পনা, হতে পারে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ, হতে পারে যেকোনোও রকমের সফটওয়ার, এমনকি পুং-জীবের লিঙ্গও হতে পারে। কেবল দেখা দরকার তারা সবাই 'লীন হবার জন্য' যাচ্ছে কি না। বহুরৈখিক প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার এই কারিস্মা। স্বভাবতই লিঙ্গ শব্দ বহু সংখ্যক অর্থ ধারণ করে, অর্থাৎ মানব শরীরের লিঙ্গ থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতিচেতনা পর্যন্ত সর্বপ্রকার লীনভাবাকুল সত্তাকেই লিঙ্গ শব্দে উল্লেখ করা সম্ভব। আবার বিপরীতে যেখানে নিযুক্ত হয় সেই ক্ষেত্রকে অর্থাৎ 'যোজন-বিয়োজন গ্রহণ করে যে' সেই কর্মক্ষেত্রকে 'যোনি' বলে। হতে পারে সেটা টেবিলের জন্যে আনা তক্তাগুলি, হতে পারে বিশেষ ভূখণ্ড, হতে পারে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল zone (যোনি), হতে পারে যেকোনোও প্রকারের হার্ডওয়ার, এমনকি স্ত্রী-জীবের যোনিও হতে পারে। মোট কথা যেকোনোও ক্ষেত্রই বা zone-ই যোনি পদবাচ্য। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমা রাও যখন দাভোস্-শীর্ষ সম্মেলনে, গ্যাট চুক্তির প্রাক্কালে, বিশ্বের 'পুঁজি ও নো হাউ' রূপ লিঙ্গকে ভারতে 'বিনিয়োগের' জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন 'ভারত গর্ভ উন্মোচন করে'[৯] অপেক্ষা করছে, তখন ঐ প্রকার লিঙ্গ যোনি জ্ঞানেরই প্রকাশ ঘটান, হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারেই।[১০]

তাহলে দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ শব্দের ছত্রচ্ছায়ায়, 'শিশ্ন, পুংশ্চিহ্ন' থেকে শুরু করে থিয়োরি, তত্ত্ব, ডিজাইন, জ্ঞান, নো-হাউ, বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি ইত্যাদি ইত্যাদি এমনকি এ যুগের সফটওয়্যারও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিপরীতে যোনি শব্দের ছত্রচ্ছায়ায় 'স্ত্রীচিহ্ন, ভগ' থেকে শুরু করে প্র্যাকটিস, প্রয়োগ, এগজিকিউশান, কর্ম, নো-হোয়ার, পুঁজির রমণক্ষেত্র ইত্যাদি ইত্যাদি এমনকি এ যুগের হার্ডওয়ারও

একটি বিশেষ নিয়ম থাকায়, তা পৃথিবীর অন্য সকল ভাষা থেকে বাংলাকে পৃথক বিশেষত্ব দিয়েছে। এই বিশেষ নিয়ম হল, এই ভাষায় শব্দেরা বর্ণের মাধ্যমে অর্থ বহন করে এবং তার মূলে রয়েছে এক বা একাধিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি বিষয়ে লেখকের একাধিক রচনা বিদ্যমান। দ্র: 'ভাষাতত্ত্বের পূর্ব দিগন্ত', 'মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে' প্রভৃতি।

৯ বাক্যাংশটি নেওয়া হয়েছে শ্রীনিরপেক্ষ মহাশয়ের একটি নিবন্ধ থেকে, দাভোস সম্মেলনের পরে পরেই আনন্দবাজারে যেটি প্রকাশিত হয়।

১০ অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় ক্ষেত্র দুই প্রকার। যে ক্ষেত্রে বীর্য/বীজ নিষেক করার পর ক্ষেত্র সন্তানকে একই পথে বমন (woman) করে তাকে বলে প্রিয়ব্রত যোগ। যেমন জমি, নারী ইত্যাদি। আর যে ক্ষেত্রে বীর্য নিষেক করার পর ক্ষেত্রই সন্তানে নবরূপ পায় তাকে বলে উত্তানপাদ যোগ। যেমন টেবিল বস্ত্র ইত্যাদি।

অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। লিঙ্গ যোনি বিষয়ে এই প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে লিঙ্গপুরাণ, যোনিতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এবং নানা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে এবং কামসূত্র সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহেও। তবে সেগুলিকে ক্রিয়াভিত্তিক (বহুরৈখিক, ভেরিয়েবল) শব্দার্থবিধিতে পাঠ করতে হয়, কেননা সেগুলি ঐ বিধি মান্য করেই রচিত। আধুনিকোত্তর ভাষায় সকল প্রকার লিঙ্গকে কেন্দ্র ও কনটেন্ট শব্দেও বোঝানো হয়ে থাকে এবং সকল প্রকার যোনিকে প্রান্ত ও ফর্ম শব্দেও বোঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ বলতে মানব শরীরের লিঙ্গ থেকে শুরু করে লিঙ্গদেহ বা অমৃতলিঙ্গ পর্যন্ত সর্বপ্রকারের লিঙ্গকেই বুঝতে হবে। তেমনি আবার যোনি বললে মানবযোনি থেকে শুরু করে ব্রহ্মযোনি পর্যন্ত সর্বপ্রকার যোনিকেই বুঝতে হবে। অধুনান্তিক ইকোফেমিনিস্ট দার্শনিকরা এই দুই ক্ষেত্রে Universal masculinity ও Universal femininity শব্দ দুটি আজকাল প্রয়োগ করছেন, বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারার পর। আজকের কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় বললে বলতে হয়, বিশ্বের সমস্ত ধরা-অধরা সফটওয়ারই লিঙ্গ পদবাচ্য এবং বিশ্বের সমস্ত জানা-অজানা হার্ডওয়ারই যোনি পদবাচ্য। আগুন জ্বালাতে পারার বিদ্যা যদি আদি সফটওয়্যার হয়, তো পরমাণু জ্বালানি জ্বালতে পারা এ যুগের সফটওয়্যার। তেমনি সমিধকাঠ যদি আদি হার্ডওয়ার হয় তো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোজেক্ট এ যুগের হার্ডওয়ার। এ যুগের যত প্রকার infrastructure, supertstructure ইত্যাদির কথা বলা হয়, তা সবই যোনি পদবাচ্য। ... এইভাবে সর্বত্র বিরাজমান অতিচেতন যখন অমৃতলিঙ্গ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত সম্পর্কের নিয়মজাল[১১] তখন ব্রহ্মযোনি। তন্ত্রশাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে একে বিশ্বযোনি[১২] শব্দেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

যোগসাধনা ও তন্ত্রসাধনা
Coupling & System Designing

মনুষ্যলিঙ্গ থেকে অমৃতলিঙ্গ এবং মনুষ্যযোনি থেকে বিশ্বযোনি পর্যন্ত লিঙ্গ ও যোনির যে বহু রূপ, তাদের মধ্যেকার সম্বন্ধ কী? তারা পরস্পরের বিপরীত গুণবিশিষ্ট, এবং সে কারণেই তারা পরস্পরের পরিপূরক, তাই তারা পরস্পরে 'যোগ্য'। 'যাহাকে যোগ করা যায়' তাকে যোগ্য বলে। যেমন নরকে নারীতে বা নারীকে নরে যোগ করা যায় বলে, তারা পরস্পরের যোগ্য। এইভাবে শ্রম তক্তায় যোগ্য, কৃষি মজুর ও

---

১১ দ্রষ্টব্য: 'ব্রহ্মবিহার অধ্যায়': মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে। সেই নিয়মজালে মানুষ কীভাবে মনন নিষেক করে তার ব্যাখ্যা আছে সেখানে।

১২ 'অতএব শক্তি বা নাদই সমস্ত বিশ্বের যোনি। অথবা সমস্ত বিশ্ব যোনি স্বরূপ।' – পৃষ্ঠা ৩০৪। 'ইনি বিশ্বযোনি নামে খ্যাতা'। – পৃষ্ঠা ১১৩। দ্রষ্টব্য: জ্ঞানার্ণবতন্ত্রম।

সারবীজাদি ভূখণ্ডে যোগ্য, নো হাউ ও পুঁজি ইন্ডাষ্ট্রিতে যোগ্য ইত্যাদি ইত্যাদি, অর্থাৎ সর্বপ্রকার লিঙ্গ যথাযথ বিপরীত যোনিতে যোগ্য। একথা উল্টো ভাবেও বলা যায়। এবং এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা যেতে পারে। মোট কথা যার সঙ্গে যার যোগসাধন সম্ভব, যোগসাধন হলে যারা পরস্পরে কর্মরত হয়, অর্থাৎ যোগসাধন হলে যাদের মধ্যে রতিক্রিয়া প্রবর্তিত হয় এবং ফলে 'পুত্র বা সন্তান'[১৩] উৎপাদিত হয়, তারাই পরস্পরের পরিপূরক বা যোগ্য। যারা 'পুংসবন' (বা বীজমন্ত্র নিষেক) করতে অক্ষম, সেই সকল 'নপুংসক' ও যারা গর্ভধারণে অক্ষম সেইসকল 'নিগর্ভযোগিনী'-দের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। কিংবা তাদের কথাও বলা হচ্ছে না, যারা 'রতিক্রীড়া'-য় রত হয় বলে 'সন্তান' উৎপাদন হয় না; এবং কদাচ 'রতিক্রিয়া'য় রত হয় না। একমাত্র যথাযথ যুগ্মের (binary-র) যোগসাধনেই রতিক্রিয়া প্রবর্তিত হয় এবং তার ফলেই সৃজন সম্ভব হয়। শাস্ত্রে বলেছে: 'সম্পূর্ণ বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলেই, যেকোনোও শক্তিদ্বয়ের সহসা সংযোগ বা মিলন দ্বারা কোনও এক অভিনব ক্রিয়ার উন্মেষ হইয়া থাকে।' ঐ অভিনব ক্রিয়াই নতুন সৃষ্টি, যা কিনা দুই বিপরীত গুণবিশিষ্টের 'অমীমাংসেয়তার' ফল। এই সৃষ্টিই সমাজকে, মানুষকে, বিশ্ব-প্রকৃতিকে এগিয়ে চলার পথ করে দেয়, উপস্থিত অচলায়তনকে এড়িয়ে অহিত বিনাশের উপায় করে দেয়। সেই কারণে যুগ-যুগ ধরে মানুষ লিঙ্গ-যোনির যথাযথ যুগ্মের অনুসন্ধান করে তাদের যোগসাধন করে চলেছে। আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় এই যুগ্মের যোগসাধনাকে coupling বলে।

'একের সহিত অন্যের মিলন কার্যই যোগ', বলেছেন তন্ত্রসাধকেরা। এ যুগের তন্ত্রসাধকদের বলা হয় 'System-Designers'। System (তন্ত্র) শব্দের আদি অর্থ 'standing together'। পুরুষ প্রকৃতি বা লিঙ্গ-যোনিকে একত্রিত করে একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের রতিক্রিয়া হতে দেওয়ার বিদ্যাকেই এ যুগের ভাষায় বলে সিস্টেম-ডিজাইনিং। 'বিশেষ উদ্দেশ্যের' সঙ্গে যথাযথ ক্ষেত্রের, তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, ইত্যাদি ইত্যাদি কোটি রকমের যোগসাধনেই উদ্ভূত হয়েছে বিশ্বের বিপুল জ্ঞানসম্ভার ও বিশাল পণ্যসম্ভার। তন্ত্রসাধনা বা সিস্টেম ডিজাইনিং সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে কোটি রকমের যুগ্মে বিন্যস্ত করে দেখে

---

১৩ পুত্র, সন্তান, উৎপাদন, পুংসবন, নপুংসক, নিগর্ভযোগিনী, রতি, রতিক্রিয়া, রতিক্রীড়া প্রভৃতি শব্দগুলির যথার্থ অর্থ গ্রহণ করতে হয় ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির মাধ্যমে। এগুলি প্রত্যেকটিই বহুরৈখিক শব্দ, স্বভাবতই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকারীদেরকে বোঝায়। রতিক্রীড়ার পার্থক্য সবচাইতে ভালো আলোচনা করেছেন মি: প্লেখানভ তার 'Some Unaddressed Letters of G. Plekhanov' গ্রন্থে, যেখানে তিনি জীবজন্তুর খেলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর আমাদের ক্রিয়া ও ক্রীড়া শব্দ দুটির ভেতরেই সেই রহস্য লুকানো রয়েছে।

নিয়ে, তাদের যোগসাধনে ব্রতী হয়। প্রথমে দুই, তারপর চার, ছয়, আট এইভাবে গড়ে তোলে বাইনারি-ট্রি এবং অবশেষে বাইনারি-ফরেস্ট। এইভাবে তন্ত্রসাধক বা সিস্টেম-ডিজাইনারগণ বাইনারি-বিপরীতগুলি সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এক প্রকার ব্যবস্থা (তন্ত্র) বা সিস্টেম গড়ে তোলেন, যা বিশেষ সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখে। এই কাজে সফল হবার জন্য কোন লিঙ্গের সঙ্গে কোন যোনির যোগ সম্ভব, সে বিষয়ে সম্যকরূপে জানতে হয়। জানতে হয় সমস্ত মিলনব্যাকুল বিরহকাতরদের কথা। আর সেই কথা জানার জন্য তন্ত্রসাধক বা সিস্টেম ডিজাইনারদের যার উপর নির্ভর করতে হয় তার নাম যোজনগন্ধ।

যোজনগন্ধ (প্রকৃত যৌনতা)
Real Information

নর থেকে নারীর উদ্দেশে, নারীর থেকে নরের উদ্দেশে কিংবা লিঙ্গ থেকে যোনির উদ্দেশে এবং যোনি থেকে লিঙ্গের উদ্দেশে – মোট কথা পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পরের উদ্দেশে যে গন্ধ বা ইশারা বা সংবাদ সদাসর্বদা স্বতঃস্ফুরিত হতে থাকে, তাকে যোজনগন্ধ বলে। অর্থাৎ কিনা, যোজনগন্ধ হল যোগসাধনার সম্ভাবনার সংবাদ বহনকারী গন্ধ। যার সঙ্গে যার যোগসাধন সম্ভব, তারা পরস্পরের উদ্দেশে ঐ সম্ভাবনার খবর পাঠাতে থাকে, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই। (সচেতনভাবে, জেনেশুনে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেও ঐ খবর পাঠানো হয়ে থাকে, তবে সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব।) স্বভাবতই ঐ যোজনগন্ধ একান্তভাবেই অস্তিত্বের নিজস্ব ধর্ম। যেকোনোও অস্তিত্ব থেকেই যোজনগন্ধ যথাযথ যোগ্যের উদ্দেশে উৎসারিত হতে থাকে, কেননা শাস্ত্রমতে এ বিশ্বজগৎ ‘পুরুষ প্রকৃতিরূপে (যুগ্ম যুগ্মরূপে) কামসূত্রে গ্রথিত’, এ যুগের বিজ্ঞানমতে যা পরস্পরের ‘পরিপূরক’, ‘যুগ্ম’ অস্তিত্বসমূহের সুশৃঙ্খল এক মহা-অবয়ব। তাই যোজনগন্ধের স্ফুরণ ঘটানো যেমন অস্তিত্বের স্বভাবধর্ম, তেমনি যোজনগন্ধের গ্রাহক হওয়াও অস্তিত্বের স্বভাবধর্ম। সেই কারণে যোজনগন্ধ দু’রকমের: (ক) যে যোজনগন্ধ যোনির (প্রকৃতির) থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে লিঙ্গের উদ্দেশে ধাবমান হয়, তাকে স্ত্রীযোজনগন্ধ বলে, আর বিপরীতে (খ) যে যোজনগন্ধ লিঙ্গ (পুরুষ) থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে যোনির উদ্দেশে ধাবমান হয়, তাকে পুংযোজনগন্ধ বলে। স্ত্রীযোজনগন্ধ মন্ত্রণা দেয় – ‘এসো! এসো! আমাতে যোজিত হও।’ বিপরীতে পুংযোজনগন্ধ আবেদন জানায় – ‘অবকাশ দাও! তোমাতে লীন হয়ে যাই।’ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি এই চিরন্তন লীলার আকাঙ্ক্ষায় চিরব্যাকুল। কর্মক্ষেত্র কর্মীর উদ্দেশে, কর্মী কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশে সদাসর্বদা ঐ যোজন-

গন্ধের স্ফুরণ ঘটায়। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই। এর কোনও শ্লীল-অশ্লীল হয় না। যেমন ফুলের প্রস্ফুটিত হওয়া ও সৌরভ ছড়ানোর কোনও শ্লীল -অশ্লীল, উচিত-অনুচিত হয় না, তেমনি। এটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অনিবার্য এক নিয়ম। তাই একে 'স্বাভাবিক-লিঙ্গতা' (পুংযোজনগন্ধ) বা 'স্বাভাবিক-যৌনতা' (স্ত্রীযোজনগন্ধ) বলা যেতে পারে। কিংবা উভয়ের ক্ষেত্রে একে 'প্রকৃত-যৌনতা'ও বলা চলে।

যদি পৃথিবীতে দিন রাত না হত, আবহাওয়ার কোনওরকম পরিবর্তন না হত, তাহলে পার্থিব সময়কে চিহ্নিত করা একটি কঠিন কাজ হত, সন্দেহ নেই। চিহ্নিত করতে হলে বদল চাই, পার্থক্য চাই, ভেদ চাই। শাস্ত্রে বলেছে – ভেদ থেকেই বেদের (জ্ঞানের) সৃষ্টি। জ্ঞান হল – 'বস্তুর পরিচ্ছেদ্য নির্দ্ধারণী বৃত্তি'।[১৪] অভেদ থেকে জ্ঞানের উন্মেষ নেই। কারণ ভেদ নেই বলে অভেদ পরিমাপযোগ্য নয়। ভেদ থাকলে তবেই পরিমাপ করা সম্ভব হয়। আদিগন্ত বিস্তৃত চিহ্নহীন একরূপী মরুভূমিকে খুঁটি পুঁতে আলাদা করতে না পারলে জরিপ করা যায় না। সবাই জানেন, জরিপ বা পরিমাপ দিয়েই বিজ্ঞানের শুরু। ভেদগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত হলে, তবেই তা ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে পরিমাপযোগ্য হয়ে ওঠে। যোজনগন্ধ যতদিন অবিকৃত ছিল, ততদিন তাকে 'অজানা ধারণা'র অসীম এলাকা থেকে 'পোষা-ধারণা'র সসীম এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে, তার নামকরণ করা যায়নি। জগতে যোজনগন্ধ ছিল, কিন্তু যোজনগন্ধ নামে কেউ তাকে চিনত না; কারণ অবিকৃত ছিল বলে তাকে শনাক্ত করাই সম্ভব হয়নি। যেমন অনবিচ্ছিন্ন ও সমরূপী স্থান, কাল বা পাত্রকে শনাক্ত করা যায় না, তেমনি। চিন্তাবিদেরা জানেন – অমন অশনাক্ত কত বিষয় ও বস্তু যে এই পৃথিবীতে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে, নরমানুষসহ সকল প্রকারের পুরুষই স্বভাবত যেমন পুংযোজনগন্ধ বিকিরণকারী ছিল, তেমনি নারীমানুষসহ সর্বপ্রকারের প্রকৃতিও স্বভাবতই স্ত্রীযোজনগন্ধ স্ফুরণকারিণী ছিল; কিন্তু তাদের সেই স্ফুরণগুণ বা বিকিরণগুণ চিহ্নিত ছিল না। চিহ্নিত হল বিকৃত হয়ে যাওয়ার পর।

সামাজিক উৎপাদন কর্ম্মজগতে, পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যেকার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়ে মর্যাদার অসাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে পর, একসময় সর্বপ্রকারের লিঙ্গগন্ধ ও যৌনগন্ধের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গেল অর্থাৎ সর্বপ্রকারের যৌনগন্ধই একসময় বিকৃত হয়ে গেল। 'পরস্পরের পরিপূরক' অবস্থান থেকে লিঙ্গ ও যোনি, অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতি যথাক্রমে শাসক-শাসিতে পরিণত হয়ে গেলো। 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার[১৫]'-এর সনাতন নীতি থেকে পুরুষ-প্রকৃতি বিচ্যুত হলে পর, অর্থাৎ

---

১৪ দ্রষ্টব্য: শিবপুরাণ / বায়বীয় সংহিতা : ৪.১১।

‘সমুচ্চয়’-এর নীতি পরিত্যক্ত হলে পর, পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে ‘দাম্পত্য’[১৬] সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল। তাই যে যোজনগন্ধ শেষমেষ দাম্পত্য সম্পর্কে ‘পরিণত’ হয় তাকেই বিকৃত যোজনগন্ধ বলা যায়। তখন একজন হয়ে যায় দমিত, অন্যজন হয়ে যায় দমনকারী। আর তখনই সেই বিকৃত যোজনগন্ধই প্রথম চিহ্নিত হতে শুরু করে এবং সেটাও একতরফা। পুরুষ শাসক বলে, তার বিকৃত-পুংযোজনগন্ধ বা বিকৃত লিঙ্গগন্ধ বা লিঙ্গতার নাম হয়ে যায় পৌরুষ, আর প্রকৃতি শাসিত বলে তার বিকৃত-স্ত্রীযোজনগন্ধ বা বিকৃত যোনিগন্ধ বা যৌনতা, ‘যৌনতা’ নামেই নিন্দনীয় হয়ে যায়। প্রকৃতির যোজনগন্ধ ছড়ানো এরপর থেকে পুরুষের সম্মতি সাপেক্ষ, কিন্তু পুরুষ অবাধ। সতীত্বের প্রশ্ন ওঠে, আর সেটা কেবল প্রকৃতির জন্য নির্দিষ্ট এবং অবশ্য পালনীয়। এমনকি সতী শব্দের পুংলিঙ্গও নিষেধ হয়ে যায়। এবার থেকে পুংযোজনগন্ধের নাম পৌরুষ, যা কিনা গৌরবজনক এবং স্ত্রীযোজনগন্ধের নাম যৌনতা যা কিনা নিন্দনীয়। লিঙ্গতা শব্দটিকেই বাদ দিয়ে দেয়া হয়। যোজনগন্ধী পুরুষ এখন থেকে তার পৌরুষের সৌরভের জন্যে সংবর্ধিত, ‘যোজনগন্ধ্যা’[১৭] প্রকৃতি তার যৌনতার জন্যে ‘দুর্গন্ধবতী’ নামে নিন্দিত … কর্মজগতের এই বিশাল পরিবর্তন ছায়া ফেলল মানুষ মানুষির ব্যাক্তিজীবনে। তাদের যোজনগন্ধ বিকারের নাম হয়ে গেল যৌনতা। আর সেই যৌনতা অশ্লীল হয়ে গেল।

যোজনগন্ধ সংকোচ ও যোজনগন্ধ বিকার

Information hiding and misinformation

একই কর্মের পুনরাবৃত্তির মৌলবাদী দক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠা পেলে পর[১৮], পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের বিকৃতি ঘটে। যোজনগন্ধের উপর তার প্রভাব পড়ে সোজাসুজি।

---

১৫ দ্রষ্টব্য: ‘ভাষায় ঔপনিবেশিকতা: প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেন্ট ও বাৎসায়নের কামসূত্র’। এই গ্রন্থের [কলিম খানের *দিশা থেকে বিদিশা* গ্রন্থের] ৮ম প্রবন্ধ।

১৬ দম + পতি = দম্পতি। দম = যাকে দমন করা হয় < দম < Dame < Damesel, ইকুয়াল পার্টনারশিপের সম্পর্ককে নষ্ট, অপরকে ঠেলে নামানোর জন্য যে নিজেও নিচে নামতে থাকে বলে পতিত হতে থাকে, সেইই পতি-পদবাচ্য – [Potent = ‘Physically strong / having great authority, control or domination’; Domination দমন ইত্যাদি]।

১৭ যৌথ সমাজে কোনো গোষ্ঠী যদি আমিষগন্ধী হয় তো সে নিন্দনীয়। তাই পরাশর (‘যে পর আশ্রয়ভোগী’) সহযোগিনী যোজনগন্ধ্যা মৎসগন্ধাও ছিলেন দুর্গন্ধবতী। পরাশরের প্রচেষ্টায় (= বরে) মৎসগন্ধাই একদিন ‘গন্ধবতী’-রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

১৮ এ নিয়ে কলিম খানের *মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে* (কলকাতা: হাওয়া ঊনপঞ্চাশ, ১৯৯৫) গ্রন্থের এত এত পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। – *সম্পাদক*

প্রথমত একই ক্ষেত্রে বারংবার একইভাবে নিযুক্ত হবার ফলে 'জ্ঞান সাধনের' বা লিঙ্গের অর্জন হয়ে যায় সীমিত। নিত্যনতুন ক্ষেত্রে, নিত্যনতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন কর্মে লিপ্ত হবার আবিষ্কারমূলক সৃজনশীল শৈব-নীতি পরিত্যক্ত হবার ফলে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনিত 'কর্মময়ী-অবিদ্যা'র আবির্ভাব হয়। সেই অবিদ্যা স্বভাব-বশতই কর্মক্ষেত্রকে গোপন করতে প্ররোচিত করে। ফলে উৎপাদনক্ষেত্রকে গোপন করার, বেড়া দেওয়ার, ঘিরে দেওয়ার প্রথার প্রচলন হয়ে যায়। আজকের কমপিউটার বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে Information hiding, সেই উৎপাদন-ক্ষেত্র গোপন থেকেই তার আদিম সূত্রপাত। মানুষ শিখে যায়, কেবল কৃষিক্ষেত্রটিই নয়, সর্বপ্রকারের উৎপাদনক্ষেত্রই সুরক্ষিত-গুপ্ত রাখাই উচিত। অর্থাৎ কিনা, কৃষি কাজ করতে শেখার পর, মানুষ যেদিন তার শস্য উৎপাদন-ক্ষেত্রকে গোপন করবার বিদ্যা অর্জন করেছিল, তারপর থেকেই সে তার লিঙ্গ ও যোনিকে ঢেকে রাখা উচিত বলে বিবেচনা করেছিল। বলতে কি, যোজনগন্ধ সংকোচের সে-ই আদি সূত্রপাত। তারপর থেকে সংকোচপ্রথা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। পুরুষ কেবল শাসক হয়নি, প্রকৃতির মালিক হয়ে গেছে বলে মনে করেছে। নিজে ভোক্তা আর প্রকৃতি ভোগ্যা। তাই কর্মক্ষেত্রের সীমা, জমির সীমা, দেশের সীমা প্রভৃতি ঘিরে নানারকমের দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। ক্রমশ বেড়েছে আবরণ, আচ্ছাদন। বিশ্বের সর্বপ্রকারের লিঙ্গ ও যোনিকে ঢেকে রাখতে কত শত আইন যে তৈরি করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। নর নারীকে বোরখা পরিয়েছে, মুখোশ পরিয়েছে। সীমাবদ্ধ করেছে। আকাশ সীমা, সমুদ্র সীমা, জ্ঞানের সীমা, কর্মের সীমা, কর্মক্ষেত্রের সীমা, ভূখণ্ডর সীমা, এক্তিয়ারের সীমা, ইত্যাদি ইত্যাদি – আর সেই সকল সীমা-লঙ্ঘন নিয়েই দুনিয়ার সমস্ত জুডিশিয়ারির কর্মকাণ্ড। প্রত্যেকের যোজনগন্ধ যেন তার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই থাকে। তাই সীমায়-সীমায় লক্ষ লক্ষ পাহারাদার। সীমা সুরক্ষা বল বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের শেষ নেই। ঘরের চারদিকে, কারখানার চারদিকে, বাগিচার চারদিকে, দেহের চারদিকে, মনের চারদিকে, কত না বাউন্ডারি ওয়াল, কত না বিধি-নিষেধ, কত রকমের সীমা। 'আবরণ'[১৯]-অত্যাচারের শেষ নেই। কোনও সীমা দেখতে পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায় দেহের চোখ দিয়ে, কোনও সীমা দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে। আর পাহারাদারও কত রকমের। কলেজের অধ্যক্ষ জেঠু যদি কলকাতার ছেলেমেয়েদের পোষাকের সীমা পাহারা দেন, তো জাতিসংঘের জেঠুরা 'হিউম্যান রাইট্স'-এর সীমা প্যাহারা দেন ইরাকে, বসনিয়ায়, সার্বিয়ায়। যত সীমা, তত

---

১৯ দ্রষ্টব্য: 'আবরণ': শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ। নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে বিস্তারিভিবাবত বিশ্লেষণ কেছেন। উলঙ্গ স্বাভাবিকতার পক্ষে অমন সওয়াল পোস্টমর্ডান ভাবুকদেরও করতে বুক কেঁপে যাবে। এই নিবন্ধের প্রেরণার একটি উৎস রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটি।

সীমালঙ্ঘনকারী, আর তত পাহারাদার। কর্মক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র কোন ক্ষেত্রই নিরাপদ নয়। একদল বাউন্ডারী-ওয়াল তোলে, তো অন্যদল সেটা ভাঙে কিংবা টপকায়। প্রতিটি বিষয়ের সীমা নির্দেশ করে দেওয়াল তোলা যদি দক্ষের ধর্ম তো সীমা লঙ্ঘন করা শিবের ধর্ম। যোজনগন্ধ-সংকোচ দক্ষধর্ম, তো অবাধ যোজনগন্ধ বিস্তার শিবধর্ম। সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে সব দেওয়াল ভেঙে পড়ছে দেখে, বিশ্বের দক্ষেরা তাদের শেষ আশ্রয় গড়ছে, 'পেটেন্ট-আইন'-এর সীমা বরাবর উঁচু করে দেওয়াল তুলে। নিজেদের দেওয়া সীমাটি বাদ দিয়ে, বাদবাকি সমস্ত সীমাগুলিকে অকেজো করে দেয়ার জন্যে, দুনিয়ার সমস্ত সীমালঙ্ঘনকারীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারা 'ট্রান্সপারেন্সি'র ডাক দিয়েছে। তাদের একান্ত বাসনা, সব একাকার হয়ে যাক, কেবল তাদের 'নোহার জাহাজ'টি[২০] একার্ণবের 'মৎস্যের ন্যায়' বেঁচে থেকে যাক। নরনারীর ও তাদের সমাজের এই যোজনগন্ধ-সংকোচ কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে এভাবেই শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়েছে 'জ্ঞানের-মালিকানা'র সংকোচনে। 'পেটেন্ট-আইন' বানিয়ে তার সীমা বরাবর পাহারা বসানোর তোড়জোড়ে।

যোজনগন্ধ-সংকোচ প্রকৃত বিচারে এক প্রকারের ননট্রান্সপারেন্সি, এক প্রকারের গোপনীয়তা। এই গোপনীয়তাই প্রকৃতির উপর পুরুষের[২১] সমস্ত ক্ষমতার উৎস। 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' পুরুষের ও ক্ষমতাধারীর আদি মন্ত্র। সিক্রেট-কারী সেক্রেটারি (secretary = who secrets) ক্ষত্রিয়দের[২২], সচিবদের[২৩] সাহায্যে ও মন্ত্র গোপন করবার অঙ্গীকারবদ্ধ মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণকারী মন্ত্রীদের ছাড়া কোনও ক্ষমতাকেন্দ্রই একদিনও টিকে থাকতে সমর্থ নয়। কিন্তু খবর গোপন করলে, লোকে সেটা খোঁজে। তাই সত্য গোপন করার ভালো উপায় হল ভুল খবর দিয়ে দেওয়া। এই সেই কারণ, যে জন্য একদিন যোজনগন্ধ-সংকোচ করার চেয়ে যোজনগন্ধ-বিকারের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। আধুনিক ভাষায় একে বলে ডিপ্লোমেসি, অ্যাড্ভারটাইজিং, বিজ্ঞাপন, সেল্স-প্রমোশন। এর ফলে সমগ্র সমাজ নানা প্রকারের যোজনগন্ধ-বিকারে কলুষিত হয়ে ওঠে। মিডিয়া বা বায়ুর প্রকোপ বাড়ে। অধুনাতন যুগে গড়ে উঠেছে information highway। তাতে information এর সাথে সাথে misinformation, disindormation-ও সমানে দৌড়াচ্ছে। এমনকি

---

২০ বাইবেলে ও কোরানে এই মহাপ্লাবনের কাহিনী বর্ণিত আছে, যেখানে নোহা পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে বলে ধান, গম প্রভৃতির বীজ, জীবেদের একটি করে sample নিয়ে তাঁর জাহাজে চেপে যান। একই কাহিনী আছে পুরাণে – মৎসের কাহিনীতে।

২১ ভারতীয় শাস্ত্রমতে পুরুষ দুই প্রকার, শিব ও দক্ষ। প্রকৃতি-প্রেমিক পুরুষ ও প্রকৃতি-শাসক পুরুষ। এখানে কেবল দক্ষ পুরুষদের কথা বলা হচ্ছে।

২২ ক্ষত্রিয় শব্দের একটি অর্থ 'সত্যগোপনকারী'।

২৩ সচ্-ইব। সচের মতো। কিন্তু সচ্ নয়। সুতরাং মিথ্যার চেয়েও ভয়ংকর।

information jumble-ও ঘটছে। যোগ্যের জন্য যোগ্যের যে ব্যাকুলতা, তার উপশম ঘটাতে হয় এই কলুষিত প্রদুষিত আবহাওয়ায়। তবে highway তৈরী হওয়া ভালো। আজ যদি তা লুঠেরার কাজে লাগে, কাল তা মানুষের কাজে লেগে যাবে।

আজকের যুগের পত্রপত্রিকাগুলিও এর যথার্থ সাক্ষ্য বহন করে। আনন্দবাজার, আজকাল, প্রতিদিন, বর্তমান, Statesman, Telegraph, Asian Age-এর পাতা খুললেই চোখে পড়বে। দেখা যাবে, পাত্র-পাত্রীর বাবা-মায়েরা পরস্পরের উদ্দেশে যোজনগন্ধ পাঠাচ্ছে। তারা নিজেরা নয়, তাদের অভিভাবকেরা (আজকাল অবশ্য ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ স্বয়ং ঐ বিজ্ঞাপন দেয়, সেটা সুলক্ষণ)। কারণ পুত্র-কন্যারা এখনও পিতা-মাতার অধিকারভূক্ত। এই সেই অধিকার, যে অধিকারে পৌরাণিক যুগে গাধির পিতা তাকে গলায় দড়ি বেঁধে গরু-বেচার মতো বেচতে এসেছিল। আরও আছে। কর্মপ্রার্থী ও কর্মখালির কলম। কারখানা যোজনগন্ধ পাঠাচ্ছে হবু শ্রমিকের উদ্দেশে, বিপরীতে শ্রমিক যোজনগন্ধ পাঠাচ্ছে কারখানার উদ্দেশে। আছে শিক্ষার কলম। সেখানে সাধারণত শিক্ষক (পুরুষ) ছাত্র (প্রকৃতি)[২৪] -র প্রতি যোজনগন্ধ পাঠায় ঐ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। কিংবা সম্পত্তি, ঘরবাড়ি ভাড়া এমনকি ব্যক্তিগত কলমও, প্রকৃত বিচারে, পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পরের উদ্দেশে যোজনগন্ধ পাঠানোর আধুনিক মাধ্যম। কেবল পুরুষ শাসকে পরিণত হয়ে কলুষিত হয়ে গেছে, আর প্রকৃতি শাসিতে পরিণত হয়ে গ্লানিগ্রস্ত হয়ে গেছে বলে, এবং এই অবস্থা বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছে বলে, এই প্রকার মাধ্যমের সাহায্যে এ যুগে যে যোজনগন্ধ পাঠানো হয়, তা বিকারগ্রস্ত। যোজনগন্ধ-গ্রাহককে বোকা বানানো যোজনগন্ধ-প্রেরকের স্বার্থের পক্ষে অনুকুল বলে, ঐ বিকার ঘটানো হয়। কারণ এখন গ্রাহক-প্রেরক উভয়েরই 'ব্যক্তিগত স্বার্থ' বিদ্যমান, কেননা ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান। তাই যোজনগন্ধকে বিকৃত করা হয়, মিথ্যা প্রচার করা হয়, তীক্ষ্ণ তীব্র কৃত্রিম গন্ধ ছড়ানো হয়। কিন্তু কিছু তো করার নেই। ব্যবস্থা যতই কলুষিত হয়ে যাক না কেন, মিলনব্যাকুলদের তো পরস্পরের উদ্দেশে খবর পাঠাতেই হবে। তারা তো বসে থাকতে পারে না। চিকিৎসা ব্যবস্থা যতই কলুষিত হোক, রুগির তো উপায় নেই। তাকে তারই সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে হয়।

আমরা জেনেছি লিঙ্গই জ্ঞানসাধন। তাই কর্মজগতের ছায়াই জ্ঞানজগৎ! সেই কারণে কর্মজগৎ যে রীতিতে চলে, আমাদের মানসিকতাও সেই অনুযায়ী চলতে শুরু করে। সামাজিক উৎপাদন কর্মজগৎ এখনও প্রধানত দু'ভাবে চালানো হয় – সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক। যোজনগন্ধ প্রেরণ-গ্রহণের রীতিও তাই দুই রকমের। ফলিত সমাজতন্ত্র প্রধানত যোজনগন্ধ-সংকোচে বিশ্বাসী, যখন কিনা ধনতন্ত্র

২৪ কে কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি তার একটি তালিকা পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থের [কলিম খানের *দিশা থেকে বিদিশা* গ্রন্থের – *সম্পাদক*] ১৪শ প্রবন্ধে।

প্রধানত যোজনগন্ধ-বিকারে বিশ্বাসী। মূলত দুটি প্রক্রিয়াই আসলে সত্যগোপন। আর সত্যগোপনই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। পুরুষ যে আজ পর্যন্ত প্রকৃতির উপর রাজত্ব করে আসছে তার প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে এই যোজনগন্ধ-সংকোচ বা যোজনগন্ধবিকার, এক কথায় সত্যগোপন।

আজকের পরিস্থিতি কিন্তু ভিন্ন। তথাকথিত সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র সেকেলে হয়ে গেছে। নতুন বিশ্বব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সির ডাক। বলা হচ্ছে সত্যগোপন চলবে না। যোজনগন্ধ-সংকোচও চলবে না, তার বিকারও চলবে না। প্রকৃতি উঠে আসছে সমমর্যাদার দাবি নিয়ে। এবার যোজনগন্ধ হয়ে যাবে স্বাভাবিক, পৌরুষ নেমে আসবে তার স্বাভাবিক লিঙ্গতায় এবং যৌনতা উঠে আসবে তার স্বাভাবিক পবিত্রতায়। পুরুষ-প্রকৃতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে কোনও কোনও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে। ফলে লিঙ্গতা ত্যাগ করছে অহংকার, যৌনতা হারাচ্ছে গ্লানি, স্বাভাবিক হয়ে উঠছে তারা। প্রকৃত যোজনগন্ধের সৌরভ ক্রমশ বাড়ছে। অচিরে জগতের সমস্ত প্রকারের পুরুষ-প্রকৃতি প্রকৃত যোজনগন্ধের সৌরভে আকুলিত হবে, এমন আশা করা যেতে পারে। সব ব্যাপারেই গোপন-গোপন ভাব দূর হবে। যা স্বাভাবিক, তার উপর মিথ্যার আবরণ ভালো কথা নয়। সিস্টেম ডিজাইনিং -এর বা তন্ত্রসাধনার সেটি অন্যতম বাধা। তাই তা ক্রমান্বয়ে বিদূরিত হবে। স্বাভাবিক বিশুদ্ধির (শিবতার) নীতি[২৫] মান্য করে মানুষ ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, আশা করা যাক।

এই রচনাটি নেওয়া হয়েছে কলিম খানের *দিশা থেকে বিদিশায় : নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশ বার্তা* (প্রথম প্রকাশ: ২২শে শ্রাবণ ১৪০৬, কলকাতা: হাওয়া ঊনপঞ্চাশ প্রকাশনী) নামের বই থেকে।

---

২৫ এ প্রসঙ্গে সেলিম রেজা নিউটনের *নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩) গ্রন্থের 'আদিম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কর্তৃত্বনীতি বনাম শিবতার নীতি' শীর্ষক অংশটি (১২২-১৩৪ পৃষ্ঠা) প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। — *সম্পাদক*

লেখক-পরিচিতি

কলিম খান মেদিনীপুরের ডেবরার কাঁসাই নদীর ধারে মামুদাবাদ গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্ম। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি। ছিলেন বিভিন্ন জীবিকায়: শিক্ষকতা, পার্টির হোলটাইমার, কৃষিকাজ, দোকানীর জোগাড়ে, কন্সট্রাকশন-উপদেষ্টা, জমি কেনাবেচা, ইত্যাদি। প্রকাশিত গ্রন্থ: *মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে*, *দিশা থেকে বিদিশায়*, *জ্যোতি থেকে মমতায়*, *পরমাভাষার সংকেত*, *রমাভাষার বোধন-উদ্বোধন* প্রভৃতি। নিজে এবং অধ্যাপক রবি চক্রবর্তীর সাথে যৌথভাবে লিখেছেন আরও কিছু বই।

কাজল ইসলাম তথ্যচিত্রনির্মাতা, বাচিক শিল্পী। জন্ম খুলনায় ১৯৬৬ সালে।

নাসরিন খন্দকার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক এবং এক বাচ্চার মা। পড়ান জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে। হাঙ্গেরির সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনি-ভার্সিটিতে জেন্ডার স্টাডিজ-এ মাস্টার্স শেষ করে এখন আয়ারল্যান্ডের মেইনুথ ইউনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞান বিভাগে পিএইচডি গবেষণা করছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাজগতের ভেতরে ও বাইরে যখন যেমন সুযোগ পান, প্রধানত লিঙ্গীয় সম্পর্ক ও বিদ্যমান সামাজিক অসমতার বিপক্ষে লেখার, বলার এবং সোচ্চার হবার চেষ্টা করেন।

নাসরিন সিরাজ এ্যানী নৃবিজ্ঞানী, গবেষক, লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা।

নিয়ামুন নাহার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধানত চিত্রশিল্পী। ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে পর্যটন করেছিলেন। তখনকার দিনে সংসারকে ভয় করে সংসার থেকে পালিয়ে বেড়াতেন আর তাতেই এতটা ভ্রমণ-অবকাশে নানাপ্রকার সাধুসঙ্গের যোগাযোগ ঘটেছিল তাঁর। তাঁর দীর্ঘ সেই পর্যটনে একমাত্র সঙ্গী ছিল একখানি খাতা, আর একটি পেন্সিল। তার পাতায় পাতায় ছিল গান আর নানা কথা টোকা, আর ছিল সাধুসঙ্গের নানা আলোচনার নোট। আরও ছিল অনেকগুলি সাধুসজ্জনের স্কেচ। তাঁর রচনাগুলো একে একে ১৯৩৬ সাল থেকে প্রকাশ পেতে শুরু করে। পরে সেগুলো গ্রন্থাকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে এবং আরও পরে অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়।

মনিরুল ইসলাম পেশায় চিকিৎসক। ১০ই জুন ১৯৬৫-তে ঢাকায় জন্ম। ছাত্রা-বস্থাতেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। পরবর্তী কালে বাংলাদেশ লেখক শিবির-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জড়িয়ে পড়েন চিন্তা জগতের নানা বিতর্কের সাথে। সেই সূত্রেই লেখালেখির শুরু। প্রায় সব লেখাই প্রকাশিত হয়েছে ছোট কাগজে। আগ্রহের বিষয় বিজ্ঞানের দর্শন, জৈববিবর্তনবাদ এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার জীবতাত্ত্বিক ভিত্তি। তাঁর প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের নাম: *জৈববিবর্তনবাদ: দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ* (এপ্রিল ২০০৭), *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার* (বইমেলা ২০০৮), এবং *নারী-পুরুষ বৈষম্য: জীবতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* (ফেব্রুয়ারি ২০১০)।

মানস চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিছুকাল মিডিয়া অধ্যয়ন ও সংবাদ-আলোকচিত্রেও পড়িয়েছে। তার বাইরে গল্প লেখে, গান গায়, অভিনয় করে, শিস বাজায়, কলাম লেখে, প্রচুর কথা বলে, যা ইচ্ছে তাই করে।

মামুন হুসাইন জন্ম ১৯৬২ সালে কুষ্টিয়ায়। বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মনোরোগবিদ্যা বিভাগে কর্মরত। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ: *শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি*, *মানুষের মৃত্যু হলে*, *কয়েকজন সামান্য মানুষ*, *বালক বেলার কৌশল*, *আমাদের জানা ছিল কিছু*, *নিরুদ্দেশ প্রকল্পের প্রতিভা*, *একটি স্মারকগ্রন্থের জীবনপ্রণালী*, *রাষ্ট্রযন্ত্রের খেলাধূলা*, *কর্ণেল ও কিলিং বিষয়ক এন্ডগেম*, *যুদ্ধাপরাধ ও ভূমিব্যবস্থার অস্পষ্ট বিজ্ঞাপন*, *মামুন হুসাইনের গল্প সংগ্রহ: তিন দশকের দীর্ঘ-ছোট গল্প*। গদ্যগ্রন্থ/জর্নাল: *কথা ইশারা*। উপন্যাস: *নিক্রপলিস*।

মুঈনুদ্দীন আহ্মদ লেখক হিসেবে মুঈনুদ্দীন আহ্মদ তেমন পরিচিত কেউ নন। কদাচিৎ বাংলা-ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ দেখা যায়। সেই হিসেবে তাঁকে অনিয়মিত একজন লেখক বললে মনে হয় ভুল হবে না। মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রতি আগ্রহী এবং আস্থাশীল। ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চাকুরি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। ১৯৫৪ সালের ৩০শে অগাস্ট বরিশাল শহরে পিত্রালয়ে তাঁর জন্ম। আটান্ন সালের গোড়ার দিকে তাঁর আইনজীবী পিতা সপরিবারে ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করেন। সেই থেকে ঢাকা শহরেই তাঁর বেড়ে ওঠা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম ১৮৬১। মৃত্যু ১৯৪১। কবি, গল্পকার, ঔপনাস্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সঙ্গীতস্রষ্টা, চিত্রকর, দার্শনিক। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে। তাঁর রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

রেহনুমা আহমেদ নৃবিজ্ঞানী, লেখক, ইংরেজি *নিউ এজ* পত্রিকার কলামিস্ট।

সায়দিয়া গুলরুখ একজন গবেষক। তাজরীন অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে *একটিভিস্ট নৃবিজ্ঞানী*-র সাথে কাজ করছেন। ইংরেজি দৈনিক *নিউ এইজ* এবং নারীবাদী ব্লগ, *ঠোঁটকাটা*র অনিয়মিত লেখক।

সুস্মিতা চক্রবর্তী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের শিক্ষক। সম্পাদনা করেছেন নারী বিষয়ক ছোটকাগজ *চন্দ্রাবতী* । কাব্যগ্রন্থ: *খোঁয়াড়ের মেয়ে* । গবেষণা-গ্রন্থ: *ফোকলোর ও জেন্ডার*।

সেলিম রেজা নিউটন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জন্ম ১৮৫৩ সালে। মৃত্যু ১৯৩১। বিখ্যাত বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ, সংস্কৃত ভাষা বিশারদ, সংরক্ষণবিদ ও বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ*-এর আবিষ্কর্তা। স্কুল শিক্ষক ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি বেঙ্গল লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বও পালন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হয়েছিলেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও কিজ করেছেন ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। মাঝে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। (*উইকিপিডিয়া* থেকে)

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা

অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ

সেলিম রেজা নিউটন

নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এম এন রায়ের মুক্তিপরায়ণতা প্রসঙ্গে

আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৩

অরুন্ধতী রায়

অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট

অনুবাদ ও সম্পাদনা: সুস্মিতা চক্রবর্তী

আগামী প্রকাশনী ঢাকা ২০১৩

সেলিম রেজা নিউটন

অচেনা দাগ: সম্পর্ক স্বাধীনতা সংগঠন

আগামী প্রকাশনী ঢাকা

প্রকাশিতব্য বইয়ের তালিকা

বিডিআর-বিদ্রোহ: পর্যালোচনা ও নথি

সেলিম রেজা নিউটন

অকুপাই-আন্দোলন: নৈরাজের নৃতত্ত্ব

ডেভিড গ্রেইবার। অনুবাদ: বখতিয়ার আহমেদ

অকুপাই

নোম চমস্কি। অনুবাদ: বদরে মুনীর

ঊনিশ শ চুরাশি

জর্জ অরওয়েল। অনুবাদ: বখতিয়ার আহমেদ

সাইফারপাঙ্কস: ইন্টারনেটের স্বাধীনতা ও ভবিষ্যত

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন

শাহবাগ: পথ ও পরিস্থিতি

সেলিম রেজা নিউটন (সম্পাদিত)

অরাজপন্থা

সেলিম রেজা নিউটন

মানুষ নেটওয়ার্ক

যাঁদের লেখা নিয়ে এই বই:
কলিম খান, কাজল ইসলাম, নাসরিন খন্দকার
নাসরিন সিরাজ এ্যানী, নিয়ামুন নাহার
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনিরুল ইসলাম, মানস চৌধুরী
মামুন হুসাইন, মুঈনুদ্দীন আহমদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রেহনুমা আহমেদ, সায়দিয়া গুলরুখ
সুস্মিতা চক্রবর্তী, সেলিম রেজা নিউটন
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ISBN 978-984-8875-18-6
9 789848 875186